পতঞ্জলি প্রণীত

ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

পস্পশাহ্নিক

বঙ্গানুবাদ বিবৃতি ও পাদটীকা-সমন্বিত

অনুবাদক ও সম্পাদক

দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম
কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

প্রকাশক :—
দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসঙ্ঘ
আদ্যাপীঠ, কলিকাতা— ৭৬

প্রাপ্তিস্থান

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ নং বিধান সরণি, কলিকাতা ৭০০০০৬
২। আদ্যাপীঠ

মুদ্রণ :—
শ্রীঅরুণ রায়
শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫৪।১বি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৭০০০০৪

বিষয়সূচিকা

			পৃষ্ঠা
ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন	...	...	১—৫৬
ব্যাকরণাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন	...	...	৫৭—১৩৭
শব্দানুশাসনের কর্তব্যতা	...	...	১৩৮—১৪৭
শব্দোপদেশের কর্তব্যতার প্রকার	...	...	১৪৮—১৬২
পদের অর্থ	...	...	১৬৩—১৬৭
শব্দের নিত্যত্ব ও কার্যত্ব	...	...	১৬৮—১৭০
শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব	...	...	১৭১—১৮৬
জাতি ও ব্যক্তির পদার্থত্ব	...	...	১৮৭—২০১
অনাদি ব্যবহার দ্বারা শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যতা	...	..	২০১—২০৬
ব্যাকরণশাস্ত্রে ধর্মনিয়ম	...	..	২০৭—২১৮
শব্দের অপ্রযুক্তত্বের আক্ষেপ ও সমাধান	...	...	২১৯—২৩৩
শব্দের জ্ঞান ও প্রয়োগের ধর্মজনকতা	...	...	২৩৪—২৫১
ব্যাকরণশব্দের অর্থ	...	..	২৫১—২৬৯
বর্ণোপদেশের প্রয়োজন	...	...	২৬৯—২৯১

উপক্রমণিকা

জগদ্গুরুনবরত্নমালাস্তব, যতিসার্বভৌমোপহার, বালমনোরমা, নটরাজস্তব, নটেশবিজয়, পাতঞ্জলবিজয় পূণ্যশ্লোকমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ জানা যায়। প্রাচীন কালে 'পণী' নামেএক মুনি ছিলেন। তিনি 'পাণিন' নামক এক পুত্রলাভ করেন। পণী মুনি তাঁর পুত্র 'পাণিনকে' দক্ষের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। কালক্রমে দাক্ষীর গর্ভে পাণিনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রের নাম হয় পাণিনি। তিনি কার্তিকের মত রূপবান ছিলেন। পাণিনি কঠোর তপশ্চরণ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে নিজ হস্তে স্থিত ডমরুতে চতুর্দশবার দণ্ডাঘাত করেন। পাণিনি মুনি শব্দসমূহের ব্যাকরণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মহাদেবের চতুর্দশবার ডমরুধ্বনি জনিত ১৪টি সূত্রকে তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের আদিসূত্র করে মহাদেবের অনুগ্রহে তাথেকে সূত্রসমূহ রচনা পূর্বক শব্দ সমূহের ব্যাকরণ করলেন। তারপর কাত্যায়ন মুনি মহাদেবের কঠোর তপস্যা করে পাণিনি সূত্রের পদার্থের বোধকরূপে বার্তিকগ্রন্থ রচনা করেন। কোন একসময়ে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁর শয্যারূপী শেষ নাগকে [অনন্ত নাগ] বলেন আমি একবার মহাদেবের নৃত্য দর্শন করেছিলাম ; সেই নৃত্য স্মরণ করে আমার পরম আনন্দ হচ্ছে, আনন্দে আমার শরীরের ভার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েগেছে, তুমি আমাকে বহন করছ, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। আর তুমি দীর্ঘ কাল আমাকে বহন করেছ, তুমি মহাদেবের নৃত্যদর্শন কর, তোমার পুত্র তখন আমাকে বহন করবে। তুমি তপস্যা কর,তপস্যায সন্তুষ্ট হলে মহাদেব তোমাকে দর্শন দিবেন এবং তাঁর নৃত্য তোমাকে দর্শন করাবেন। আর তুমি পাণিনি সূত্রের দুরূহ বার্তিকের উপর ভাষ্যরচনা কর। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়েই তোমকে ভাষ্যরচনায় নিযুক্ত করবেন। এইভাবে ভগবানের কথায় আনন্দিত হয়ে ফণিপতি মহাদেবের নৃত্য দর্শন মানসে এবং তাঁর নিয়োগ পাবার অভিপ্রায়ে পৃথিবীতে নিজের অবতরণের যোগ্য মুনিবংশ অন্বেষণ করতে লাগলেন। তখন পৃথিবীতে গোণিকা নাম্নী অতি গুণবতী

এক রমণী পুত্রের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দারুণ তপস্যায় কালাতিবাহন করছিলেন। একদিন সেই রমণী সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিবার জন্য অঞ্জলি পুটে পবিত্র জল গ্রহণ করে চক্ষুঃ নিমীলনপূর্বক আদিত্যের ধ্যান করতে লাগলেন; মনে মনে আদিত্যের নিকট প্রার্থনা করলেন—'হে আদিত্যদেব! আমাকে বিদ্বান্ পুত্র প্রদান করুন।' তখন আদিত্যের আদেশে নিযুক্ত হয়ে ফণিপতি সেই রমণীর অঞ্জলি জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। তারপর যখন সেই 'গোণিকা' রমণী সূর্যের উদ্দেশ্যে অঞ্জলির জল নিঃক্ষেপ করলেন তখন সেই জল থেকে ফণিপতি তপস্বীর আকৃতিরূপে পতিত হলেন। তখন গোণিকাদেবী আনন্দিতা হয়ে, আমার পুণ্যের ফলে অগ্নির মত তেজস্বী আমার পুত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছে বলে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। পুত্র জননীকে প্রণাম করলেন, প্রণাম করার সময় জননী 'অঞ্জলি থেকে পতিত হয়েছে' বলে পুত্রের নাম পতঞ্জলি রাখলেন এবং পুত্রকে সেই নাম শুনিয়ে দিলেন। পুত্র পতঞ্জলি জননীকে প্রণাম করে বললেন—মা—আমি আপনার নিকট আসব, এখন তপস্যায় যাচ্ছি। এই বলে পুত্র তপস্যার জন্য চলে গেলেন এবং দুষ্কর তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মহাদেব উমার সহিত বৃষভে আরোহণ করে, পতঞ্জলির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হয়ে বললেন—হে শেষ! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে বর দিবার জন্য এসেছি, তুমি বর চাও। ফণিপতি মহাদেবের কথায় প্রথমে পাণিনি সূত্র ও বার্তিকের উপর ভাষ্যরচনার পটুতাবর প্রার্থনা করে মহাদেবের নৃত্যদর্শন করবার যোগ্যতা প্রার্থনা করলেন। তখন মহাদেব তাঁকে তথাস্তু বলে বর প্রদান করে বললেন বৎস ফণিপতে! তুমি এই বনপথে চিদম্বরক্ষেত্রে গমন কর। আমি তোমাকে সেখানে আমার নাট্যলীলা সন্দর্শন করাব। এই কথা বলে মহাদেব অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তখন পতঞ্জলি মহাদেবের নাট্যদর্শনলোভে চিদম্বরে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মাকর্তৃক রচিত মহাদেবের নাট্যোপযোগী স্বর্ণময় সভা সন্দর্শন করলেন। তারপর দেখলেন মহাদেব বৃষ থেকে অবতরণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাদেব কৃপাপূর্বক পতঞ্জলিকে এবং ব্যাঘ্রপাদ্ নামক অপর ঋষিকে দিব্যচক্ষুপ্রদান করে বললেন, তোমরা আমার নৃত্যসন্দর্শন কর। তখন তাঁরা এবং আরও কয়েকজন ঋষি ও কয়েকজন দেবতা মহাদেবের নৃত্যদর্শন করে ধন্য হলেন। তারপর পতঞ্জলি জগতের

উপকারের জন্য পাণিনিসূত্র ও বার্তিকের উপর মহাভাষ্য রচনা করলেন। তখন হাজার হাজার ছাত্র সেই ভাষ্য পড়বার জন্য পতঞ্জলির কাছে উপস্থিত হলেন। পতঞ্জলি তখন একটা যবনিকার মধ্যে থেকে হাজার হাজার ছাত্রকে নিজের সহস্রমুখে ভাষ্য পড়াতে লাগলেন এবং বললেন ; তোমরা আমার এই পর্দা উঠাবে না বা এর মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করবে না। পতঞ্জলি পাঠের পূর্বে এবং শেষে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে ভাষ্য পড়াতেন। শিষ্যেরা এইভাবে পড়ছিল। একদিন শিষ্যদের বিস্ময় হল, গুরুদেব কি করে একমুখে যুগপৎ আমাদের সকলকে, ভাষ্য পড়ান। শিষ্যেরা কৌতূহল বশত পর্দা উঠিয়ে পতঞ্জলির সহস্রফণা সমন্বিত সর্পরূপ যেই দেখেছে, অমনি পতঞ্জলির দৃষ্টিমাত্রে তারা ভস্মীভূত হয়ে গেল। একশিষ্য সেই সময় বাহিরে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে দেখে সতীর্থেরা ভস্মীভূত। তখন সে পতঞ্জলিকে বলল প্রভু আমি পর্দা উঠাই নাই। আমি বাহিরে গিয়েছিলাম। তখন পতঞ্জলি বললেন কেন তুমি শান্তিমন্ত্র শেষ হবার পূর্বে আমাকে না বলে বাহিরে গিয়েছিলে— তুমি রাক্ষস হও। তখন সে অনেক অনুনয় বিনয় করে পতঞ্জলিকে প্রসন্ন করলে পতঞ্জলি বললেন—আমার কথা অন্যথা হবে না। তবে তুমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করবে পচ্ ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ে কিরূপ হয়। যখন কোন লোক 'পক্ব' এইরূপ প্রকৃত উত্তর দিবে, তখন তুমি রাক্ষস থেকে মুক্ত হবে— এবং তুমি আমার এই মহাভাষ্য জগতে প্রচার করবে—এই বলে পতঞ্জলি অন্তর্হিত হলেন।

তারপর পতঞ্জলি গোনর্দাখ্য দেশে গিয়ে জননী গোণিকাকে প্রণাম করলেন। কিছুকাল পরে তাঁর জননী স্বর্গারোহণ করলেন। তখন পতঞ্জলি কিছুকাল নিজ দেশে বাস করলেন। এদিকে পতঞ্জলির সেই শিষ্য রাক্ষস হয়ে এক বটগাছে বাস করল। সেই বটগাছের পাস দিয়ে যে যায় তাকে রাক্ষস জিজ্ঞাসা করত পচ্ ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ে কিরূপ হবে। কেউই ঠিক উত্তর বলতে পারতো না। অনেকে 'পচিতম্' এই উত্তর করত। যারা 'পচিতম্' উত্তর করতো রাক্ষস তাদের খেয়ে ফেলত। এইভাবে বহুদিন যাওয়ার পর এক ব্রাহ্মণ সেই বটগাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। রাক্ষস তাঁকে জিজ্ঞাসা করল পচধাতুর ক্ত প্রত্যয়ে কিরূপ হবে। সেই ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন

"পক্কম্"। ব্রাহ্মণের এই উত্তর শুনে রাক্ষস আনন্দে বটগাছ থেকে নেমে এল। তার খুব আনন্দ হল। সে বুঝলো আমার শাপ শেষ হয়ে গেল। এই মনে করে সে ব্রাহ্মণকে বলল, আপনি কে? কিজন্যই বা এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আপনি আমার নিকট ফণি ভাষ্য অধ্যয়ন করুন। রাক্ষস এই কথা বললে— সেই ব্রাহ্মণ বললেন আমার নাম চন্দ্রশর্মা' আমার বাসস্থান উজ্জয়িনীতে। হাঁ আপনার নিকট ফণিভাষ্য অধ্যয়ন করব। রাক্ষস শুনে সন্তুষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয়ে ভোজন ও নিদ্রা ত্যাগ করে দুইমাসকাল নিরন্তর রাক্ষসের কাছথেকে সমগ্র ফণিভাষ্য শুনলেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যতটা শুনতেন, সেটা বটপাতায়, নিজের নখের দ্বারা লিখে রাখতেন। অনন্তর রাক্ষস, রাক্ষসশরীর পরিত্যাগ করে দিব্যমূর্তি ধারণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকে বললেন তুমি সুখে পৃথিবীতে বিচরণ করে এই ফণিভাষ্য প্রচার কর। এই কথাবলে সেই পতঞ্জলি শিষ্য হিমালয়ে এসে স্বর্গগমন করলেন এবং দিব্যদেহে শুকমুনির শিষ্য গৌড়পাদাচার্য হলেন। এদিকে সেই চন্দ্রশর্মা ব্রাহ্মণ নখলিখিত বটপাতাগুলি নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে লাগলেন। রাস্তায় যেতে যেতে পথে এক সুন্দর নদী দেখে—সেই নদীর জলপান করে সেই নদীর তীরস্থিত এক বৃক্ষমূলে বস্ত্রের মধ্যে বটপাতাগুলি বেঁধে, সেটা মাথায় দিয়ে শ্রম দূরকরার জন্য শুয়ে পড়লেন। শোয়ামাত্রই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন এক বৎস [বাছুর] খাদ্য মনে করে তাঁর মাথার নীচেথেকে সেই কাপড়ে বাঁধা বটপাতা-গুলি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করছে; এমন সময়ে ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি বাছুরের মুখ থেকে সেই বট পাতাগুলি টেনে নিলেন। নিয়ে দেখলেন, কিছু কিছু লেখা বটপাতায় সেই বাছুরের দাঁত সংযুক্ত হওযায় কিছু কিছু অক্ষর বিকল হয়ে গেছে। তারপর সেই ব্রাহ্মণ চলতে চলতে সিন্ধু নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, সেখানে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে উপবেশন করলেন। তখন এক কন্যা তাঁকে নবনীত ভক্ষণ করতে দিলেন এবং বললেন আমাকে কোন তপস্বী বলেছেন, আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ হবে। সুতরাং আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ইত্যাদি। তারপর সেই কন্যার সহিত তাঁর বিবাহ হলো। সেই কন্যার গর্ভে তাঁর দেবোপম পুত্র হলো। কোন একসময় সেই ব্রাহ্মণ বটপাতায় লিখিত সেই ভাষ্যপঙ্‌ক্তিগুলি মেলাবার জন্য সেগুলিকে বের করে দেখতে লাগলেন, মাঝে মাঝে বৎসকর্তৃক ভক্ষিত

হওয়ায়, তিনি সেই সেই স্থানে বেড়া পাঠ বলে লিখে রাখলেন। এইজন্য শোনা যায় মহাভাষ্যের স্থানে স্থানে পাঠ মিলে না।

তারপর সেই চন্দ্রশর্মা ব্রাহ্মণ সংসার ত্যাগ পূর্বক চতুর্থাশ্রমে গৌড়পাদাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গোবিন্দপাদ নামে খ্যাত হলেন। এই গোবিন্দপাদের শিষ্য হচ্ছেন ভগবান্ শঙ্করাচার্য। বিদ্যারণ্য মুনির মতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য পতঞ্জলি মুনির শিষ্য।

— ——

ভূমিকা

নব্যমতাবলম্বীদের মতে পাণিনি, কাত্যায়ন, যাস্ক প্রভৃতি শব্দ গ্রন্থকারগণের ব্যক্তিগত নাম নয়। প্রাচীনকালে এই সকল শব্দ বংশের পরিচায়করূপে ব্যবহৃত হয়ে গ্রন্থকারগণেরও নামরূপে প্রচলিত হোত। এইভাবে ঠিক চাণক্য বা কৌটিল্য নামও ব্যক্তিগত নাম নয়। কিন্তু ঐ নামও বিষ্ণুগুপ্তের বংশগত নাম। যাস্ক শব্দটি যস্কের অপত্য এইরূপ অর্থে [যস্কস্যাপত্যং যাস্কঃ। শিবাদ্যণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্ ৪।১।১১২ সিদ্ধান্তকৌমুদী অপত্যাধিকার)] নিষ্পন্ন হয়েছে। অমরকোষে অপত্য শব্দকে পুত্র ও কন্যার বাচকরূপে লেখা হয়েছে [আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ স্ত্রিয়াং ত্বমী। আহুর্দুহিতরং সর্বেঽপত্যং তোকং তয়োঃ সমে—অমরকোষ-মনুষ্যবর্গ] বটে কিন্তু পতঞ্জলি বলেছেন "যার দ্বারা পূর্বপুরুষদের পতন হয় না তাঁকেই অপত্য বলে"(১) এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বংশের পরবর্তী যে কোন সন্তান পূর্বপুরুষের অপত্য হয়।

পাণিনির গণপাঠে শিবাদির মধ্যে বর্তমানে যস্ক শব্দের প্রচলন না দেখতে পেলেও পাণিনি 'যস্কাদিভ্যো গোত্রে" [পাঃ সূঃ ২।৪।৬৩] এই সূত্রে যস্ক শব্দের উল্লেখ করেছেন। উক্তসূত্রের অর্থ এইরূপ—অপত্যের বহুত্ব অর্থ বুঝালে যস্ক প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে যে প্রত্যয় হয়, তার লুক্ হয়। যস্কবংশীয় এক অথবা দুইজন ব্যক্তি বুঝালে 'যাস্ক' এইরূপ প্রয়োগ হবে, কিন্তু

---

(১) "অপত্যশব্দঃ ক্রিয়ানিমিত্তো ন তু আত্মজপর্যায়ঃ। 'ন পতন্ত্যনেনেত্যপত্যম্' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ "পঙ্‌ক্তি বিংশতি" ইতি সূত্রে [৫।১।৫৯] ভাষ্যকৃতা দর্শিতত্বাদ্ বাহুলকাৎ করণে যৎ প্রত্যয়ঃ। যন্নিমিত্তঃ যস্যাপতনং তত্তস্যাপত্যমিতি ফলিতোঽর্থঃ। তথা চ পৌত্রাদিরপি পিতামহাদীনামপতনে হেতুরিতি তেষামপত্যত্বং ভবতি। প্রসিদ্ধং চ ব্যবহিতোঽপি পিতামহাদীনামুদ্ধর্তেতি কয়ংকার্বাদীনামুপাখ্যানেষু "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতী" তি (৪।১।১৬২) সূত্রমপাত্রানুগুণম্।...অমরস্তু সূত্রভাষ্যাদি বিরোধাদুপেক্ষ্যঃ"—তত্ত্ববোধিনী অপত্যাধিকার। প্রৌঢ়মনোরমা এবং শব্দেন্দুশেখরেও এই প্রকার কথা বলা হয়েছে। ৪।১।৯৩ সূত্রে পদমঞ্জরীতেও এই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পুত্রা অপত্যমিত্যপতনাদপত্যম্—মহাভাষ্য ৫।১।৫৯।

যস্কবংশীয় বহু ব্যক্তি বুঝালে 'যাস্ক' এইরূপ প্রয়োগ হবে না কিন্তু 'যস্ক' এইরূপ প্রয়োগ হবে। কারণ অপত্য অর্থে বহুবচনে অণ্ প্রত্যয়ের লুক্ হয়ে যাবে।

পাণিনি তাঁর সূত্রপাঠে ও গণপাঠে অনেক ঋষির নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরা যে সকলেই গ্রন্থকার ছিলেন তা নয়। কিন্তু সেইসব ঋষি ব্যাকরণের তৎকাল প্রচলিত শব্দ সম্বন্ধে যেরূপ মত পোষণ করতেন, সেইমত দেখাবার জন্য পাণিনি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগ দ্বারা শব্দার্থ বুঝাতে প্রসঙ্গক্রমে সেই সকল ঋষির নামোল্লেখ করেছেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে পাণিনি বংশপ্রবর্তক যস্ক ঋষির নাম জানতেন, কিন্তু সেই বংশের যে ব্যক্তি নিরুক্ত রচনা করেছেন তিনি যে পাণিনির পূর্ববর্তী, তাতে কোন প্রমাণ নাই। মূলপুরুষ যস্ক ঋষির অপত্য অর্থে "যাস্ক" শব্দ নিষ্পন্ন এইটা দেখানই পাণিনির অভিপ্রায়। সেই যাস্ক পাণিনির পরবর্তী হলেও কোন অনুপপত্তি হয় না।

বরং নিরুক্তকার যাস্ক যে পাণিনির পরবর্তী এবিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে—যাস্কের উক্তি। যাস্ক তাঁর নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের ১৭শ খণ্ডে "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা" [পাঃ সূঃ ১।৪।১০৯] এই পাণিনির সূত্রটিকে অবিকল উদ্ধৃত করেছেন (২)।

আশঙ্কা হতে পারে যে 'যাস্ক পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু পাণিনির পূর্ববর্তী কোন বৈয়াকরণের রচিত সূত্রই উদ্ধৃত করেছেন। পাণিনিও সেই পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের সূত্রটি অবিকল উদ্ধৃত করেছেন।

এর উত্তরে বক্তব্য এই যে—এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের সূত্রই পাণিনি উদ্ধৃত করছেন এরূপ কল্পনাতে কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বিষয় প্রমাণিত করতে গেলে দেখাতে হবে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে আরও দু একটি সূত্র, অন্য ব্যাকরণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তা আর কেউ দেখাতে পারবেন না। এইজন্য পাণিনির সূত্রগুলি তাঁর নিজের রচিত—এটাই দৃঢ় ভাবে সিদ্ধ হয়।

---

(২) যাস্ক যেমন পাণিনির "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা" সূত্রের উদ্ধৃতি করেছেন সেইরূপ শৌনকের প্রাতিশাখ্যেরও উদ্ধৃতি করেছেন।

যথা:—"পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা" [ঋক্প্রাতিশাখ্য ২।১]। আর একটি বচনও উদ্ধৃত করেছেন—"পদপ্রকৃতীনি সর্বচরণানাং পার্ষদানি।"

অতএব যাস্কই পাণিনিসূত্র ও প্রতিশাখ্য অবিকল উদ্ধৃত (৩) করেছেন। যাস্ক পাণিনির পরবর্তী হলেও পতঞ্জলির পূর্ববর্তী। কারণ মহাভাষ্যে নিরুক্তের দু চারটি কথার প্রতিধ্বনি দেখা যায়। যেমন নিরুক্তকার বলেছেন—"তান্যে-তানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ (১৷১৷৮)। মহাভাষ্যে ঐকথা মার্জিত ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে "চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপ সর্গনিপাতাশ্চ" (মহাভাষ্য—পস্পাশাহ্নিক)। এখানে নিরুক্তকার দুটি সমাসের উল্লেখ করেছেন, মহাভাষ্যকার একটি সমাসের উল্লেখ করে সকলকে চমৎকৃত করেছেন। এর দ্বারাও পতঞ্জলি যাস্কের পরবর্তী বলে প্রমাণিত হয়। কারণ পরবর্তিকালেই ভাষা প্রভৃতির মার্জিত অবস্থা দেখা যায়। পাণিনিতে কিন্তু এই চারিপ্রকার পদবিভাগের কোন ইঙ্গিত দেখা যায় না।

নিরুক্তকার আরও বলেছেন—"তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ" অর্থাৎ সমস্ত নাম বা প্রাতিপদিক আখ্যাত (ধাতু) হতে উৎপন্ন—ইহা (৪) শাকটায়ন [একজন বৈয়াকরণ ঋষি] বলেছেন এবং ইহা নিরুক্তবিদ্‌গণের সম্মত। মহাভাষ্যকার এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন—"নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্ (মহাভাষ্য ৩৷৩৷১)। আবার তিনি [পতঞ্জলি] নিজেই ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন "নাম খল্বপি ধাতুজম্। এবমাহুর্নৈরুক্তাঃ। বৈয়াকরণানাং শাকটায়ন আহ ধাতুজং নামেতি।" অর্থাৎ নাম ধাতুজাত একথা নিরুক্তকারিগণ বলেন। বৈয়াকরণদের মধ্যে শাকটায়নও বলেন নাম ধাতুজাত। এখানে দেখা যাচ্ছে নিরুক্তকারের ভাষা থেকে মহাভাষ্যকারের ভাষা প্রাঞ্জল। নিরুক্তকার প্রথমে [১৷১৷১২]

---

(৩) যাস্ক, পাণিনি বা প্রাতিশাখ্যের পংক্তি অবিকল উদ্ধৃত করলেও আকরস্থান নির্দেশ করেন নাই বা সেইসব গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে যাস্কের সময় ব্যাকরণশাস্ত্র বেশ পরিপুষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিল, যেজন্য যাস্ক বলেছেন—"তদিদং বিদ্যাস্থানং (নিরুক্তং) ব্যাকরণস্য কার্ৎস্যম্।" অর্থাৎ এই নিরুক্তরূপ বিদ্যাস্থান [বেদার্থজ্ঞানের উপকারক] ব্যাকরণ শাস্ত্রের সমগ্রতা। ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বরূপ হচ্ছে নিরুক্ত। যাস্ক নিরুক্তে [১৷১২৷৩] বৈয়াকরণদের মত প্রদর্শন করে অবৈয়াকরণকে নিরুক্ত শাস্ত্রোপদেশের অযোগ্য বলছেন। পাণিনির সূত্র বা কাত্যায়নের বার্তিকে নিরুক্ত সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখা যায় না। কেবল মহাভাষ্যে [৩৷৩৷১] নিরুক্তের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৪) পাণিনির সূত্রে শাকটায়নের উল্লেখ আছে [৮৷৩৷১৮, ৮৷৪৷৫০]। পরবর্তীকালে শাকটায়ন নামে একজন জৈন বৈয়াকরণ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থও মুদ্রিত হয়েছে। ভট্টোজীদীক্ষিত এই পরবর্তী শাকটায়নকে প্রৌঢ়মনোরমা গ্রন্থে "অভিনব শাকটায়ন" বলে উল্লেখ করেছেন।

আখ্যাত শব্দের তিঙ্‌বিভক্তি যুক্ত অর্থ (৫) করেছিলেন কিন্তু পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে "আখ্যাতজানি" অংশের উল্লেখ থাকায় তিঙ্‌বিভক্তিযুক্তপদের অংশ যে ধাতু, তাকে আখ্যাত বলে বুঝিয়েছেন। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে নাম ধাতুজাত। এতে নিরুক্তকারের উক্তিতে অস্পষ্টতা থেকে গেছে। কিন্তু মহাভাষ্যকার বলেছেন—"নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে।" এতে মহাভাষ্যকারের স্পষ্ট উক্তি দেখা যাচ্ছে।

নিরুক্তকার তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে বলেছেন—"ষড্‌ভাববিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণির্জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি।" এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বার্ষ্যায়ণি নামে এক অতি প্রাচীন আচার্য ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ যাস্কের সময় ছিল। কিন্তু এখন সেইগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং সেইগ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। মহাভাষ্যকারও বলেছেন "ষড্‌ ভাববিকারা ইতি হ স্মাহ বার্ষ্যায়ণিঃ জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽ পক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি" [মহাভাষ্য ১।৩।১]। যাস্কের উক্তি দেখলে মনে হয় তাঁর সময় বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ ছিল। কিন্তু পতঞ্জলির উক্তি দেখে মনে হয়, তাঁর সময় বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ ছিল না।

যাস্ক পাণিনির পরবর্তী হলেও বার্তিককার কাত্যায়নের পরবর্তী নন। কারণ পাণিনি অরণ্যশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যানী শব্দের সাধন করেছেন [অষ্টাধ্যায়ী ৪।১।৪৯]। যাস্ক অরণ্যের পত্নী অর্থে অরণ্যানীশব্দের সাধন করেছেন। [নিরুক্ত ৫।২৯—অরণ্যানী—অরণ্যস্য পত্নী]। কিন্তু বার্তিককার অরণ্যানী শব্দের মহৎ অরণ্য অর্থ করেছেন। শব্দের ব্যবহার কালে কালে পরিবর্তিত হয়। পাণিনি ও যাস্কের সময়ে অরণ্যের স্ত্রী অর্থে অরণ্যানী শব্দের ব্যবহার হোত। বার্তিককারের সময় সেই অর্থে অরণ্যানী শব্দের প্রয়োগ হোত না—এটাই অনুমান করা যায়। যারজন্য বার্তিককার মহৎ অরণ্য অর্থে অরণ্যানীশব্দ সিদ্ধ করবার জন্য বার্তিকরচনা করেছেন। পাণিনি একই সূত্রে ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অরণ্যশব্দের পাঠ করেছেন। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী শব্দ সিদ্ধ হয়। এই সকল শব্দের সহিত অরণ্যশব্দ পঠিত হওয়ায় অরণ্যের স্ত্রী অরণ্যানী এই শব্দ সিদ্ধ হয় বলেই অনুমান করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তা না হলে পাণিনি

---

(৫) পূর্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতি পচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তম্‌ [নিরুক্ত ১।১।১]

ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সাধারণভাবে একই সূত্রে অরণ্যশব্দের গ্রহণ না করে অরণ্যানীশব্দের সিদ্ধির জন্য ভিন্ন সূত্রের রচনা করতেন। পূর্বেই বলেছি একটি নির্দিষ্ট অর্থেই একটি শব্দের চিরকাল প্রয়োগ হয় না। নতুন ভাষায় যেমন কালে কালে অর্থভেদে শব্দের ব্যবহার বদলে যায় সেইরূপ প্রাচীন ভাষায়ও কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অনেক শব্দের ব্যবহার হয়। বৈদিক ভাষায় পূর্বে কর্ম অর্থে ধী শব্দের (৬) ব্যবহার হোত এখন সেরূপ হয় না। কর্ম অর্থে বেদে (৭) শক্তি শব্দেরও ব্যবহার হয়েছে, এখন সেরূপ হয় না। সামর্থ্য অর্থে শক্তি শব্দের (৮) ব্যবহার বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়। নিঘণ্টুতে কর্মনামের মধ্যে শিল্প শব্দ (৯) পঠিত হয়েছে। পাণিনি কলাকৌশল অর্থে শিল্প শব্দের (১০) প্রয়োগ করেছেন।

লৌকিক সংস্কৃতেও অনেক শব্দের পূর্বব্যবহৃত অর্থের পরিবর্তন হয়ে গেছে। পাণিনিব্যাকরণে ব্যবধান অর্থে ব্যবায়শব্দের (১১) প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বমীমাংসাতেও 'ব্যবধান অর্থে ব্যবায় শব্দের (১২) প্রয়োগ দেখা যায়। অমরকোষে ব্যবায় শব্দের (১৩) যৌনসংযোগ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এইরূপ পাণিনি ইচ্ছা অর্থে মতি শব্দের (১৪) ব্যবহার করেছেন, পরবর্তিকালে বুদ্ধি অর্থে মতি শব্দের (১৫) ব্যবহার করা হয়েছে। এইজন্য বৈয়াকরণগণ বলেন—"সর্বে সবার্থবাচকাঃ।" অর্থাৎ সব শব্দ সব অর্থের বাচক।

শব্দের অর্থ এইভাবে কালে কালে পরিবর্তিত হয় বলে বার্তিককার

---

(৬) নিঘণ্টু ২য় অধ্যায়। (৭) নিঘণ্টু ২য় অধ্যায়। স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভী রোদসিপ্রাম্। তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ॥ [ঋক্‌সংহিতা ৮।৪।১১।৫]। শক্তিভিঃ=কর্মভিঃ। নিরুক্ত ৭।২৮।১।

(৮) শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ [বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ৩।২]

(৯) নিঘণ্টু ১১শ অধ্যায়। (১০) অষ্টাধ্যায়ী ৪।৪।৫৫। শিল্পং কৌশলম্, কাশিকা। কৌশলমিতি ক্রিয়াভ্যাসপূর্বকো জ্ঞানবিশেষঃ। পদমঞ্জরী।

(১১) অষ্টাধ্যায়ী ৮।৩।২ ; ৩৮।

(১২) জৈমিনিসূত্র ২।১।৪৯।

(১৩) ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্মো মৈথুনং নিধুবনং রতম্। [অমরকোষ ২ কাঃ ব্রঃ বর্গ ৫৭

(১৪) অষ্টাধ্যায়ী ৩।২।১৮৮

(১৫) অমরকোষ প্রথম কাণ্ড ধীবর্গ ১।

কাত্যায়নের সময় অরণ্যানী শব্দ মহারণ্য অর্থে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অবশ্য এখনও সেই অর্থে অরণ্যানী শব্দের ব্যবহার হয়। পাণিনি তৎপ্রণীত অষ্টাধ্যায়ীতে কোন প্রসঙ্গেও সুস্পষ্টভাবে দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করেন নাই। কিন্তু কাত্যায়নের বার্তিকে দার্শনিক বিষয়ের বিচার দেখা যায়। কাত্যায়ন তাঁর প্রথম বার্তিক গ্রন্থেই শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধের নিত্যতা (১৬) প্রতিপাদিত করেছেন। যাস্কও তাঁর নিরুক্তগ্রন্থের প্রারম্ভে দার্শনিক বিচারের অবতারণা করে শব্দের নিত্যতার উল্লেখ করেছেন (১৭)। বার্তিককার কাত্যায়ন পাণিনির সূত্রের উপর নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গে অনেক প্রকার বিচারের উত্থাপন করেছেন। যাস্কও তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে অনেক বিচার প্রণালীর প্রদর্শন করেছেন (১৮)। এই ধরণের বিচারপদ্ধতি পাণিনির পরবর্তিকালে উদিত হয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রযুগের গ্রন্থ। সূত্র যুগে সূত্রসকলই বহু অর্থের সূচকরূপে রচিত হয়েছিল। যাস্কের নিরুক্তে নানাপ্রকার বিচারের অবতারণা দেখেও নিশ্চয় করা যায় যে যাস্ক পাণিনির পরবর্তী।

দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে জাত কাশ্মীরদেশীয় সোমদেব ভট্টের রচিত কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেছেন "পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক। ক্যাত্যায়ন পাণিনির সূত্রের অনেক সংস্কার করেছেন।"

কিন্তু এটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কথাসরিৎসাগরের গল্পের প্রামাণ্য যথেষ্ট শিথিল। কাত্যায়ন পাণিনির সূত্রের উপর

(১৬) "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে"। [কাত্যায়ন বার্তিক—পস্পশাহ্নিক মহাভাষ্যে উদ্ধৃত]। আচার্য ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলেছেন—সূত্র, বার্তিক ও ভাষ্যের প্রণেতা তিনজন ঋষি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, শব্দ, অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধকে নিত্য বলেছেন; [বাক্যপদীয় ১।২৩]।

(১৭) নিরুক্ত ১।২

(১৮) নিরুক্ত ১।১২ এই স্থলে নাম যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে—নিরুক্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত রূপে তা সমর্থন করা হয়েছে। নিরুক্তের ১।১১ গ্রন্থে, বেদের মন্ত্রের অর্থ আছে, মন্ত্র সকল নিরর্থক শব্দসমষ্টি নয়—এই সিদ্ধান্তকে বিচার দ্বারা স্বীকৃত করা হয়েছে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের সূত্রে এবং শাবরভাষ্যেও মন্ত্রের অর্থ আছে—এই বিষয়ে বিচার করা হয়েছে। নিরুক্ত ৭।৪—গ্রন্থে দেবতাসম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে।

প্রায় ৪০০০ বার্তিক রচনা করেছিলেন। কাত্যায়ন যেমন অরণ্যাণী শব্দের অর্থের পরিবর্তন দেখে বার্তিক রচনা করেছেন, সেইরূপ পাণিনি যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ দেখে সূত্র রচনা করেছিলেন, বার্তিককার তাঁর সময়ে সেই শব্দের সেই অর্থের পরিবর্তন দেখে অন্য অনেক স্থলেও বার্তিক রচনা করেছেন এবং অনেকস্থলে পাণিনিসূত্র দ্বারা যে শব্দের যে আকার সিদ্ধ হতে পারত, বার্তিককার তার আকারেরও পরিবর্তন করেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনিকে 'প্রমাণভূত আচার্য" বলেছেন। এইরূপ প্রামাণিক আচার্য পাণিনির সূত্রের সংশোধন তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন বৈয়াকরণ করে দিবেন এটা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে পাণিনির সময়ে যে ভাবে ভাষার প্রচলন ছিল, পরবর্তিকালে তার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কাত্যায়ন সেটা লক্ষ্য করে তদনুযায়ী বার্তিক রচনা করেন। তার দ্বারা পাণিনির সূত্রের সংস্কার হয়েছে বলা যেতে পারে। অতএব কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্তী ইহাই সিদ্ধ হয়। কাত্যায়নের অনেক পরবর্তিকালে কাশিকাকার ভাষার এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করে সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই সংস্কার বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তারও বহু পরবর্তিকালে ভট্টোজী দীক্ষিতের উক্ত সংস্কারসাধন ফলবৎ হয়েছে।

কাত্যায়ন যদি পাণিনির সমসাময়িক হতেন, তা'হলে তিনি পাণিনির ব্যাকরণের সংস্কার না করে নিজে স্বতন্ত্র একটি ব্যাকরণ রচনা করতেন। কারণ অপরের ব্যাকরণের সংস্কার অপেক্ষা নিজে স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করলেই, গ্রন্থকারকে লোক অধিক সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্তী হলে বরং তাঁর এই পাণিনি ব্যাকরণের উপর সংস্কার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ কাত্যায়ন যখন আসেন তখন পাণিনির ব্যাকরণ লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রামাণিক ব্যক্তি কর্তৃক আদৃত হয়ে গেছে এটা তিনি দেখলেন। দেখে তিনি বুঝলেন যে আমি যদি স্বতন্ত্র একটা ব্যাকরণ রচনা করি তা হলে পাণিনি ব্যাকরণ থাকতে থাকতে আমার গ্রন্থকে লোকে গ্রহণ করবে না। অতএব আমি পাণিনি ব্যাকরণের উপর সংস্কার করি। সেই সংস্কার বিদ্বানগণ গ্রহণ করবেন। অতএব পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক নন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কাল সম্বন্ধে বিদেশীয় ও ভারতীয় অনেক বিদ্বান্ পর্যালোচনা করেছেন।

অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার খৃষ্টপূর্ব ৪০০—২০০ অব্দ, পতঞ্জলির সময় নির্দেশ করেছেন (১৯)। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের মতে পতঞ্জলির সময় হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ। তাঁর মতে পতঞ্জলির সময় খৃষ্টাব্দের আরম্ভের পরবর্তী হতেই পারে না (২০)।

অধ্যাপক ভিন্‌সেন্ট এস্মিথ, নানাপ্রকার প্রমাণ দ্বারা পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব ১৫০ হতে ১৪০ বলে সিদ্ধান্তিত করেছেন (২১)। অধ্যাপক কীথের মতে পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব ১৫০। (২২)। অধ্যাপক বেলভেলকারও খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দকে পতঞ্জলির কাল বলে স্বীকার করেছেন (২৩)।

শুঙ্গবংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে মৌর্য বংশের শেষ অকর্মণ্য রাজা বৃহদ্রথকে বধ করে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র পিতার মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব ১৪৯ অব্দে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ হতে ১৪৯, প্রায় ৩৬ বৎসর। কিন্তু পুষ্যমিত্র শান্তিতে রাজ্য শাসন কর্তে পারেন নি। তাঁর রাজ্য লাভের প্রায় ২০ বৎসর পরে সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ১৬৫ অব্দে কলিঙ্গের জৈন রাজা খারবেল পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। উক্ত আক্রমণে খারবেল বিশেষ কিছুই সুবিধা কর্তে না পেরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার আবার ৪ বৎসর পরে খারবেল অতর্কিত ভাবে পুনরায় পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করে পুষ্যমিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। খারবেল কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এর পর খৃষ্টপূর্ব ১৫৫—১৫৩ অব্দে কাবুল ও পাঞ্জাবের গ্রীক রাজা মেনাণ্ডার পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। পুষ্যমিত্র এই গ্রীক রাজাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন। এর পাঁচ বৎসর পরে পুষ্যমিত্র

---

(১৯) Proffessor Goldstucker's Panini (2nd Edn) P, 180.

(২০) A History of Sanskrit Literature (Macdonell) fourth impression, P. 431.

(২১) The Early History of India (4th Edn) P. 228

(২২) A History of Sanskrit Literature (Dr. A. Keith) P. 423.

(২৩) System of Sanskrit Grammar (1915) P. 32.

পরলোকগমন করেন। অথচ ইতিহাসে দেখা যায় যে পুষ্যমিত্র তাঁর রাজত্ব কালে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নাম পাঁচবার উল্লিখিত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে ১।১।৬৮ সূত্রের ভাষ্যে (২৪) পুষ্যমিত্রসভা শব্দটি দেখা যায় এবং পুষ্যমিত্র যে একজন রাজা তাও সেই প্রকরণের পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়। মহাভাষ্যে 'পুষ্যমিত্রসভা' এই শব্দের পর 'চন্দ্রগুপ্তসভা' শব্দটি দেখা যায় এবং চন্দ্রগুপ্ত যে একজন রাজা তাও সেখানে বলা হয়েছে। এর পর ৩।১।২৬ সূত্রের মহাভাষ্যে (২৫) পুষ্যমিত্রের নামের তিনবার উল্লেখ দেখা যায় (২৬)। তারপর 'বর্তমানে লট্' [৩।২।১২১] সূত্রের মহাভাষ্যে "ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ" এই উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এইভাবে মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের অনেকবার উল্লেখ দেখে এবং বর্তমানকালের ক্রিয়াপদের সঙ্গে তাঁর নামের প্রয়োগ দেখে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এর উপর আশঙ্কা হতে পারে যে মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ দেখে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলা যেতে পারে না। মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্তেরও নামের উল্লেখ আছে। তজ্জন্য কেহই পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলেন না। ১।১।৬৮ সূত্রের মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ আছে। এই সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে একইভাবে পুষ্যমিত্র ও চন্দ্রগুপ্ত এই উভয়ের নামের উল্লেখ দেখে যেমন কাশিকাকার জয়াদিত্যকে (২৭)

---

(২৪) স্বংরূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা।

(২৫) হেতুমতি চ।

(২৬) যজ্যাদিষু চাবিপর্যাসো বক্তব্যঃ। পুষ্যমিত্রো যজতে যাজকাঃ যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকা যজন্তীতি। ...নাবশ্যং যজিঃ হবিঃপ্রক্ষেপণে এব বর্ততে, কিং তর্হি, ত্যাগেঽপি বর্ততে। অহো যজতে ইত্যুচ্যতে যঃ সুষ্ঠু ত্যাগং করোতি। তং চ পুষ্যমিত্রঃ করোতি যাজকাঃ প্রয়োজয়ন্তি।

(২৭) বামন ও জয়াদিত্য নামক দুইজন বৌদ্ধপণ্ডিত একত্র কাশিকাবৃত্তি রচনা করেন। জয়াদিত্য পাণিনির প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাশিকা রচনা করেন অবশিষ্ট অংশ বামন রচি…?

প্রথমদ্বিতীয়পঞ্চমষষ্ঠা জয়াদিত্যকৃতবৃত্তয়ঃ। ইতরা—

—বামনকৃতা বৃত্তয়ঃ ইত্যভিযুক্তাঃ। শব্দরত্ন—সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্।

পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করি না বা কাশিকায় প্রত্যুদাহরণরূপে 'পুষ্যমিত্রসভা' শব্দে উল্লেখ দেখে জয়াদিত্যকে পুষ্যমিত্রের সমকালিক বলি না। কারণ জয়াদিত্য পুষ্যমিত্রের বহু পরবর্তী ব্যক্তি—এটা ইতিহাসবিদ্‌গণ জানেন। সেইরূপ মহাভাষ্যে "পুষ্যমিত্রের" নামের উল্লেখ দেখেও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কাশিকাকার জয়াদিত্য যেমন পরবর্তিকালে গ্রন্থ লিখে পূর্বজাত পুষ্যমিত্র বা চন্দ্রগুপ্ত নাম উল্লিখিত করেছেন, সেইরূপ পতঞ্জলিও পরবর্তী ব্যক্তি হয়ে পূর্বজাত পুষ্যমিত্র ও চন্দ্রগুপ্তের নামের উল্লেখ করেছেন। নতুবা মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ দেখে পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িকও বলা যেতে পারে। অথচ চন্দ্রগুপ্তকে পতঞ্জলির পূর্ববর্তী বলা হয়েছে। সেই যুক্তিতে পুষ্যমিত্রকেও পতঞ্জলির পূর্ববর্তী বলা উচিত।

এর উত্তরে বক্তব্য এই যে যার গ্রন্থে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ আছে তাঁকে কোন প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলা যেতে পারে না। এইজন্য বিদেশীয় পণ্ডিতগণ পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অনেকবার পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ থাকায় পুষ্যমিত্রের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল—ইহা মনে হয়। এইরূপ মনে হওয়ার আরও কারণ এই যে মহাভাষ্যকার পাণিনির ৩।২।১২৩ সূত্রের মহাভাষ্যে উদাহরণরূপে তিনটি বাক্যের উল্লেখ করেছেন—

যথা :—[১] "ইহ বসামঃ" [এখানে আমরা বাস করছি]

[২] "ইহাধীমহে" [এখানে আমরা অধ্যয়ন করছি]

[৩] "ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ" [এখানে আমরা পুষ্যমিত্রকে যজ্ঞ করাচ্ছি]। এই উদাহরণ তিনটির ক্রমিক বিন্যাস থেকে মনে হয় পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্‌কর্মে ব্রতী ছিলেন। ৩।১।২৬ এবং ৩।২।১২৩ এই দুটি সূত্রে যেভাবে বর্তমানকালের লট্‌বিভক্তি দ্বারা পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহাভাষ্যের উক্ত অংশ পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময় রচিত হয়েছিল। কাশিকাকার জয়াদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত ও পুষ্যমিত্রের নামযুক্ত প্রত্যুদাহরণ মহাভাষ্য থেকেই সংগ্রহ করেছেন—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কিন্তু মহাভাষ্যকার যে পুষ্যমিত্রের নামযুক্ত উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণগুলি অন্যের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন—এ

বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ইতিহাসে পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের উল্লেখ থাকলেও তাঁরা সেই যজ্ঞের কালের নির্দেশ করেন নাই। যুবরাজ অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব ১৪৯ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন—একথা পূর্বে বলা হয়েছে। তাহলে মনে হয় যে সেই খৃঃ পূঃ ১৪৯ অব্দেই পুষ্যমিত্র স্বর্গারোহণ করেন। মেনাণ্ডারের আক্রমণের উল্লেখ মহাভাষ্যে (২৮) আছে। মহাভাষ্যকার যেভাবে মেনাণ্ডারের আক্রমণের উল্লেখ করেছেন তাতে বুঝা যায়, মেনাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে মহাভাষ্যকার জীবিত ছিলেন এবং মেনাণ্ডারের আক্রমণের পরে মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন। তবে মহাভাষ্যকার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেন নাই।' এই সমস্ত প্রমাণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে—পুষ্যমিত্রের জীবিতকালের খৃষ্টপূর্ব ১৫৩ হতে ১৪৯ অব্দের মধ্যে মেনাণ্ডারের আক্রমণের পরে মহাভাষ্য রচিত হয়েছিল এবং সেই সময়েই পুষ্যমিত্রের, যজ্ঞানুষ্ঠান ও তাতে মহাভাষ্যকারের ঋত্বিক্ কর্মে নিয়োগ হয়েছিল। নব্যমতাবলম্বিদের মত এই যে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে অলৌকিক মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন, সেটা তিনি অধিক বয়সেই করেছিলেন। কারণ এইরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন কর্তে তাঁর অনেক সময়ই লেগেছিল। এই পাণ্ডিত্য শঙ্করাচার্যের মত অল্পবয়সে সম্ভব হয় না বা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। আমরা প্রস্তাবনায় প্রাচীন মতানুসারে বর্ণনা করেছি।

---

(২৮) "পরোক্ষ চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয়ে [কাত্যায়নবার্তিক]। "পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্ যবনো মধ্যমিকাম্" [মহাভাষ্য ৩।২।১১১]।

"অনুভূতত্বাৎ পরোক্ষোঽপি প্রত্যক্ষযোগ্যতামাত্রাশ্রয়েণ দর্শনবিষয় ইতি বিরোধাভাবঃ।" [কৈয়ট]

যে ব্যাপারটি পরোক্ষ অথচ লোকপ্রসিদ্ধ এবং যিনি শব্দ প্রয়োগ কচ্ছেন তাঁর প্রত্যক্ষের যোগ্য অর্থাৎ তিনি চেষ্টা করলে সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পারতেন—এরূপ স্থলে লঙ্ হয়। যবন সাকেত অবরোধ করেছিল। যবন মধ্যমিকা অবরোধ করেছিল। ডাঃ কীলহর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন—মধ্যমিকা চিতোরের নিকটবর্তী একটা প্রাচীন নগরী। [Indian Antiquary VII P 266]। অনেকে সাকেতের অর্থ করেছেন—উত্তর অযোধ্যা প্রদেশ।

কাশিকায় এই দুটি উদাহরণ অবিকলভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

মহাভাষ্য বিশাল গ্রন্থ। (পরিমাণে উহা বাল্মীকি রামায়ণের সমান। ২৪০০০ অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত) অভিজ্ঞগণ বলেন ২৪০০০ অনুষ্টুপ্ ছন্দের (শ্লোকে পরিমিত মহাভাষ্য) শ্লোকে যত অক্ষর থাকে মহাভাষ্য সেই পরিমিত অক্ষরে নিবদ্ধ।

অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণে অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক ব্যতীত অন্যছন্দের শ্লোকও আছে।

পুষ্যমিত্র খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দ হতে ১৪৯ অব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন—ইহা পতঞ্জলির কাল। পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি যখন মেনাণ্ডারকে ভারত হতে বিতাড়িত করেন তারকাল হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ১৫৫—১৫৩ অব্দ।

মেনাণ্ডারের বিতাড়িত হবার পর পাশ্চাত্যদেশীয় কোন আক্রমণকারী স্থলপথে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এই সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে খৃষ্টপূর্ব ১৫৫—১৪৯ অব্দ পর্যন্ত পুষ্যমিত্র নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করিতে পেরেছিলেন। অতএব সেই নিরুপদ্রব কালেই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। পতঞ্জলি যখন সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ হয়েছিলেন এবং তার অনতিবিলম্বকালে মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন তখন অনুমান করা যায় যে পতঞ্জলি তখন প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং পতঞ্জলির জন্ম, খৃষ্টপূর্ব ২০০ বৎসর সময়ে হওয়া সমীচীন মনে হয় এবং তিনি খৃষ্টপূর্ব ২০০ হতে ১০০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

আচার্য ভর্তৃহরি বলেছেন—পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হবার পূর্বে পাণিনি ব্যাকরণে "সংগ্রহ" নামক বিশাল বিস্তৃত নিবন্ধ ছিল। কালক্রমে সেই বহু বিস্তৃত গ্রন্থের পঠন পাঠনে শিথিলতা উপস্থিত হয়। তখন বৈয়াকরণগণ বিস্তৃত গ্রন্থ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাঠেই ইচ্ছুক হন। বৈয়াকরণদের এই শিথিলতার জন্য সংগ্রহের পঠনপাঠন লুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়ায় সকল শাস্ত্রার্থদর্শী ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য (২৯ রচনা করেন।

---

(২৯) প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্।
প্রাপ্য বৈয়াকরণান্ বৈ সংগ্রহেঽস্তমুপাগতে॥
কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে॥
অলব্ধগাধে গাম্ভীর্যাদুত্তান ইব সৌষ্ঠবাৎ। [বাক্যপদীয় ২.৪৮৪—৪৮৮]

সূত্রগ্রন্থগুলির উপর ভাষ্যযুগে ভাষ্যগ্রন্থ লিখা হয়েছে। যেমন জৈমিনি সূত্রের উপর শাবর ভাষ্য। গোতম সূত্রের উপর বাৎস্যায়ন ভাষ্য। কণাদ (মহাভাষ্যের মহাভাষ্যত্ব) সূত্রের অর্থাবলম্বনে প্রশস্ত পাদভাষ্য।

এইভাবে পাণিনি ও কাত্যায়ন সূত্রের উপর পতঞ্জলির ভাষ্য। কিন্তু কোন ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলা হয় না। কেবলমাত্র এই পতঞ্জলির ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য ভর্তৃহরি (৩০) কৃত বাক্য পদীয়ের টীকাকার (৩১), কৈয়ট ও তাঁর টীকার ব্যাখ্যাকার নাগেশ প্রভৃতি (৩২) বলেছেন এই মহাভাষ্য অর্থগাম্ভীর্যে অতলস্পর্শ অথচ ললিত পদবিন্যাসের সৌষ্ঠবে সরল বলে প্রতীয়মান হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি "সংগ্রহ" গ্রন্থের অনুসরণে মহাভাষ্য রচনাকরে প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপপদ্ধতি দেখিয়েছেন। সমস্ত ন্যায়ের [যুক্তির] মূলতত্ত্ব সকল এই গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকায় এবং অর্থগাম্ভীর্য ও ভাষা-সৌষ্ঠবে এই গ্রন্থটি অতুলনীয় হওয়ায়—ইহার [ভাষ্যের] উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য 'মহৎ' শব্দের যোগ করে ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয়েছে। বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ মহাভাষ্যের মহত্ত্বের কারণ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন [৩১নং পাদটীকা]।

নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোতে মহাভাষ্যের নামের কারণ বলেছেন —"মহাভাষ্য গ্রন্থ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলেও অন্য ভাষ্য অপেক্ষা এর বৈলক্ষণ্য আছে। অপর ভাষ্যে কেবল মূলের ব্যাখ্যা থাকে। এইভাষ্যে ব্যাখ্যা আছেই, তদ্ব্যতীত আবশ্যক স্থলে শব্দসিদ্ধির জন্য স্বতন্ত্রভাবে বচন রচনা করেছেন। এই স্বতন্ত্র ভাবে রচিত বচন গুলিকে ইষ্টি বলা হয়। এই বৈলক্ষণ্যের জন্য অন্য ভাষ্য অপেক্ষা এই ভাষ্যের মহত্ত্ব আছে। সেই জন্য ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয়।(৩২)

---

(৩০) 'এতেন সংগ্রহানুসারেণ ভগবতা পতঞ্জলিনা সংগ্রহসংক্ষেপভূতমেব প্রায়শো ভাষ্যমুপনিবদ্ধমিত্যুক্তং বেদিতব্যম্। [পুণ্যরাজটীকা বাক্যপদীয় ২।৪৮৫]

(৩১) 'অতএব সর্বন্যায়বীজহেতুত্বাদেব মহচ্ছব্দেন বিশিষ্য মহাভাষ্যমিত্যুচ্যতে লোকে। অথ মহত্ত্বমেব বিশেষণদ্বারেণাস্যোপপাদয়িতুমাহ—অলব্ধগাধে...।" [পুণ্যরাজটীকা বাক্যপদীয় ২।৪৮৫]

(৩২) "ব্যাখ্যাতৃত্বেহপ্যপ্রাপ্তেষ্ট্যাদিকথনেনান্যাখ্যাতৃত্বাদিতরভাষ্যবৈলক্ষণ্যম্"।
[কৈয়টকৃত উপক্রমস্থ শ্লোকের নাগেশভট্টকৃতব্যাখ্যা উদ্দ্যোত]

বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে সূত্রকার পাণিনি অপেক্ষা বার্তিককারের অধিক প্রামাণ্য, আবার বার্তিককার অপেক্ষা মহাভাষ্যকারের অধিক প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় (৩৩)।

প্রাচীনকালে মহাভাষ্যকে চূর্ণি বা চূর্ণিন্ নামে আখ্যাত করা হোত। ভর্তৃহরির মহাভাষ্যটীকার যে খণ্ডিত অংশ বার্লিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে তাতে মহাভাষ্যকারকে চূর্ণিকার বলে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। [ডাঃ কীলহর্ণ সম্পাদিত মহাভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ড ভূমিকা]।

যুক্তি দীপিকাতেও মহাভাষ্যকারকে চূর্ণিকার বলা হয়েছে এবং মহাভাষ্য হতে কিছু কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

গৌতমসূত্রের ব্যাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যের উপর উদ্দ্যোতকরকৃত ব্যাখ্যাকে বার্তিক বলা হয়। জৈমিনিসূত্রের শবরস্বামিকৃত ভাষ্যের উপর কুমারিলভট্টকৃত ব্যাখ্যাকেও বার্তিক বলা হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের সুরেশ্বরাচার্য প্রণীত ব্যাখ্যার জন্য বার্তিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে (৩৪)।

---

(৩৩) "যথোত্তরং হি মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্. [কৈয়ট ১ ১।২৯]

"উত্তরোত্তরস্য বহুলক্ষ্যদর্শিত্বাৎ স্পষ্টং চেদং ধিন্বিকৃণ্বোরিতি সূত্রে [৩।১।৮০] ভাষ্যে।" [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত]

"এতচ্চ ধিন্বিকৃণ্বোরচেতি সূত্রেভাষ্যে ধ্বনিতম্." [লঘুশব্দেন্দুশেখর সর্বনামপ্রকরণ]

নাগেশভট্ট বলেছেন পূর্ববর্তী মুনি অপেক্ষা পরবর্তী মুনির অধিক প্রয়োগের জ্ঞান থাকে পরবর্তীকালে ভাষার অধিক পরিপুষ্টি হয় বলে পরবর্তী মুনির অধিক প্রামাণ্য।

(৩৪) "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" [যুক্তিদীপিকাদিতে উদ্ধৃত]
"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ
সর্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ [বাচস্পতিমিশ্রকৃত তাৎপর্যটীকায় উদ্ধৃত ন্যাঃ সূঃ ভাষ্য বাঃ ১।১।১]

ভাষ্যের লক্ষণ "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।" [ব্রঃ সূঃ ভাষ্য টীকা আনন্দ গিরি]

বার্তিকের লক্ষণ—"উক্তানুক্তদুরুক্তার্থচিন্তা যত্র প্রবর্ততে।
"তং গ্রন্থং বার্তিকং প্রাহুঃ বার্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।" [বৃহদারণ্যক সম্বন্ধবার্তিকের আনন্দ গিরিটীকা]

টীকার লক্ষণ—"টীকা নিরন্তরং ব্যাখ্যা"
[পরীক্ষামুখ সূত্রের টীকায় উদ্ধৃত]

কিন্তু পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে কাত্যায়নকৃত বার্তিকেরই প্রধানভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু কিছু পাণিনিসূত্রেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা মহাভাষ্যটি বার্তিকের ব্যাখ্যা। পতঞ্জলি কোন কোন স্থলে পাণিনি সূত্রেরও স্বতন্ত্রভাবে মহাভাষ্য রচনা করেছেন। সমস্ত পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা মহাভাষ্যে দেখা যায় না। যে সূত্রে বিশেষ কোন বিচার্য বিষয় পতঞ্জলির লক্ষ্য হয় নাই সেই সূত্রের উল্লেখ তিনি করেন নাই। কাশিকাতে কিন্তু সমস্ত পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা আছে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কালের কথা বলা হয়েছে, দেশের সম্বন্ধেও নানা পণ্ডিতের নানা বিবাদ আছে। তবে ভাষ্যকার "গোনর্দীয়স্ত্বাহ" এইরূপ পরোক্ষ ভাবে নিজের পরিচয় দেওয়ায় গোনর্দ দেশে ভাষ্যকারের জন্ম বলে অনুমান করা যায়। গোনর্দ দেশকে দেশীয় ভাষায় গৌড়া বলে কথন করা হয়। এইগোড়া সম্ভবত অযোধ্যাদেশই হবে। যদিও পুষ্যমিত্রের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র তথাপি ঐতিহাসিকগণ বলেন পুষ্যমিত্রের অযোধ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। সেই সম্বন্ধ হতে বুঝাযায় পতঞ্জলির সঙ্গে পুষ্যমিত্রের সম্বন্ধ হয়েছিল।

বার্তিককার কত্যায়নের দেশ, কাল সম্বন্ধে ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি বলে আমরা মহাভাষ্যে পাই। আর মহাভাষ্যে "প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ" [পস্পশাহ্নিক মহাভাষ্য] এইভাবে বার্তিককারের সম্বন্ধে উক্তি আছে বলে—দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে কাত্যায়নের জন্ম এই পর্যন্ত বুঝা যায় কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কোন দেশে কি কোন নগরে তাঁর জন্ম তা সঠিক ভাবে এখনও জানা যায় না। কাল সম্বন্ধেও কাত্যায়নের বিষয়ে বিবাদ আছে। তবে সরূপসূত্রে বার্তিককার "দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ" এইকথা বলেছেন বলে বুঝাযায় পাণিনির সূত্রের উপর ব্যাড়ির যে সংগ্রহ নামক বিশাল গ্রন্থ ছিল, সেই গ্রন্থরচনার বা ব্যাড়ির পরবর্তী হচ্ছেন কাত্যায়ন। আবার কাত্যায়নের বার্তিকের উপর পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করায় সম্ভবত পতঞ্জলির ২।৫ শত বৎসর পূর্বে কাত্যায়নের কাল। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী কাত্যায়নের কাল বলে মনে হয়।

পাণিনির দেশ সম্বন্ধে অনেকে গান্ধার দেশকে পাণিনির জন্মস্থান বলে অনুমান করেন। অবশ্য এবিষয়ে স্পষ্টভাবে জানা কঠিন। কাল সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে পাণিনির সূত্রের উপর সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল।

সেই গ্রন্থ নিশ্চয় অনেকদিন প্রচারিত হয়েছিল, তারপর বার্তিককার বার্তিক রচনা করেন। তারপর পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করেন। সুতরাং পতঞ্জলির অন্তত এক হাজার বৎসর পূর্বে পাণিনি সূত্র রচনা করেন। আর বার্তিককারের বার্তিকের অন্তত পাঁচশত বৎসর পূর্বে পাণিনি-সূত্র রচিত হয়েছিল। নতুবা পাণিনির অল্পকালের পরে বার্তিক রচিত হয়েছে—ইহা বলা যায় না। কারণ পাণিনি ও বার্তিকের মধ্যে সংগ্রহ গ্রন্থের পঠন পাঠনের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দী পাণিনির কাল বলে মনে করা যেতে পারে। পাণিনির সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীতে আটটি অধ্যায় আছে, এবং তার প্রত্যেক অধ্যায়ে চারটি চারটি পাদ আছে। সুতরাং পাণিনি ব্যাকরণে সর্বশুদ্ধ ৩২ টি পাদ আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির ঐ পাদগুলিকে বিভিন্ন আহ্নিকে বিভক্ত করেছেন। মহাভাষ্যে সর্বসমেত ৮৪ টি আহ্নিক আছে। তার মধ্যে প্রথম আহ্নিককে পস্পশা আহ্নিক বলা হয়।

স্পর্শনার্থক স্পশ ধাতুর উত্তর যঙ্ করে সেই যঙন্ত স্পশ পস্পশানামের অর্থ। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করে তার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করে পস্পশা শব্দ সিদ্ধ হয়। পস্পশা শব্দটি স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। উহার প্রকৃতি-প্রত্যয় লভ্য অর্থ হচ্ছে—যা অধিকভাবে স্পর্শ করে। এই আহ্নিকটি ব্যাকরণ শাস্ত্রকে বা ব্যাকরণাধ্যায়ীকে অতিশয় স্পর্শ করে। কারণ ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কথা পস্পশাআহ্নিকে থাকায় ব্যাকরণাধ্যয়নে পাঠার্থীকে এই আহ্নিক প্রবর্তিত করে। কেহ কেহ বলেন স্পশ বাধনে একটি স্পশ ধাতু আছে। সেই ধাতুর পূর্বোক্তরূপে যঙন্তরূপের উত্তর অচ্, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করে পস্পশা শব্দ সিদ্ধ হয়। অর্থ হচ্ছে যে আহ্নিকটি ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নে পাঠার্থীর বাধা দূর করে দেয় তা পস্পশা। অধ্যয়নার্থী স্বভাবত ব্যাকরণশাস্ত্র নীরস বলে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু এই পস্পশা আহ্নিকে ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য এর প্রয়োজন আছে ইত্যাদি বলে অধ্যয়নার্থীর অধ্যয়নে প্রবৃত্তির বাধা দূর করে দেয়।

এই পস্পশা আহ্নিকটিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের ভূমিকা বলা যেতে পারে। এই আহ্নিকে যদিও কোন সূত্রের ব্যাখ্যা নাই তথাপি শব্দের স্বরূপ কি শব্দ শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজন কি ইত্যাদি বিষয় সমূহের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণসম্বন্ধীয় বহুতত্ত্বের বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করেছেন বলে

পাণিনিব্যাকরণাধ্যায়ীর নিকট এর মূল্য যথেষ্ট আছে। শুধু তাই নয় এই আহ্নিক হতে ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনকারিগণও অনেক উপাদান সংগ্রহ কর্তে পারেন। এই গ্রন্থে সেই পস্পশা আহ্নিকের অনুবাদ ও বিবৃতি করার যথাশক্তি যথাবুদ্ধি প্রযত্ন করা হয়েছে।

ইতি ভগবচ্ছঙ্করাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীহৃষিকেশাশ্রম শিষ্য দামোদরাশ্রম।

পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণ মহাভাষ্য

পস্পশাহ্নিক

[অনুবাদ ও বিবৃতি]

মূল

অথ শব্দানুশাসনম্। অথেত্যয়ংশব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অথ শব্দানুশাসন [শব্দোপদেশ]। "অথ" এই শব্দটি অধিকার [আরম্ভ] অর্থে প্রযুক্ত [ব্যবহৃত] হচ্ছে। শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র অধিকৃত [আরব্ধ] হচ্ছে—ইহা বুঝতে হবে ॥ ১ ॥

বিবৃতি—কোন শাস্ত্র আরম্ভ করতে গেলে সেই শাস্ত্রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির উপযোগিরূপে চারটি অনুবন্ধের বর্ণনা করতে হয়। অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের জ্ঞান না হলে বুদ্ধিমান্ লোকদের সেই শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয় না। অনুবন্ধচতুষ্টয় হচ্ছে—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন (১)। যে ব্যক্তি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যোগ্য, তাকে সেই শাস্ত্রের অধিকারী বলা হয়। যে পদার্থ যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহাই সেই শাস্ত্রের বিষয়। ও বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের বা শাস্ত্রের সহিত প্রয়োজনের যে সম্বন্ধ তাকে সম্বন্ধ বলা হয়। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে যে ফললাভ হয় তাকে প্রয়োজন বলা হয় সেই শাস্ত্রের। অবিবেকী বা উন্মত্ত ব্যক্তি ভিন্ন যে ব্যক্তি যে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রবৃত্তি হওয়ার পূর্বে "এই কার্য আমি করতে পারব" এইজ্ঞান হয়। প্রবৃত্তির উপযোগী এইরূপ জ্ঞানকে ন্যায়ের ভাষায় 'কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান' বলে—"ইদং মৎকৃতিসাধ্যম্।"

১। প্রবৃত্তিপ্রয়োজকজ্ঞানবিষয়ত্বম্ অনুবন্ধত্বম্ [তর্কসংগ্রহ টীকা] অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান হলে লোকের শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয়, তাকে অনুবন্ধ বলে। অধিকারীর জ্ঞানটি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান উৎপাদন করে শাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগী হয়, আর বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের জ্ঞান ইষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানের উৎপাদন করে শাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগী হয়।

এইকাজ আমার কৃতি বা যত্নদ্বারা সাধিত হবার যোগ্য। শাস্ত্রে অধিকারীর জ্ঞান না হলে, সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান হয় না। কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান না হলে শাস্ত্রে বিচারশীল ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। অধিকারীর জ্ঞান হলে অধিকারী নিজের সামর্থ্য প্রভৃতির চিন্তা করে, নিজের ভিতর সেই অধিকারীর অনুরূপ সামর্থ্য আছে—ইহা যদি জানতে পারে তাহলে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্য কোন বিষয়ে বা শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে অধিকারীর জ্ঞান আবশ্যক। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও শাস্ত্রে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'ইদং মদিষ্টসাধনম্' ইহা আমার অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধির উপায়—ইহা জেনে সেই ইষ্টসাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্য যে কার্যে নিজের কোন ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে—বলে মনে হয় না সেই কার্যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় না। শাস্ত্রের প্রয়োজন জ্ঞান জন্মালে সেই শাস্ত্রে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ইষ্ট সাধনতাজ্ঞান হয়ে প্রবৃত্তি হয়। এই হেতু শাস্ত্রের প্রয়োজন জ্ঞান আবশ্যক (২)। বিষয়ের জ্ঞানও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের উপযোগী। যে বিষয়কে অবলম্বন করে শাস্ত্র রচিত হয় সেই বিষয়ের জ্ঞানই শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। এই বিষয় জ্ঞানটি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যরূপ যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন জ্ঞানের সহায়ক। এইভাবে শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের, বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের, শাস্ত্রের সহিত প্রয়োজনের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধজ্ঞানও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের সহায়ক হয় যে প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করে শাস্ত্র রচিত হয়, সেই প্রয়োজনটি সেই শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা হতে পারে—এরূপ দৃঢ়জ্ঞান না হলে শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হতে পারে না। শাস্ত্রের সহিত বিষয় এবং প্রয়োজনের সম্যগ্ জ্ঞান যদি না হয়, তা হলে সেই শাস্ত্রকে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলে মনে হয়, তার ফলে সেই শাস্ত্রে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। বিষয় ও প্রয়োজনের জ্ঞান হলে তা থেকে সম্বন্ধ ও অধিকারীর জ্ঞান অনায়াসে হতে পারে। এইহেতু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সর্বপ্রথম 'শব্দানুশাসন' এই সার্থক নামের উল্লেখ করে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সূচিত করেছেন।

২। 'সর্বস্যাপি হি শাস্ত্রস্য কর্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে॥" [শ্লোক বার্তিক—উপোদ্ঘাত]

শব্দানুশাসন—যার দ্বারা অসাধু=অশুদ্ধ-অপভ্রংশ প্রভৃতি শব্দ হতে পৃথগ্‌ভাবে সাধু [শুদ্ধ] শব্দের জ্ঞানোৎপাদন করা হয় (৩) তার নাম শব্দানুশাসন। অনুপূর্বক শাস ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ [অনট্] প্রত্যয় করে অনুশাসন শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। ["করণাধিকরণয়োশ্চ" ইতি ল্যুট্ পাঃসূঃ ৩।৩।১১৭]। তারপর "শব্দানামনুশাসনম্" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করে "শব্দানুশাসনম্" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এখানে "আচার্য কর্তৃক" [আচার্যেণ] এইরূপ কর্তৃবাচক পদের উল্লেখ না থাকায় কর্মে ষষ্ঠী সমাসের কোন বাধা হয় নি। কর্তা কর্ম উভয়ত্র ষষ্ঠী প্রাপ্ত হলে কর্মে যে ষষ্ঠী হয়, সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে সমাস হয় না। এখানে কর্তৃপদের উল্লেখ না থাকায় উভয়ত্র ষষ্ঠীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় কর্মষষ্ঠীর সঙ্গে সমাস হতে কোন বাধা হয় নাই।

শব্দানুশাসন শব্দের অর্থ

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" [মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক]। শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র- এই ছয়টি বেদের অঙ্গ (৪)। এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদের অধ্যয়ন অর্থাৎ অক্ষর-গ্রহণ ও তার অর্থজ্ঞান—ইহা ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম। অভিপ্রায় এই যে বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান—ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য। এরজন্য ব্রাহ্মণের কোন প্রকার লৌকিক ফলের অপেক্ষা করা উচিত নয়। এখানে নিষ্কারণ ধর্ম বলায় সন্ধ্যা বন্দনার মত ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন ও তার অর্থজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষে একটি নিত্যকর্ম বলে প্রতিপাদিত হয়েছে। সন্ধ্যাবন্দনা না করলে যেমন ব্রাহ্মণ পাপভাগী হয়, সেইরূপ ষডঙ্গসহিত বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান না করলেও পাপভাগী হয়। যাঁরা উত্তম অধিকারী, তাঁদের ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন না বললেও এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হতে পারে এই মনে

৩। "অনুশিষ্যন্তে অসাধুশব্দেভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তে অনেনেতি"
[মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত]।
অনুশিষ্যন্তে বিবিচ্য অসাধুভ্যো বিভজ্য বোধ্যন্তে যেনেতি করণে ল্যুট [শব্দকৌস্তুভ]।
বিবিক্তাঃ সাধবঃ শব্দাঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগতো জ্ঞাপ্যন্তে যেন তচ্ছাস্ত্রমত্র শব্দানুশাসনম্।
[পদমঞ্জরী]

৪। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গতিঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষডঙ্গো বেদ উচ্যতে॥ [অমরকোষ শব্দাদিবর্গ ভানুদীক্ষিত টীকা৪]

করে ভগবান্ পাণিনি ব্যাকরণের কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নি। বার্তিককার বলেছেন—ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রক্রিয়াজ্ঞান পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয় (৫)। তার দ্বারা ধর্মলাভ ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন ইহা সূচিত হয়েছে। যাঁরা মধ্যম অধিকারী তাঁরা ধর্মলাভের জন্য ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হতে পারেন, এইহেতু বার্তিকারের এই প্রয়োজন মধ্যম অধিকারীর প্রতি কথিত হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু সূত্রকার পাণিনি এবং বার্তিককার কাত্যায়ন—এঁরা কেউই নিকৃষ্ট অধিকারীর ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রবৃত্তির জন্য কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নাই। যাঁরা নিকৃষ্ট অধিকারী তাঁদের শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা না থাকায় তাঁরা জন্মান্তরে প্রাপ্তব্য স্বর্গাদি-ফলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করতে পারেন না। এইজন্য তাঁরা প্রত্যেক কর্মের ঐহলৌকিক ফলের অনুসন্ধান করেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহা লক্ষ্য করে অধম অধিকারীর প্রবৃত্তির উপযোগী প্রয়োজন সূচিত করেছেন। 'শব্দানুশাসন' এই সার্থক নামের প্রযোগ করায় শব্দজ্ঞানই [সাধুশব্দজ্ঞান] যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন—তাহা সূচিত হয়েছে। এখানে শব্দ বলতে যে সাধু [শুদ্ধ] শব্দ এবং ব্যাকরণ বলতে যে সাধু শব্দের অনুশাসন [জ্ঞাপন] তাহা ভাষ্যকার একটু পরে নিজেই বলবেন। শব্দানুশাসন—এই নামের শব্দের [শব্দানাম, অনুশাসন [অনুশাসনম্] এইরূপ অর্থ হওয়ায়, শব্দই যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় তাহাও সূচিত হয়েছে। মহাভাষ্যপ্রদীপ নামক মহাভাষ্যের টীকায় আচার্য [illegible]ট বলেছেন—যে শব্দানুশাসন—এই সার্থক নামের দ্বারা মহাভাষ্যকার যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন শব্দের জ্ঞান তাহা সূচিত করেছেন। শব্দানুশাসন এই সার্থক নামের দ্বারা ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় যে সাধু শব্দ তাহা সূচিত হয়েছে একথা জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রণীত কাশিকাবিবরণ পঞ্জিকায়, ভট্টোজীদীক্ষিতপ্রণীত শব্দকৌস্তুভে এবং হরদত্তপ্রণীত পদমঞ্জরীতে বলা হয়েছে। মহামতি নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোতে এই দুইপ্রকার মতের সামঞ্জস্য করে বলেছেন যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন শব্দজ্ঞান ও প্রতিপাদ্য বিষয় শব্দ এই উভয়ই শব্দানুশাসন—এই সার্থক নামের দ্বারা সূচিত হয়েছে। এইভাবে শব্দজ্ঞান ব্যাকরণশাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন হলেও মূল প্রয়োজন হচ্ছে—ধর্ম এবং মোক্ষ। সুখ বা

(৫) শাস্ত্রপূর্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন। [মহাভাষ্যপস্পশাহ্নিকে উদ্ধৃত]

দুঃখনিবৃত্তিই হচ্ছে আসল প্রয়োজন। শব্দজ্ঞান – সুখ নয় বা দুঃখ নিবৃত্তি নয়। কিন্তু সুখের বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হচ্ছে শব্দজ্ঞান। এই জন্য নাগেশ ভট্ট বলেছেন – প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষ। ব্যাকরণাধ্যয়নের দ্বারা শব্দজ্ঞান হলে তার দ্বারা শব্দের অর্থেরও জ্ঞান হয়। তার দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞান হয়। বেদের অর্থজ্ঞানপূর্বক শুদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা বৈদিক কর্মানুষ্ঠান করলে ধর্ম উৎপন্ন হয়। সেই ধর্মদ্বারা স্বর্গসুখ হয়। আবার ব্যাকরণাধ্যয়ন হতে শব্দজ্ঞান হলে উপনিষদের অর্থজ্ঞান হয় বা ব্যাকরণশব্দ প্রক্রিয়াজ্ঞান পূর্বক আসল শব্দ ব্রহ্মেরজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। অতএব শব্দজ্ঞানটি সাক্ষাৎ প্রয়োজন হলেও ব্যাকরণাধ্যয়নের পরম্পরায় ফল হচ্ছে ধর্ম ও মুক্তি। তবে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি নিকৃষ্ট অধিকারীর ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগিরূপে শব্দজ্ঞানকে সাক্ষাৎ প্রয়োজন বলে সূচিত করেছেন—ইহাই অভিপ্রায়।

ভাষ্যের লক্ষণ পরাশর উপপুরাণে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥" [১৮ অধ্যায়]

যে গ্রন্থে সূত্রস্থিত পদকে গ্রহণ করে, সূত্রের অনুকূল পদের দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা হয় এবং নিজের পদেরও ব্যাখ্যা করা হয়, ভাষ্যাভিজ্ঞগণ সেই গ্রন্থকে ভাষ্যরূপে অঙ্গীকার করেন। পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলার (৬) কারণ এই যে এই পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণভাষ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলেও, ইহাতে অনেকস্থলে সূত্র ও বার্তিকের অপেক্ষা না করে, ইষ্টি অর্থাৎ স্বতন্ত্র বচনের প্রণয়ন করে স্বাধীনভাবে শব্দের সাধন করা হয়েছে। ইহাই এই ভাষ্যের অন্যভাষ্য হতে বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের জন্যই এই ভাষ্যের মহত্ত্ব। সেইজন্য একে মহাভাষ্য বলা হয়। বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয় কাণ্ডের শেষে ভর্তৃহরি এই ভাষ্যের অন্যপ্রকার মহত্ত্বের কথা বলেছেন এবং বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ সেইস্থলের অভিপ্রায় স্পষ্টকরে বলেছেন। তিনি বলেছেন – এই ভাষ্য কেবল ব্যাকরণের নিবন্ধ নয়, কিন্তু ইহা সমস্ত ন্যায়বীজের অর্থাৎ সমগ্রযুক্তি কলাপের মূলতত্ত্বের সংগ্রহ। এই জন্য এইগ্রন্থকে 'মহৎ' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করে মহাভাষ্য নামে অভিহিত করা হয়। এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাহুল্য

৬। "ব্যাখ্যাতৃত্বেঽপ্যসোষ্টিবদিকথনেনাব্যাখ্যাতৃত্বাদিতর ভাষ্যবৈলক্ষণ্যেন মহত্ত্বম্।"

[নাগেশভট্টকৃত প্রদীপোদ্যোত]

থাকায় ইহা অতি গম্ভীর অর্থাৎ অতলস্পর্শ এবং প্রতিপাদন রীতির সুন্দরতার জন্য ইহা অতিস্পষ্ট। অতএব সজ্জন ব্যক্তিগণের চিত্তের মত এই গ্রন্থ স্বভাবত সুকুমার অথচ অতিগম্ভীর। এই কারণে ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয় (৭)। এই গ্রন্থ ভাষ্য বলে এতে স্বকীয় পদেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৮) এই জন্য "অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে" বলে অথ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে। অথ শব্দের বাচ্যার্থ দুটি এবং আর তিনটি আনুষঙ্গিক অর্থ বা প্রয়োজন (৯)। এখানে আরম্ভ অর্থেরই গ্রহণ করতে হবে ইহা বুঝাবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে। 'অথ শব্দানুশাসনম।' এই বাক্যে অথ শব্দের আরম্ভ অর্থ গ্রহণ করলে সমগ্র বাক্যটির যে অর্থ পর্যবসিত হয়, তাই ব্যাখ্যায় বলেছেন "শব্দানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্" শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র আরব্ধ হচ্ছে ইহা বুঝতে হবে।

আর একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়, এই যে—কোন গ্রন্থকার বা কোন বক্তা যে বিষয়ের বর্ণনা করবেন, সেই বিষয়টির প্রথমে যদি নির্দেশ করেন, তাহলে শিষ্যদের বা শ্রোতৃ বর্গের তাতে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়, নতুবা আলোচ্য বিষয়ের জ্ঞানের অভাবে শ্রোতার মনোনিবেশ ঘটে না। কোন গ্রন্থ বা প্রকরণের আরম্ভে সেই গ্রন্থ বা প্রকরণের আলোচ্য বিষয়ের নির্দেশকে প্রতিজ্ঞা বলে। গ্রন্থকার বা বক্তা যদি নিজের ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে কোন আভাষ না দিয়ে প্রথমেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করেন তাহলে শিষ্য বা শ্রোতৃবৃন্দের সে বিষয়ে মনোনিবেশ না থাকায় তাঁর সেই প্রতিপাদন অরণ্যরোদনের মত ব্যর্থ হয়। এই জন্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণ তাঁদের

৭। "কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে॥ [বাক্যপদীয় ২।৪৮৫।৮৬]
অলব্ধগাধে গাম্ভীর্যাদুত্তান ইব সৌষ্ঠবাৎ॥
"তচ্চ ভাষ্যং ন কেবলং ব্যাকরণস্য নিবন্ধনং........ সজ্জনমানসমিব" [পুণ্যরাজটীকায়]

৮। পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপোঽথ সমাধানং ব্যাখ্যানং ষড়্বিধং মতম॥ [পরিভাষেন্দুশেখর ভৈরবী টীকা]
পদচ্ছেদ, পদার্থের বর্ণনা, সমাসাদির বিগ্রহপ্রদর্শন, সমগ্র বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের পরস্পর অন্বয় প্রদর্শন, প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে সম্ভাবিত আশঙ্কা এবং সেই আশংকার সমাধান। ব্যাখ্যা এই ৬ প্রকার।

৯। "মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ।" [অমরকোষ]

প্রতিপাদ্যবস্তু বলার পূর্বে প্রতিপাদ্য বিষয়ের এইরূপ আভাষ দিয়ে থাকেন। মহাভাষ্যকারও তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে "অথ শব্দানুশাসনম্" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা নিজের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি শিষ্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। অতএব "অথ শব্দানুশাসনম্" এই বাক্যটি যেমন শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজনের প্রতিপাদক সেইরূপ শিষ্যদের মনোনিবেশের হেতুভূত প্রতিজ্ঞাবাক্যও বটে।

প্রশ্ন হতে পারে আস্তিকগ্রন্থকারগণ সকলেই গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মঙ্গলাচরণ করে থাকেন, মহাভাষ্যকার এতবড় বিশাল গ্রন্থ করার পূর্বে মঙ্গলাচরণ করলেন না কেন? তার উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন "অথ শব্দানুশাসনম্" এই বাক্যে প্রথমে 'অথ' শব্দের উচ্চারণ করায় মহাভাষ্যকারের মঙ্গলাচরণ স্বতঃই সিদ্ধ হয়েছে। মহাভাষ্যকার অতি আস্তিক ছিলেন। তিনি নিজেই শাস্ত্রের আদিতে মধ্যে ও অন্তে মঙ্গলাচরণের গুণাবলী (১০) কীর্তিত করেছেন। যে শাস্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে মঙ্গল থাকে, সেই শাস্ত্রের বিস্তার অর্থাৎ প্রচার হয়, যাঁরা সেই শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন তাঁরা বীরপুরুষ হয়ে থাকেন অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁরা কখনও পশ্চাৎপদ হন না এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকেন। মহাভাষ্যকারের গ্রন্থারম্ভে প্রযুক্ত অথ শব্দটি যদিও আরম্ভ অর্থের বাচক তথাপি এই অথ শব্দ উচ্চারণ করাতে মঙ্গল হয়েছে শ্রোতার ও মঙ্গল হয়েছে (১১)॥ ১॥

— — —

১০। মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিকের 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলেছেন—"মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষাণি চাধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্যুরিতি। "বৃদ্ধিরাদৈচ্" [১।১।১] "ভূবাদয়ো ধাতবঃ" [১।৩।১] সূত্রের মহাভাষ্যে শাস্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে মঙ্গলের কর্তব্যতা বলা হয়েছে।

১১। ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

ব্রহ্মসূত্রের [১।১।১] ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন—"অর্থান্তর প্রযুক্তো হ্যথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গল প্রয়োজনো ভবতি।" অর্থাৎ অন্য অর্থে উচ্চারিত অথশব্দ শ্রবণ মাত্রে মঙ্গল জনক হয়। বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন যেমন পানের জন্য কেউ জলের কলসী জলপূর্ণ করে নিয়ে গেলে তা দর্শন করে অপরের মঙ্গল হয় সেইরূপ, অন্য অর্থে উচ্চারিত অথ শব্দ শ্রবণ করে শঙ্খাদিধ্বনির মত মঙ্গল হয়।

মূল

কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাং চ।
তত্র লৌকিকাস্তাবদ্ গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী
শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইতি। বৈদিকাঃ খল্বপি—
শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে [অঃ সং ১৷৬৷১]। ইষেত্বোর্জে,ত্বা
[তৈঃ সং ১৷১৷১৷১]। অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ [ঋঃসং১৷১৷১]।
অগ্ন আয়াহি বীতয় [সাঃ সং ১৷১৷১] ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—কোন্ শব্দ সকলের [অনুশাসন]? লৌকিক ও বৈদিক শব্দসকলের। তার মধ্যে লৌকিক শব্দ [দেখান হচ্ছে] গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী,, শকুনিঃ মৃগঃ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বৈদিক শব্দ [দেখান হচ্ছে]। শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে [অথর্ব বেদ] ইষে ত্বোর্জে ত্বা [যজুর্বেদ]। অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ [ঋগ্বেদ]। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে [সামবেদ] ইত্যাদি ॥ ২ ॥*

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার প্রথমেই বলেছেন—"অথ শব্দানুশাসনম্" অর্থাৎ শব্দের অনুশাসন বা উপদেশক শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে। এখন আশঙ্কা হতে পারে কোন্ শব্দের উপদেশ করা হবে। শব্দ বলতে তো অনেক রকম শব্দ বুঝায়—কাকের শব্দ, হাতীর শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ আবার মানুষের ব্যবহৃত শব্দ। কোন্ শব্দের উপদেশ করা হবে? এই আশঙ্কা মহাভাষ্যকার নিজেই উঠিয়েছেন "কেষাং শব্দানাম্'। এই বাক্যে। এই শাস্ত্রে [ব্যাকরণে] কাক প্রভৃতির শব্দের জ্ঞাপন করা হবে না, কিন্তু লৌকিক শব্দের ও বৈদিকশব্দের। লোকে বিদিতঃ [জ্ঞাতঃ] এইরূপ অর্থে

---

* পাদটীকা :—মহাভাষ্যে 'তাবৎ' এই একটি অব্যয় পদ প্রযুক্ত হয়েছে, তার কোন অর্থ নাই। ঐ শব্দটি বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত হয়েছে। বাক্যের শ্রুতিমাধুর্য সম্পাদনের জন্যই উহার প্রয়োগ। আবার এই "তাবৎ" শব্দের "আদৌ" অর্থাৎ প্রথমে এইরূপ অর্থও ধরা যেতে পারে। তাতে অর্থ হবে—প্রথমে লৌকিক শব্দ দেখান হচ্ছে। তারপর "বৈদিকাঃ খল্বপি" এখানে 'খল্বপি' শব্দ দেখা যাচ্ছে। ওটা একটা শব্দ নয় কিন্তু 'খলু' ও 'অপি' এই দুটি অব্যয় শব্দের সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ হয়েছে। এইদুটি শব্দও বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত। কোন অর্থ নাই। অথবা খলু ও অপি এই দুটি শব্দের সমুচ্চয় অর্থও ধরা যেতে পারে। তাতে অর্থ হয় এই যে—বৈদিক শব্দও [প্রদর্শিত হচ্ছে]।

অথবা লোকে ভবঃ [ব্যবহৃতঃ] এইরূপ অর্থে লোক শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় করে লৌকিক শব্দ এখানে সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে—মানুষেরা যে শব্দ জানে বা ব্যবহার করে। অবশ্য এখানে অপভ্রংশকে বাদ দিয়ে মানুষের ব্যবহৃত সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাশব্দকেই মহাভাষ্যকার লৌকিক কথা দ্বারা যে বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে—শব্দানুশাসন মানে সাধু শব্দের জ্ঞাপন। লোকব্যবহারে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই সকল শব্দ লৌকিক শব্দ। আর যে সকল শব্দ কেবল বেদেই প্রযুক্ত হয় সেগুলি বৈদিক শব্দ। প্রশ্ন হতে পারে মহাভাষ্যকার প্রথমে "লৌকিকানাং" এই কথা বললেন কেন? বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ বলে গুরুত্ববশত বৈদিকশব্দের প্রথমে উল্লেখ করা উচিত ছিল? তার উত্তর এই যে লৌকিক শব্দের ব্যবহার সর্বদা হয়, এই জন্য লৌকিক শব্দ আমাদের সুপরিচিত, আমাদের বুদ্ধিতে সন্নিহিত। এই সান্নিধ্যবশত প্রথমে লৌকিক শব্দের উল্লেখ করে পরে বৈদিক শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। লোকব্যবহারে যে সকল শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তার আনুপূর্বী অর্থাৎ ক্রমের নিয়ম নাই। যেমন 'গৌরস্তি' এও যেমন ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ "অস্তি গৌঃ" এই রূপও ব্যবহৃত হয়। ঐ উভয় ব্যবহারই শুদ্ধ। এই জন্য লৌকিক শব্দের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে ভাষ্যকার কতকগুলির পদের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে গো শব্দটি মঙ্গল বাচক এবং বহু অর্থের বোধক বলে প্রথমে "গৌঃ" এই পদের উল্লেখ করেছেন। এইরূপ পদের উল্লেখ থেকে লৌকিক সংস্কৃত বাক্যকেও শব্দ বলে বুঝে নিতে হবে।

কিন্তু বেদে পদের আনুপূর্বী বা ক্রম নিয়ত বলে 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদিরূপে বাক্যের প্রয়োগ করেছেন। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" বললে এই বাক্যের যেমন বেদত্ব থাকে, 'পুরোহিতম্ অগ্নিমীলে' বললে কিন্তু ঐ বাক্যের আর বেদত্ব থাকে না। কারণ বৈদিক বাক্য নিয়তক্রম বিশিষ্ট। এইজন্য ভাষ্যকার বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রদর্শনে নিয়তক্রমযুক্ত বেদবাক্যের উল্লেখ করেছেন, কেবল কতকগুলি বৈদিক পদের উল্লেখ করেন নাই। এথেকে বুঝা যায় যে পূর্ববর্তী গুরুশিষ্য পরম্পরায় যে ক্রমে বেদবাক্যের উচ্চারণ চলে আসছে ঠিক সেইরূপ উদাত্তাদি স্বরসংযুক্ত উচ্চারণেই বেদের বেদত্ব রক্ষিত হয়, অন্যথা হয় না। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উদিত

হতে পারে এই যে, ভাষ্যকার বৈদিকশব্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে বৈদিক মন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন [বৈদিক] ব্রাহ্মণ বাক্যের উদাহরণ দিলেন না কেন? মন্ত্রেরও যেমন বেদত্ব আছে ব্রাহ্মণেরও সেইরূপ বেদত্ব আছে। আপস্তম্ব বলেছেন—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ বেদনামধেয়ম্।" আর ভাষ্যকারও ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকার করেন। নতুবা তিনি "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি।" এই ব্রাহ্মণবাক্যকে "আগমঃখল্বপি" বলে উদাহরণরূপে উল্লেখিত করলেন কি করে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে মহাভাষ্যকারের মতে বেদ বিভিন্ন ঋষিপ্রণীত। তার মধ্যে মন্ত্রগুলিই আগে রচিত হয়েছে, পরে ব্রাহ্মণবাক্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া যজ্ঞাদিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেই অনুষ্ঠান হয়, বাহ্মণ বাক্যের উচ্চারণ করে অনুষ্ঠান বা অর্থের স্মরণ করা হয় না। এইহেতু মন্ত্রের প্রামাণ্য অধিক। ব্রাহ্মণবাক্য সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি বলে মন্ত্রের উপজীবক [আশ্রিত]। এই হেতু ভাষ্যকার মন্ত্রেরই উদাহরণ বলেছেন। আর বেদকে যাঁরা অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করেন তাঁদের মতে যদিও বেদ নিত্য তথাপি মানুষের মাঝে প্রথমে মন্ত্রগুলি অভিব্যক্ত হয়েছে, তারপর ব্রাহ্মণের অভিব্যক্তি। এই হিসাবে এবং যজ্ঞাদিতে মন্ত্রের প্রাধান্যবলে মন্ত্রবাক্যই বৈদিকশব্দের উদাহরণরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আর একটা প্রশ্ন স্বতই উদিত হয় এই যে—সর্বত্র বেদের ক্রমে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এইভাবে উল্লিখিত হয়। মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে উক্ত ক্রমই দেখা যায়। ভাষ্যকার সেই ক্রমকে পরিত্যাগকরে বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রদর্শনে অথর্ব, যজুঃ, ঋক্ ও সাম-এই ক্রম দেখিয়েছেন কেন? এর উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যজ্ঞ দুই প্রকার-শ্রৌত ও স্মার্ত। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে যজ্ঞের বিধান করা হয় তার নাম শ্রৌতযজ্ঞ। গৃহ্যসূত্রে বিহিত যজ্ঞের নাম স্মার্তযজ্ঞ। যজ্ঞীয় অগ্নি আবার প্রধানভাবে তিনপ্রকার:-আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নিকে ত্রেতা বলে। যিনি বেদবিধি অনুসারে ত্রেতাগ্নির আধান করেন তিনি শ্রৌতযজ্ঞের অধিকারী হন। যিনি লৌকিক অগ্নি অর্থাৎ গৃহ্যসূত্রপ্রতিপাদিত স্মার্ত অগ্নির আধান করেন তিনি শ্রৌতযজ্ঞে অধিকারী হন না কিন্তু স্মার্তযজ্ঞে অধিকারী হন। শ্রৌতযজ্ঞে যজুঃ, ঋক্ ও সামবেদের উপযোগিতা আছে, অথর্ববেদের কোন উপযোগিতা নাই। কিন্তু শ্রৌতযজ্ঞের উপযোগী

অগ্নিকুণ্ড, বেদি প্রভৃতির নির্মাণের পূর্বে অথর্ববেদের উপযোগিতা আছে। অগ্নিকুণ্ড, বেদি এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিগ্‌গণের উপবেশনের স্থান—এই সকলকে যাজ্ঞিক পরিভাষায় বিহার বলে। আবার অথর্ববেদে অভিচার শান্তি প্রভৃতি কর্মেরও বিধান আছে। বিহার নির্মাণের পূর্বে রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি থেকে যে যজ্ঞের বিঘ্ন হয়, সেই সকল বিঘ্ন দূর করবার জন্য শান্তিকর্ম করতে হয়। যজ্ঞ আরম্ভ করবার পূর্বে যজ্ঞের উপযোগী বিহারনির্মাণ করতে হয়। বিহার নির্মাণের পূর্বে শান্তিকর্ম করতে হয়। এই শান্তিকর্মের জন্য অথর্ববেদের প্রয়োজন। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বেই অথর্ববেদের উপযোগিতা আছে বলে মহাভাষ্যকার প্রথমে অথর্ববেদের মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যজুর্বেদে আধ্বর্যব অর্থাৎ অধ্বর্যুর কর্তব্য বলা হয়েছে। অধ্বর্যুই প্রথমে যজমানকে দীক্ষিত করেন। "অধ্বর্যুর্গৃহপতিং দীক্ষয়িত্বা" ইত্যাদি বেদে অধ্বর্যুর যজ্ঞে প্রথম কর্তব্যতার কথা বলা আছে। এই অধ্বর্যুর কর্ম যজ্ঞে প্রধান ব্যাপার। আধ্বর্যব যজুর্বেদে বিহিত হয়েছে আবার নিত্য কর্তব্য অগ্নিহোত্রহোম কেবল যজুর্বেদের [মন্ত্রের] দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই হেতু ভাষ্যকার অথর্ববেদের উল্লেখের পর ঋক্ ও সামের পূর্বে যজুর্বেদের উল্লেখ করেছেন। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টিতে [ঔষধিদ্রব্যক যাগবিশেষ] আধ্বর্যবের সঙ্গে হৌত্রকর্মেরও সমাবেশ আছে, এই হৌত্রকর্ম ঋগ্বেদের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় বলে যজুর্বেদের-পর ভাষ্যকার ঋগ্বেদের উল্লেখ করেছেন। অগ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সোমযাগে আধ্বর্যব ও হৌত্রের সঙ্গে ঔদগাত্রকর্ম অর্থাৎ সামবেদের কর্মও বিহিত হযেছে। এইজন্য ঋগ্বেদের পর সামবেদের উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষ্যকার এইরূপ গূঢ় অভিপ্রায়বশতই প্রসিদ্ধ ক্রম পরিত্যাগ করে এইরূপ ক্রমের উল্লেখ করেছেন। কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবার্তিকে অথর্ববেদের বেদত্ব অস্বীকার করেছেন। এটা ভট্টপাদের প্রৌঢ়িবাদ বলে মনে হয়। নতুবা ভট্টপাদের মত এতবড আস্তিক কি করে বললেন। বেদেই সর্বত্র অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। আর অথর্ববেদের মহাবাক্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য মাণ্ডূক্যোপনিষদের ব্যাখ্যা করে সেই মহাবাক্যের কথা বলেছেন। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট শব্দপ্রকরণে কুমারিলের উক্ত মত খণ্ডন করে অথর্ববেদের বেদত্বের উল্লেখ করছেন। মহাভাষ্যকার প্রথমেই অথর্ববেদের উল্লেখ করে এখানে তার বেদত্বের স্বীকার করেছেন ।২॥

মূল

অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ ? কিং যত্তৎ সাস্নালাঙ্গূল-
ককুদখুরবিষাণ্যর্থরূপং স শব্দঃ। নেত্যাহ।
দ্রব্যং নাম তৎ। যত্তর্হি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং
নিমিষিতমিতি স শব্দঃ ? নেত্যাহ। ক্রিয়া
নাম সা। যত্তর্হি তচ্ছুক্লো নীলঃ কপিলঃ
কপোত ইতি স শব্দঃ ? নেত্যাহ। গুণো নাম
সঃ। যত্তর্হি তন্মিন্নেষভিন্নং ছিন্নেষচ্ছিন্নং সামান্য-
ভূতং স শব্দঃ ? নেত্যাহ। আকৃতির্নাম সা ।৩॥

অনুবাদ—"গৌঃ" এই স্থলে কোন্‌টি শব্দ ? যে বস্তুর সাস্না [গলকম্বল] লাঙ্গুল [লেজ] ককুদ [ঝুঁটি] খুঁর ও বিষাণ [শিং] আছে সেই বস্তুটি কি শব্দ ? না। এই উত্তর বলছেন। সে বস্তুটি দ্রব্য। তা হলে কি যা, ইঙ্গিত [ইসারা] চেষ্টিত, [চেষ্টা] এবং নিমিষিত [নিমেষ] তাই শব্দ ? না। এই উত্তর বলছেন। সেগুলির প্রত্যেকটি ক্রিয়া। তা হলে যা শুক্ল নীল, কপিল, কপোত তাই শব্দ ? না। এই উত্তর বলছেন। সেগুলি গুণ। তাহলে কি বিভিন্ন গরুতে অভিন্ন, গোর বিনাশ হলেও যার বিনাশ হয় না, সকল গরুতে সামান্যরূপে অর্থাৎ সাধারণভাবে অবস্থিত তাই শব্দ ? না। এই উত্তর বলছেন। সেটি আকৃতি [জাতি] ॥ ৩ ॥

শব্দার্থ—"অথ গৌঃ" ইত্যাদি মূলের "অথ" শব্দটির অর্থ অনন্তর। অথবা এখানে প্রশ্ন বুঝাবার জন্য অথ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। অথ এই অব্যয়টি প্রশ্নের দ্যোতক। উহার এখানে কোন বাচ্য অর্থ নাই। বাক্যে প্রযুক্ত হলে প্রশ্ন বুঝায়। লৌকিক শব্দের মধ্যে ভাষ্যকার প্রথমেই "গৌঃ" শব্দের উচ্চারণ করেছেন বলে তারই উল্লেখ এখানে করেছেন। তার মানে "গৌঃ" এই নির্দিষ্ট শব্দ নয়। কিন্তু শব্দ বলতে কাকে বুঝায়—এই অভিপ্রায়েই উহা উল্লিখিত হয়েছে।

সাস্না = গরুর গলার নীচে লম্বমান মাংসখণ্ড, যাকে গলকম্বল বলা হয়। ককুদ = গরুর কাঁধের উপর যে মাংসপিণ্ড থাকে তাই, লৌকিক ভাষায় ঝুঁটি বিষাণ = শিং। নেত্যাহ = না, এই কথা বলছেন। কে বলছেন ? ভাষ্য-

কারই বলছেন, তবে তিনি "আমি বলছি" এইরূপ না বলে নিজেকে প্রথম পুরুষরূপে পরোক্ষভাবে বলছেন,-বৈয়াকরণের সিদ্ধান্তরূপে। প্রত্যেক প্রশ্নে ভাষ্যকার যে 'যৎ" শব্দের নপুংসকে প্রয়োগ করেছেন- সেটা সামান্যে অর্থাৎ সামান্য ভাবে কোন অর্থ বুঝাতে শব্দ নপুংসকলিঙ্গ হয় এই নিয়মে নপুংসকের প্রয়োগ করেছেন। স গুণঃ, সা ক্রিয়া ইত্যাদি উত্তরবাক্যে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে তৎ শব্দের লিঙ্গের প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইঙ্গিতম্ = যার দ্বারা মনের অভিপ্রায় সূচিত হয় এরূপ শরীরব্যাপারকে ইঙ্গিত বলে।

চেষ্টিতম্ = শরীরের সাধারণ ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। নিমিষিতম্ = চক্ষুর পলক ফেলা প্রভৃতি ব্যাপারের নাম নিমিষিত বা নিমেষ। কপিল = পিঙ্গল বর্ণ।

কপোত = চিত্র বর্ণ। ছিন্নেষু = (এখানে) বিনষ্ট হলে।

অচ্ছিন্নম্ = অবিনষ্ট।

সামান্যভূতম্ = সমানত্বপ্রাপ্ত। আকৃতিঃ = (এখানে) জাতি।

মীমাংসাদর্শনে ভাষ্যে ও বার্তিকপ্রভৃতি গ্রন্থে আকৃতি শব্দটি জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "আক্রিয়তে অভিব্যজতে অসৌ" এইরূপ কর্মবাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করে অবযব সংযোগাদি দ্বারা যা অভিব্যক্ত হয় তা আকৃতি। অবয়ব সন্নিবেশদ্বারা জাতি অভিব্যক্ত হয়-। অতএব গোত্বাদি জাতিকে মীমাংসা-দর্শনে আকৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়। ন্যায়দর্শনে "জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ" [ন্যাঃসূঃ ২।২।৬৮] আকৃতি শব্দের অর্থ করা হয়েছে সংস্থান = অবয়বসন্নিবেশ অর্থাৎ অবয়বসম্বন্ধ। [শব্দশক্তিপ্রকাশিকা-২৩ কারিকা] "জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ" [পাঃ সূঃ ৪।১।৬৩] এই সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি "আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ" বলে আকৃতিশব্দের আকার অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশ অর্থ করেছেন। তবে মহাভাষ্যের অন্যত্র অধিকাংশস্থলেই মহাভাষ্যকার জাতি অর্থে আকৃতি শব্দের প্রয়োগ করেছেন ॥ ৩ ॥

বিবৃতি—"গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ" "গৌঃ" এই স্থলে কোন্‌টি শব্দ ? এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন ভাষ্যকার। এই প্রশ্নটি কেবল "গৌঃ" এই অক্ষর সমূহকে অবলম্বন করে হয় নাই। কেবলমাত্র অক্ষরসমূহই যদি প্রশ্নের বিষয় হোতো, তাহলে সেই অক্ষর গুলি শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তার সঙ্গে অন্য বস্তুর

জ্ঞান না থাকায় কোন সন্দেহ হোতো না, সন্দেহ না হলে জিজ্ঞাসা হতো না। জিজ্ঞাসা না হলে প্রশ্নও হতে পারতো না। এই জন্য স্বীকার করতে হবে যে প্রশ্নটি—অক্ষরসমূহকে লক্ষ্য করে করা হয় নাই। কিন্তু "গৌঃ" শব্দ উচ্চারণ করলে আমাদের বুদ্ধিতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান তিনটি পদার্থ অবিবিক্তরূপে [যেন মিশ্রিত ভাবে] ভাসমান হয়।

আবার অর্থটিও পরিষ্কৃত ভাবে সাধারণের প্রতীত হয় না। গোপদার্থটি দ্রব্য বলে তাতে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি বিদ্যমান থাকে। দ্রব্যের জ্ঞান হতে গেলেই তাতে বিদ্যমান রূপাদি গুণ, ইঙ্গিত প্রভৃতি ক্রিয়া এবং সেই দ্রব্যে বিদ্যমান জাতিকে নিয়েই দ্রব্যের জ্ঞান হবে। গুণ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে দ্রব্যের জ্ঞান হয় না। মহাভাষ্যকারের মতে শব্দের দ্বারা দ্রব্যের প্রতীতি হলেই দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির অভেদ থাকায় দ্রব্যের জ্ঞানের সময় কেবল দ্রব্যের জ্ঞান হয় না কিন্তু গুণাদিদ্বারা সম্মিশ্রিত রূপেই দ্রব্যের জ্ঞান হয়। ঐরূপে দ্রব্যের জ্ঞানের সঙ্গে দ্রব্যের বাচক শব্দও জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে—ইহা মহাভাষ্যকার প্রভৃতি বৈয়াকরণ আচার্যদের মত। গুণাদির সহিত দ্রব্যের যেমন অভেদ আছে সেইরূপ বাচকশব্দের সহিতও দ্রব্যের অভেদ আছে। অবশ্য বাচকশব্দের সহিতও গুণাদিরূপ অর্থের [দ্রব্যের] সহিত পরস্পর ভেদাভেদ আছে–ইহা মহাভাষ্যকারানুযায়ী বৈয়াকরণগণের মত। সুতরাং গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বাচক শব্দের সহিত দ্রব্যের ভেদাভেদ থাকায় গোশব্দ উচ্চারণ করলে অর্থের জ্ঞান, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও শব্দের সহিত দ্রব্যের জ্ঞান হয়। এগুলিকে পরিত্যাগ করে কেবল দ্রব্যের জ্ঞান হয় না। একটি ন্যায় বা যুক্তি আছে "তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বম্।" ইহার অর্থ হচ্ছে দুই বা তাহার অধিক বস্তু যদি কোন এক বস্তুর সহিত অভিন্ন হয়, তাহলে ঐ দুই বা অধিক বস্তুগুলিও পরস্পর অভিন্ন হবে। গোশব্দের দ্বারা যেখানে দ্রব্যের প্রতীতি হয়, সেখানে গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও শব্দ উক্ত প্রতীতির বিষয় হওয়ায়, দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির অভেদ থাকায় গুণ, ক্রিয়া, জাতিও শব্দের পরস্পর অভেদ প্রাপ্তি হয়ে যায়। সুতরাং গুণ, ক্রিয়া, জাতি, শব্দ ও দ্রব্য এগুলি পরস্পর অভিন্ন ভাবে একটি জ্ঞানের বিষয় হয়ে যাওয়ায় তাহাদের মধ্য থেকে শব্দকে সহসা পৃথক করা যায় না। মহাভাষ্যকার কেবল শব্দটিকে গুণাদি থেকে পৃথক করে বুঝাবার জন্য—"গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ" এই রূপে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয়েছে, তা আলোচনা করলেও উক্তসিদ্ধান্তই সূচিত হয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "দ্রব্যং নাম তৎ" সেটি দ্রব্য। মীমাংসকের মতে শব্দ দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত। যদিও শব্দের দ্রব্যত্বমতটি কুমারিলের সম্প্রদায়েই এখন প্রচলিত তথাপি পূর্বেও মীমাংসকদের মধ্যে এই মত প্রচলিত ছিল। এই মতের অস্তিত্ব স্বীকার করলে, শব্দপদার্থটি দ্রব্য হওয়ায় "দ্রব্যং নাম তৎ" এই উত্তরের দ্বারা সাস্নালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট বস্তুর শব্দত্ব নিষিদ্ধ হতে পারে না। কারণ শব্দও দ্রব্য বলে সেই সাস্নাদিবিশিষ্টবস্তু শব্দ হবে না, এর কোন হেতু নাই। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে শব্দকে গুণ স্বীকার করা হয় বলে 'গুণো নাম সঃ' সেটিগুণ এই উত্তরের দ্বারা শব্দ শুক্লাদি রূপ গুণ নয় = এইভাবে নিষেধ করা সঙ্গত হয় না। কেবল ন্যায় বৈশেষিক মতেই যে শব্দ গুণ তা নয়। মহাভাষ্যকারের মতেও শব্দ গুণ। মহাভাষ্যকার "তস্য ভাবস্ত্বতলৌ" [৫।১।১১৯] সূত্রে বলেছেন—"শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাগুণাঃ" শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এগুলি গুণ। সুতরাং গুণ হলেও শব্দ হতে পারে, যেহেতু শব্দ গুণ হতে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নয়। অতএব ভাষ্যকারের—উক্ত উত্তর দুটি সঙ্গত হচ্ছে না। এর উত্তরে বলা যায় = ভাষ্যকার কোন স্থলেই শব্দকে দ্রব্য বলে উল্লেখ করেন নি। সুতরাং তাঁর মতে শব্দ দ্রব্য নয়। তা হলে 'দ্রব্যং নাম তৎ' সেটি দ্রব্য – এই কথায় = সাস্নালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট বস্তুর শব্দত্বের আশঙ্কা থাকে না। এইভাবে = প্রথম উত্তর সঙ্গত হয়। কিন্তু "গুণো নাম সঃ" সেটি গুণ = এই উত্তরের দ্বারা শুক্লাদিরূপের শব্দত্ব নিবারিত হয় না। এইজন্য 'গুণো নাম সঃ' এই অংশের পূর্বে "ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ" পদটির অধ্যাহার করে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতে সমগ্র উত্তর বাক্যটি হবে—"ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো গুণো নাম সঃ" সেটি [শুক্লাদি] ভিন্নইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ, কিন্তু শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ। শুক্লাদি রূপ গুণ হলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য। শব্দটি শ্রোত্রগ্রাহ্য। অতএব শুক্লাদিরূপ শব্দ হতে পারে না। যদি শব্দকে দ্রব্য বলে মনে করা হয় তা হলে প্রথম উত্তরেরও পূর্বে অর্থাৎ "দ্রব্যং নাম তৎ" এর পূর্বে "ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যম্" পদের অধ্যাহার করে উত্তর দিতে হবে। তাতে উত্তরটি হবে এইরূপ সাস্নালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট পদার্থটি চক্ষু বা ত্বক্‌রূপ ভিন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্য। শব্দটি কিন্তু শ্রোত্রগ্রাহ্য দ্রব্য। সুতরাং শব্দ দ্রব্য হলেও সাস্নাদি বিশিষ্ট বস্তু হতে পারে না।

তৃতীয় উত্তরে 'ক্রিয়া নাম সা' সেটি ক্রিয়া এই অংশে অনুপপত্তি নাই। ইঙ্গিত প্রভৃতি ক্রিয়া। কিন্তু শব্দ ক্রিয়া একথা কেউই বলেন না। সুতরাং ইঙ্গিত প্রভৃতি ক্রিয়া শব্দ হতে পারে না।

চতুর্থ উত্তরে শব্দের জাতিত্ব নিষেধ করা হয়েছে। শব্দকে কেউ জাতি বলেন না। চতুর্থ প্রশ্নে "সামান্যভূতম্" শব্দটি আছে। কৈয়ট মহাভাষ্য প্রদীপে তার অর্থ করেছেন 'সামান্যসদৃশ'। আর তার ব্যাখ্যায় বলেছেন—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিনপদার্থে সত্তা জাতি থাকে। সত্তা জাতি গোত্বাদি সকল জাতির ব্যাপক। এই হেতু এই সত্তা কেবল সামান্য [জাতি] নয়, কিন্তু মহাসামান্য বা মহাজাতি। এই সত্তা জাতিটি ভাষ্যের প্রশ্নে গোত্বাদি জাতির উপমান রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। সামান্যভূতম্ = সামান্যমিব [সত্তারূপ] সামান্যসদৃশ [গোত্বজাতি]। কিন্তু নগেশ ভট্ট কৈয়টের এই ব্যাখ্যা অস্বীকার করে বলেছেন—এখানে [সামান্যভূতম্স্থলে] উপমান্-উপমেয় ভাব কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধিরাদৈচ [১।১।১] সূত্রের মহাভাষ্যে "প্রমাণভূত" প্রয়োগ আছে। সেখানে কৈয়ট প্রমাণ শব্দকে ভাব প্রধান রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। প্রমাণ শব্দের প্রামাণ্য অর্থ গ্রহণ করে—ভূত শব্দটিকে প্রাপ্ত্যর্থক চুরাদিগণীয় ভূ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ান্ত রূপে সিদ্ধ করে—প্রমাণ ভূত শব্দের অর্থ করেছেন প্রামাণ্যপ্রাপ্ত। (১২)]। সেখানকার মত 'সামান্যভূত' শব্দটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সমান শব্দটিকে "চাতুর্বর্ণ্যাদি" আকৃতিগণের মধ্যে ধরে তার উত্তর স্বার্থে 'ষ্যঞ্' [৫।১।১২৪ সূত্রের ১ সংখ্যক বার্তিক ও তার কৈয়ট এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভাবতদ্ধিত প্রকরণ] করলেও সামান্য শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় 'সমান'। তারপর "সামান্যভূত" স্থলে সমানার্থক সামান্য শব্দটিকে ভাবপ্রধান নির্দেশ করে, 'ভূত' শব্দের সহিত দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বা সুপ্‌সুপা সমাস করে—সামান্যভূত শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ হয় সমানত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ সাধারণত্বপ্রাপ্ত। গোত্বজাতিটি তার সকল আশ্রয়ে [গরুতে] একভাবে থাকে বলে তাকে সমানত্ব প্রাপ্ত বলায় কোন বাধা নাই। এখানে সমান শব্দের উত্তর ভাবে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করলেও সামান্য শব্দ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাতে সামান্য শব্দটি বিশেষ্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে

---

(১২) প্রমাণভূত ইতি। প্রামাণ্যং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ভূপ্রাপ্তাবিত্যস্য আধৃষাদ্বেতি নিজভাবপক্ষে রূপম্। বৃত্তিবিষয়ে চ প্রমাণশব্দঃ প্রামাণ্যে বর্ত্ততে। মহাভাষ্যপ্রদীপঃ ১।১।১।

সামান্য শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সমান শব্দের স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করলে তার বিশেষণত্বটি রক্ষিত হয়। অবশ্য ভাবে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করেও সামান্য ভূত শব্দ র সামানত্বপ্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করা যায়। (১৩)।

এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে এই যে, ভাষ্যকার শব্দের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে শব্দের দ্রব্যত্ব, ক্রিয়াত্ব, গুণত্ব ও জাতিত্ব ক্রমে ক্রমে নিবারিত করেছেন। কিন্তু এই ক্রমে নিষেধ না করে অন্যরূপে করলে কি হানি হোতো? এর উত্তরে বলা যায় গুণ, ক্রিয়া ও জাতির আশ্রয় হচ্ছে দ্রব্য। এইজন্য গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির অপেক্ষা দ্রব্যের প্রাধান্য আছে (১৪)। অতএব প্রথমে শব্দের দ্রব্যত্বের আশঙ্কা করা হয়েছে। তারপর শব্দ স্পর্শাদি যে সকল গুণ জন্য পদার্থ ক্রিয়া তাদের একটি কারণ। কার্যের অপেক্ষা কারণের পূর্ববর্তিতা থাকায় দ্রব্যের পরে অথচ গুণের পূর্বে শব্দের ক্রিয়াত্বের আশঙ্কা করা হয়েছে। ক্রিয়ার পর গুণের আশঙ্কা করে শেষে জাতির আশঙ্কার হেতু এই যে জাতি দ্রব্য ক্রিয়া ও গুণ এই তিনে আশ্রিত। এই জন্য পূর্বে জাতির আশ্রয় বলে তারপর জাতির কথা বলা হয়েছে। "কিং যত্তৎ" ইত্যাদিস্থলে "যত্তৎ" এই দুই শব্দকে মিলিত ভাবে শব্দের সমানার্থকরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে। অথবা 'তৎ' শব্দটিকে।

স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এখানে প্রসিদ্ধ অর্থে তৎশব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নগুলিতেও অনুরূপ অভিপ্রায় বুঝতে হবে। "কিং যত্তৎ......" এই স্থলে প্রশ্নবাক্যে প্রথমে ক্লীবলিঙ্গের দ্বারা নির্দেশ করে পরে "স শব্দঃ" এইভাবে পুংলিঙ্গের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে; প্রথমে যৎশব্দের দ্বারা যে বস্তুকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে পরবর্তিস্থলে তৎশব্দের দ্বারা সেই বস্তুকে নির্দিষ্ট করায়, এই দুটি 'যৎ' তৎ' শব্দের সমান লিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। অথচ তা না করে ভাষ্যে ভিন্নলিঙ্গের নির্দেশের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে—যৎ, তৎ প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের একত্ব প্রতিপাদন করে। এইজন্য ঐ সকল সর্বনাম শব্দ

---

(১৩) গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্মণি চ ৫।১ ১২৪।

(১৪) গুণসংদ্রাবো দ্রব্যম্—মহাভাষ্য ৫।১।১১৯। গুণানামাশ্রয়ো দ্রব্যমিত্যর্থঃ। কৈয়ট ৫ ১ ১১৯।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের লিঙ্গকে গ্রহণ কর্তে সমর্থ। বক্তার ইচ্ছানুসারে কোন স্থলে উদ্দেশ্যের এবং কোন স্থলে বিধেয়ের লিঙ্গে উহাদের প্রয়োগ হয় (১৫)। সুতরাং একস্থলে উদ্দেশ্যের প্রাধান্য বিবক্ষায় নপুংসকলিঙ্গের এবং অন্যস্থলে বিধেয়ের প্রাধান্য বিবক্ষায় পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের নির্দ্দেশ করা হয়েছে ॥ ৩ ॥

মূল

কস্তর্হি শব্দঃ? যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গূল-
ককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তা হলে কোন্‌টি শব্দ? যাহা উচ্চারিত [অভিব্যক্ত] হলে, সাস্না, লাঙ্গুল, ককুদ, খুর ও শৃঙ্গ বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—এখানে ভাষ্যকার যে ভাবে বলেছেন, তাতে সহজে মনে হয় যে বর্ণসমূহই শব্দ। কারণ লোকে বর্ণকে উচ্চারণ করে। যাহা উচ্চারিত হলে সাস্নালাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয় তাহা শব্দ। "গ্, ঔঃ," উচ্চারিত হলে সাস্নাদিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়। সুতরাং গকার ঔকার ও বিসর্গ এই বর্ণগুলিই শব্দ, এইরূপ অর্থ সহজেই প্রতীত হয়।

কিন্তু মহাভাষ্যকার "তপরস্তৎকালস্য" [১।১।৯—৭০] সূত্রে স্ফোটকেই শব্দস্বরূপ বলেছেন। ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে ভাষ্যের মত ব্যাখ্যা করে শব্দের স্ফোটস্বরূপতা প্রতিপাদন করেছেন। সুতরাং "যেন উচ্চারিতেন" এর সহজ অর্থ যা উচ্চারিত হলে—এরূপ অর্থ গৃহীত হতে পারে না। এইজন্য এর ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলেছেন "প্রকাশিতেন" যাহা প্রকাশিত হলে। অভিব্যক্তির অর্থ জ্ঞান, অভিব্যক্তের অর্থ জ্ঞানবিষয়তাপ্রাপ্ত—। জ্ঞানবিষয়তাপ্রাপ্ত—আর প্রকাশিত একই অর্থ। কৈয়ট বলেছেন—(১৬)

---

(১৫) উদ্দিশ্যমান প্রতিনির্দ্দিশ্যমানয়োরৈকত্বমাপাদয়ন্তি সর্বনামানি পর্যায়েণ তল্লিঙ্গমুপাদদত ইতি কামচারতঃ স শব্দ ইতি পুংলিঙ্গেন নির্দেশঃ। কৈয়ট। উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যয়োরৈক্যমাপাদয়ৎ সর্বনাম পর্যায়েণ তত্তল্লিঙ্গভাক্ [লঘুশব্দেন্দুশেখর অচসন্ধি প্রকৃতি ভাব প্রকরণ]।

(১৬) "বৈয়াকরণা বর্ণব্যতিরিক্তস্য পদস্য বাক্যস্য বা বাচকত্বমিচ্ছন্তি। বর্ণানাং প্রত্যেকং বাচকত্বে দ্বিতীয়াদিবর্ণোচ্চারণানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিপক্ষে যৌগপদ্যেনোৎপত্ত্যভাবাৎ অভিব্যক্তিপক্ষে ক্রমেণৈবাভিব্যক্ত্যা সমুদায়াভাবাদেকস্মৃত্যুপারূঢ়ানাং বাচকত্বে সরোরস ইত্যাদাবর্থপ্রতিপত্তাবিশেষপ্রসঙ্গাত্তদ্ব্যতিরিক্তঃ স্ফোটো নাদাভিব্যঙ্গ্যো বাচকো বিস্তরেণ বাক্যপদীয়ে ব্যবস্থাপিতঃ। উচ্চারিতেন প্রকাশিতেনেত্যর্থঃ ॥

বৈয়াকরণেরা বর্ণব্যতিরিক্ত পদ বা বাক্যকে বাচক স্বীকার করেন। বর্ণকে অর্থের বাচক বললে প্রত্যেকে বর্ণ অর্থের বাচক অথবা বর্ণ সমুদায় অর্থের বাচক [এইরূপ বিকল্প হলে], যদি প্রত্যেক বর্ণকে বাচক বলা হয় তা হলে, প্রথম বর্ণ থেকেই অর্থের জ্ঞান সম্ভব হওয়ায় দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের আনর্থক্য হয়। আর সমস্ত বর্ণকে বাচক বললে - বর্ণের উৎপত্তিপক্ষে একসঙ্গে সব বর্ণের উৎপত্তি হতে পারে না বলে একসঙ্গে সমুদায় বর্ণের অবস্থানের অভাবে অর্থের জ্ঞান অনুপপন্ন হয়। আর বর্ণের অভিব্যক্তি স্বীকার করলেও অভিব্যক্তি ক্রমে ক্রমে হওয়ায় যুগপৎ সকল বর্ণের উপস্থিতির অভাবে অর্থজ্ঞান হতে পারে না। প্রথমে বর্ণগুলির ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্তি হয়, তারপর সমুদায় বর্ণ একটি স্মৃতির বিষয় হয়ে যুগপৎ অর্থবোধ জন্মায় এই কথা বললে 'সর' 'রস' এইরূপ বিপরীত ক্রমে জাত বর্ণ সমুদায় হতে একরূপ অর্থের জ্ঞানের আপত্তি হয়ে যাবে। এই হেতু বর্ণ থেকে অতিরিক্ত নাদ বা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যঙ্গ স্ফোটকেই শব্দস্বরূপ বলতে হবে। সেই স্ফোটই অর্থের বাচক হয়। নাগেশ ভট্ট প্রদীপোদ্দ্যোতে মহাভাষ্যের "উচ্চারিতেন" পদের অর্থ করেছেন শরীরের ভিতর হতে অর্থাৎ মূলাধার বা নাভি হতে যে বায়ু উঠে সেই বায়ুর অভিঘাত নামক সংযোগ হলে সেই বায়ুসংযুক্ত কণ্ঠস্থান প্রভৃতির দ্বারা অবয়বক্রমে অভিব্যক্ত হয় যে বস্তু [স্ফোট] তার দ্বারা (১৭)। সুতরাং উক্ত মহাভাষ্য পংক্তির অর্থ হচ্ছে যা অভিব্যক্ত হলে সাস্নালাঙ্গুলাদি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি হয় তাহাই শব্দ।

শব্দ হতে কি ভাবে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হচ্ছে। অপর ব্যক্তির অর্থজ্ঞানের জন্য আমরা শব্দপ্রয়োগ করে থাকি। সেই শব্দ থেকে অপরের অর্থজ্ঞান হয়। এই অর্থজ্ঞান কি ভাবে জন্মে– সে বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তন্মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতানুযায়ী পণ্ডিতগণ মনে করেন—অকার প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। উচ্চারণ প্রযত্নের দ্বারা অকারাদি বর্ণ উৎপন্ন হয়, তারপর দ্বিতীয়ক্ষণে তাদের স্থিতি আর তৃতীয়ক্ষণে তাদের বিনাশ হয় (১৮)। এইরূপ

(১৭) 'উচ্চারিতেনেতি'—শরীরমারুতাভিহতকণ্ঠাদিস্থানৈঃ বয়বশোভিব্যক্তেন যেনেত্যর্থঃ। পস্পশাহ্নিক মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

(১৮) যে সকল প্রাচীন নৈয়ায়িক জ্ঞায়মান শব্দকে শাব্দবোধের করণ স্বীকার করতেন তাঁদের মতে শব্দ তিনক্ষণস্থায়ী। এঁদের মতে প্রথম ক্ষণে শব্দের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দের প্রত্যক্ষ ও শব্দের শক্তিস্মরণ [সমূহালম্বনরূপ] একসঙ্গে হয়ে থাকে, তৃতীয় ক্ষণে শব্দ হতে শব্দবোধের উপযোগী পদার্থের স্মরণ এবং শাব্দবোধের সহকারী আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান ও তাৎপর্যজ্ঞান একসঙ্গে [সমূহালম্বনরূপে] হয়। চতুর্থক্ষণে শব্দের নাশ ও শাব্দবোধ যুগপৎ হয়। এই মতের আভাস ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে দেখতে পাওয়া যায়।

উৎপত্তি বিনাশশীল বর্ণসমুদায়ই পদ এবং এইরূপ পদ সমুদায়ই বাক্য। এই ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তে সমুদায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক থেকে সমুদায় ভিন্ন নয় বলে পদ বা বাক্য, বর্ণ হতে কোন অতিরিক্ত বস্তু নয়। এঁদের মতে অ-কার প্রভৃতি সব বর্ণই অসংখ্য।

জৈমিনির মতাবলম্বী অধ্বরমীমাংসকগণ অকার প্রভৃতি বর্ণের অসংখ্যতা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অকার প্রভৃতি সব বর্ণের প্রত্যেকটি নিত্য এক ও বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানগুলিতে বায়ুর বিচিত্র সংযোগবশতঃ ঐ সকল বর্ণের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না। অভিব্যক্তিবিশিষ্ট বর্ণের যে সমুদায় তাহাই পদ এবং এইরূপ পদের যে সমুদায় তাহাই বাক্য। অবশ্য বাক্য হতে অর্থের জ্ঞান হয় এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দ্বিতীয় বর্ণের স্থিতিকালে প্রথম বর্ণের ধ্বংস হয়ে যায়। এইরূপ তৃতীয় বর্ণের স্থিতিকালে দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বংস হয়। 'ঘট' এই শব্দে ঘ + অ + ট + অ এই চারটি বর্ণ আছে। ঘট' শব্দের অন্তিম অকারের স্থিতিকালে পরবর্তী তিনটি বর্ণই নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় চারটি বর্ণের এককালে স্থিতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বর্ণসমুদায়ের এককালে স্থিতি না হওয়ায় চারটি বর্ণের যুগপৎ প্রত্যক্ষ হতে পারে না পরবর্তী বর্ণগুলির ক্রমিক প্রত্যক্ষ হয়ে, সেই প্রত্যক্ষ থেকে সংস্কার উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানজনিত ঐ সংস্কারের সহিত অন্তিম বর্ণের যে প্রত্যক্ষ সেইটি পদের প্রত্যক্ষ। এইরূপে পদের জ্ঞান হয়ে থাকে। যে পদ থে যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের সহিত সেই পদের একটি সম্বন্ধ আছে ইহা অবশ্যই বলতে হবে। ঘট" শব্দের সহিত ঘট পদার্থেরই এই সম্বন্ধ আছে, পট পদার্থের সহিত ঘট শব্দের অর্থজ্ঞানজনক সম্বন্ধ নাই। এই জন্য ঘট শব্দ থেকে ঘটের জ্ঞান হয় পটের জ্ঞান হয় না। শব্দ ও অর্থের এই সম্বন্ধকে শক্তি বলে। যে ব্যক্তির এই শক্তিজ্ঞান আছে তার পূর্বোক্তরূপে শব্দজ্ঞান হওয়ায় অর্থের উপস্থিতি হয়। যে দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকে—সেই সম্বন্ধের জ্ঞান থাকলে একটি বস্তুর জ্ঞান হলে অপর বস্তুর স্মরণ হয়। যেমন হাতীকে দেখলে মাহুতের স্মরণ হয়। এই রীতিতে শব্দ থেকে অর্থের স্মরণ হয়।

মীমাংসকমতে বর্ণ নিত্য হলেও বর্ণের জ্ঞান সর্বদা থাকে না। যেমন ঘট বস্তুটি পূর্ব হতে বিদ্যমান থাকলেও অন্ধকারে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। ঘটের

সহিত আলোকের সম্বন্ধ হলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এই আলোক ঘটের অভিব্যঞ্জক। এইরূপ নিত্য বর্ণগুলি সর্বদা বিদ্যমান থাকলেও আমাদের শ্রোত্রদেশে বাহ্যবায়ুর দ্বারা বর্ণগুলি আবৃত থাকে। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চারণ করে তখন তার শরীরের ভিতর থেকে বায়ু উঠে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে অভিব্যক্ত [সংযুক্ত] হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই মুখনির্গত বায়ুর সংযোগ বিভাগগুলি শ্রোত্রদেশস্থ বাহ্য বায়ুকে অপসৃত করে দেয়। তখন বর্ণ বা বর্ণসমূহাত্মক পদ বা বাক্য অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। এই বায়বীয় সংযোগ বিভাগরূপ অভিব্যঞ্জক যখন থাকে না তখন বর্ণের অভিব্যক্তি হয় না অর্থাৎ জ্ঞান হয় না। অভিব্যক্তি হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান দ্বিক্ষণস্থায়ী পদার্থ। প্রথমক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ হয়। সুতরাং বর্ণ নিত্য হলেও অভিব্যক্তিবিশিষ্ট বর্ণের স্থায়িত্ব দুইক্ষণ। এইজন্য পূর্বমীমাংসকমতেও বর্ণসমুদায়াত্মক পদের সকল বর্ণ এককালে না থাকায় (অজ্ঞাত থাকায়) যুগপৎ সকল বর্ণের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। সুতরাং ইহাদের মতেও একটি শব্দের [পদের] অন্তর্গত পূর্ববর্তি বর্ণগুলির অনুভব থেকে যে সংস্কার জন্মে সেই সংস্কার সহিত যে অন্তিম বর্ণের জ্ঞান তাহাই পদজ্ঞান। এই পদজ্ঞান থেকে অর্থের জ্ঞান হয়। এঁদের মতে পদের সহিত পদার্থের প্রত্যায্য প্রত্যায়ক সম্বন্ধ থাকে বলে—পদের জ্ঞান হতে সম্বন্ধজ্ঞান থাকলে পদার্থের উপস্থিতি হয়। পদ প্রত্যায়ক = অর্থের বোধক। অর্থ = প্রত্যায্য = পদের দ্বারা জ্ঞেয়।

বৈয়াকরণগণ – এই দুই মতই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন পূর্ব পূর্ব বর্ণের সংস্কার সহিত অন্তিম বর্ণের জ্ঞানকে পদজ্ঞান বলে স্বীকার করলে যেখানে এক একটি বর্ণের উচ্চারণ করে মধ্যে বিরাম দিয়ে পরে অন্তিম বর্ণের উচ্চারণ করা হয় সেখানেও পদজ্ঞান হতে পারে। সুতরাং সে স্থলেও অর্থজ্ঞান অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলে ঐভাবে উচ্চারিত বর্ণ থেকে অর্থপ্রতীতি হয় এরূপ কেহ স্বীকার করেন না। আমাদের সেরূপ অনুভবও ঐরূপ অর্থজ্ঞানের সমর্থন করে না। এইজন্য বর্ণসমুদায় থেকে বৈয়াকরণেরা অর্থপ্রতীতি স্বীকার করেন না।

বৈয়াকরণ সম্প্রদায় "স্ফোট" স্বীকার করেন। যা থেকে অর্থের জ্ঞান হয় তার নাম স্ফোট। স্ফোট-শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থ পাদটীকায় প্রদত্ত

হলো (১৯)। এই 'স্ফোট' শব্দটি ঠিক যৌগিক শব্দ নয় কিন্তু পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দের মত এটি যোগরূঢ় শব্দ (২০)। বৈয়াকরণ মনীষিগণ প্রথমতঃ আটপ্রকার স্ফোট স্বীকার করেছেন। যথা—(১) বর্ণস্ফোট, (২ পদস্ফোট (সখণ্ডপদস্ফোট । (৩) বাক্যস্ফোট (সখণ্ডবাক্যস্ফোট)] (৪) অখণ্ডপদস্ফোট। (৫) অখণ্ডবাক্য স্ফোট। (৬) বর্ণজাতিস্ফোট। (৭) পদজাতিস্ফোট। (৮) বাক্যজাতিস্ফোট। এইসব স্ফোটই যে পারমার্থিক তা নয়। বাক্যস্ফোটকে বুঝাবার জন্য পূর্ববর্তী স্ফোটগুলি কল্পিত হয়েছে।

১। বর্ণস্ফোট।

পচতি এই পদে 'পচ' ধাতু এবং 'তি' প্রত্যয় আছে। এদের মধ্যে 'শপ্' [অ] প্রত্যয় হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী এরূপ প্রত্যয়কে ব্যাকরণের ভাষায় 'বিকরণ' বলে। বৈয়াকরণেরা বিকরণের কোন অর্থ স্বীকার করেন না। প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিতভাবে যে অর্থ প্রকাশ রূপ কার্য করে, বিকরণ সেই অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে, স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থপ্রকাশ করে না। যার [যে শব্দের] অর্থপ্রকাশ করবার শক্তি আছে অর্থাৎ যার বাচকতা আছে "স্ফোট" শব্দে তাহাদিগকে অভিহিত করা হয়। ক্রমিকবর্ণসমূহ থেকে অর্থপ্রতীতি হয় বলে ক্রমিক বর্ণসমূহ স্ফোট শব্দের বাচ্য। ইহাই হলো

---

(১৯) স্ফুটতি প্রকশেতে অর্থো অস্মাদিতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবৎ—বৈয়াকরণভূষণসার—৬১। স্ফুটতি অভিব্যক্তীভবতি অর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটো নামাত্মক শব্দঃ, ব হুলকাদপাদানে ঘঞ্ [বৈয়াকরণভূষণসারদর্পণটীকা]। যা থেকে অর্থ অভিব্যক্ত হয়, তার নাম স্ফোট। স্ফুট ধাতুর উত্তর অপাদানে ঘঞ্। এখানে দর্পণকার বাহুলকাদপাদানে ঘঞ্ বলেছেন। তবে অকর্তরি। চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ [পাঃ সূঃ ৩।৩ ১৯] এই সূত্র দ্বারা ঘঞ্ প্রত্যয় বললে ভালো হয়।

(২০) স্ফুটতি অর্থো যস্মাদিতি বুৎপত্ত্যা পঙ্কজাদিবদ্ যোগরূঢ়ঃ স্ফোটশব্দঃ। স্ফোটচন্দ্রিকা। যে সকল শব্দ থেকে কেবল প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাদের নাম যৌগিক শব্দ। যেমন পাচক, পাঠক প্রভৃতি শব্দ। এই সব স্থলে ধাতুর অর্থ পাক, পাঠ প্রভৃতি। এবং প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা—এই দুই অর্থেরই বোধ হয়। যে সকল শব্দ থেকে প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের সহিত মিলিতভাবে আর একটি স্বতন্ত্র অর্থের প্রতীতি হয়, তাদের নাম যোগরূঢ়। যেমন পঙ্কজ শব্দ। এখানে পঙ্ক+জন+ড। পঙ্ক শব্দের উত্তর জন ধাতু, তারপর ড প্রত্যয় আছে। এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ যাহা কর্দমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানে কেবল যে এইটুকু বুঝায় তা নয়। পঙ্কজ শব্দ থেকে কর্দমে উৎপন্ন পদ্মের প্রতীতি হয়। কর্দমে উৎপন্ন শৈবাল, কুমুদ প্রভৃতির প্রতীতি হয় না।

বর্ণস্ফোটের তাৎপর্য। এই পক্ষটি নৈয়ায়িক ও মীমাংসকদের অভিমত হলেও বৈয়াকরণগণ ইহা স্বীকার করেন নি—একথা পূর্বে আমরা বলেছি।

একটি পদে যতগুলি বর্ণ আছে, সেই বর্ণসমূহের কোন্ অংশের দ্বারা কতটুকু অর্থ প্রকাশিত হয়, তা বলা কঠিন। যে হেতু

২। পদস্ফোট। ব্যবহার ক্ষেত্রে কেবল প্রকৃতি বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় না। সুতরাং প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ কল্পনা করে তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে এরূপ নির্দেশ করা একটা কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নয়। "পচতি" "দেবদত্তঃ" প্রভৃতি পদে যে প্রকৃতি ও প্রত্যয় কল্পিত হয়—তাদের স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ নাই। কিন্তু এই সকল পদ হতে যে অর্থের প্রতীতি হয় তা সমগ্র পদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। পদই ব্যবহার ক্ষেত্রে আমাদের অর্থ জ্ঞানের উপায়। সুতরাং অর্থ প্রকাশের শক্তি [সামর্থ্য] পদে আছে বলে বর্ণসমূহাত্মক পদই 'স্ফোট' [বাচক]। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বাচকতা নাই। ইহাই পদস্ফোট পক্ষ।

প্রত্যেক পদকে পৃথগ্‌ভাবে প্রয়োগ করলে তা থেকে লোকের ব্যবহারোপযোগী কোন অর্থের জ্ঞান হয় না। আমরা নিজের অভিমত বিষয় অপরকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে কেবল পদের প্রয়োগ না

৩। বাক্যস্ফোট। করে বাক্যের প্রয়োগ করে থাকি। অন্য ব্যক্তিও আমাদের অভিমত বিষয় বাক্য হতে বুঝে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যই অর্থজ্ঞানের সাধন। সুতরাং অর্থজ্ঞানের অনুকূল শক্তি বাক্যেই আছে, পদে নাই। এই বাক্য ক্রমিক বর্ণের সমষ্টিমাত্র। এইটি বাক্যস্ফোট পক্ষ।

উপরে যে তিনটি পক্ষ দেখান হলো, সেই সব পক্ষেই বর্ণের সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। অতএব প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ এবং বাক্যের বর্ণরূপ অবয়ব আছে বলে সেই প্রকৃতি, প্রত্যয়, প্রভৃতি সখণ্ড।

পদের কোন অবয়ব নাই। বর্ণবাদীরা যেমন বর্ণের কোন অবয়ব স্বীকার করেন না—বর্ণকে নিরবয়ব-অখণ্ড বলে

৪। অখণ্ড পদস্ফোট। স্বীকার করেন। সেইরূপ অখণ্ডপদস্ফোটবাদীরাও পদকে অখণ্ড বস্তু বলেন। এই অখণ্ড পদ থেকেই আমাদের অর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং অখণ্ড পদেই অর্থ প্রকাশের

শক্তি আছে। অতএব অখণ্ডপদই বাচক [স্ফোট]। ইহাই অখণ্ড-পদস্ফোটপক্ষ।

৫। অখণ্ড বাক্যস্ফোট।

পদের যেমন কোন অবয়ব নাই, সেরূপ বাক্যেরও কোন অবয়ব নাই। বাক্যের অর্থ জ্ঞানের সুবিধার জন্য পদগুলিকে বাক্যের অবয়বরূপে কল্পনা করা হয়। পদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। অখণ্ডবাক্যেই অর্থ প্রতীতির অনুকূল শক্তি আছে। অতএব অখণ্ডবাক্যই বাচক [স্ফোট], ইহাই অখণ্ড বাক্যস্ফোট পক্ষ।

উপরে যে পাঁচ প্রকার স্ফোটের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—সেই পাঁচপ্রকার স্ফোটকে সাধারণভাবে 'ব্যক্তিস্ফোট' নামে অভিহিত করা হয়। (২১)

৬। বর্ণজাতি স্ফোট।

মহর্ষি, জৈমিনির অনুযায়ী পূর্বমীমাংসকগণ জাতিশক্তিবাদী। তাঁরা ঘট প্রভৃতি ব্যক্তিকে ঘট প্রভৃতি শব্দেরবাচ্য বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু ঘটত্ব, পটত্ব জাতিকেই ঘটাদি শব্দের বাচ্য বলেন। মীমাংসকদের মতের অনুকরণ করে জাতিস্ফোটবাদিগণ সিদ্ধান্ত করেছেন—যেভাবে ঘটাদি পদার্থনিষ্ঠ জাতি বাচ্যরূপে স্বীকৃত হয়, সেইভাবে শব্দনিষ্ঠ জাতিরও বাচকতা সমর্থিত হয়। অতএব প্রকৃতি ও প্রত্যয়, অর্থের বাচক নয় কিন্তু প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত জাতিই অর্থের বাচক। এই প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত জাতির বাচকতা যে মতে স্বীকৃত হয়, সেইমতই বর্ণজাতিস্ফোটপক্ষ। এই পক্ষের সংক্ষেপে অভিপ্রায় এই—প্রকৃতি ও প্রত্যয়নিষ্ঠ জাতিই বাচক [স্ফোট]। এখানে বর্ণ বলতে প্রকৃতি ও প্রত্যয়কে বুঝতে হলে।

৭। পদজাতিস্ফোট।

একটি পদে যে প্রকৃতি প্রত্যয়ের সমষ্টি থাকে, সেই সমষ্টির অন্তর্গত প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের প্রত্যেকে যে বিভিন্ন জাতি বিদ্যমান তাদের বাচকতা নাই। তাদের অর্থবোধের অনুকূল কোন শক্তি নাই। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের সমষ্টি যে পদ, সেই সমগ্র পদে যে একটি জাতি বিদ্যমান, সেই জাতিই অর্থের বাচক [স্ফোট]। ইহাই পদজাতিস্ফোটপক্ষ।

---

(২১) পঞ্চাপি ব্যক্তিস্ফোটাবান্তরভেদাঃ। শব্দকৌস্তুভ পস্পশাহ্নিক।

ব্যবহারক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পদের পৃথগ্‌ভাবে প্রয়োগ করা হয় না। নিজের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে অন্যের নিকট প্রকাশ করবার

৮। বাক্যজাতিস্ফোট। জন্য আমরা শব্দ প্রয়োগ করি। ইহাকে শব্দব্যবহার বা ব্যবহারশব্দে অভিহিত করা হয়। বাক্যের দ্বারা আমাদের এই ব্যবহার সম্পন্ন হয়। যদি কেবল এক একটি পদ থেকে অন্যের অর্থজ্ঞান হোত, তা হলে আমরা অপরের জ্ঞানের জন্য কেবল এক একটি পদেরই প্রয়োগ করতাম, বাক্যের প্রয়োগ করতাম না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেবল পদ থেকে ব্যবহার ক্ষেত্রে অর্থের জ্ঞান হয় না, বাক্যের দ্বারাই অর্থপ্রতীতি হয়। এই বাক্যের অর্থপ্রকাশ করার সামর্থ্য—ইহা বাক্যে নাই। সমান আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন বাক্যে একটি জাতি আছে। বাক্যনিষ্ঠ সেই জাতিই অর্থের বাচক [স্ফোট]। বাক্য অর্থের বাচক নয়। ইহাই বাক্যজাতিস্ফোটপক্ষ।

যাঁরা জাতিস্ফোটবাদী তাঁদের মধ্যে শব্দনিষ্ঠ জাতির আধারভূত, প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ ও বাক্যের বহুত্ব স্বীকৃত হয়েছে—ইহা অবশ্যই বলতে হবে। অনেক পদার্থে একাকার জ্ঞানের কারণরূপেই জাতি স্বীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রং এর ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার গোব্যক্তিসমূহ গোত্বজাতি স্বীকৃত হয়। যদি কোন বস্তুর একত্বটি স্বাভাবিক হয়, তা হলে সেখানে জাতিস্বীকার করা হয় না। সমান আকারের অনেক বস্তুতে একটি জাতি থাকে—এইরূপ নিয়ম দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জাতিস্ফোটবাদীর মতে তাঁদের স্বীকৃত শব্দনিষ্ঠ জাতিগুলির প্রত্যেকের আশ্রয় শব্দের অনেকত্ব অনিবার্য। অতএব ইঁহাদের সিদ্ধান্তে প্রত্যেক জাতির আধারভূত প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি অনন্ত। এইটা লক্ষ্য করেই আচার্য ভর্তৃহরি জাতিস্ফোটপক্ষের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন -

"অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতা।
কৈশ্চিদ্ ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ ॥

[বাক্যপদীয় ১।৯৬]

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, গোত্বাদি জাতি যেমন সমানাকার অনেক গবাদি ব্যক্তিদ্বারা অভিব্যঙ্গ্য সেইরূপ সমানাকার অনেক শব্দের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য যে শব্দনিষ্ঠ জাতি উহাই স্ফোট [বাচক]। স্ফোটের অভিব্যক্তির কারণকে ধ্বনি বলা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে জাতিরূপ স্ফোটের অভিব্যক্তির কারণ যে শব্দব্যক্তি সেই শব্দব্যক্তিগুলিই ধ্বনিরূপে পরিকল্পিত হয়। এই জাতিস্ফোট

পক্ষ ভর্তৃহরির নিজের সিদ্ধান্ত নয় (২২)। ভর্তৃহরি এই সিদ্ধান্তকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত রূপে উল্লেখ করেছেন এবং বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ একে মতান্তর বলে নির্দেশ করেছেন। ভর্তৃহরি অখণ্ড বাক্যস্ফোট স্বীকার করতেন।

পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ইব।

বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন॥ [বাক্যপদীয় ১।৭৩]

ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ এই সকল বর্ণের মধ্যে যথাক্রমে র, ল, অ + ই, অ + উ, অ + এ, অ + ও এই সকল বর্ণ আছে—ইহা আমাদের নিকট আপাতত প্রতীত হলেও বস্তুত এই সকল বর্ণের [ঋ ঌ এ, ও ঐ ঔ] কোন অবয়ব নাই, ইহারা নিরবয়ব, অখণ্ড বর্ণ · ইহা মীমাংসক প্রভৃতি বর্ণবাদী দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। বর্ণবাদীর মতে বর্ণগুলি যেমন অখণ্ড, স্ফোটবাদীর মতে সেইরূপ বাক্য অখণ্ড, অবয়বশূন্য। বাক্য থেকে পদের কোনরূপ ভেদ নাই। বাক্যে পদের সত্তা প্রতীয়মান হলেও বস্তুতঃ পদের কোনরূপ পৃথক্ সত্তা নাই। বুঝাবার সুবিধার জন্য বাক্যে পদের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। এ কথা ভর্তৃহরি নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন—

'যথা পদে বিভজ্যন্তে প্রকৃতি প্রত্যয়াদয়ঃ।

অপোদ্ধারস্তথা বাক্যে পদানামুপবর্ণ্যতে॥ [বাক্যপদীয় ২।১০]

পদগুলি অখণ্ড বলে তাতে বস্তুতঃ প্রকৃতি ও প্রত্যয়রূপ অবয়ব নাই। কেবল অল্পবুদ্ধির সহজ উপায়ে জ্ঞানের জন্য পদে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের কল্পনা করা হয়। এইরূপ বাক্যেও বস্তুত পদ না থাকলেও বাক্যে পদের অপোদ্ধার অর্থাৎ কল্পনা করা হয়।

এই অখণ্ড বাক্যস্ফোটই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে তার পূর্ববর্তী বর্ণস্ফোট প্রভৃতি স্বীকার করবার অনুকূল কোন প্রমাণ নাই। এই সকল নিষ্প্রমাণ পক্ষ স্বীকারের পক্ষে কোন সমুচিত যুক্তিও দেখা যায় না। এই

---

(২২) প্রাচীনকালে কোন্ সম্প্রদায় এই জাতিস্ফোটপক্ষ স্বীকার করতেন তা জানা যায় না। বাক্যপদীয় গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখে আমরা কেবল অনুমান করতে পারি—এই সিদ্ধান্ত ভর্তৃহরির পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের ছিল। পরবর্তিকালে বোপদেব এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করতেন—ইহা শব্দকৌস্তুভের পস্পশাহ্নিক এবং বৈয়াকরণভূষণের স্ফোটনির্ণয় প্রকরণের ৭১ কারিকার অবতরণিকা হতে জানা যায়। বোপদেব কোন গ্রন্থে জাতিস্ফোটের কথা বলেছেন—তা জানা যায় না।

অবস্থায় অখণ্ড বাক্যস্ফোট ব্যতীত অপর স্ফোটগুলির অস্তিত্ব কেন স্বীকার করা হয়েছে তা চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। কিন্তু পূর্বাচার্যগণ আমাদের চিন্তার অবকাশ দেওয়ার জন্য কোন বিষয়ই উপেক্ষা করেন নি। তাঁরা বলেছেন—অখণ্ড বাক্যস্ফোট বস্তুটিই পারমার্থিক—এটা সত্য। এই পারমার্থিক বস্তুকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে তার পূর্ববর্তী স্ফোটগুলি কল্পিত হয়েছে, তাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই।

এখানে একথার পুনরায় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জাতিস্ফোট পক্ষ ভর্তৃহরির সম্মত নয়। উহা ভর্তৃহরি অপর বাদীদের মতরূপে উল্লেখ করেছেন। অখণ্ড বাক্যস্ফোটের—জ্ঞানের জন্য এই জাতিস্ফোট কল্পিত হয় নাই। এটা একটা স্বতন্ত্র প্রস্থান।

স্ফোটবাদী আচার্যগণের মতে বাক্ [শব্দ], জ্ঞান থেকে পৃথক্ বস্তু নয়। জ্ঞান বা চৈতন্যে এই বাগ্‌রূপতা থাকে। সুতরাং জ্ঞান ও বাক্ এই দুইটি অভিন্ন বস্তু—

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী॥

[বাক্যপদীয় ১।১২৫]

জ্ঞানে বাগ্‌রূপতা যদি না থাকত, তা হলে সেই জ্ঞান কখনও প্রকাশিত হতে পারতো না। যেহেতু জ্ঞানের এই যে বাগ্‌রূপতা—ইহাই জ্ঞানের প্রকাশক। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় সকল জ্ঞানকেই সবিকল্পক বলে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে জ্ঞানের এই সবিকল্পক অবস্থা, তার বাগ্‌রূপতা থেকেই সম্পাদিত হয়।

কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা (২৩ অথবা সেই ব্যাপার থেকে বর্ণের উচ্চারণ স্থানে যে বায়ুসংযোগ হয় সেই বায়ু সংযোগ দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না।

---

(২৩) "অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥ [পাণিনীয় শিক্ষা ১৩]"
বর্ণের উচ্চারণ স্থান আটটি উরঃ হৃদয়), কণ্ঠ, শিরঃ [মূর্দ্ধা], জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু।

স্ফোটের অভিব্যঞ্জককে 'ধ্বনি' বলা হয়; আবার বর্ণকেও স্ফোটের অভিব্যঞ্জক বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তে স্ফোটই বর্ণরূপে প্রতিভাত হয় (২৪)।

মহাভাষ্যকারের পরবর্তী বৈয়াকরণগণ প্রাচীন ও নবীন দুইভাগে বিভক্ত। নাগেশভট্টের পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ প্রাচীন বিভাগের অন্তর্গত। নাগেশ ভট্ট এবং তাঁর পরবর্তী বৈয়াকরণগণ নবীন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ বলেছেন—কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে বায়ুর যে অভিঘাত [সংযোগ-বিশেষ] হয় তারই ফলে প্রথমে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। এই বিষয়ে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন—বর্ণ উচ্চারণের উদ্দেশ্যে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির ব্যাপার করলে যখন প্রমাদবশত জিহ্বার ঠিক্‌স্থানে সংযোগ না হয়ে যদি একটু ব্যবধানে সংযোগ হয় তখন বর্ণের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ধ্বনির উপলব্ধি হয়ে থাকে। এতে বুঝা যায় কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ ধ্বনির উৎপত্তির প্রতি কারণ। যে স্থলে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সেখানেও ধ্বনির উৎপত্তি অবশ্যই হয়। যদি সেরূপ স্থলে ধ্বনির উৎপত্তি স্বীকার না করা হয়, তা হলে বলতে হবে যে স্ফোটের উৎপত্তির প্রতি যাহা কারণ তাহা ধ্বনির উৎপত্তির প্রতিবন্ধক। এরূপ প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করলে কল্পনাগৌরব হয়। এইজন্য বলতে হবে যে স্থলে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সে স্থলেও কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির ব্যাপার থেকে ধ্বনির উৎপত্তি হয়ে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এরূপ স্বীকার করলে একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয়। যেখানে ঘট শব্দের উচ্চারণের জন্য কণ্ঠাদির ব্যাপার করা হয়, সেখানে "ঘট" এই শব্দের জ্ঞান হয়। এই "ঘট" জ্ঞানটি স্ফোটের অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। এস্থলে 'ঘট' শব্দ ভিন্ন ধ্বনির কোন উপলব্ধি হয় ইহা বুঝা যায় না। যদি ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়—ইহা স্বীকার করা যায়, তা হলে যে যে স্থলে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সেই সকল স্থলেই ধ্বনি বিদ্যমান থাকায় ধ্বনির উপলব্ধি হওয়া উচিত; কিন্তু তা হয় না। সুতরাং ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়।

(২৪) ব্যঞ্জকধ্বনিবিশেষোপহিতঃস্ফোট এব ককারাদ্যাত্মনা ব্যবহ্রিয়তে ইত্যভ্যুপগমাৎ। ভাট্টমতে তাবৎ মন্দো গকার ইতিবদ্ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিষয়সম্বন্ধান্তঃকরণবৃত্তিবৈচিত্র্যেণ ব্রহ্মস্বরূপস্য-এ বৈচিত্র্যবচ্চ। অতএব বাচস্পতিমিশ্রাস্তত্ত্ববিন্দৌ বস্তুতঃ ককারাদ্যতিরিচ্যমানমূর্তেঃ গকারস্যাভাবাৎ ইতি স্ফোটবাদিমত মুপন্যস্থৎ। [শব্দকৌস্তুভ ১]

এর উত্তর বাক্যপদীয়ে বর্ণিত হয়েছে। যে স্থলে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সে স্থলে ভর্তৃহরি ধ্বনি সম্বন্ধে তিনপ্রকার মতের উল্লেখ করেছেন—

স্ফোটরূপাবিভাগেন ধ্বনেগ্র্হণমিষ্যতে।
কৈশ্চিদ্ ধ্বনিরসংবেদ্যঃ স্বতন্ত্রোঽন্যৈঃ প্রকাশকঃ॥

[বাক্যপদীয় ১।৮২]

কোন আচার্যের মতে স্ফোটের সহিত অভিন্নভাবে ধ্বনির প্রতীতি হয়, স্বতন্ত্রভাবে ধ্বনির প্রতীতি হয় না। অন্য আচার্যের মতে ধ্বনি অসংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অযোগ্য। চক্ষুঃ, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়ের উপলব্ধির হেতু। কিন্তু চক্ষুঃ বা তার রূপ আমাদের উপলব্ধির যোগ্য নয়। এইরূপ রসনেন্দ্রিয় বা তার রস আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। সব ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই নিয়ম; ইন্দ্রিয় কিংবা তার গুণ জ্ঞানের যোগ্য নয়। যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণ থাকে, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণকেই গ্রহণ করতে পারে। চক্ষু রূপকেই গ্রহণ করতে পারে, রস বা গন্ধকে গ্রহণ করতে পারে না। চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু যে দ্রব্যে রূপ থাকে, চক্ষুঃ তাকেই গ্রহণ করতে পারে, রূপহীন দ্রব্যকে গ্রহণ করতে পারে না। ঘটের রূপ আছে, চক্ষুঃ তাকে গ্রহণ করে। বায়ুর রূপ নাই, চক্ষুঃ তাকে গ্রহণ করতে পারে না। এইভাবে যে দ্রব্যে স্পর্শ থাকে ত্বগিন্দ্রিয় তাকে গ্রহণ করে, স্পর্শহীন দ্রব্যকে গ্রহণ করতে পারে না। ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শবিশিষ্ট বৃক্ষ, জল ও বায়ুকে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু আলোকের বা সূর্যাদিতেজের প্রভাতে স্পর্শ থাকে না বলে ত্বগিন্দ্রিয় প্রভাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অবশিষ্ট রসনা, ঘ্রাণ ও শ্রোত্র নামক তিনটি ইন্দ্রিয়, রস গন্ধ ও শব্দ—এই তিনটি গুণকেই যথাক্রমে প্রত্যক্ষ করে। দ্রব্যকে গ্রহণ করতে পারে না। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের গুণ স্বয়ং জ্ঞানের অযোগ্য হয়েও যেমন অন্যের জ্ঞানের কারণ হয়, সেইরূপ এই মতে ধ্বনিও নিজে জ্ঞানের অযোগ্য হয়েও স্ফোটের অভিব্যক্তির কারণ হয়।

অপর বৈয়াকরণ সম্প্রদায় মতে স্ফোট থেকে ধ্বনির সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। এইজন্য দূরত্বাদিদোষবশতঃ যে স্থলে আমাদের স্ফোটের জ্ঞান হয় না, সে স্থলে কেবল ধ্বনির প্রতীতি হতে পারে। স্ফোটের জ্ঞানকালে ধ্বনি ও স্ফোটের মিলিত ভাবে জ্ঞান হয় বলে, আমরা ধ্বনিকে স্বতন্ত্র ভাবে উপলব্ধি

করতে পারি না। কিন্তু সে স্থলেও ধ্বনির সত্তা থাকে এবং তার প্রতীতি হয়। যেমন দুধ ও জল মিলিত হলে স্বতন্ত্রভাবে জলের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ ধ্বনি ও স্ফোটের মিলিত ভাবে প্রতীতি স্থলে স্বতন্ত্র ভাবে আমরা ধ্বনির নিশ্চয় করতে পারি না।

বর্ণসমুদায় থেকে অর্থের জ্ঞান হয়—ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসার এই মত বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন নাই এবং বর্ণ থেকে অর্থজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই ইহা তাঁরা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন। আবার ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়—বৈয়াকরণদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও পূর্বোক্ত দার্শনিকগণ অনেক যুক্তি প্রদান করেছেন। বর্ণবাদীরা বলেছেন যদি বর্ণসমুদায় থেকে অর্থের জ্ঞান অসম্ভব হয়, তা হলে ধ্বনি সমুদায় থেকেও স্ফোটের অভিব্যক্তি অসম্ভব। প্রত্যেক বর্ণ ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় যেমন তাদের সকলের এককালে অবস্থিতি হতে পারে না, এইজন্য বর্ণের একটি সমুদায় কোন কালেই হতে পারে না, সেইরূপ প্রত্যেক ধ্বনিও ক্ষণস্থায়ী বলে, তাদের কোন একটা সমুদায় সম্ভাবিত হয় না। আর প্রত্যেক ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় এরূপ স্বীকার করা যায় না। কারণ এরূপ স্বীকার করলে প্রথম ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়ে যায় বলে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি অন্য ধ্বনিগুলি বৃথা হয়ে যায়। এইজন্য স্ফোটবাদীকেও বলতে হবে ধ্বনিসমুদায় থেকেই স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এরূপ বললে ধ্বনির সমুদায় কোন কালেই সম্ভাবিত না হওয়ায় স্ফোটের অভিব্যক্তি সম্ভব হবে না। সুতরাং যে যুক্তির দ্বারা স্ফোটবাদিগণ বর্ণবাদীর মত খণ্ডন করেন, তাঁদের সেই যুক্তির দ্বারাই স্ফোটের খণ্ডন হয়ে যায়। অতএব স্ফোটবাদীরা বর্ণবাদীর উপর যে দোষ দিয়েছেন সে দোষ তাঁদের পক্ষেও আছে! যে দোষ উভয়পক্ষেই থাকে, সে দোষ একজন অপরের সিদ্ধান্ত বিষয়ে উদ্ভাবন করতে পারেন না (২৫)।

স্ফোটবাদিগণ এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—ধ্বনিসমুদায় থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রত্যেকটি ধ্বনিই স্ফোটের অভিব্যঞ্জক। প্রথম ধ্বনি থেকে অস্পষ্টভাবে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি ধ্বনি থেকে পূর্বাপেক্ষা কিছু কিছু স্পষ্টভাবে স্ফোট প্রকাশিত হয়: চরম ধ্বনির দ্বারা সুস্পষ্টরূপে স্ফোট অভিব্যক্ত হয়। সুস্পষ্টভাবে

(২৫) 'যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ নৈকঃ পর্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে॥"
[শুক্লযজুর্বেদসংহিতার মহীধরভাষ্যে উদ্ধৃত]

অভিব্যক্ত স্ফোট থেকেই অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্য পূর্ববর্তী ধ্বনিগুলি থেকে স্ফোটের কিছু কিছু অভিব্যক্তি হলেও সে সময়. সুস্পষ্টরূপে স্ফোটের অভিব্যক্তি না হওয়ায় অর্থপ্রতীতি হয় না। বৈয়াকরণগণ স্ফোট ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ধ্বনি দ্বারা এই স্ফোট অভিব্যক্ত হয়ে অর্থজ্ঞানের কারণ হয়। এই স্ফোটই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়ে জাগতিক সমস্ত ব্যবহারের বিষয় হয়ে থাকে।

শব্দকৌস্তুভকার স্ফোট সম্বন্ধে অন্য মতের কথা বলেছেন। শব্দকৌস্তুভে বলা হয়েছে—স্ফোট অবিদ্যাকল্পিত পদার্থ। স্ফোট অবিদ্যাকল্পিত পদার্থ হলে তার অধিষ্ঠানরূপে একটি অকল্পিত বস্তু স্বীকার করতে হবে। কল্পনার মূলে কোন অকল্পিত বস্তু স্বীকার না করলে কল্পনা দাঁড়াতে পারে না। কল্পিত পদার্থ শূন্যে অবস্থান করে না। বৈয়াকরণগণ নিজেদের শূন্যবাদী বলে স্বীকার করেন না। সুতরাং শব্দকৌস্তুভমতে অকল্পিত ব্রহ্মবস্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তাতে অবিদ্যা স্ফোটের কল্পনা করেছে—ইহা স্বীকার করতে হয়। বৈয়াকরণ পরমাচার্য ভর্তৃহরির এই মত নয়। তিনি স্ফোটকেই ব্রহ্মরূপে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে উৎপত্তি বিনাশরহিত, অবিকারী, সর্বব্যাপী, স্ফোটরূপ শব্দ ব্রহ্ম থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে (২৬)।

ভর্তৃহরির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে কৌণ্ডভট্ট বৈয়াকরণ ভূষণগ্রন্থে স্ফোটকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করেছেন (২৭)।

তিনি বলেছেন অবিদ্যাকে অবলম্বন করে জাতিস্ফোটের কল্পনা করা হয়েছে।

---

(২৬) "অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্,
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥ [বাক্যপদীয় ১।১]

জন্ম ও বিনাশ শূন্য শব্দতত্ত্বরূপ যে অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি পদার্থরূপে বিবর্তিত হন, যা থেকে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হয়।

(২৭) কৌণ্ডভট্ট সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রৌঢ়মনোরমা শব্দকৌস্তুভ প্রভৃতির প্রণেতা ভট্টোজীদীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং নিজেও মহাপণ্ডিত ছিলেন—
বাগ্‌দেবী যস্য জিহ্বাগ্রে নরীনর্তি সদা মুদা।
ভট্টোজীদীক্ষিতাহং পিতৃব্যং নৌমি সিদ্ধয়ে॥ [বৈয়াকরণ ভূষণ ৩য় শ্লোক]

সূক্ষ্মবিচার করলে দেখা যায় ব্রহ্মই স্ফোট ; ব্রহ্ম থেকে স্ফোটের কোন ভেদ নাই (২৮)।

এই স্ফোটের অবস্থা ভেদে তিন প্রকার ভেদ ভর্তৃহরি বর্ণনা করেছেন। স্ফোট যখন আমাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সেই অবস্থায় তাকে 'বৈখরী' নামে অভিহিত করা হয়। এই 'বৈখরী' প্রয়োগের পূর্বে বক্তার অন্তঃকরণে এবং বৈখরীশ্রবণের পর শ্রোতার অন্তঃকরণে স্ফোটের প্রতিভাস হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় স্ফোটকে 'মধ্যমা শব্দে অভিহিত করা হয়। এই মধ্যমা থেকেই আমাদের অর্থজ্ঞান জন্মে। লোকব্যবহারের অতীত পারমার্থিক অবস্থায় স্ফোটকে 'পশ্যন্তী' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই 'পশ্যন্তী'ই ভর্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্যদের মতে "পরা বাক্" (২৯)।

এই পশ্যন্তীই অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ সর্ববিকারবর্জিত পরমব্রহ্ম (৩০)। এই শব্দ ব্রহ্মই বৈয়াকরণদিগের সিদ্ধান্তে আত্মা (৩১)। "পশ্যন্তীর"

---

(২৮) তস্মাদ্বিদ্যাশায়ানুকারীত্যা জাতরব স্ফোটঃ। নিষ্কর্ষে তু ব্রহ্মৈব স্ফোট ইতি ভাবঃ।... ব্রহ্মৈবেতননাত্মায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ [বৃঃ উঃ ৪।৩।৯] তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি [কঠ ৫।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০ শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪] ইতি শ্রুতিসিদ্ধং স্বং প্রকাশকত্বং সূচয়ন্ স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি স্ফোট ইতি যৌগিকস্ফুটশব্দাভিধেয়ত্বং সূচয়তীতি সিদ্ধম্। [বৈয়াকরণভূষণস্ফোট নির্ণয় ৭৫ কারিকাব্যাখ্যা]

(২৯) বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতম্।

অনেকতীর্থভেদায়াস্ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্॥ [বাক্যপদীয় ১।১৪০]

এতদ্ ব্যাকরণম্। অনেকতীর্থেতি। স্থিতিব্যক্তবর্ণরূপা প্রাপ্তসাধুভাবাঃ পভ্রষ্টা দুন্দুভিবেণুবীণাদিশব্দরূপা চেত্যর্থঃ। লঘুমঞ্জুষা স্ফোটপ্রকরণে উক্তব্যাখ্যা। তত্র শ্রোত্রবিষয়া বৈখরী। মধ্যমা-হৃদয়দেশস্থা।... পশ্যন্তী লোকব্যবহারাতীতা নাগেশভট্ট ১।১।১।

(৩০) অথাস্মাকং জ্ঞানশক্তির্যা সদাশিবরূপতা।
বৈয়াকরণসাধূনাং পশ্যন্তী সা পরাস্থিতিঃ॥
ইত্যাহুস্তে পরং ব্রহ্ম যদনাদি তথাক্ষরম্।
তদক্ষরং শব্দরূপং সা পশ্যন্তী পরা হি বাক্॥ [সোমানন্দ নাথ প্রণীত শিবদৃষ্টি ২।১—২]

যদনাদি অনন্তং চ পরং ব্রহ্ম চিদ্রূপং তদক্ষরং নির্বিকারং শব্দরূপম্। সৈব পশ্যন্তীসংজ্ঞা পরা বাক্।—উৎপলদেবকৃত শিবদৃষ্টিবৃত্তি ২।২।

(৩১) স এবাত্মা—ইত্যাহ (উৎপলদেব কৃতবৃত্তি)
স এবাত্মা সর্বদেহব্যাপকত্বেন বর্ততে।
কুতঃ পশ্যন্ত্যবস্থৈব চিদ্রূপত্বমথাপবান্॥ [শিবদৃষ্টি ২।৩]
শব্দব্রহ্মময়ং পশ্যন্তীরূপমাত্মতত্ত্বমিতি বৈয়াকরণাঃ।—
ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়—৮ সূত্রব্যাখ্যা।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অভিব্যক্তিকে বৈখরী এবং অন্তঃকরণের গ্রাহ্যরূপে অভিব্যক্তিকে মধ্যমা বলা হয়—এরূপ বললে কোন দোষ হয় না। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে এবং শাক্তসম্প্রদায়ে 'পশ্যন্তী' থেকেও সূক্ষ্মতর অবস্থা স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই অবস্থাতেই বাক্‌কে "পরা" সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। ভর্তৃহরি পশ্যন্তী থেকে কোন সূক্ষ্মতর অবস্থা স্বীকার করেন নি। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তে পশ্যন্তীই "পরা বাক্"।

মহাভাষ্যকার ধ্বনি ও স্ফোটের উল্লেখ করেছেন (৩২)। তবে তিনি স্ফোটকেই শব্দের স্বরূপ এবং ধ্বনিকে তার ব্যঞ্জক বলেছেন। মহাভাষ্যকার ও বার্তিককার উভয়েই শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেছেন (৩৩)। কিন্তু তাঁরা স্ফোট সম্বন্ধে কোনরূপ সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শন করেন নাই। মহাভাষ্যকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আচার্য ভর্তৃহরি স্ফোট সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শন করেছেন। স্ফোট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হলে বাক্যপদীয়, শব্দকৌস্তুভ, বৈয়াকরণভূষণ, লঘুমঞ্জুষা, স্ফোটচন্দ্রিকা, স্ফোটসিদ্ধি, শারদাতিলক ও তার টীকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুশীলন করতে হবে। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক দার্শনিকগণ স্ফোট স্বীকার করেন নাই। মীমাংসক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি বৈদিক দার্শনিকগণও স্ফোটের খণ্ডন করেছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী বাচস্পতি মিশ্র, অমলানন্দ প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্যগণও স্ফোট স্বীকার করেন নাই (৩৪)। শ্রীমৃগেন্দ্রাগমের বৃত্তিকার ভট্টনারায়ণ কণ্ঠের

---

(৩২) অথবা উভয়তঃ স্ফোটমাত্রং নির্দিশ্যতে। মহাভাষ্য ১।১।২।৩,৪। এবং তত্র স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।—স্ফোটস্তাবানেব ভবতি। ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ।

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তৎস্বভাবতঃ॥ [মহাভাষ্য ১।১।৯।৭০

শব্দগুণ-ইতি। শব্দস্য গুণ উপকারকো ব্যঞ্জকত্বেনেত্যর্থঃ।

উভয়মিতি। ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জকশ্চ প্রমাণেন স্বভাবতঃ

স্বরূপেণ সিদ্ধাবিত্যর্থঃ। কেষাঞ্চিদিতি—ব্যক্তানামুভয়ং

গৃহ্যতে অব্যক্তানাং তু ধ্বনিরেব।—কৈয়ট।

(৩৩) সিদ্ধন্তু নিত্যশব্দত্বাৎ। [কাত্যায়ন বার্তিক]...নিত্যাঃ শব্দাঃ। মহাভাষ্য—১।১।৩।১

শব্দের নিত্যতার কথা মহাভাষ্যে আরও অনেক স্থলে বলা হয়েছে।

(৩৪) ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যভামতী—কল্পতরুপরিমল। দেবতাধিকরণ ১।৩,২৮।

পুত্র ভট্টরামকণ্ঠ তাঁর "নাদকারিকা" গ্রন্থে স্ফোটের খণ্ডন করে, তার পরিবর্তে নাদকেই অর্থ জ্ঞানের সাধনরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এই "নাদকারিকার" টীকাকার অঘোর শিবাচার্য এই নাদের অর্থবোধকত্ব স্বীকার করেছেন ৩৫)। আচার্য মণ্ডন মিশ্র মীমাংসক হলেও স্ফোট স্বীকার করেছেন এবং স্ফোটসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করে স্ফোট সমর্থন প্রসঙ্গে কুমারিলভট্ট প্রভৃতির স্ফোটবিরোধী যুক্তির খণ্ডন করেছেন। এই মণ্ডন মিশ্র তাঁর "ব্রহ্মসিদ্ধি" নামক বেদান্ত গ্রন্থে ব্রহ্মকে শব্দাত্মক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন [ব্রহ্মসিদ্ধি জ্ঞানকাণ্ড ১ম শ্লোকের অক্ষর পদের ব্যাখ্যা]।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে—যে যে স্থলে অর্থের জ্ঞান জন্মে, সেই সকল স্থলেই বৈয়াকরণেরা স্ফোট স্বীকার করেন। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশ শব্দ এবং ম্লেচ্ছদের ব্যবহৃত শব্দ—এই সকল স্থলেই স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়; তারপর অর্থের জ্ঞান হয়—ইহা বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত। তবে এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে শব্দানুশাসন শাস্ত্র কিন্তু সাধু [সংস্কৃত] শব্দের অনুশাসন—অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছসম্প্রদায়ে ব্যবহৃত শব্দের অনুশাসন নয় ॥ ৪ ॥

মূল

অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইতি
উচ্যতে। তদ্‌যথা—শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ,
শব্দকার্যয়ং মাণবক ইতি ধ্বনিং কুর্বন্নেবমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ধ্বনিঃ শব্দঃ ॥৫॥

অনুবাদ—অথবা "শব্দ" এই শব্দটি প্রসিদ্ধার্থক। লোকে ধ্বনিকে শব্দ বলা হয়। যেমন—'শব্দ কর' 'শব্দ করো না' 'এই মাণবক [ব্রহ্মচারী বা বালক] শব্দকারী' যে ধ্বনি করে তাকে এরূপ বলা হয়। [সুতরাং] সেইহেতু ধ্বনি [ই] শব্দ ॥ ৫ ॥

পদার্থবর্ণনা—প্রতীতপদার্থকঃ = প্রতীতঃ [জ্ঞাত] পদার্থঃ [অর্থ] যস্য [যাহার—যে শব্দ এই শব্দের], এইভাবে বহুব্রীহি সমাসে—যার অর্থ প্রতীত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ লোকে জ্ঞাত।—এইরূপ অর্থে "প্রতীতপদার্থকঃ" শব্দটি নিষ্পন্ন। বহুব্রীহি সমাসে 'ক' আগম হয়েছে।

---

(৩৫) নাদকারিকা—৬, ১০, ১১ এবং এইগুলির অঘোর শিবাচার্যপ্রণীতটীকা।

অথবা—পদার্থ এব পদার্থক—এইরূপ স্বার্থে কন্ প্রত্যয় করে পদার্থক শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তারপর প্রতীতঃ পদার্থকঃ এইরূপ কর্মধারয় সমাস করে জ্ঞাত পদার্থ এইরূপ অর্থও পাওয়া যায়। লোকে জ্ঞাতপদার্থ ধ্বনি শব্দ বলে কথিত হয়। মাণবক — ব্রহ্মচারী বা বালক। ধ্বনি — [এখানে] বর্ণসমূহকে ধ্বনি বলে উল্লিখিত করা হয়েছে ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্তে স্ফোটই শব্দস্বরূপ, ধ্বনি সেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জক, স্ফোট থেকে ধ্বনি ভিন্ন পদার্থ—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়েছি। বৈয়াকরণগণ ধ্বনিকে অর্থবোধক স্বীকার করেন নি। ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটকেই অর্থবোধক বলে স্বীকার করেছেন। পূর্বে যেরূপ দেখা গেছে তাতে জানা যায়, ব্যাকরণে অর্থবোধক শব্দেরই নিরূপণ করা হয়েছে। এই অবস্থায় এখানে মহাভাষ্যকার ধ্বনিকে শব্দ বলে নির্দেশ করায় ধ্বনি ও স্ফোটের অভেদ প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু ধ্বনি ও স্ফোটের অভেদ বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এইরূপ একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে কৈয়ট বলেছেন —মহাভাষ্যের পূর্বে ব্যাড়িপ্রণীত 'সংগ্রহ' নামক বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক এক গ্রন্থ ছিল। তার পঠন পাঠন মহাভাষ্যের রচনার পূর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই গ্রন্থে ধ্বনি ও স্ফোট বিভিন্ন পদার্থ ইহা সমর্থিত হয়েছিল এবং "তপরস্তৎকালস্য" [১।১।৭০] সূত্রের মহাভাষ্যেও ধ্বনি ও স্ফোটের ভিন্নপদার্থতা উক্ত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোক মনে করে ধ্বনি থেকেই তাদের অর্থের জ্ঞান হয়, তারা ধ্বনি ও স্ফোটের পার্থক্য অন্বেষণ করে না। সুতরাং ধ্বনি ও স্ফোটের ভিন্নতা লোকের বুদ্ধির বিষয় হয় না মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সেই লোকবুদ্ধির অনুসরণ করে এখানে ধ্বনি ও স্ফোটের অভেদ আরোপ করে শব্দের স্বরূপ বুঝাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। লোকে আপাতত শব্দস্বরূপ বুঝুক; পরে তারা প্রজ্ঞাশীল হলে—স্ফোটকে শব্দস্বরূপ বলে বুঝতে পারবে। লোকে যাতে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি—এগুলিকে শব্দস্বরূপ বলে না বুঝে। এই অভিপ্রায়ে ধ্বনিকে শব্দ বলেছেন। ধ্বনি ও ও স্ফোটের অভেদ পতঞ্জলির অভিপ্রেত নয়। এইরূপ অভেদ তাঁর অভিপ্রেত এইরূপ কল্পনা করলে পতঞ্জলির পূর্বাপর গ্রন্থের বিরোধ উপস্থিত হবে। "তপরস্তৎ-কালস্য" এই সূত্রের ভাষ্যের সঙ্গে এখানকার ভাষ্যের সামঞ্জস্য থাকবে না।

সুতরাং বলতে হবে যে "শব্দ" দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি থেকে ভিন্ন বস্তু—কেবল এইটুকু বুঝান এখানে পতঞ্জলির অভিপ্রায় (৩৬)।

এখানে আর একটি আশঙ্কা উঠে এই যে—বিধি ও নিষেধ অনারব্ধ কার্যেই প্রবৃত্ত হয়। লোকে যে কার্য করতে জানে না এবং যে কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই বিধি লোককে সেই কার্য করতে হবে—এইটা জানিয়ে দেয়। আর লোকে কোন অনিষ্টসাধন কার্যে প্রবৃত্ত হবে বা প্রবৃত্ত হচ্ছে; নিষেধ সেই লোককে সেই কার্য থেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু যে কার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে প্রবৃত্তির জন্য যেরূপ বিধি নিরর্থক, সেইরূপ তা থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য নিষেধও নিরর্থক। সে কার্য তো অনুষ্ঠিত হচ্ছেই। এখানে ভাষ্যকার বলছেন—যে ব্যক্তি ধ্বনি করছে [ধ্বনিং কুর্বন্] তাকে শব্দ কর [শব্দং কুরু] শব্দ করো না [মা শব্দং কার্ষীঃ] এইরূপ বলা হয়। কিন্তু যে শব্দ করছে, তাকে শব্দ কর—এই কথা বলে শব্দ করতে প্রবৃত্ত করা যায় না। অপ্রবৃত্তেরই প্রবর্তনা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি যে কার্যে প্রবৃত্ত তাকে সেই কার্যে প্রবৃত্ত করার কোন আবশ্যকতা নাই। যে শব্দ করছে, সে তো শব্দ করেছেই, তাকে নিষেধ করাও বৃথা। যে ব্যক্তি কোন অনিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রম করছে, এখনও প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তিকে নিষেধ করলে, সে নিষেধ সার্থক হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু নিষেধও নিরর্থক। কারণ মাণবক [বালক] তো শব্দ করছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এস্থলে ভাষ্যকারের গ্রন্থ অসঙ্গত। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য—যে শ্রুতিমধুর মনোরম শব্দ করছে, তার সেই কার্য থেকে বিরতির সম্ভাবনা দেখে, বিরামের নিবৃত্তির জন্য "শব্দ কর" [শব্দং কুরু] এরূপ বলা যায়। আবার যে ব্যক্তি কঠোর অশ্রাব্য শব্দের উচ্চারণ করে শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করছে, তাকে সেই শব্দের উচ্চারণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য "শব্দ করো না" [মা শব্দং কার্ষীঃ] এরূপ বলা যায়। এইরূপ স্থলকে লক্ষ্য করেই মহাভাষ্যকার এখানে—"শব্দং কুরু" এই বিধি এবং "মা শব্দং কার্ষীঃ" এই নিষেধের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের কোন অসঙ্গতি এখানে হয় নাই ॥ ৫ ॥

---

(৩৬) অন্তত্র ধ্বনিস্ফোটয়োর্ব্যবস্থাপিতত্বাদিহাভেদেন ব্যবহারেঽপি ন দোষঃ। দ্রব্যাদয়ো ন শব্দশব্দবাচ্যা ইত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ।—কৈয়ট।

অতএবেতি—সংগ্রহাদৌ তপরসূত্রাদৌ ভাষ্যে চেত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

মূল

কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি ?॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শব্দানুশাসনের [ব্যাকরণশাস্ত্রের] প্রয়োজন [ফল] কি কি ? ৬॥

বিবৃতি—ভাষ্যকার শব্দানুশাসন অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন বিষয়ে প্রশ্ন নিজেই উঠিয়েছেন—এর একটা অভিপ্রায় আছে। অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে—ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্য কর্ম অথবা কাম্য কর্ম—ইহা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া। যে কর্মের অনুষ্ঠান না করলে প্রত্যবায় [পাপ] হয় সেই কর্ম নিত্য কর্ম। যেমন দ্বিজাতির [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য] পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। যে কর্মের অনুষ্ঠান না করলে কোন প্রত্যবায় হয় না অথচ করলে কোন একটি অভীষ্ট ফললাভ হয়, তাকে কাম্য কর্ম বলে। যেমন দর্শপৌর্ণমাসযাগ, জ্যোতিষ্টোম যাগ ইত্যাদি। এইগুলির অনুষ্ঠান করলে স্বর্গ হয়, বেদে বর্ণিত আছে—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৬।৪।১৭] ইত্যাদি। ব্যাকরণের অধ্যয়ন সন্ধ্যাবন্দনার মত অবশ্য কর্তব্য নিত্য কর্ম অথবা কোন কাম্য ফলের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ? ইহাই পতঞ্জলির প্রশ্নের অভিপ্রায়। এর উত্তরে যা বলা হয়েছে—তার তাৎপর্য এই যে—ব্রাহ্মণের পক্ষে ষডঙ্গসহিত বেদ অবশ্য অধ্যয়নীয়। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিনের উপলক্ষণ। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ বলে তার অধ্যয়নও অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্য কর্ম। আবার বেদরক্ষা প্রভৃতি ফলের কথা পরেই বলছেন। সুতরাং ব্যাকরণাধ্যয়ন কাম্যকর্মও বটে ॥ ৬ ॥

মূল

রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্। রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণ-বিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতীতি ॥৭॥

অনুবাদ—[বেদের] রক্ষা, উহ, আগম, লঘু [লাঘব] ও অসন্দেহ [সন্দেহাভাব] এইগুলি ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন। বেদের রক্ষার জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। লোপ, আগম এবং বর্ণবিকারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি

বেদের সম্যক পরিপালন [রক্ষা] করবেন—এই জন্য [ব্যাকরণাধ্যয়ন কর্তব্য] ॥ ৭ ॥

শব্দার্থবর্ণন : - রক্ষা = বেদের রক্ষা। উহঃ = সঙ্গতার্থকপদের কল্পনা। আগমঃ = শ্রুতি। লঘু = লাঘব—সহজ উপায়। অসন্দেহঃ = সন্দেহের নিবৃত্তি। প্রয়োজনম্ = ফল, [ব্যাকরণঅধ্যয়নের ফল] হি = যেহেতু। লোপঃ = জ্ঞাত বর্ণের অদর্শন। আগমঃ = অতিরিক্ত বর্ণের উপস্থিতি। বর্ণবিকারঃ = একবর্ণের অন্যথাভাব ॥৭॥

বিবৃতি—ভাষ্যের আরম্ভেই "অথ শব্দানুশাসন" এই কথা বলে সাধু [শুদ্ধ-সংস্কৃত] শব্দের জ্ঞান ব্যাকরণের অর্থাৎ ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রযোজন [সাক্ষাৎ]—ইহা সূচিত হয়েছে। এখন এই সাধু শব্দের জ্ঞানের প্রয়োজন [প্রয়োজনের প্রয়োজন] বেদরক্ষা প্রভৃতি—ইহাই বলা হচ্ছে। আমরা যে সংস্কৃত ভাষা সাধারণভাবে ব্যবহার করি, কাব্য, নাটক, পুরাণ প্রভৃতি যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাকে লৌকিক সংস্কৃত বলে। বেদের সংস্কৃতকে বৈদিক সংস্কৃত বলা হয়। যে সকল কার্য লৌকিক সংস্কৃতে দেখা যায় না। সেইরূপ অনেক কার্য বৈদিক সংস্কৃতে দেখা যায়। যাঁরা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তাঁরা লৌকিক ও বৈদিক সংস্কৃতে যে সকলস্থলে ভিন্ন ভিন্ন আকার হয় তাহা অনায়াসে বুঝতে পারেন। কিন্তু যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই, তারা ভাষার ব্যবহার থেকেই ভাষা শিক্ষা করে—ইহাই তাহাদের পক্ষে সম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তি লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবহার ক্ষেত্রে যে সকল পদের প্রয়োগ দেখে, সেই সকল পদকেই শুদ্ধ বলে নিশ্চয় করে। লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয় না, অথচ বেদে তাহাদের বহুল প্রয়োগ হয়, এরূপ বহুপদ আছে। যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই, সেই সকল ব্যক্তি, সেই বৈদিক শব্দকে অশুদ্ধ বলে মনে করে, শুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হবে। বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতিতে সেই সেই বৈদিক শব্দের স্থলে, উহাদের সমানার্থক ও অনেকাংশে সমানাকার লৌকিক সংস্কৃত শব্দের সন্নিবেশ করতে পশ্চাৎপদ হবে না। তাতে বেদ বাক্যের আনুপূর্বীর [ক্রমবদ্ধ সন্নিবেশের] পরিবর্তন হওয়ায় সেই বাক্যের বেদত্বই থাকবে না। বৈদিক গ্রন্থে যে শব্দ যে আকারে ও যে ক্রমে পঠিত হয়ে আসছে—ঠিক সেই আকারে ও সেই ক্রমে পঠিত হলেই সেটি বেদ হবে। যদি কোন প্রকারে বৈদিক

বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের মধ্যে কোন একটি পদ বা পদাংশের উদাত্তাদি স্বর এবং অকারাদি বর্ণের ব্যত্যয় অর্থাৎ অন্যরূপে পরিবর্তন করা হয়, কিম্বা গুরু পরম্পরাক্রমে যে ক্রমে বেদবাক্য পঠিত হয়ে আসছে, সেই ক্রমের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমও করা হয়, তাহলে সেস্থলে সেই বাক্য বেদ বাক্যরূপে পরিগণিত হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হবে। পূর্বেও একথা বলা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, কোন অবৈয়াকরণ নিজের ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব বশতঃ বেদ বাক্যের অন্তর্গত কোন শব্দে কোন প্রকার পরিবর্তন করলেই সেই বাক্যের বেদত্ব নষ্ট হবে। এই কারণে বেদের যথাযথ রক্ষার জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

লৌকিক সংস্কৃতে হুহ্ ধাতুর লঙের [অনদ্যতন অতীতের] আত্মনে পদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে "অহুহ্বত" এইরূপ পদ হয়। কিন্তু বেদে "অহুত্র" এই প্রকার রূপেরও প্রয়োগ হয়।* দেবশব্দের প্রথমার বহুবচনে লৌকিক সংস্কৃতে "দেবাঃ" এই প্রকার রূপ হয়, কিন্তু বেদে "দেবাসঃ" এই প্রকার প্রয়োগও হয়ে থাকে। আত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে লৌকিক সংস্কৃতে "আত্মনা" এইরূপ আকার হয়, বেদে এরূপস্থলে "ত্মনা" এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। লৌকিক সংস্কৃতে গ্রহ্ ধাতুর লটের [বর্তমানার] উত্তম পুরুষের একবচনে "গৃহ্ণামি" এইরূপ প্রয়োগ হয়; বেদে এরূপস্থলে "গৃভ্ণামি" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বেদে 'হৃ' ধাতুর লিটের প্রথমপুরুষের একবচনে "জভার" এইরূপ প্রয়োগ হয়; লৌকিক সংস্কৃতে এরূপস্থলে "জহার" প্রয়োগ হয়।

এখন অনায়াসেই ইহা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে যাদের ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান নাই, তাদের হাতে পড়লে বেদের কিরূপ দুর্দশা হতে পারে। পূর্বোক্ত স্থলগুলিতে এবং ঐরূপ আরও অনেকস্থলে তারা বৈদিক প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ মনে করে, তাদের সংশোধনের চেষ্টা যদি করে তা হলে আর বেদের বেদত্ব থাকবে না। অতএব বেদের যথার্থ স্বরূপ রক্ষার জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন যে অবশ্য কর্তব্য তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বেদরক্ষায় পাণিনি ব্যাকরণই অধ্যেতব্য। বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণের দ্বারা বেদরক্ষা হবে না। অতএব সেইসব ব্যাকরণ অবৈদিক ॥৭॥

মূল

ঊহঃ খল্বপি। ন সর্বৈর্লিঙ্গৈর্ন চ সর্বাভির্বিভক্তিভিঃ

বেদে মন্ত্রা নিগদিতাস্তে চাবশ্যং পুরুষেণ যজ্ঞ

গতেন যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তান্নাবৈয়া-

করণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্।

তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ ॥৮॥

অনুবাদ—ঊহ [বলা হচ্ছে] বেদে সমস্ত লিঙ্গ এবং সমস্ত বিভক্তির দ্বারা মন্ত্র পঠিত হয় নাই। যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত মানুষকে সেই সকল মন্ত্রের যথাযথ বিপরিণাম [পরিবর্তন] করতে হবে। যে বৈয়াকরণ নয়, সে ব্যক্তি ঠিক্‌ঠিক্‌ ভাবে সেই সকল মন্ত্রের বিপরিণাম করতে সমর্থ হয় না। সেই হেতু ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ৮ ॥

বিবৃতি—বেদের বিহিত যজ্ঞকর্ম দুই প্রকার, প্রকৃতি যাগ ও বিকৃতি যাগ। প্রত্যেক যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপযোগী পদার্থগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অঙ্গ ও প্রধান। যাহা স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ করণরূপে বেদে বিহিত হয়েছে তাকে 'প্রধান' বলা হয়। স্বর্গাদি ফলের উৎপাদনে ব্যাপৃত প্রধানের সহায়ক রূপে যেগুলি বেদে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে অঙ্গ বলে। এই অঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য করে যজ্ঞক্রিয়ার প্রকৃতিবিকৃতিভাব বুঝতে হবে। যজ্ঞক্রিয়ার বিভিন্নতার হেতু হচ্ছে তার অন্তর্গত প্রধান কর্মের বিভিন্নতা। অঙ্গগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য থাকলেও যদি প্রধান কর্মের ভেদ হয়, তা হলে যজ্ঞকর্মের ভেদ হয়ে থাকে। বেদে কতকগুলি কর্ম এরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই সকল কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপযোগী অঙ্গগুলিও সাক্ষাদ্‌ভাবে উপদিষ্ট হয়েছে। এই সকল কর্মকে প্রকৃতি [যাগ] বলে। বৈদিক যজ্ঞগুলির অন্যপ্রকার অবান্তর ভেদ আছে। এই যজ্ঞগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হোম বলে। জুহোত্যাদি -গণে পঠিত হুধাতুর উচ্চারণের দ্বারা যে সকল কর্মের বিধান করা হয়েছে সেগুলি হোম। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে হোমের লক্ষণ বলা হয়েছে (৩৭)।

(৩৭) "উপবিষ্টহোমা স্বাহাকারপ্রদানা জুহোতয়ঃ। [কাত্যায়নশ্রৌঃ সূঃ ১।২৮]

যে সকল যজ্ঞক্রিয়ায় উপবিষ্ট অবস্থায় আহুতি দেওয়া হয় এবং যাতে "স্বাহা" শব্দের উচ্চারণ করে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যের ত্যাগ করতে হয় তাদের নাম হোম। বেদে অনেক প্রকার হোম বিহিত হয়েছে। যে যজ্ঞক্রিয়ায় দণ্ডায়মান অবস্থায় অগ্নিতে মন্ত্রপূত আহুতি প্রক্ষেপ করা হয়, যাতে "বৌষট্" শব্দের উচ্চারণপূর্বক দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যের ত্যাগ করা হয় এবং যাতে বেদোক্ত "যাজ্যা" ও "পুরোনুবাক্যা" (৩৮) নামক মন্ত্রের উচ্চারণ বিহিত হয়েছে সেই সকল ক্রিয়ার নাম যাগ। এই যাগের লক্ষণও কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে উক্ত হয়েছে। যে সকল যাগ বা হোমে কোন অঙ্গের উপদেশ করা হয় নাই, অথবা আবশ্যক অঙ্গগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র অঙ্গ উপদিষ্ট হয়েছে, অন্য অঙ্গগুলি অপর যাগ বা হোম থেকে গৃহীত হয়ে থাকে এইরূপ যাগ বা হোমকে বিকৃতি বলা হয়। মীমাংসকগণ বলেছেন "প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কর্তব্যা" প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতি করবে। যার দ্বারা একের ধর্ম অপরে বোধিত হয়, তার নাম অতিদেশ। সুতরাং "প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্তব্যা" এটাও একটা অতিদেশ। মীমাংসাদর্শনের সপ্তমাধ্যায়ে সামান্য অতিদেশ ও অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষ অতিদেশের বিচার করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে উহের বিচার করা হয়েছে। এখানে পতঞ্জলি বলছেন - উহের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। উহ বিতর্কে—ধাতু + ঘঞ্ প্রত্যয় করে উহ শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হলো কল্পনা। প্রকৃতির মত বিকৃতির অনুষ্ঠান করবে, এরূপ অতিদেশের দ্বারা প্রকৃতির সকল প্রকার অঙ্গই বিকৃতিতে অতিদিষ্ট [বোধিত] হয়। মন্ত্রও অতিদিষ্ট হয়। প্রকৃতিযাগের যে মন্ত্র অতিদেশবশত বিকৃতিতে প্রাপ্ত হয়,

---

(৩৮) 'যাজ্যা' "যে যজামহে" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ায় হোতা যে মন্ত্র পাঠকরে থাকেন, যে মন্ত্রের সমাপ্তিতে 'বৌষট্' শব্দ উচ্চারিত হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ পরিত্যাগের সময় এইরূপ যে মন্ত্র পঠিত হয় তার নাম যাজ্যা। [শ্রৌতপদার্থনির্বচন ইষ্টিপ্রকরণ ২৩৩। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র কর্কভাষ্য, — ১৮৪]

পুরোনুবাক্যা'=দেবতার আবাহনের উদ্দেশ্যে অধ্বর্যুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে হোতা একশ্রুতিস্বরযোগে ইষ্টিনামক যজ্ঞে যে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন এবং সোমযাগে অধ্বর্যুপ্রেরিত মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্ দেবতার আবাহনের জন্য যে ঋক্ পাঠ করেন তার নাম "পুরোহনুবাক্যা" বা "অনুবাক্যা" [শ্রৌতপদার্থনির্বচন—ইষ্টিপ্রকরণ এবং উক্ত কর্কভাষ্য]।

যাজ্ঞিকগণ সাধারণত 'বৌষট্' শব্দকে "বষট্কার" শব্দের দ্বারা উল্লেখ করেন। পিত্রোষ্টিতে 'স্বধানমঃ" এই মন্ত্রকে বষট্কার বলা হয়। [শ্রৌতপদার্থনির্বচন ইষ্টিপ্রকরণ ২৩১, ২৩২]

বিকৃতি যাগে স্থলবিশেষে তার কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি ও বিকৃতির দেবতা স্বভাবতঃ ভিন্ন হয়। প্রকৃতিতে দেবতার প্রকাশের নিমিত্ত যে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, বিকৃতিতে সেই মন্ত্র অবিকল প্রযুক্ত হতে পারে না। বিকৃতির দেবতার প্রকাশের জন্য বিকৃতিতে প্রয়োগকালে সেই মন্ত্রের দেবতাবাচক পদের পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়। তা না হলে, সেই মন্ত্রের দ্বারা বিকৃতির দেবতার প্রকাশ বা জ্ঞান হতে পারে না। দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের একটি দেবতা হচ্ছে অগ্নি। এই অগ্নির উদ্দেশ্যে যে যাগ করা হয় তাকে আগ্নেয় যাগ বলে। এই আগ্নেয়যাগের বিকৃতি হচ্ছে সৌর্যযাগ। শ্রুতিতে আছে ' সৌর্যং চরুং নির্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ" অর্থাৎ যে ব্রহ্মতেজ কামনা করে সে সূর্যদেবতার উদ্দেশে চরু নির্বাপ করবে। এখানে নির্বাপশব্দের মুখ্য অর্থের সঙ্গতি নাই বলে লক্ষণাস্বীকার করে যাগ অর্থ গ্রহণ করতে হবে (৩১)।

যাগের অঙ্গ হচ্ছে নির্বাপ। প্রকৃতি যাগে ["আগ্নেয়যাগে] মন্ত্র পঠিত আছে "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি।" [বাস্কল সংহিতা ১।১৩]

"অগ্নিদেবতা তোমাকে সেবিত পদার্থ প্রদান করি।" প্রকৃতি যাগে অগ্নিদেবতা বলে মন্ত্রে অগ্নিবোধক "অগ্নয়ে" পদ আছে। বিকৃতি যাগে সূর্য দেবতা হওয়ায়, অগ্নিপদের স্থানে সূর্যপদের প্রক্ষেপ করতে হবে এবং প্রকৃতি যাগে দেবতা বোধক পদের উত্তর যে বিভক্তি আছে, সূর্যপদের উত্তরও সেই বিভক্তির প্রযোগ করতে হবে অর্থাৎ "অগ্নয়ে" পদের স্থানে "সূর্যায়" এই পদের প্রয়োগ করতে হবে। একেই মন্ত্রের উহ বলে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে এরূপ "উহ" করতে পারা যায় না। এইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন আবশ্যক। যদিও উহ করলে বেদের বেদত্ব থাকে না বলে মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে না, তথাপি মন্ত্রে অনেক পদ থাকায়, তার মধ্যে একটা পদের পরিবর্তন করলেও 'সেই মন্ত্র' বলে প্রত্যভিজ্ঞা হয়। সুতরাং সেই উহ অর্থাৎ পরিবর্তিত পদঘটিত বাক্যকে মন্ত্র বলে ব্যবহার করা হয় এবং তার দ্বারা

---

(৩১) শকটাবস্থাপিতব্রীহিসজ্ঘান্নিষ্কাস্য মুষ্টিচতুষ্টয়পরিমিতানাং ব্রীহীণাং শূর্পে প্রক্ষেপো নির্বাপস্তৎপূর্বকো যাগোঽত্র নির্বাপেণোপলক্ষ্যতে [ঐতরেয়ব্রাহ্মণ সায়নভাষ্য ১।১।১]।

শকটে অবস্থিত ব্রীহিসমূহ [ধান] হতে নিষ্কাশন পূর্বক চারমুঠো ব্রীহির শূর্পে [কুলাতে] প্রক্ষেপের নাম নির্বাপ। সেই নির্বাপ পূর্বক যে যাগ তাকে এখানে নির্বাপ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে।

যাগের অঙ্গ সম্পাদিত হয়। উহ তিন প্রকার—যজ্ঞের অঙ্গরূপ সংস্কার নামক উহ (১) সামমন্ত্রোহ (২)। মন্ত্রের উহ (৩)। এই তিন প্রকার উহের মধ্যে এখানে শেষোক্ত "মন্ত্রোহের" কথাই বলা হয়েছে। এই মন্ত্রের উহেই ব্যাকরণজ্ঞানের প্রয়োজন। পূর্বোক্ত দুটি উহে ব্যাকরণের অপেক্ষা নাই। মীমাংসা দর্শনের নবম অধ্যায়ে উহ বিষয়ে বিশদ বিচার আছে ॥ ৮ ॥

মূল

আগমঃ খল্বপি। "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চে"তি। প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আগমও [শ্রুতি বা স্মৃতি] (ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন)। ব্রাহ্মণের পক্ষে ছয় অঙ্গের (৪০) সহিত বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান কর্তব্য—ইহা নিষ্কারণ ধর্ম। ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান। প্রধানে যত্ন করলে, সেই যত্ন, সফল হয়ে থাকে। [এইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত] ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি।" এটি একটি শাস্ত্রবাক্য। পদমঞ্জরীকার হরদত্তপ্রভৃতি বৈয়াকরণগণ বলেন এই বাক্যটি শ্রুতি বাক্য। কুমারিলভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকগণ বলেন—ইহা শ্রুতি নয় কিন্তু ইহা স্মৃতিবাক্য (৪১)।

এই উদ্ধৃত আগমবাক্যে যে বেদ শব্দ আছে, তার অর্থ সমগ্র বেদ নয়, কিন্তু নিজ নিজ শাখামাত্র—ইহা মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত গ্রন্থে বলা হয়েছে। নাগেশ ভট্ট "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ [তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।১৫।১] এই শ্রুতি-বাক্যের সঙ্গে মহাভাষ্য প্রদর্শিত উক্ত আগমবাক্যের একবাক্যতার প্রতি লক্ষ্য

---

(৪০) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃশাস্ত্র এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। [এই বইয়ের ৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে]

(৪১) শ্রুতিরেবেতি হরদত্তাদয়ঃ। স্মৃতিরিতি তু ভট্টাচার্যাঃ। তত্র যদি স্মৃতিরেবেতি প্রামাণিকম্ তর্হি "আগমঃ খল্বপীতি" ভাষ্যেঽপি আগমমূলকত্বাদাগমঃ স্মৃতিরেবেতি ব্যাখ্যেয়ম্।। [শব্দকৌস্তুভ ১।১।১] আগমপদেন শ্রুতিঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত ১।১।১]

ইয়ং চ শ্রুতিঃ, আগমপদস্য বেদে রূঢত্বাদিতি শাব্দিকাঃ। স্মৃতিরিতি মীমাংসকাঃ। [বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতকৃত ব্যাকরণসিদ্ধান্ত সুধানিধি ১।১।১]

করে এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বাক্যের স্বাধ্যায় শব্দের দ্বারা সমগ্র বেদ গৃহীত হয় নাই, কিন্তু এ স্থলে স্বাধ্যায় শব্দের দ্বারা নিজ নিজ শাখারূপ বেদই বুঝতে হবে—ইহা মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ৪২) ।।৯।।

বিবৃতি—আগম অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন ইহা বলা হয়েছে। এখানে প্রয়োজন শব্দটি করণবাচ্যে ল্যুট্ [অন] প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই কিন্তু "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" [৩।৩।১৩] এই সূত্রে কর্তৃবাচ্যে ল্যুটপ্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে। অতএব এখানকার এই প্রয়োজন শব্দের অর্থ প্রয়োজক। "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজক অর্থাৎ হেতু। পূর্বে ভাষ্যের যে সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ" এই ভাষ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে। "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ" এখানে পুংলিঙ্গের বহুবচন আছে, আর "প্রয়োজনম্" এখানে ক্লীবলিঙ্গের একবচন আছে। এইভাবে লিঙ্গ ও বচনের বৈসাদৃশ্যের কারণের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, রক্ষা, উহ, লঘু এবং অসন্দেহ—এই চারটি ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল। কিন্তু আগম অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফল হতে পারে না, কিন্তু ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রবর্তক। ঐরূপ শাস্ত্র শুনে লোকের ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে। ফলবাচক প্রয়োজন শব্দ নিত্য নপুংসকলিঙ্গ। কিন্তু প্রবর্তকবোধক প্রয়োজন শব্দ কর্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন; এইজন্য উহ' নিয়তলিঙ্গ শব্দ নয়; বিশেষ্যের যেরূপ লিঙ্গ হবে উহারও সেরূপ লিঙ্গ হবে। এখানে প্রবর্তকবোধক প্রয়োজন শব্দটি "আগমের" বিশেষণ। 'আগম' শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ। অতএব তার বিশেষণ "প্রয়োজন" শব্দটিও পুংলিঙ্গ হবে। সুতরাং পূর্বোক্ত রক্ষা, উহ, লঘু ও অসন্দেহের বিশেষণ যে ফলবাচক শব্দ, সেটি নপুংসকলিঙ্গ; এই চারিটির বিশেষণ চারিটি নপুংসকলিঙ্গ প্রয়োজন শব্দ এবং আগমের বিশেষণ একটি পুংলিঙ্গ প্রয়োজন শব্দ; এই পাঁচটি প্রয়োজন শব্দের একশেষ হয়েছে। এখানে নপুংসকলিঙ্গ প্রয়োজন শব্দেরই একশেষ হবে। এরূপ স্থলে আবার বিকল্পে একবচন হয়। সুতরাং পক্ষান্তরে "প্রয়োজনানি" এরূপ প্রয়োগও হতে পারে।

(৪২) "অত্র স্বাধ্যায়শব্দেন স্বশাখাভিধানম্। যতঃ পরম্পরয়াঽধ্যয়নবিধয়স্তদনুষ্ঠানবিষয়ত্বাৎ। তেন বেদত্রয়ান্তর্গতৈকৈকশাখাপরঃ স্বাধ্যায়শব্দঃ। [ভাট্টচিন্তামণি ১ম অধিকরণ]

"নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্" [১৷২৷৬৯]। অর্থাৎ অনপুংসক-লিঙ্গ শব্দের সহিত প্রয়োগে নপুংসকলিঙ্গ শব্দের শেষ [অন্য শব্দের নিবৃত্তি পূর্বক স্থিতি হয় এবং বিকল্পে উহার একবদ্‌ভাব অর্থাৎ একবচন হয়। অতএব "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" এই স্থলে বিশেষ্যপদে পুংলিঙ্গ বহুবচন থাকলেও "প্রয়োজনম্" এই বিশেষণ পদে নপুংসকলিঙ্গ একবচন অনুপপন্ন নয়।

বেদের ৬টি অঙ্গ পূর্বে বলা হয়েছে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিঃ-শাস্ত্র ও ছন্দঃশাস্ত্র। ইহাদের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে—

(১) যে শাস্ত্রের সাহায্যে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরযুক্ত বেদ-মন্ত্রের শুদ্ধভাবে উচ্চারণপ্রণালী জানতে পারা যায়, সেই শাস্ত্রের নাম শিক্ষা। তৈত্তিরীয় উপনিষদের আরম্ভে এবং গোপথ ব্রাহ্মণে (৪৩) শিক্ষার সূচনা দেওয়া হয়েছে। পাণিনি প্রণী শিক্ষা সাধারণভাবে সকল বেদের উপযোগী হওয়ায় ইহাকে সর্ববেদ-সাধারণী শিক্ষা বলা যায়। পাণিনি ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, লোমশ প্রভৃতি অনেক ঋষি শিক্ষা শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। সেই সকল শিক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বেদের বর্ণোচ্চারণের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। সেগুলি সব বেদ সাধারণ শিক্ষা নয়। শৌনক, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত "প্রাতিশাখ্য" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহও শিক্ষার মধ্যে পরিগণিত। এই সকল প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখার উপযোগী উদাত্তাদি স্বরের ব্যবস্থা ও উচ্চারণ পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এই জন্যই এই গ্রন্থসমূহকে প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত করা হয়।

(২) আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সাংখ্যায়ন, লাট্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত সূত্রগ্রন্থকে "কল্প" বলা হয়। পূর্বমীমাংসার শাবর ভাষ্যে মাশক, হাস্তিক, কৌণ্ডিন্যক এই তিনটি কল্পসূত্রের নাম দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে মাশক কল্পসূত্র কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত অবস্থায় আছে—বলে শোনা যায়। শবর স্বামী আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি প্রচলিত কল্পসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। এই সকল কল্পসূত্রে স্বাধীনভাবে কোন প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি বলা হয় নাই। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ

(৪৩) তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।১।২। গোপথব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১।২৪,২৭।

ব্রাহ্মণ ভাগ থেকে সেই সকল শ্রুতিবাক্য আহরণ করে এবং তাদের অভিপ্রায় মীমাংসাদর্শন প্রদর্শিত বিচার পদ্ধতির দ্বারা স্থির করে কল্পসূত্রে যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপদেশ করেছেন।

(৩) যে শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দ্বারা সাধু [শুদ্ধ সংস্কৃত] শব্দের উপদেশ করা হয়, সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ। বৈদিক যুগ থেকেই এই ব্যাকরণ শাস্ত্রের আরম্ভ হয়েছিল—এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় (৪৪)। ঋষি-যুগের সূত্রকার বৈয়াকরণগণের মধ্যে পাণিনি সকলের অন্তিম। পাণিনির পূর্বে আপিশলি, গার্গ্য, শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্মণ, গালব, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন [ইনি ঋষি শাকটায়ন জৈন শাকটায়ন নয়] প্রভৃতি বৈয়াকরণ ঋষি ছিলেন। বর্তমানে ইঁহাদের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এই সকল বৈয়াকরণের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে (৪৫)। পাণিনি ইঁহাদের গ্রন্থ পর্যালোচনা করে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছেন। পাণিনির পরে দুর্গসিংহ, চন্দ্রগোমী প্রভৃতি আরও অনেকে ব্যাকরণের সূত্রপ্রণয়ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সূত্রগ্রন্থ পাণিনির মত আদরলাভ করতে পারে নাই। পুরুষোত্তম দেব (৪৬) জিনেন্দ্রবুদ্ধি (৪৭) প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ বৈয়াকরণগণ পাণিনি সূত্রের উপাদেয়তা লক্ষ্য করে পাণিনি ব্যাকরণেরই ব্যাখ্যা লিখে গেছেন। শোনা যায় বৌদ্ধবহুল তিব্বত দেশেও তিব্বতীভাষায় পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছিল। পাণিনির পরে কাত্যায়ন পাণিনি ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতা পরিহারের উদ্দেশে পাণিনি সূত্রের উপর প্রায় ৪০০০ বার্তিক রচনা করেছেন। এই বার্তিকের পরেও যে অসম্পূর্ণতা ছিল,

---

(৪৪) তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৫।২ ; এখানে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণপ্রতিপাদিত বিভক্তির উল্লেখ আছে। গোপথব্রাহ্মণেও ব্যাকরণের প্রসঙ্গ আছে। গোপথব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১।২৪,২৬,২৭, এতদ্ব্যতীত বেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থেও কুণ্ডিবিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হয়েছে—দেখা যায়।

(৪৫) পাণিনির সূত্রে বৈয়াকরণদের নামের কয়েকটির উল্লেখ করা হলো আপিশলি ৬।১।৯২। গার্গ্য ৭।৩।৯৯,৮।৩।২০,৮।৪।৬৭। শাকল্য ১।১।১৬,৬।১।১২৭,৮।৩।১৯,৮।৪।৫১। সেনক ৫।৪।১১২। স্ফোটায়ন ৬।১।১২৩। চাক্রবর্মণ ৬।১।১৩০। গালব ৬।৩।৬১। ভারদ্বাজ ৭।২।৬৩। শাকটায়ন ৮।৩।১৮, ৮।৪।৫০ ইত্যাদি।

(৪৬) পাণিনিসূত্রের ভাষাবৃত্তিকার। (৪৭) কাশিকার-ব্যাখ্যান্যাসকার।

তার নিরাকরণের জন্য মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি স্বতন্ত্র ভাবে কতকগুলি বিধি নিষেধ প্রবর্তিত করে গেছেন। ব্যাখ্যা রচনা ভাষ্যকারের কর্ত্তব্য হলেও পতঞ্জলির দৃষ্টিতে পাণিনীয় ব্যাকরণে যে সকল ত্রুটি লক্ষিত হয়েছিল তিনি তার সমাধানে উপেক্ষা করেন নাই (৪৮) ভাষ্য কারের প্রবর্তিত এই সকল বিধি ও নিষেধের নাম "ইষ্টি"।

(৪) নিরুক্ত—নিরুক্তকে স্বতন্ত্র বেদাঙ্গরূপে বর্ণনা করলেও নিরুক্তশাস্ত্রে ব্যাকরণের অপেক্ষা অতিশয় থাকায় নিরুক্তকে ব্যাকরণের পরিশিষ্ট বললে কোন দোষ হয় না। পদের সাধনের জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রে সূত্ররচনা করা হয়েছে। ব্যাকরণের সূত্রে যে সকল পদের সুস্পষ্টভাবে সাধন প্রণালী বলা হয নাই, অথচ পদসাধনের সূচনা করা আছে, নিরুক্তে অনেকক্ষেত্রে সেই সকল শব্দের সাধন প্রণালী দেখানো হয়েছে (৪৯) এই জন্য নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন এই নিরুক্তশাস্ত্র ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতা পরিহার করে তার পূর্ণতা সম্পাদন করেছে (৫০)। যার ব্যাকরণজ্ঞান নাই, তার নিরুক্তে ব্যুৎপত্তি হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কারণে যাস্ক অবৈয়াকরণকে নিরুক্তের উপদেশের অযোগ্য বলেছেন (৫১)।

যদিও ব্যাকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে নিরুক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়েব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তথাপি ব্যাকরণশাস্ত্রের সহিত নিরুক্তের কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, একথা বলা যায় না। এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে যাস্ক বলেছেন নিরুক্ত শাস্ত্রেব স্বতন্ত্ররূপেও প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনটি যাস্ক স্পষ্টভাবে

---

(৪৮) পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র বলেছেন

যদ্বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎস্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ॥

সূত্রকার যা বিস্মৃত হয়েছেন বা লক্ষ্য করেন নি, বার্তিককার [পদমঞ্জরী ১।১] তা বলেছেন, বার্তিককার যা লক্ষ্য করেন নি ভাষ্যকার তা বলেছেন।

(৪৯) নিরুক্তং তু ব্যাকরণস্যৈব পরিশিষ্টপ্রায়ম্। বাহুলকাদিসাধ্যানাং লোপাগমবিকারাদীনাং প্রায়শস্তত্র সংগ্রহাৎ। [শব্দকৌস্তুভ ১।১।১]

(৫০) তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যম্। [নিরুক্ত ১।১৫।১] পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র যাস্কের এই উক্তির সমর্থন করেছেন—নিরুক্তং ব্যাকরণস্যৈব কার্ৎস্ন্যম্। পদমঞ্জরী ১।১

(৫১) "নাবৈয়াকরণায়" [নিরুক্ত ২।৩।৫)

যস্তাবদবৈয়াকরণঃ তস্মৈ ন নির্ব্রুয়াদয়ং সমাম্নায়ঃ, ন হ্যসাবলক্ষণজ্ঞত্বাদ্ ব্যুৎপাদ্যমানমেতদ্ বুধ্যেত, ততো ব্যর্থ এব শ্রমঃ স্যাদিতি। দুর্গাচার্যটীকা।

বলেন নাই। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য স্পষ্টভাবে বলেছেন—নিরুক্ত শাস্ত্রে পদসমূহের অর্থ স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। ব্যাকরণে কেবল সূত্র আছে, সেই সূত্রের ইঙ্গিত থেকে পদের অর্থ জ্ঞাপিত হলেও প্রত্যেক পদকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে সুস্পষ্টভাবে তার অর্থ প্রদর্শন করা হয় নাই। ব্যকরণশাস্ত্র সূত্র প্রধান। কিন্তু নিরুক্তশাস্ত্র সেরূপ নয়। এইটুকুই ব্যাকরণ থেকে নিরুক্তের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই নিরুক্ত শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণনা করা হয়। পাণিনির পূর্বে আপিশলি প্রভৃতি বৈয়াকরণ ছিলেন এবং তাঁদের গ্রন্থ অবলম্বন করে পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছেন। এইরূপ যাস্কের পূর্বেও শাকপূণি, ঔর্ণনাভ, ক্রৌষ্টুকি, প্রচর্মশিরা প্রভৃতি নিরুক্তকার ছিলেন। যাস্ক তাঁদের অনুসরণ করে নিজের গ্রন্থরচনা করেছেন। সেই সকল ঋষির গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। যাস্কের নিরুক্তের অনেক স্থলে এঁদের মত উদ্ধৃত হয়েছে (৫২)।

(৫) জ্যোতিষ [জ্যৌতিষ]। বেদের অধ্যয়ন কাল এবং বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের কালের নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। এই জ্যোতিঃশাস্ত্রও প্রথমে ঋষিরা রচনা করেছিলেন। পরবর্তিকালে এর অনেক বিস্তার সাধিত হয়েছে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদের অঙ্গ জ্যোতিষের কথা এখন পর্যন্ত জানা গেছে।

(৬) ছন্দঃ—বেদে তিনপ্রকার মন্ত্র অছে—ঋক্, যজুঃ এবং সাম। যে সকল মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ তাদের নাম ঋক্। যে সকল মন্ত্রের ছন্দঃ নাই গদ্যরূপে পঠিত, তাদের নাম যজুঃ। যে সকল মন্ত্র ঋক্ ও যজুঃ হতে ভিন্নজাতীয়, গানরূপে উচ্চারিত হয়, তাদের নাম সাম। এই সামমন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্রেরই গানরূপে পরিবর্তিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ঋগ্ মন্ত্রের ছন্দোজ্ঞানের জন্য ছন্দঃ শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। অধুনা অন্য ঋষি প্রণীত ছন্দঃ শাস্ত্র দেখা যায় না। কেবল পিঙ্গলের ছন্দঃ শাস্ত্র এখন প্রচলিত।

এই ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই বেদের প্রধান অঙ্গ। পাণিনীয় শিক্ষায়

---

(৫২) নিরুক্ত—শাকপূণি ৩।১১।২,৮।১০।৩। ঔর্ণনাভ ২।২৬।১,১২।১।৪। ক্রৌষ্টুকি ৮।২।১। প্রচর্মশিরা ৩।১৫।২। এতদ্ব্যতীত আগ্রয়ণ, ঔদুম্বরায়ণ, কৌৎস, কাত্থক্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী বহু নৈরুক্ত আচার্যের উল্লেখ যাস্কের নিরুক্তে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে শাকপূণির নাম অধিকস্থলে উল্লিখিত।

আছে—

(৫৩) ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্॥ [পাঃশি ৪০— ৪২]

ছন্দঃশাস্ত্র বেদের পদদ্বয়, কল্প অর্থাৎ শ্রৌত সূত্র বেদের হস্তদ্বয়, জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদের চক্ষুঃ, নিরুক্ত বেদের শ্রোত্র, শিক্ষা বেদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ। মানুষের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মুখ প্রধান অঙ্গ, সকল অঙ্গ থেকে মুখ না থাকলে আহার কার্য অনিষ্পন্ন হতো; আহার কার্য অনিষ্পন্ন হলে শরীর রক্ষা সম্ভব হতো না এবং শরীরে বলও থাকতো না। বল না থাকলে হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃশ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মক্ষম হতো না। তাদের সত্তা নিরর্থক হোত। এইরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্র না থাকলে বেদের কোনরূপ অর্থজ্ঞান সম্ভব হোত না। অর্থজ্ঞান না হলে বেদের দ্বারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোত না। তাতে বেদ ব্যর্থ হয়ে যেত। ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা আমরা বেদের অর্থজ্ঞান করতে পারি ও সেই অর্থজ্ঞান থেকে যজ্ঞাদি কর্মে যথাযথ ভাবে বেদের উপযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হই। অতএব ব্যাকরণই বেদের প্রধান অঙ্গ। বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান হওয়ায় "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ" ইত্যাদি আগম [শাস্ত্র] অনুসারে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। কারণ প্রধান বিষয়ে যে যত্ন সম্পাদিত হয়, সেই যত্নই ফলের জনক হয়ে থাকে। এখানে "ফলবান্" এই শব্দের অন্তর্গত "ফল" শব্দটির অর্থ বাক্যার্থজ্ঞান। এই ব্যাকরণ শাস্ত্র পদ ও পদের অর্থজ্ঞান-দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞানের উপযোগী। অতএব বেদের প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণের অধ্যয়ন থেকে বাক্যের অর্থজ্ঞানরূপ ফললাভ হয়ে থাকে।

---

(৫৩) শব্দ কৌস্তুভের পস্পশাহ্নিকে এই অংশের পাঠ অন্যরূপে গৃহীত হয়েছে—

মুখং ব্যাকরণং তস্য জ্যোতিষং নেত্রমুচ্যতে।
নিরুক্তং শ্রোত্রমুদ্দিষ্টং ছন্দসাং বিচিতিঃ পদে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য হস্তৌ কল্পান্ প্রচক্ষতে॥

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত প্রণীত ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত সুধানিধিতেও এইরূপ পাঠ গৃহীত হয়েছে। শব্দ-কৌস্তুভকার ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন অঙ্গ যেমন অঙ্গীর উপকার করে থাকে, সেইরূপ ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টিশাস্ত্র বেদের উপকারিক হওয়ায় উহাদিগকে বেদের অঙ্গ বলা হয়। উপকারকত্বা-দঙ্গত্বম্ (শব্দকৌস্তুভ ১।১।১)

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"। এই আগম-বাক্যের অন্তর্গত "নিষ্কারণো ধর্মঃ" এই অংশের দ্বারা ইহাই অভিব্যক্ত হয়েছে যে, কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন ও তার অর্থজ্ঞান অবশ্য কর্তব্য (৫৪)

মীমাংসকেরা শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহকে নিত্য ও কাম্য ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান না করলে সেই কর্মের অধিকারীর প্রত্যবায় [পাপ] হয়, সেইগুলিকে নিত্য কর্ম বলে। আর যে সকলকর্মের অনুষ্ঠান না করলে সেই কর্মের অধিকারীর কোনরূপ প্রত্যবায় হয় না, কিন্তু অনুষ্ঠান করলে কোন কাম্যফলের লাভ হয় তাদের নাম কাম্য কর্ম। উপনীত দ্বিজাতি সন্ধ্যা বন্দনাদি না করলে পাপ হয় বলে সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বিজাতির নিত্য কর্ম। এইরূপ আরও যে সকল কর্ম যে সকল আধিকারীর জন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে, যাদের অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই, কিন্তু না করলে অধিকারীর পাপ হয় সেই সমস্ত কর্মও নিত্যকর্মের অন্তর্গত। "বাজপেয় যজ্ঞ" প্রভৃতির অনুষ্ঠান না করলে যারা ঐসকল কর্মের অধিকারী তাদের কোন পাপ হয় না কিন্তু অনুষ্ঠান করলে বিশিষ্টফললাভ হয়; এইজন্য এই শ্রেণীর কর্মসমূহ 'কাম্য' কর্মের অন্তর্গত।

শাস্ত্রে এরূপ অনেক কর্মের, বিধান আছে, যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান না করলে, যাঁরা সেই সব কর্মের অধিকারী তাঁদের পাপ হয়, অথচ অনুষ্ঠান করলে বিশিষ্টফললাভ হয়। এই সকল কর্ম একাধারে নিত্য এবং কাম্য উভয়ই। ব্রাহ্মণের পক্ষে ষড়ঙ্গবেদের অধ্যয়ন ফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে করা উচিত—এইরূপ উপদেশ থাকায় বুঝা যাচ্ছে যে ষডঙ্গসহিত বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম। ব্যাকরণ বেদের একটি অঙ্গ বলে তার অধ্যয়নও ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মরূপে বিহিত হয়েছে। ব্যাকরণাধ্যয়নের সাধুশব্দজ্ঞান ও বেদরক্ষাদি ফল আছে বলায় উহা যে কাম্যকর্ম তাও বলা হয়ে গেছে।

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" এই আগম বাক্যের দ্বারা বেদের অধ্যয়নের মত ব্যাকরণের অধ্যয়নও ব্রাহ্মণের পক্ষে

(৫৪) উক্ত বাক্যের অন্তর্গত "কারণ" শব্দটির অর্থ ফল। "কারণশব্দঃ ফলপরঃ (মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যোত] কারয়তেঃ করণল্যুটা প্রবৃত্তিজনকেচ্ছাবিষয়ত্বসম্বন্ধেন প্রবৃত্তিজনকস্য ফলস্য কারণপদেন লাভাৎ। [ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত সুধানিধি]

নিত্য কর্মরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায়, এর অনুষ্ঠান না করলে ব্রাহ্মণের প্রত্যবায় হবে—ইহা সূচিত হয়ে গেছে। অতএব এইরূপ প্রত্যবায় যাতে না জন্মে তার জন্য ব্যাকরণাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য—ইহাই মহাভাষ্যকার উক্ত আগম উদ্ধৃত করে প্রতিপাদন করেছেন। যদিও "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ছয়টি বেদাঙ্গেরই অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, তথাপি মহাভাষ্যকার অন্যান্য অঙ্গের অধ্যয়ন অপেক্ষা ব্যাকরণের অধ্যয়ন অতিশয় আবশ্যক—ইহা প্রতিপাদন করবার জন্য তার যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করেছেন—

"প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।" বেদের ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। প্রধান বিষয়ে যে যত্ন করা হয়, সেই যত্ন ফলবান [সফল] হয়। এখানে মহাভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় ব্যাকরণের অধ্যয়ন না করলে দুটি দোষ হয়। (১) ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যাকরণাধ্যয়ন যে অবশ্য কর্তব্য, তা না করলে একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান করা হয় না। (২) ব্যাকরণের অধ্যয়ন না করায়, বেদের অর্থজ্ঞান যা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য তাহাও হয় না ॥ ৯ ॥

মূল

লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা জ্ঞাতুম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—লঘুর [লাঘবের] নিমিত্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দসমূহ [সাধু সংস্কৃত শব্দ] অবশ্য জ্ঞাতব্য। ব্যাকরণ ব্যতীত লঘুউপায়ের দ্বারা শব্দ সমূহ জানতে পারা যায় না ॥ ১০ ॥

শব্দার্থ বর্ণনাঃ—মহাভাষ্যের এখানে 'লঘ্বর্থম্' পদের অন্তর্গত লঘু শব্দটির অর্থ লাঘব। সাধারণত "লঘু" এই শব্দের দ্বারা যে বস্তু, লাঘববিশিষ্ট তাকেই বোঝায়; কেবল লাঘব অর্থ বুঝায় না। যেমন 'ঘট' শব্দের দ্বারা ঘটত্ববিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়, কেবল ঘটত্বকে বুঝায় না। এখানে "লঘু" শব্দটি নিজের স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করে "লাঘব" অর্থকে বুঝাচ্ছে। এরূপ প্রয়োগকে ভাবপ্রধান নির্দেশ করে। [ভাবপ্রধানঃ নির্দেশঃ]। এরূপ বলার অভিপ্রায় এই; যে শব্দটি ধর্মবিশিষ্টের [ধর্মীর] বাচক, সেই শব্দটিকে তার

মুখ্যঅর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। তার মুখ্য অর্থ ধর্মী; সেই মুখ্যঅর্থটিকে পরিত্যাগ করে "ধর্ম" রূপ অর্থে তার লক্ষণা প্রয়োগকরা হয়েছে। এরূপ স্থলে একটিমাত্র বস্তু [ধর্ম] ই প্রকারতা [বিশেষণতা] ও বিশেষ্যতা এই উভয়রূপে প্রতীয়মান হয় [নাগেশভট্ট লঘুমঞ্জুষা স্ফোট প্রকরণ] ॥ ১ ॥

বিবৃতি :—ব্রাহ্মণের একটি বৃত্তি [জীবিকা] অধ্যাপনা। যার শব্দজ্ঞান নাই ছাত্রগণ তাকে অব্যুৎপন্ন মনে করে, তার নিকট অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হয় না। ছাত্র উপস্থিত না হলে অধ্যাপনা কার্য সম্পন্ন হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দজ্ঞান অবশ্য কর্তব্য। ব্যাকরণ ব্যতীত শব্দজ্ঞানের অন্যকোন রূপ লাঘব বিশিষ্ট উপায় নাই। এই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দজ্ঞানার্থ ব্যকরণের অধ্যয়ন অবশ্য করণীয়। (৫৫)

এখানে একটি আশঙ্কা উত্থিত হয়;—এখানে লাঘবকে ব্যাকরণাধ্যয়নের একটি ফল বলা হয়েছে। কিন্তু লাঘব ব্যাকরণাধ্যয়নের ফল হতে পারে না। যেহেতু ব্যাকণের সূত্রগুলি লোকব্যবহারে অজ্ঞাত নানা প্রকার সংজ্ঞা, পরিভাষা অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। সেই সব সংজ্ঞা ও পরিভাষার অর্থজ্ঞান সহজসাধ্য নয়। ব্যাকরণে যে সকল বার্তিক সন্নিবিষ্ট আছে, তাদের অর্থও অত্যন্ত গভীর বলে সেই সকল বার্তিকের তাৎপর্য অবগত হওয়া সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই সকল সূত্র ও বার্তিকের অর্থজ্ঞানের অতি প্রাচীন কাল থেকে ঋষিগণ যে সকল ভাষ্যাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই সকল গ্রন্থের অর্থও অত্যন্ত গভীর। এই হেতু ব্যাকরণের দ্বারা শব্দজ্ঞানে কোন লাঘব দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন করে যদি শব্দজ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা হলে তাতে অত্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে,—এতে সন্দেহ নাই। তা হলে দেখা যাচ্ছে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের অধ্যয়নে যে লাঘব প্রদর্শন করেছেন তা বস্তুতঃ গৌরবে পর্যবসিত হয়েছে।

এর উত্তরে বক্তব্য - শব্দশাস্ত্র বা শব্দরাশি অনন্ত। সেই শব্দরাশির প্রত্যেক শব্দকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পাঠ করে যদি সমস্ত শব্দের জ্ঞানলাভ করতে হয়— তাহলে তা একেবারে অসম্ভব হবে। আর এইভাবে পঠিত প্রত্যেক শব্দকে পৃথগ্‌ভাবে জেনে কারও সমগ্র ভাষায় ব্যুৎপত্তি হবে ইহাও অসম্ভব। বহু-

(৫৫) কৈয়টকৃত প্রদীপ, শব্দকৌস্তুভ এবং ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি।

পরিশ্রম করলে অনন্তশব্দরাশির কতকগুলি শব্দের জ্ঞান হতে পারে এইপর্যন্ত। ব্যাকরণের সাহায্যে শব্দজ্ঞান করতে যত্ন করলে অত্যন্ত লাঘব দেখা যায়। সামান্যসূত্র [উৎসর্গ শাস্ত্র] এবং সামান্য সূত্রের বাধক বিশেষসূত্রের [অপবাদ শাস্ত্রের] সাহায্যে অনন্ত অনন্ত শব্দরাশির জ্ঞানলাভ কিছু আয়াসসাধ্য হলেও অসাধ্য বা অত্যন্ত দুঃসাধ্য নয়। মহাভাষ্যকার এই হেতু ব্যাকরণে বলেছেন, ব্যাকরণ ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান সম্পাদিত হতে পারে না ['ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শাক্যা জ্ঞাতুম্'] ॥ ১০ ॥

মূল

অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি
"স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত" ইতি।
তস্যাং সন্দেহঃ, স্থূলা চাসৌ পৃষতীচ স্থূলপৃষতী,
স্থূলানি বা পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতী।
তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্বপদ-
প্রকৃতিস্বরত্বং ততো বহুব্রীহিঃ। অথান্তোদাত্তত্বং*
ততস্তৎপুরুষ ইতি॥ ১১ ॥

অনুবাদ :—সন্দেহের অভাবের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। যাজ্ঞিকেরা পাঠ করেন [স্থূলপৃষতীম্ আগ্নিবারুণীম্ অনড্বাহীম্ আলভেত] অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দেশে স্থূলপৃষতী [যার স্থূল বিন্দু আছে] অনড্বাহী [স্ত্রী গোকে] কে আলম্ভন [বধ] করবে। তাহাতে [স্থূলপৃষতী এই স্থলে] সন্দেহ [হয়] যে• স্থূলা সেই পৃষতী স্থূলপৃষতী [স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ] (এইরূপ বিগ্রহে কর্মধারয় নামক তৎপুরুষসমাস) অথবা স্থূল পৃষৎ [বিন্দু] সমূহ যার [গায়ে] সেই স্থূল পৃষতী [স্থূলানি বা পৃষন্তি যস্যাং সেয়ং স্থূলপৃষতী] (এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাস)? যিনি বৈয়াকরণ নন, তিনি তাকে [স্থূলপৃষতীকে] [উদাত্তাদি] স্বরের দ্বারা নিশ্চিত রূপে জানতে পারেন না। যদি পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হয় ["বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্" ৬।২।১ এই সূত্র অনুসারে পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হয়], তাহলে বহুব্রীহি [বুঝতে হবে] যদি [সমাসনিমিত্ত] অন্তোদাত্ত [সমাসস্য ৬।১।২২৩ এই সূত্র অনুসারে সমস্ত

* 'অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং" এই পাঠান্তর অনেক পুস্তকে দেখা যায়

পদটির অন্ত্য স্বর উদাত্ত] হয়, তা হলে তৎপুরুষ [কর্মধারয় নামক তৎপুরুষ] (বুঝতে হবে) ॥ ১১ ॥

বিবৃতি :—পৃষৎ শব্দের অর্থ দুইপ্রকার—(১) বিন্দু, (২) শ্বেতবিন্দুযুক্ত (৫৬)। শ্বেতবিন্দুযুক্ত এই অর্থে পৃষৎ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "উগিতশ্চ" ৪।১।৬ এইসূত্রের দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয় করলে "পৃষতী" শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয়, শ্বেতবিন্দুযুক্ত স্ত্রী। তার পর 'স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ' এরূপ বিগ্রহবাক্যে কর্মধারয় সমাস করলে "স্থূলপৃষতী" শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় এই, যে নিজে স্থূল এবং যার শীররে শ্বেতবিন্দু বিদ্যমান। স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ" একপবিগ্রহ বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করলে "স্থূলপৃষৎ" শব্দসিদ্ধ হয়। তার পর সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "উগিতশ্চ" [৪।১। ।] সূত্রানুসারে ঙীপ্ প্রত্যয় করলে স্থূলপৃষতী পদসিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় যার শরীরে স্থূল বিন্দু সকল বিদ্যমান আছে। এখানে কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের অর্থভেদ অনুসন্ধেয়। কর্মধারয় সমাসে "স্থূলপৃষতী" শব্দের অর্থ হচ্ছে যে গাভী, সে নিজে স্থূলা হবে, তার গায়ে যে বিন্দু গুলি থাকে সেই বিন্দু স্থূল [বড] হবে কি সূক্ষ্ম [ছোট] হবে তার কোন নিয়ম নাই। গাভীটি স্থূলা হবে এবং সে [গায়ে] শ্বেতবিন্দুযুক্তা হবে। আর বহুব্রীহি সমাসে সেই গাভীর শরীর স্থূল হবে কি কৃশ হবে তার কোন নিয়ম বুঝায় না। কিন্তু তার শরীরে যে বিন্দুগুলি থাকে সেগুলি স্থূল [বড] হবে। যারা যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের পক্ষে কর্মটিকে যথাযথ ভাবে নিষ্পাদিত করার জন্য "স্থূলপৃষতী" শব্দটির অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। এখানে কর্মধারয়ে ও বহুব্রীহি সমাসে উভয় ক্ষেত্রে "স্থূলপৃষতী" এই আকারটি সমানভাবে থাকে বলে উদাত্তাদি স্বরের (৫৭) দ্বারাই তার অর্থের নিশ্চয় করতে হয়।

---

(৫৬) ".পৃষতস্তু মৃগে বিন্দৌসংরোহিতে। অমরকোষ বারিবর্গ ৬ শ্বেতবিন্দুযুতেঽপি স্যাৎ"—[ভানুজীদীক্ষিতের টীকায় উদ্ধৃত হৈমকোষ।

(৫৭) সমাসস্য [৬।১।২২৩] সমাসস্যান্ত উদাত্তো ভবতি। কাশিকা। সমাসের অন্ত উদাত্ত হয়। এই সূত্রটি সামান্য সূত্র। কোন বিশেষ সূত্র না থাকলে এই সূত্রের প্রবৃত্তি হবে। সমাস স্থলে সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর হয় না. কিন্তু সমুদায়ের অন্ত্যস্বরটি উদাত্ত হয়। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য। "স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ" স্বরবিধিতে ব্যঞ্জন অবিদ্যমানের মত—এই পরিভাষা অনুসারে সমাসযুক্ত পদটি হলন্ত হলেও তার স্বরের মধ্যে যেটি অন্ত্য স্বর সেটি উদাত্ত হবে। তাকেই সমাসের অন্ত বলে ধরতে হবে।

এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই—যদি কোন পদের কোন একটি স্বর উদাত্ত অথবা স্বরিত হয়, তাহলে সেই পদের অবশিষ্ট সমস্ত স্বর অনুদাত্ত হয়ে যায়। "অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্" [৬।১।১৫৮] "পরিভাষেয়ং স্বরবিধিবিষয়া। যত্রান্যঃ স্বর উদাত্তঃ স্বরিতো বা বিধীয়তে তত্র অনুদাত্তং পদমেকং বর্জয়িত্বা ভবতীত্যেতদুপস্থিতং দ্রষ্টব্যম্। অনুদাত্তাচ্ কমনুদাত্তম্ ? কঃ পুনরেকো বর্জ্যতে ? যস্যাসৌ স্বরো বিধীয়তে।" কাশিকা। [পর পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

[পর পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

মোট কথা—মহাভাষ্যের উক্ত উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে—যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই তারা উদাত্তাদিস্বরের সহায়তায় এরূপ সন্দিগ্ধস্থলে শব্দের অর্থনির্ণয় করতে পারে না। অথচ বেদের এই সকল সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ নির্ণয় না হলে যাগাদির অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। এই সকল সন্দিগ্ধ শব্দের উদাত্তাদি স্বরের দ্বারা অর্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। অতএব ইহাও [স্বরদ্বারা অর্থনির্ণয়] ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন। এখানে পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর অর্থাৎ সমাসের পূর্বে যে স্বর ছিল সেইস্বর থাকায় "স্থূলপৃষতী" এই শব্দটির বহুব্রীহি সমাস অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় [যে গাভীর শরীরে স্থূল বিন্দু সকল আছে] সেই অর্থটি গ্রহণ করতে হবে। এখানে 'স্থূল' শব্দটির অন্ত্যস্বর সমাসের পূর্বে উদাত্ত ছিল। এখন সমাস হওয়ার পরেও তাহাই থাকবে।

এইজন্য এটি বহুব্রীহি সমাস বলে বুঝতে হবে। *।

এখানে কৈযট বলেছেন মহাভাষ্যের 'অসন্দেহ' শব্দটি সন্দেহের অভাব অর্থ বুঝাচ্ছে। কিন্তু এই অভাবটি সন্দেহের ধ্বংসাভাব নয়। সন্দেহ উৎপন্ন হলে তবে তার ধ্বংস হয়। এখন যে বৈয়াকরণ তার যদি সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তা হলে তাকে বৈয়াকরণ বলা যায় না। অন্ততঃ যে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় সেই পদাদি বিষয়ে সে বৈয়াকরণ নয়। এইজন্য এখানে সন্দেহের প্রাগভাবই অসন্দেহ শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। বৈয়াকরণের সন্দেহের প্রাগভাব থাকতে

[(৫৭) টীকার শেষাংশ] এই নিয়ম ত্রিপাদীতে [অষ্টাধ্যায়ীর অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্থ পাদ পর্যন্ত অংশ] যে সকল স্বর বিহিত আছে তাদের বিষয়ে প্রবৃত্ত হবে না। যথা:— —"উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ" [৮।৪।৬৬] এই সূত্রের দ্বারা বিহিত যে স্বরিত, সেই স্বরিত স্বর হলে, "অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্" এই পূর্বোক্ত শাস্ত্র অনুসারে পদের অন্তর্গত অন্য স্বরের স্থানে অনুদাত্ত স্বর হবে না।

বহুব্রীহি স্থলে সমাসের পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হওয়ার সূত্র যথা:—"বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্" [৬।২।১], বহুব্রীহি সমাস হওয়ার পূর্বে পূর্বপদটির যে স্বর ছিল বহুব্রীহি সমাস হওয়ার পরেও সেই স্বরই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। পূর্বপদের এই প্রকৃতিস্বর হলেও পূর্বোক্ত "অনুদাত্তংপদমেকবর্জম্" এই সূত্রের দ্বারা সমগ্র সমাস পদটির অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হবে। এখানে সূত্রস্থিত 'পূর্বপদ" শব্দের দ্বারা উদাত্ত অথবা স্বরিত স্বরযুক্ত পূর্বপদ বুঝতে হবে অর্থাৎ যেস্থলে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে উদাত্ত বা স্বরিত স্বর থাকবে সেখানেই বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হবে। যদি পূর্বপদের সমস্ত স্বর অনুদাত্ত হয়, তাহলে সেরূপ স্থলে এই সূত্রের প্রবৃত্তি হবে না। সেস্থলে পূর্বোক্ত "সমাসস্য" এই সামান্য সূত্রানুসারে সমগ্র সমাসের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হবে। [মহাভাষ্য ও কাশিকা দ্রষ্টব্য]

* পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরাদ্বহুব্রীহ্যর্থাবসায় ইত্যর্থঃ [মহাভাষ্যপ্রদীপ]।

পারে। উৎপত্তিশীল বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে প্রাগভাব থাকে। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে কপালে প্রাগভাব থাকে। সেইরূপ সন্দেহের উপাদান কারণ অন্তঃকরণ বলে বৈয়াকরণের অন্তঃকরণে সন্দেহের প্রাগভাব থাকে। প্রাগভাব থেকে বস্তুর-উৎপত্তি হয়। বৈয়াকরণের অন্তঃকরণে সন্দেহের প্রাগ-ভাব থাকায়, কোনদিন সন্দেহের উৎপত্তি হতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা হতে পারে না। কারণ বৈয়াকরণের শব্দবিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকায় ঐ ব্যুৎপত্তিই সন্দে-হের প্রাগভাবকে সর্বদা রক্ষা করে থাকে অর্থাৎ সন্দেহকে উৎপন্ন হতে দেয় না।

মহাভাষ্যে একটি বাক্য আছে—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।" এখানকার "যাজ্ঞিকাঃ" শব্দের সোজাসুজি অর্থ যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা। যজ্ঞের অনুষ্ঠান যাঁরা করতেন তাঁরা "স্থূলপৃষতীম্" ইত্যাদি বেদভাগটি পাঠ করেন অর্থাৎ ঐ বেদভাগের সৃষ্টি করেন—এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। তাতে দোষ হয় এই যে "বেদ-যজ্ঞ-কারী ঋষিগণ কর্তৃক রচিত" ইহাই প্রতিপাদিত হওয়ায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা নিত্যত্ব ব্যাহত হয়ে যায়। মীমাংসক প্রভৃতি বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। এইজন্য নাগেশভট্ট "যাজ্ঞিকাঃ" শব্দের অর্থ বলেছেন "যজ্ঞকাণ্ডভবাঃ শব্দাঃ যাজ্ঞিকাঃ"। অর্থাৎ যজ্ঞকাণ্ডে = যজ্ঞপ্রকরণে অবস্থিত যে সকল শব্দ সেই শব্দ সকল জ্ঞাপন করছে—"স্থূলপৃষতীম্" ইত্যাদি। শব্দ জ্ঞাপন করে অর্থ। সুতরাং বৈদিকশব্দ কারও দ্বারা রচিত বলে আর বুঝা গেল না। অতএব "বেদ নিত্য" এই সিদ্ধান্তের হানি হলো না। তবে মহাভাষ্যকার "তেন প্রোক্তম্" [৪।৩।১০] এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করেছেন বেদের প্রতিপাদ্য অর্থরূপ বস্তু নিত্য হলেও তার শব্দ রচনার কর্তা হচ্ছেন ঋষিগণ। সুতরাং "যাজ্ঞিকাঃ" শব্দের অর্থ যজ্ঞকর্মের জ্ঞাতা বা যজ্ঞকর্মের উপদেষ্টা ঋষিগণ বললে এখানে কোন অসঙ্গতি হয় না। আর এজন্য কষ্টকল্পনা করে "যজ্ঞকাণ্ডে স্থিত শব্দ" এই অর্থ করবারও আবশ্যকতা থাকে না। "স্থূলপৃষতী" শব্দটি এখানে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন (৫৮)। ॥ ১১ ॥

---

(৫৮) কৈয়টের উক্তি থেকে বুঝা যায় 'স্থূলপৃষতী" শব্দটি উক্ত বেদভাগে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন।

"পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরাদ্বহুব্রীহিরর্থাবসায়" ইত্যর্থঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপ]

"ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" [ফিট্‌সূত্র ১।১]। "প্রাতিপদিকং ফিট্, তস্যান্তঃ উদাত্তঃ স্যাৎ [সিদ্ধান্তকৌমুদী স্বরপ্রকরণ]। প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। এই সূত্রানুসারে স্থূল শব্দটি প্রাতিপদিক হওয়ায় তার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়ে থাকে। সমাস হওয়ার পরও এই স্থূল শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত থাকবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে "স্থূলপৃষতী' শব্দটি বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হয়েছে।

'তত্র লকারাকারে উদাত্তত্বং দৃষ্ট্বা পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ বহুব্রীহিং বৈয়াকরণো নিশ্চিনোতি" [শব্দকৌস্তুভ—পস্পশাহ্নিক]। তত্র পূর্বপদান্তোদাত্তত্বং দৃষ্ট্বা 'পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ বহুব্রীহিং নিশ্চয়ঃ। [ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি পস্পশাহ্নিক]

মূল

ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি।

(১) "তেঽসুরাঃ", (২) "দুষ্টঃ শব্দঃ", (৩) 'যদধীতম্", (৪) 'যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে", (৫) "অবিদ্বাংসঃ" (৬) "বিভক্তিং কুর্বন্তি", (৭) "যো বা ইমাম্", (৮) "চত্বারি", (৯) "উত ত্বঃ",, (১০) "সক্তুমিব", (১১) "সারস্বতীম্", (১২) "দশম্যাং পুত্রস্য", (১৩) "সুদেবো অসি বরুণ", ইতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এইগুলি পুনরায় শব্দানুশাসনের [ব্যাকরণের] প্রয়োজন ।· "তেঽসুরাঃ", "দুষ্টঃ শব্দঃ', "যদধীতম্", যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে", "অবিদ্বাংসঃ", "বিভক্তিং কুর্বন্তি", "যো বা ইমাম্", "চত্বারি", 'উত ত্ব.", ' সক্তুমিব", "সারস্বতীম্", "দশম্যাং পুত্রস্য", "সুদেবো অসি বরুণ". ॥ ১২ ॥

বিবৃতি—এখানে মহাভাষ্যে 'ভূয়ঃ" শব্দটির অর্থ পুনঃ। (৫৯)। মহাভাষ্যকার ' অথ শব্দানুশাসনম্"-এইরূপে ভাষ্যের আরম্ভ করে সাধু শব্দই ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ইহা সূচিত করেছেন। তা থেকে আরও সূচিত হয়েছে যে—অসাধু [অশুদ্ধ, `অপভ্রংশ ইত্যাদি] শব্দ থেকে পৃথগ্‌ভাবে সাধু [শুদ্ধ] শব্দের জ্ঞান ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। তারপর 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" এই বাক্যের দ্বারা সাধুশব্দের জ্ঞানের যা ফল তা বলা হয়েছে। আর ঐ "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ" বাক্যে আগম অর্থাৎ শাস্ত্রকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রেরক বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনাদির মত ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্যকর্ম, ইহা "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে। এখন অপর কতকগুলি শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শন করে মহাভাষ্যকার ব্যাকরণাধ্যয়নের কর্তব্যতা প্রতিপাদন করছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে ভাষ্যকার পূর্বে যখন "রক্ষোহাগম" ইত্যাদি বাক্যে ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন যে শব্দজ্ঞান—সেইশব্দজ্ঞানের প্রয়োজনরূপে বেদরক্ষা প্রভৃতির কথা বলেছিলেন—তখন আগমের ব্যাখ্যাকালে "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন, যে শাস্ত্রবাক্য ব্যাকরণ অধ্যয়নের

(৫৯) "ভূয় ইতি পুনরিত্যর্থঃ।" [মহাভাষ্যপ্রদীপ]

প্রবর্তক। সেই শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে এই "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যগুলি প্রদর্শন করলে বলার লাঘব এবং শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শন রূপ একটা প্রকরণও রক্ষিত হতো। তা না বলে ভাষ্যকার এই শাস্ত্রবাক্যগুলিকে পৃথগ্ভাবে পরে বর্ণনা করেছেন কেন ?

এর উত্তরে কৈয়ট বলেছেন পূর্বোক্ত বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি প্রয়োজন প্রধান প্রয়োজন, আর "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি প্রয়োজনগুলি আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। এই হেতু প্রথমে প্রধান প্রয়োজনের কথা বলে ভাষ্যকার পশ্চাৎ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনগুলির উল্লেখ করেছেন। এখানে "প্রধান"ও "আনুষঙ্গিক" এর ভেদ উল্লিখিত হচ্ছে। যা কারও অধীন নয় স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান তাকে প্রধান বলে। প্রধানের উদ্দেশ্যে কার্য করলে, যেগুলি অনায়াসে সিদ্ধ হয়ে যায় তাকে আনুষঙ্গিক বলে। এখানে "শব্দানুশাসন" এই সার্থক নাম থেকে—সাধুশব্দের জ্ঞানই ব্যাকরণ অধ্যয়নের সাক্ষাৎ প্রয়োজন ইহা সূচিত হয়েছে। সেই সাধু শব্দের জ্ঞানের ফল হচ্ছে, বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি। এই বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি ফলের উদ্দেশে সাধুশব্দের জ্ঞানের জন্য ব্যকরণ অধ্যয়ন করলে তার সঙ্গে যে ফলগুলি সিদ্ধ হয় তাহাই আনুষঙ্গিক ফল। তাহলে দেখা গেল যে—লোকে যার উদ্দেশে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেটি তার মুখ্যফল বা প্রধান প্রয়োজন। আর সেই প্রধান ফলের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ফল সিদ্ধ হয় সেগুলি আনুষঙ্গিক ফল বা প্রয়োজন। যেমন কেহ যদি কৃষিকর্মের উদ্দেশে কূপ বা খাল খনন করে সেইকূপ বা খাল খননের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে কৃষি আর সেই কূপ বা খালের জলের দ্বারা যে স্নান পানাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, সেই স্নান পানাদি কূপাদি খননের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার যে "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শ্রুতি প্রথমবারে উদ্ধৃত করে তার সঙ্গে "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ না করে দ্বিতীয়বারে এইশ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করলেন তার আরও অভিপ্রায় আছে। যথাঃ—পূর্বের "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি আগমবাক্য দ্বারা ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্যকর্ম ইহা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই বেদবাক্যটি বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। আর ঐ বেদবাক্যটি ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন মানে প্রবর্তক [পূর্বে ইহা বলা হয়েছে]। বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে "ব্রাহ্মণেন"

ইত্যাদি প্রবর্তক শাস্ত্র বাক্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যদি "তেঽসুর,' ইত্যাদি শাস্ত্র উল্লেখ করে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হোত তা হলে—"বেদরক্ষা" প্রভৃতি অন্য প্রয়োজনগুলি বুঝতে অসুবিধা হোত। এইজন্য মহাভাষ্যকার বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের বর্ণনার সঙ্গে "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শাস্ত্রকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি প্রয়োজনবর্ণনের সমাপ্তি করে ঐ "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য পরে "তেঽসুরা." ইত্যাদি শাস্ত্রের কথা বলেছেন। "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো" ইত্যাদি বাক্যও আগম আর "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি বাক্যও আগম। সুতরাং "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শাস্ত্র যেমন ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজনঅর্থাৎ প্রবর্তক সেইরূপ "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রও ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রবর্তক। অতএব এই শাস্ত্রগুলি "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শাস্ত্রের সমধর্মী এবং "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি শাস্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং "ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি" এর অর্থ হলো ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রবর্তক আরও এই শাস্ত্রগুলি আছে। সেই শাস্ত্রগুলির প্রত্যেকটির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করে ভাষ্যকার তাদের সমগ্র অংশের সূচনা করছেন। পরে সেই সমগ্র অংশের উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন ॥ ১২ ॥

মূল

"তেঽসুরাঃ"। তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ "তেঽসুরাঃ" ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—"তেঽসুরাঃ", [এই প্রতীকের (সমগ্রবস্তুর একাংশকে প্রতীক বলা যায়) দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছিল, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]। সেই অসুরেরা 'হেলয়ঃ' হেলয়ঃ এইরূপ উচ্চারণ করে পরাভূত [পরাজিত] হয়েছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন করবে না। অপভাষা প্রয়োগ করবে না। যা অপশব্দ [অশুদ্ধ শব্দ] তাই ম্লেচ্ছ। আমরা যেন ম্লেচ্ছ না হই এই হেতু [ম্লেচ্ছ না হওয়ার জন্য] ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর্তব্য। তেঽসুরাঃ [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছিল তা সমাপ্ত হলো] ॥ ১৩ ॥

বিবৃতি - "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি বাক্য বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত কোন গ্রন্থ থেকে ভাষ্যকার উদ্ধৃত করেছেন। কালবশে বেদের অনেক অংশ লুপ্ত

হয়ে যাওয়ায় এইসকল বাক্য বর্তমানে প্রচলিত কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে পাওয়া যায় না। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে "তেঽসুরা আত্তবচসো হেঽলব হেঽলব ইত্যাদি পাঠ আছে [শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।২।১।২৩]

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার "সাধুভি র্ভাষিতব্যং নাপ-ভ্রংশিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ" এই প্রকার পাঠ উদ্ধৃত করেছেন। [শব্দশক্তি প্রকাশিকা-২৩]। তিনি ম্লেচ্ছিতবৈ শব্দটির তৃতীয়ান্তরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন "ম্লেচ্ছিতবৈ ম্লেচ্ছমাত্রসঙ্কেতিতৈঃ।" কিন্তু ঐরূপ পাঠ কোন শ্রুতিতে নাই। ম্লেচ্ছিতবৈ শব্দটি ম্লেচ্ছধাতুর উত্তর "কৃত্যার্থে তবৈকেন্ কেণ্যত্বনঃ" [৩।৪।১৪] সূত্রে তব্যার্থক তবৈ প্রত্যয় হওয়ায় "ম্লেচ্ছমাত্রসঙ্কেতিতৈঃ'—'কেবল ম্লেচ্ছ-সম্প্রদায়ে অর্থবিশেষের প্রতিপাদকরূপে নির্দিষ্ট এরূপ অর্থ হতে পারে না। 'নাপভাষিতবৈ" পদটিও ঠিক "ম্লেচ্ছিতবৈ" পদানুসারে সিদ্ধ। সুতরাং 'ম্লেচ্ছিতবৈ' এর অর্থ হবে ম্লেচ্ছন করা উচিত।

'তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি বাক্য বেদের কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে—ইহা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণভাগ বেদের অন্তর্গত। মহর্ষি আপস্তম্ব বলেছেন "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" [আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে ১।৩৩]। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ। পূর্বে বেদের স্বরূপবিষয়েও মতভেদ ছিল, আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষা সূত্রের হরদত্তকৃত বৃত্তি থেকে জানা যায়। "কৈশ্চিন্মন্ত্রাণামেব বেদত্বম্ আখ্যাতম্। কৈশ্চিৎ কল্পসূত্রাণামপি। উভয়নিরাসার্থময়মারম্ভঃ।" কোন কোন ব্যক্তি কেবল মন্ত্রভাগকেই বেদ বলেছেন, কেহ কেহ শ্রৌতসূত্রকেও বেদ বলে স্বীকার করেছেন। এই উভয় মতের খণ্ডনের জন্য আপস্তম্ব এই সূত্র প্রণয়ন করেছেন। ছন্দঃশাস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে মন্ত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে; সুতরাং মন্ত্রবিষয়ে সন্দেহ উঠে না। প্রশ্ন হয় এই ব্রাহ্মণ কাকে বলে? এর উত্তরে আপস্তম্ব বলেছেন যে বাক্যগুলি যজ্ঞাদিকর্মের বিধি সেইগুলি ব্রাহ্মণ। "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" [আঃসূঃ ১।৩৪]। কর্মবিধির সহিত সম্বন্ধ যে অর্থবাদ, সেগুলি ব্রাহ্মণেরই অংশ, উহারা বিধির উপকারক। "ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদঃ" [আপঃ সূঃ ।৩৫]। অর্থবাদ গুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত, নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প। "নিন্দাপ্রশংসাপরকৃতিঃপুরাকল্পশ্চ" আশ্বলায়ন [আঃ সূঃ ১।৩৬] নিন্দা—যে অর্থবাদে কোন একটি নিষিদ্ধ কর্মের নিন্দা বুঝায় তার নাম নিন্দা। যেমন-যজ্ঞের দক্ষিণারূপে রজত দানের নিন্দা করা হয়েছে "যো বর্হিষি রজতং

দদাতি পুরাস্য সংবৎসরাদ্ গৃহে রুদন্তি।" যে কুশসাধ্যযাগে রজত দক্ষিণা দেয় একবৎসরের পূর্বেই তার গৃহে রোদন আরম্ভ হয়।

প্রশংসা যে অর্থবাদ কাহারও প্রশংসার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয় তার নাম প্রশংসা অর্থবাদ। যেমন—'যজমানো বৈ প্রস্তরঃ" [তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ৬।৭] দর্শ-পূর্ণমাসাদি যাগে বেদিতে আস্তীর্ণ প্রস্তর নামক কুশকে যজমানের সদৃশ বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

পরকৃতি—যে অর্থবাদ এমন এক উপাখ্যানকে অবলম্বন করে বর্ণিত হয় যে উপাখ্যানে বর্ণিত কর্তা একজন মাত্র তাকে পরকৃতি বলে [তন্ত্রবার্তিক ২।১।৩৩]। পুরাকল্প—যে উপাখ্যানের বর্ণিত ঘটনার কর্তা এক নয় কিন্তু অনেক,— এইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদকে পুরাকল্প বলে। [তন্ত্রবার্তিক ২।১।৩৩] আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের কপর্দিস্বামি প্রণীত ভাষ্যে [১। ৫-৩৬] পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক শেষোক্ত অর্থবাদের সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায়। কপর্দিস্বামী বলেছেন—কেহ কেহ মনে করেন যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কর্তা বহুসংখ্যক ব্যক্তি, সেইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদের নাম পুরাকল্প। এখানে লক্ষণীয় এই—তন্ত্রবার্তিকে "অনেক কর্তার" মানে একের অধিক অর্থাৎ দুইজন কর্তা হলেও পুরাকল্প হতে পারে। কিন্তু কপর্দিস্বামীর উক্তিতে বুঝা যায়, যে ঘটনার কর্তা দুই সেই ঘটনার প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যানকে পুরাকল্প বলা চলে না। কপর্দিস্বামীর মতে যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কর্তা নির্দিষ্ট নাই, সেইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদকে পুরাকল্প বলে। তিনি এই পুরাকল্পের উদাহরণ দিয়েছেন—"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ" সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ জলাকারে ছিল। এই চার-প্রকার অর্থবাদ ব্যতীত অন্যপ্রকার অর্থবাদও আছে। যজ্ঞাদিকর্মের বিধি ও অর্থবাদ ভেদে ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তার মধ্যে "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি অর্থবাদ একাধারে নিন্দা ও পুরাকল্প [মতান্তরে পরকৃতি]। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যবার্তিকে অর্থবাদের অনুরূপ তিন প্রকার ভেদ দেখা যায় (৬০)।

---

(৬০) বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥

[বৃহদারণ্যক ভাষ্য বার্তিক, সম্বন্ধ বার্তিক ৫৬৭]

(১) যে স্থলে অন্য প্রমাণের সঙ্গে অর্থবাদ বাক্যের আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্যবসানে তাহা স্তুতিরূপে পরিণত হয়, সেই স্থলে সেই অর্থবাদ 'গুণবাদ' নামে কথিত হয়,। যথা "যজমানো বৈ প্রস্তরঃ [তৈঃ ব্রাঃ ৬।৭]। এখানে যজ্ঞের কর্তা যজমানের সহিত (৬১) কুশমুষ্টির অভিন্নতা বুঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা কুশমুষ্টি যজমান থেকেই ভিন্ন প্রতীত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে অর্থবাদের আপাতত বিরোধ বুঝা গেল। কিন্তু উক্ত অর্থবাদের তাৎপর্য হচ্ছে কুশমুষ্টির প্রশংসা। যজমান যেরূপ যাগক্রিয়ার নির্বাহক হয়, এই কুশমুষ্টিও সেইরূপ যাগক্রিয়ার নির্বাহক। এইভাবে প্রস্তরে [কুশমুষ্টিতে] যজমানের সাদৃশ্য বলায় বিরোধ দূরীভূত হয় বলে উক্ত অর্থবাদটি গুণবাদ।

(২) যে অর্থবাদ অন্যপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত কোন বস্তুকে প্রকাশিত করে তাকে অনুবাদ বলে। যেমন "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ৬২) অগ্নি শীতের ঔষধ অর্থাৎ বিনাশক। অগ্নি যে শীতের নিবারক তা সকলে প্রত্যক্ষের দ্বারা জানে। অতএব সকলের জ্ঞাত এই বস্তুকে উক্ত অর্থবাদ প্রকাশিত করছে বলে এইজন্য উহা অনুবাদ নামক অর্থবাদ।

(৩) যে অর্থবাদের প্রতিপাদ্য পদার্থ, অন্যপ্রমাণের দ্বারা বিরোধ প্রাপ্ত হয় না বা অন্যপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতও নয়, সেই অর্থবাদ ভূতার্থবাদ নামে কথিত হয়। যথা :—"ইন্দ্রো হ যত্র বৃত্রায় বজ্রং প্রজহার, স প্রহৃতশ্চতুর্ধা২ভবৎ" [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।২।২।১] ইন্দ্র যে সময় বৃত্রকে বজ্রের দ্বারা প্রহার করে ছিলেন, তখন সেই বজ্র বৃত্রের শরীরে অভিহত হয়ে চারভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

---

(৬১) তত্র প্রকৃতাবিষ্টৌ চতস্রো দর্ভমুষ্টয়শ্ছিদ্যন্তে, প্রথমা দর্ভমুষ্টির্মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতা বেদ্যাং জুহুর্যস্যাং নিধীয়তে, বিধৃতিসংজ্ঞকয়োরুদগগ্রয়ো দর্ভয়োরুপরি যা চ প্রাগগ্রা স্থাপিতা ভবতি। সা প্রস্তর ইত্যুচ্যতে। [শ্রৌতপদার্থনির্বচন ইষ্টিপ্রকরণ ৮৭]। প্রকৃতি ইষ্টিতে [দর্শপূর্ণ মাস যাগে] চার মুষ্টি কুশ ছেদন করা হয়। তার মধ্যে মন্ত্রপূত প্রথম কুশমুষ্টি প্রস্তর নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞের বেদির যে স্থানে জুহু' নামক হোমপাত্র স্থাপন করা হয়, সেই স্থানকে প্রথমে মন্ত্রপূত প্রথম কুশমুষ্টির দ্বারা আচ্ছাদিত করে তার উপর জুহুকে রাখা হয় এবং বিধৃতি নামক উত্তরাগ্র কুশদ্বয়, যা যাগবেদির উপরে থাকে, তার উপরেও এই প্রস্তর নামক কুশমুষ্টি স্থাপন করা হয়। যাগসমাপ্তির কিছু পূর্বে এই প্রস্তরকে আহবনীয়াগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়।

(৬২) কঃস্বিদেকাকী চরতি কউস্বিজ্জায়তে পুনঃ। কঃস্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিংস্বিদাবপনং মহৎ॥
সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ॥
[তৈঃ সঃ ৭।৪।১৯]।

অন্যপ্রমাণের দ্বারা এই ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ঘটনা জানা যায় না বলে অন্য প্রমাণের সঙ্গে বিরোধও হয় না এবং অন্যপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতও নয়। এইজন্য এই অর্থবাদ ভূতার্থবাদ নামে কল্পিত। মহাভাষ্যকারের প্রদর্শিত—"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয়ঃ" ইত্যাদি অর্থবাদটিকে ভূতার্থবাদের মধ্যে ধরা যায়। "তেঽসুরাঃ" ইত্যদি বাক্যের সার অর্থ এই যে—কোন একসময় অসুরেরা যুদ্ধে দেবতাদের নিকট পরাজিত হয়ে দেবতাদের পরাজয়ের উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অসুরেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে—'হে অরয়ঃ' 'হে অরয়ঃ' [হে শত্রুগণ, হে শত্রুগণ] এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করতে গিয়ে 'অরয়ঃ' শব্দের 'র'স্থানে 'ল উচ্চারণ করে। যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে এরূপ অশুদ্ধ-শব্দের প্রয়োগের ফলে অসুরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাজিত হয়েছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দের প্রগোগ করবে না। অপশব্দ বা অশুদ্ধ শব্দ এখানে ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত হয়েছে। আমরা যাতে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অপশব্দ প্রয়োগকারী না হই এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। "হেহলয়ঃ" এই প্রয়োগের কোন অংশে অশুদ্ধি দোষ, আছে এই বিষয়ে, নানাজনের নানামত। এই হেতু এখানে একটু বিচার করা যাচ্ছে। কেহ কেহ বলেন "হে অলয়ঃ" এইখানে "হৈহে প্রয়োগে হৈহয়োঃ" (৬৩)। এই সূত্রানুসারে প্লুতস্বর হওয়া উচিত ছিল। প্লুতস্বর হলে এখানে প্রকৃতিভাব হতো (৬৪)। তাতে সন্ধি হতো না, কিন্তু এখানে আকার হতো "হে অলয়ঃ"। সুতরাং এখানে এই প্লুতজনিত প্রকৃতিভাব না করে সন্ধি করায় "হেঽলয়ঃ" "হেলয়ঃ" এইখানে অশুদ্ধিদোষ ঘটেছে।

---

(৬৩) "হেহে প্রয়োগে হৈহয়োঃ" [পাঃ সূঃ ৮।২।৮৫]। হৈহে প্রয়োগে দূরাদ্ধূতে যদ্ বাক্যং বর্ততে তত্র হৈহযোরেব প্লুতো ভবতি। [কাশিকা] দূর থেকে সম্বোধনের নিমিত্ত যে বাক্যের প্রযোগ করা হয়, সেই বাক্য যদি 'হৈ' বা 'হে' শব্দ থাকে, তাহলে সেই 'হৈ' এবং 'হে' শব্দের প্লুত হবে। [অন্তের অর্থাৎ বাক্যের টি ভাগের প্লুত হবে না]। যেমন—'হে৩ দেবদত্ত' এই বাক্য 'হে' শব্দের প্লুত হয়। 'দেবদত্ত 'হৈ৩'। এই বাক্যে হৈ শব্দের প্লুত হয়। এখানে প্লুত বুঝাবার উদ্দেশে হে ও হৈ শব্দের পর '৩' এই অঙ্কটি যোগ করা হয়েছে। প্লুতস্বরের তিন মাত্রা বলে '৩' অঙ্কটি প্লুত বুঝাবার উদ্দেশে স্বরের পর ব্যবহৃত হয়।

(৬৪) "প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" [৬।১।১।১২৫] অচ্ [স্বরবর্ণ] পরে থাকলে প্লুতস্বর ও প্রগৃহ্য নামক স্বরের প্রকৃতি ভাব হয়, সন্ধি হয় না।

অপরে বলেন "অগ্নীৎপ্রেষণে পরস্য চ" [পাঃ সূঃ ৮।২।৯২] এই সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলেছেন সমস্ত প্লুতই বিকল্পে প্লুত হয়। এইহেতু এস্থলে প্লুতস্বর না করায় প্লুত প্রযুক্ত প্রকৃতিভাব না হওয়ায় কোন দোষ হয় নাই(৬৫)। এঁরা বলেন বীপ্সা অর্থে পদের দ্বিত্ব হয় ৬৬)। এখানে "হেঽলয়ঃ হেঽলয়ঃ" পদসমুদায়াত্মক বাক্যের দ্বিত্ব করায় অশুদ্ধি দোষ ঘটেছে।

অন্য কেহ কেহ বলেন—এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে পদসমুদায়ের দুইবার উচ্চারণ করা হয়েছে (৬৭)। বীপ্সা অর্থে দ্বিত্ব করা হয় নাই অর্থাৎ কোন সূত্রানুসারে দ্বিত্ব করা হয় নাই। সুতরাং দ্বিত্ব করায় যে দোষ সে দোষ এখানে প্রসক্ত হয় না। কিন্তু 'অরয়ঃ' এই শব্দের অন্তর্গত 'র' স্থানে 'ল' উচ্চারণ করে 'অলয়ঃ' এইরূপ বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। ইহাই এই বাক্যের অশুদ্ধি। এই শেষোক্ত মতটি সমীচীন মনে হয়।

"ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"—এইস্থলে 'ম্লেচ্ছ' শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থের সঙ্গতি হয় না। 'ম্লেচ্ছ' শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ। একঅর্থ—দেশবিশেষ (৬৮)। অপর অর্থ মনুষ্যজাতিবিশেষ (৬৯)। এই দুই অর্থের যে অর্থই এখানে গ্রহণ করা

---

(৬৫) "সর্বঃপ্লুতঃ সাহসমনিচ্ছতা বিভাষা বক্তব্যঃ" [মহাভাষ্য] পম্পশাআহ্নিকের উদ্দ্যোতটীকা। এবং প্রকৃতিভাবপ্রকরণের প্রৌঢ়মনোরমায় "বক্তব্যঃ" স্থলে "কর্তব্যঃ" এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত ভাষ্যের অর্থ হচ্ছে—যাঁরা সাহস ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ শাস্ত্রত্যাগ করতে ইচ্ছ করেন না তাঁরাও সমস্ত প্লুতস্থলে বিকল্পে প্লুতের প্রয়োগ করতে পারেন। তাতে ব্যাকরণ শাস্ত্রের লঙ্ঘন জনিত দোষ হয় না।

(৬৬) "নিত্যবীপ্সয়োঃ" [পাঃ সূঃ ৮।১।৪]। আভীক্ষ্ণ্যে বীপ্সায়াং চ দ্যোত্যে পদস্য দ্বির্বচনং স্যাৎ। [সিদ্ধান্ত কৌমুদী দ্বিরুক্ত প্রক্রিয়া] পৌনঃপুন্য ও ব্যাপ্তি অর্থে পদের দ্বিত্ব হয়। "হেঽলয়ঃ" এইটি পদ নয়, কিন্তু 'হে' ও 'অলয়ঃ' পদের সমুদায়রূপ বাক্য। এইজন্য এখানে এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হতে পারে না।

(৬৭) বাক্যের এইরূপ ঐচ্ছিক দ্বিত্ব "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" [ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২] ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়।

(৬৮) "কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥ [মনুসংহিতা২।২৩]
"প্রত্যন্তো ম্লেচ্ছদেশঃস্যাৎ" [অমর কোষ ভূমিবর্গ]
চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
তং ম্লেচ্ছবিষয়ং প্রাহুঃ" [মহেশ্বর প্রণীত অমরকোষ (ভূমিবর্গ—৭) বিবেকটীকায় উদ্ধৃত]

(৬৯) "ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ"। [অমর কোষ শূদ্রবর্গ ২০

হোক না কেন, তাতে বাক্যের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। এইজন্য এখানে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করে যোগার্থ গ্রহণ করতে হবে। নিন্দার্থক ম্লেচ্ছ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় (৭০) করে 'ম্লেচ্ছ' শব্দ সাধন করতে হবে। অতএব 'ম্লেচ্ছ' শব্দের এখানে অর্থ হবে নিন্দনীয়; দেশবিশেষ বা মনুষ্যজাতিবিশেষ নয়। ব্যাকরণশাস্ত্রনিষ্পন্ন শব্দের উচ্চারণ না করে যজ্ঞাদিকর্মে তার বিপরীত শব্দের উচ্চারণ করলে উচ্চারণকারীর পাপ হয়। এইজন্য এইরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে উচ্চারণ কর্তা নিন্দনীয় হয় (৭১)। "তেঽসুরা হেঽলয়ো হেঽলয়ঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রচলিত কোন ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে "হেঽলবো হেঽলবঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায় এবং উপসংহারে "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেৎ" এইরূপ পাঠ আছে। এখানে "অরয়ঃ" এই শব্দের 'র' স্থানে 'ল' এবং 'য়' স্থানে 'ব' করা হয়েছে। ইহাই শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বাক্যে অশুদ্ধি ॥ (৭২) ॥ ১৩ ॥

মূল

"দুষ্টঃ শব্দঃ।" দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা,
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি,
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥ ইতি ॥

দুষ্টাঞ্ছব্দান্ মা প্রযুক্ষমহি ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। "দুষ্টঃ শব্দঃ" ॥১৪॥

---

(৭০) "অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্" [পাঃসূঃ ৩৩।১৯] এই সূত্র অনুসারে "ম্লেচ্ছ" স্থলে ঘঞ্ প্রত্যয় করা হয়েছে।

এখানে 'ম্লেচ্ছ' শব্দ যৌগিক হওয়ায় সূত্রের অন্তর্গত 'সংজ্ঞায়াম্' এই অংশের সহিত বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু এই সূত্রের মহাভাষ্যে "সংজ্ঞায়াম্" এই অংশটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় উক্ত আশঙ্কার অবকাশ হয় না।

(৭১) 'ম্লেচ্ছা নিন্দ্যাঃ শাস্ত্রবোধিতবিপরীতানুষ্ঠানাদিতি ভাবঃ।" [শব্দকৌস্তুভ] ম্লেচ্ছা ইতি কর্মণি ঘঞ্" [মহাভাষ্য প্রদীপ।]

"নমু ম্লেচ্ছো নাম পুরুষবিশেষো দেশবিশেষো বা স কথমপশব্দঃ অত আহ—'ঘঞিতি'। নিন্দাবচনাদ্ ম্লেচ্ছধাতোরিতি ভাবঃ। নিন্দা চ শাস্ত্রবোধিতবিপরীতোচ্চারণেন পাপসাধনত্বাৎ। এবং চ ম্লেচ্ছিতব্যঃ সা নিন্দ্যা ইত্যর্থ ইতি দিক্" [মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত]

(৭২) "ইদং ভাষ্যাদিষু প্রসিদ্ধং শ্রুতিপাঠমনুসৃত্য ব্যাখ্যাতম্। অয়ং চ পাঠঃ কচিচ্ছাখায়ামন্বেষণীয়ঃ। মাধ্যন্দিনানাং শতপথব্রাহ্মণে তু 'হেলবো হেলব' ইতি পঠিত্বা তস্মাদ ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেদিতি পঠ্যতে। তত্র যকারস্থানে বকারোঽপশব্দ ইতি স্পষ্টমেব। [শব্দকৌস্তুভ]

অনুবাদ :—"দুষ্ট শব্দঃ"। [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছে তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে] [উদাত্ত প্রভৃতি] স্বর ও [অকারাদি] বর্ণের [অন্যপ্রকার] উচ্চারণ নিমিত্ত [যে] শব্দ দুষ্ট [হয়] [সে শব্দ] মিথ্যাপ্রযুক্ত [হওয়ায়] [উচ্চারণকারীর তাৎপর্য বিষয়ীভূত যে অর্থ] সে অর্থকে প্রকাশিত করে না। সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানের [যজ্ঞকর্তার] হিংসা করে থাকে। [উদাহরণ যথা] যেমন "ইন্দ্রশত্রু" [এই শব্দটি] [উদাত্তাদি] স্বরের [অন্য-প্রকার উচ্চারণের] নিমিত্ত [যে অপরাধ অর্থাৎ দোষ, সেই] অপরাধে যজ্ঞকর্তাকে হিংসা করেছিল। [অনিষ্ট ফল উৎপাদন করেছিল]। আমরা [যেন] দুষ্ট শব্দের প্রয়োগ না করি—এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। 'দুষ্টঃ শব্দঃ' [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছিল, তাহা সমাপ্ত হলো]॥ ১৪ ॥

বিবৃতি—ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে, বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন। তাতে ত্বষ্টা দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত বৃত্র নামক নিজের পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞটি অভিচার কর্মরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরের হিংসার জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাকে অভিচার কর্ম বলে। সেই যজ্ঞে "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব" এই বাক্যের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়েছিল। এই ব্যাক্যের 'শত্রু' শব্দটি প্রসিদ্ধ বিদ্বেষকারী [অমিত্র] অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। শদ্‌ শাতনে অর্থাৎ মরণ অর্থে শদ্‌ ধাতুর উত্তর ণিচ্‌ করে, তার উত্তর ঔণাদিক ক্রুন্‌ প্রত্যয় করে এখানে 'শত্রু' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। শদধাতুর উত্তর ণিচ করায় 'শ' এর পর অকারের বৃদ্ধি হয়ে 'শাত্রু" এইরূপ শব্দটি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞাদিগণে [৫।৪।৩৮] 'শত্রু' এই প্রকার অকারযুক্ত 'শত্রু' শব্দের পাঠ করা হয়েছে বলে নিপাতনে (৭৩) 'শত্রু' শব্দটি সাধু হয়েছে (৭৪)।

---

(৭৩) "নিপাতন নামান্যাদৃশে প্রয়োগে প্রাপ্তেঽন্যাদৃশপ্রয়োগকরণম্‌" [পরিভাষেন্দুশেখর ১১৭ পরিভাষা]। ব্যাকরণের সূত্রানুসারে যেরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত, সেরূপ প্রয়োগ না করে অন্যপ্রকার প্রয়োগ করার নাম নিপাতন। এখানে ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে 'শত্রু' এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাণিনি প্রজ্ঞাদিগণে 'শাত্রু' এইরূপ পাঠ না করে, 'শত্রু' এইরূপ পাঠ করেছেন। পাণিনির 'শত্রু' এইরূপ প্রয়োগ করার ফলে 'শাত্রু' প্রয়োগটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে। শত্রু প্রয়োগই শুদ্ধ হয়েছে।

(৭৪) 'শম্‌' ধাতুর উত্তর ণিচ্‌ প্রত্যয় করলে "মিতাংহ্রস্বঃ" [৬।৪।৯২] সূত্রানুসারে অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণের দীর্ঘস্থলে হ্রস্ব হয়ে যায়। এই হ্রস্বের জন্য কোন কল্পনা করতে হয় না। ণিজন্তশম্‌ ধাতুর [শমি] উত্তর ক্রুন্‌ [ঔণাদিক] প্রত্যয় করে প্রজ্ঞাদিগণে 'শত্রু' এইরূপ তকারযুক্ত পাঠ থাকায় নিপাতনে 'ম' স্থানে 'ত' আদেশ করলেও 'শত্রু' পদ সিদ্ধ হতে পারে। তার অর্থ হবে শময়িতা। ইন্দ্রের শময়িতা। আর শদধাতু থেকে 'শত্রু' শব্দ সিদ্ধ করলে অর্থ হবে ইন্দ্রের শাতয়িতা অর্থাৎ ঘাতক।

'ইন্দ্রশত্রু' এই শব্দে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করলে তার অর্থ হয় ইন্দ্রের ঘাতক। তা হলে 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব' এই বাক্যের অর্থ হয় 'ইন্দ্রের ঘাতক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।' ত্বষ্টার এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত ছিল। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হলে "ইন্দ্রশত্রু" শব্দটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। কিন্তু ঋত্বিকের অনবধানতাবশত এই শব্দটির উচ্চারণে তিনি অন্ত্যোদাত্ত উচ্চারণ না করে "আদ্যুদাত্ত" করেছিলেন। ইন্দ্রশব্দ ঔণাদিক রন্ প্রত্যয়ের (৭৫) দ্বারা নিষ্পন্ন বলে তার আদিস্বর উদাত্ত হয়। বহুব্রীহি সমাস করলে সেই আদিস্বর উদাত্ত থেকে যায় এবং সমস্তপদের অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হয়। এখানে ঋত্বিক্ বহুব্রীহি সমাসে যে স্বর হয় সেই স্বরই উচ্চারণ করেছিলেন। এরূপ বিপরীত অর্থের জ্ঞানের ফলে ত্বষ্টার যজ্ঞের ফল বিপরীত হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন এমন একপুত্র হবে যে ইন্দ্রকে বধ করবে। কিন্তু তাঁর যজ্ঞে স্বরের উচ্চারণের বৈপরীত্য হওয়ায় ইন্দ্রই তাঁর পুত্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন। এইরূপ আমরা যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানে অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করলে আমাদের ঈপ্সিত ফল না হয়ে অনীপ্সিত ফল হবে। ব্যাকরণের জ্ঞান থাকলে অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ না করে শুদ্ধশব্দের উচ্চারণ করে আমরা ঈপ্সিত ফল পাব। অতএব আমাদের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। পাণিনীয়শিক্ষাতে (৭৬) ও এই শ্লোকটির পাঠ আছে। তবে সেখানে "দুষ্টঃ শব্দঃ" এই দুটি শব্দের স্থানে "মন্ত্রো হীনঃ" এইরূপ পাঠ আছে। পাণিনীয় শিক্ষা থেকে ভাষ্যকার এই শ্লোক সংগ্রহ করেন নাই। কারণ পাণিনীয় শিক্ষাটি কারও রচিত (৭৭) নয় কিন্তু সঙ্কলিত এবং তাহা মহাভাষ্যকারের পরবর্তী বলে মনে হয়। সুতরাং মহাভাষ্যকার এই শ্লোকটি কোন্ পূর্ববর্তী শিক্ষাগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাগ্রন্থে "মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো" ইত্যাদি পাঠ থাকলেও মহাভাষ্যকার তাকে পরিবর্তিত করে "দুষ্টঃ শব্দঃ" ইত্যাদিরূপে উপন্যস্ত করেছেন। তার কারণ হচ্ছে এই—ত্বষ্টার যজ্ঞে "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এই বাক্যকে

---

(৭৫) "ঋজেন্দ্রাগ্রবজ্র বিপ্রকুব্রচুব্রক্ষুরখুরভদ্রোগ্রভেরভেল শুক্রশুক্লগৌরবপ্রেরমালাঃ [ঔণাদি ২য় পাদ] রন্নন্তা উনবিংশতিঃ। ইদিইন্দ্রঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

'রন্' প্রত্যয়ের 'ন্' এর ইৎসংজ্ঞা হয় বলে এই প্রত্যয়টি 'নিৎ' হয়। ঞিদন্ত ও নিদন্ত শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়। "ঞিত্যাদির্নিত্যম্" [৬।১।১৯] "ঞিতি নিতি চ নিত্যমাদিরুদাত্তো ভবতি। [কাশিকা]। ইন্দ্রশব্দটি নিৎপ্রত্যয়ান্ত হওয়ায় তার আদিস্বর 'ই' কার উদাত্ত হয়।

(৭৬) পাণিনীয় শিক্ষা—৫২

(৭৭) "অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয় মতং যথা" [পাণিনীয় শিক্ষা] পাণিনীয় শিক্ষাতে যে সকল শ্লোক আছে তার অনেকগুলি শ্লোক 'নারদীয় শিক্ষা' প্রভৃতি শিক্ষাগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্য যিনি পাণিনীয় শিক্ষাকে বর্তমান রূপ দিয়েছেন তাঁকে এই পাণিনীয় শিক্ষার রচয়িতা না বলে সঙ্কলন কর্তা বলাই সমীচীন।

মন্ত্র বলে যে উচ্চারণ করা হয়েছিল, সেটি বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্র নয়। প্রামাণিক বেদজ্ঞগণ পূর্বপরম্পরাক্রমে যে সকল বেদভাগকে মন্ত্র, বলে ব্যবহার করে থাকেন, সেই গুলিই মন্ত্র। 'ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" বা "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" ইহা বেদে পঠিত থাকলেও ত্বষ্টার কল্পিত বাক্যের অনুকরণরূপেই পঠিত আছে। ইহাকে বৈদিক শিষ্টসম্প্রদায় মন্ত্র বলে গ্রহণ করেন নাই। অতএব এখানে "মন্ত্রো হীনঃ" এই রূপ পাঠের সঙ্গতি নাই দেখে ভাষ্যকার তার পরিবর্তে "দুষ্টঃ শব্দঃ" এই রূপ পাঠ গ্রহণ করেছেন। এটা মন্ত্র না হলেও 'উহ' স্থলে যেমন মন্ত্রত্ব না থেকেও [সূর্যায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি স্বাহা] ঐ বাক্য উচ্চারণ হতে যজ্ঞের ফল হয়, সেইরূপ "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এই বাক্যপ্রয়োগের ফলেও [শুদ্ধ উচ্চারণ যদি হোত] অভীষ্ট ফল হোত। যজ্ঞাদিকর্মে মন্ত্র অশুদ্ধ উচ্চারণ করলেও যেমন প্রত্যবায় হয়, সেইরূপ অপভ্রংশাদিশব্দের উচ্চারণে বা লৌকিক সংস্কৃত বাক্যের স্বরবর্ণাদি দুষ্ট উচ্চারণেও প্রত্যবায় হয়। ত্বষ্টার তাই ঋত্বিগ্‌দোষে হয়েছিল। এইজন্য ভাষ্যকার "দুষ্টঃ শব্দঃ" এইরূপ পাঠ করেছেন। পাণিনীয় শিক্ষাদিতে ' মন্ত্রঃ" শব্দের উল্লেখ থাকলেও সেই 'মন্ত্রঃ' শব্দের অর্থ 'বাক্য' এইরূপ বুঝতে হবে। ইহাই সেখানকার তাৎপর্য। কেহ কেহ মনে করেন "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" ইহা যে মন্ত্র নয় তদ্‌বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞকর্মে মন্ত্রের একশ্রুতি স্বরের বিধান আছে (৭৮)। "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" স্থলে একশ্রুতি স্বরের উচ্চারণ করা উচিত ছিল। তা না করে, ঋত্বিক্‌ যে ইন্দ্রশত্রুশব্দটির আদিস্বর উদাত্তরূপে উচ্চারণ করেছিল তাতেই "স্বরাপরাধ"-অর্থাৎ স্বরদোষ (৭৯) হয়েছিল। সেই দুষ্ট শব্দ উচ্চারণের ফলে ত্বষ্টার যজ্ঞের ফল বিপরীত হয়েছিল।

---

(৭৮) উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এইগুলির মধ্যে প্রত্যেক স্বরকে পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারণ করতে হয়। যেখানে পৃথক্‌ পৃথগ্‌ভাবে উদাত্তাদির উচ্চারণ না করে সামান্যভাবে অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, সেইখানে "একশ্রুতি" স্বর উচ্চারিত হয় ইহাই বুঝতে হবে। সা চ 'স্বরাবিভাগঃ" [ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত সুধানিধি]। এই একশ্রুতির অপর নাম "প্রচয়"। কাত্যায়ন প্রণীত 'শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্যে' একশ্রুতিস্বরকে 'তান' স্বর বলে নির্দেশ করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এই একশ্রুতিকে "স্বর-সর্বনাম শব্দে অভিহিত করেছেন। "একশ্রুতিঃ স্বরসর্বনাম" [মহাভাষ্য ৬।৪।১৭৪]। যেখানে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের মধ্যে কোন একটি স্বরকে পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারণ না করে, তাদের বৈলক্ষণ্য বিবক্ষা না করে সামান্যভাবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ করা হয় তাহাই "একশ্রুতি।" মহাভাষ্য ও কৈয়টে [৬।৪।১৭৪ সূত্রের] বিশেষ বিবরণ আছে।

(৭৯) "যজ্ঞকর্মণ্যজপন্যূঙ্খ সামসু" [১।২।৪]। যজ্ঞকর্মণি মন্ত্র একশ্রুতিঃস্যাজ্জপাদীন্ বর্জয়িত্বা" [সিদ্ধান্তকৌমুদী সাধারণস্বর প্রকরণ] "যদি বা একশ্রুত্যভাবাদেবাত্র প্রত্যবায়ঃ।" [পদমঞ্জরী ১।১] "কেচিত্তু একশ্রুতিপ্রসঙ্গেঽপ্যুদাত্তোচ্চারণাদেবেন্দ্রশত্রুপদে দুষ্টত্বমিত্যাহুঃ" [ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১]

এই উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত এবং একশ্রুতি স্বরের প্রয়োগ বেদে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের ব্যবহার নাই একথা বলা যায় না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বৈদিক প্রয়োগের জন্য যে সকল সূত্রের রচনা করা হয়েছে তাতে বিশেষভাবে বেদের কথা উল্লিখিত আছে (৮০)। যে সকল বৈদিকপ্রয়োগ কেবল বেদের মন্ত্রভাগে কিংবা কেবল ব্রাহ্মণ ভাগেই হয়ে থাকে, সেই সকল প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য যে সকল সূত্র রচিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে "মন্ত্র" অথবা "ব্রাহ্মণ" শব্দের উল্লেখ আছে (৮১)। স্বরের মধ্যে যে সকল স্বর কেবল বেদেই হয়ে থাকে তাদের জন্যও বিশেষসূত্র প্রণয়ন করা হয়েছে (৮২)। লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় যদি স্বরের ব্যবহার না থাকতো তা হলে পাণিনির ঐসকল সূত্রে "মন্ত্র" "ব্রাহ্মণ" শব্দের উল্লেখ করা এবং বিশেষ সূত্রপ্রণয়ন করার আবশ্যকতা থাকতো না। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট ভট্ট, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের মতে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতিস্বর বেদেই বিশেষ অর্থের প্রত্যায়ক হয়, লৌকিক সংস্কৃতে ঐসকল স্বরের দ্বারা কোন অর্থের বৈলক্ষণ্য হয় না (৮৩)। বৈয়াকরণগণ আলঙ্কারিকগণের এইমত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে লৌকিক সংস্কৃতেও উদাত্তাদিস্বরের অর্থবিশেষ প্রতীতিজনকত্ব আছে। পূর্বেই এই বিষয় দেখান হয়েছে।

---

(৮০) "ছন্দসি পুনর্বস্বোরেকবচনম্." [১।২।৬১]। "ছন্দসি সহঃ" [৩।২।৬৭] "নেতরাচ্ছন্দসি" [৭।১।২৬] ইত্যাদি।

(৮১) "মন্ত্রে ঘসহ্বরণশবৃদহাদ্বৃচ্কৃগমিজনিভ্যো লেঃ" [২।৪।৮০]। "মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদ-ভূবীরা উদাত্তঃ" [৩।৩।৯৬]। "মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ" [৬।৪।১৪১] ইত্যাদি। "দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে". [২।৩।৬০]।

(৮২) "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি" [৬।২।১১৯]। "বিভাষাচ্ছন্দসি" [৬।২।১৬৪] "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্." [৬।২।১৯৯]

'স্বরবিধৌচ্ছন্দোঽধিকারাভাবাৎ।' [শব্দকৌস্তুভ ১।১] "ন চ স্বরস্য বেদমাত্রবিষয়কত্বাত্তত্র [লৌকিকে] তৎপ্রযুক্তগুণভাবয়োর্ন প্রসক্তিরিতি বাচ্যম্। তদ্বিধৌ ছন্দসীত্যনধিকারাৎ।" [ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি] "এতেন ভাষায়াং স্বরা নাস্ত্যেবেতি ভ্রান্তাস্তঃ পরাস্তাঃ, স্বরবিধৌ ছন্দোঽধিকারাভাবাচ্চ"। ['বিভাষাচ্ছন্দসি' সূত্রের লঘুশব্দেন্দুশেখর, সাধারণস্বর প্রকরণ]

(৮৩) 'ইন্দ্রশত্রুরিত্যাদৌ বেদ এব ন কাব্যে স্বরো বিশেষপ্রতীতিকৃৎ" [কাব্যপ্রকাশ ২।১৯] "কাব্যমার্গে স্বরো ন গণ্যতে ইতি চ নয়ে" [কাব্যপ্রকাশ ৯।৮৪]

"স্বরস্তুবেদ এব বিশেষকৃৎ, ন কাব্যে।" [সাহিত্যদর্পণ ২।২৬]

আর একটা কথা এই—অনেকে বলেন বঙ্গদেশের লোকেরা বেদপাঠ সর্বপ্রকারে অশুদ্ধ ভাবেই করে থাকে। তাঁদের এই কথা সমীচীন মনে হয় না। কারণ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের বিশেষভাবে উচ্চারণ ব্যতীতও বেদের একশ্রুতি স্বরের একপ্রকার পাঠ আছে। উদাত্ত প্রভৃতি বিশেষ স্বর উচ্চারণ না করে অকার প্রভৃতি বর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদির যথাযথ উচ্চারণ করলে একশ্রুতিস্বর উচ্চারিত হয়। তাতে কোন দোষ হয় না। ইহা পাণিনিসূত্র ও তার ব্যাখ্যাদি থেকে জানা (৮৪)। যায়। তবে, উদাত্তাদিস্বরের উচ্চারণে অধিকফল হয়, একশ্রুতি স্বরযোগে উচ্চারণে সেই অধিক ফল হয় না (৮৫)। মহর্ষি পাণিনি কতকগুলিস্থল ব্যতীত যজ্ঞকালে পঠিত মন্ত্রের 'একশ্রুতিস্বরের বিধান করেছেন (৮৬)। ওঁকারযুক্তরূপে মন্ত্রের পাঠ করলে মন্ত্রের উচ্চারণে যে সকল ত্রুটি, দোষ হয় তার পরিহার হয় (৮৭)। বঙ্গদেশে সবমন্ত্রই ওঁকারযুক্ত করে পাঠ করা হয় ॥ ১৪ ॥

মূল

"যদধীতম্।"

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।"

তস্মাদনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। "যদধীতম্।"

॥১৫॥

অনুবাদ :—"যদধীতম্" [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছে তা প্রদর্শন করা হচ্ছে]। যাহা অধীত অর্থাৎ পঠিত হয়, অথচ [উদাত্তাদি

(৮৪) কাশিকা [১।২।৩৬]

(৮৫) লঘুশব্দেন্দুশেখর—সাধারণস্বরপ্রকরণ—"বিভাষাচ্ছন্দসি" সূত্র।

(৮৬) "যজ্ঞকর্মণ্যজপন্যূঙ্খসামসু" (১।২।৩৪)

(৮৭) "যন্ন্যূনং চাতিরিক্তং চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধং চ যাতযামং চ যদ্ভবেৎ॥
তদোংকারপ্রযুক্তেন সর্বং চাবিকলং ভবেৎ॥
(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

স্বরের সম্বন্ধে ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় সংস্কারের জ্ঞান না থাকায় বা অর্থজ্ঞান না থাকায়] বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত না হয়ে, কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয়, অগ্নি ভিন্ন [ভস্মাদিতে] পদার্থে শুষ্ক ইন্ধন যেমন প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ সেই অধ্যয়ন কোন কার্যকরী হয় না অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। আমরা নিষ্ফল অধ্যয়ন না করি, এই জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি :—শব্দের উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের জ্ঞান ব্যাকরণদ্বারা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতির জ্ঞান ব্যাকরণের দ্বারাই হয়। শব্দের অর্থজ্ঞানও ব্যাকরণের অধীন। বেদ অধ্যয়ন করে বেদের অক্ষরগুলির গ্রহণ অর্থাৎ কণ্ঠস্থ করা হয়। বেদ কণ্ঠস্থ করে যদি তার অর্থজ্ঞান না করা হয়, তাহলে শুকপাখী প্রভৃতি যেমন বুলি শিক্ষা করে আবৃত্তি করে সেইরূপ অর্থজ্ঞানশূন্য বেদাধ্যায়ী বা অন্যশাস্ত্রাধ্যায়ী যখন সেই সব শাস্ত্র উচ্চারণ করে, তখন তার সেই উচ্চারিত শাস্ত্র বাক্য কোন কাজে লাগে না; ভস্মে ঘৃতাহুতির মত তা নিষ্ফল হয়। মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান পূর্বক যজ্ঞাদিতে প্রয়োগ করা হয়। অর্থজ্ঞান না থাকলে অনুষ্ঠান করা যায় না। বেদের অর্থজ্ঞানের অভাবে আত্মজ্ঞানও সমুদিত হয় না। ফলত অর্থজ্ঞানের অভাবে কর্মকাণ্ডাত্মক বেদ থেকেও অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না এবং উপনিষদ্ থেকেও জ্ঞান হয় না। সুতরাং বেদ থেকে ফল পেতে হলে অর্থজ্ঞান আবশ্যক। এই অর্থজ্ঞান ব্যাকরণ থেকেই হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাকরণাধ্যয়ন না করলে বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল হয়ে যায় বলে, যাতে সেই অধ্যয়ন নিষ্ফল না হয় তজ্জন্য ব্যাকরণাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। ১।২৩ নিরুক্তেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকটি নিরুক্তকার বা মহাভাষ্য-কার কোন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা জানা যায় না। নিরুক্তে উদ্ধৃত এই শ্লোকের একটু পাঠান্তর আছে। মহাভাষ্যে যেখানে 'যদধীতম্' এইরূপ পাঠ দেখা যায় সেখানে নিরুক্তে "যদ্গৃহীতম্" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। নিরুক্ত অনুসারে এই শ্লোকটির পূর্বার্ধ এইরূপ হয়—"যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।" এর অর্থ, যাহা শব্দমাত্রে গৃহীত হয়েছে যার অর্থাংশ অপরিজ্ঞাত, যাহা কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয় (৮৮ নিগদেন = পাঠের দ্বারা)।

---

(৮৮) "গৃহীতং শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতং তু অর্থতঃ"—শব্দকৌস্তুভ ১।১।

"তত্র গৃহীতং শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতমর্থত ইতি বোধ্যম্।। [মহাভাষ্যপ্রদীপ উদ্দ্যোত ১।১]

"গৃহীতং শব্দতঃ। অবিজ্ঞাতমর্থতঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগেন চেত্যর্থঃ। [ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১]

নিরুক্তে এই শ্লোকের পূর্বে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা করা হয়েছে (৮৯)। মহাভাষ্যকার জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দার জন্য নিরুক্তোদ্ধৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। তবে মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত পরবর্তী "যদ্‌গৃহীতম্" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছে। "স্থাণুরয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হয়েছে, পরবর্তী "যদ্‌গৃহীতম্" শ্লোকে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এইজন্য মহাভাষ্যকার পরবর্তী শ্লোকের প্রদর্শনই লাঘবের অনুরোধে সমীচীন মনে করেছেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নিরুক্তকার যাস্ক এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি—এই উভয়ের মতে অর্থজ্ঞানশূন্য বেদের অধ্যয়ন নিষ্ফল। পূর্বমীমাংসাদর্শনের মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণে [মীমাংসাদর্শন ১।২।৩১-৫৭ সূত্র] যজ্ঞকর্মে অর্থস্মরণ করে মন্ত্রের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। তাতে বুঝা যায়, যার অর্থজ্ঞান নাই তার উচ্চারিত মন্ত্রের কোন ফল হয় না। সেই ব্যক্তির উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াও নিষ্ফল হয়।

কিন্তু যাগযজ্ঞাদি কর্মে এবং বর্তমানের স্মার্ত কর্মেও দেখা যায় অনেক যাজনিক কর্মকারী ব্যক্তি মন্ত্রাদির অর্থ না জেনেও কর্ম করেন বা করান। তাথেকেও ফল হতেও দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে ব্রহ্মতেজের কামনা

---

(৮৯) "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্‌, অধীত্য বেদং ন জানাতি যোঽর্থম্। যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে. নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥" যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে তার অর্থে অনভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি শুষ্কবৃক্ষের মত [এখানে শুষ্ক কাষ্ঠের স্তম্ভের মত] কেবলমাত্র ভারেরই বাহক" যিনি অর্থে অভিজ্ঞ, তিনি ইহলোকে সমস্ত কল্যাণের ভাগী হন এবং জ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করে পরলোকে স্বর্গের অধিকারী হন॥

সুশ্রুতসংহিতায় এইরূপ একটি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।

এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য, চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহন্তি॥"

যেমন গর্দভ চন্দনকাষ্ঠ বহন করে, ভারের জ্ঞান তার থাকে কিন্তু চন্দনের জ্ঞান তার থাকে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি অনেকশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও তার অর্থে অনভিজ্ঞ, সে ব্যক্তি গর্দভের মত কেবল বহন করে অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন ব্যর্থ হয়, সেই অধ্যয়নের দ্বারা সেইব্যক্তির কোন লাভ হয় না।

করে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের উপনয়ন দেওয়ার বিধান আছে (২০)। পঞ্চমবর্ষের বালকের উপনয়ন হলে তার পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পঞ্চমবর্ষের বালকের গায়ত্রী বা সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রের অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়। অথচ পঞ্চমবর্ষের বালকের যখন উপনয়নের বিধান আছে, তখন বুঝা যাচ্ছে সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না থাকলেও সেই বালকের কেবল মন্ত্রোচ্চারণ থেকেও ফললাভ হবে। এ থেকে বুঝা যায় অবস্থাবিশেষে অর্থজ্ঞান না থাকলেও মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণ-ভাবে নিষ্ফল হয় না। তবে অর্থজ্ঞান থাকলে অধিক ফললাভ হয়, অর্থজ্ঞানা-ভাবে সামান্য ফল হয়। মহাভাষ্যে বা নিরুক্তে যে অর্থজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মন্ত্রোচ্চারণ নিষ্ফল বলা হয়েছে সে নিষ্ফলের অর্থ ফলবিশেষের অভাব। ইহাই বুঝতে হবে। পূর্বমীমাংসার মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণে অর্থের স্মারকরূপে মন্ত্রের উপ-যোগিতা স্বীকৃত হলেও স্থলবিশেষে অর্থের প্রকাশ না হলেও মন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকৃত হয় নাই। অদৃষ্টের জনকরূপেও স্থলবিশেষে মন্ত্রের উপযোগিতা আছে (২১) ইহা স্বীকৃত হয়েছে। অতএব অর্থজ্ঞান না থাকলেও মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না, কিন্তু অর্থজ্ঞান সত্ত্বে মন্ত্রের উচ্চারণ থেকে যেরূপ বিশিষ্ট ফললাভ হয়, অর্থজ্ঞানাভাবে সেরূপ বিশিষ্ট ফললাভ হয় না ॥ ১৫ ॥

মূল

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে।"

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥

কঃ? বাগ্‌যোগবিদেব। কুত এতৎ? যো হি শব্দাঞ্ জানাত্য-পশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽ-প্যধর্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পী-য়াংসঃ শব্দা ইতি। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্-

(২০) ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্যংবিপ্রস্য পঞ্চমে। [মনুসংহিতা ২।৩৭]
(২১) ভাট্টদীপিকা [১ম অধ্যায় ২য় পাদ ৪র্থ অধিকরণ]

যথা—গৌরিত্যস্য শব্দস্য গাবী গোণী গোতা-গোপোতলিকেত্যেব-মাদয়ো বহবোঽপভ্রংশাঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদ্‌, অজ্ঞানং তস্য শরণম্‌।।১৬।।

অনুবাদ—"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রমাণ বাক্য সূচিত হয়েছে তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]। যে নিপুণ [ব্যক্তি] শব্দ প্রয়োগের সময়, [অর্থ] বিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেন, সেই বাগ্‌যোগবিদ্‌ [শব্দতত্ত্বজ্ঞ] পরলোকে অনন্ত জয় [অর্থাৎ অভ্যুদয়] প্রাপ্ত হন এবং অপশব্দ অর্থাৎ অশুদ্ধ-শব্দের দ্বারা দূষিত হন কে [অপশব্দের—অর্থাৎ অশুদ্ধশব্দের দ্বারা দূষিত হন]? [যিনি] বাগ্‌যোগবিৎ [শব্দতত্ত্বজ্ঞ] [তিনি] ই। কেন ইহা [হয়]? যিনি শব্দ [শুদ্ধ শব্দ] জানেন, তিনি অপশব্দও [অশুদ্ধ শব্দও] জানেন। যেমন [শুদ্ধ] শব্দের জ্ঞানে ধর্ম [হয়], এইরূপ অপশব্দের [অশুদ্ধশব্দের] জ্ঞানেও অধর্ম [হয়]। অথবা [অপশব্দের জ্ঞানে] অধিক অধর্মের প্রাপ্তি হয়। যেহেতু অপশব্দ অধিক, [সাধু] শব্দ [অপশব্দের অপেক্ষা] অল্প। যেহেতু এক একটি [সাধু বা শুদ্ধ] শব্দের বহু অপভ্রংশ। যেমন 'গৌঃ' এই [সাধু] শব্দের 'গাবী' 'গোণী' 'গোতা' 'গোপোতলিকা' ইত্যাদিরূপ বহু অপভ্রংশ [আছে]। আর যিনি অবাগ্‌যোগবিদ্‌ [শব্দতত্ত্বজ্ঞানশূন্য] অজ্ঞান তাঁর শরণ।। ১৬।।

বিবৃতি—ব্যাকরণে যে শব্দ যে অর্থে প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতির দ্বারা ব্যুৎপাদিত হয় সেইশব্দ সেই অর্থে সাধু বা শুদ্ধ শব্দ। সেই অর্থের পরিত্যাগ করলে এবং অন্য অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ করলে ব্যাকরণ ব্যুৎপাদিত হলেও, ব্যাকরণের অনভিপ্রেত সেইরূপ অর্থে সেই শব্দ অপশব্দ অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ। বর্তমানে প্রথম পুরুষের একবচনে 'ভবতি' পদ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত হয়েছে। 'ভবতী' এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তির একবচনেও 'ভবতি' এই, রূপ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত। ব্যাকরণ সম্মত এই অর্থকে পরিত্যাগ করে কেহ যদি অন্য অর্থে ভবতি' এই শব্দটির প্রয়োগ করে, তাহলে সেইশব্দ অপশব্দ হবে। যেমন কেহ যদি "ত্বং ভবসি" এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্তে "ত্বং ভবতি" এইরূপ প্রয়োগ করে তাহলে অশুদ্ধ হবেই। 'স্ব' শব্দের একটি অর্থ ধন। যার ধন নাই [অবিদ্যমানংস্বংযস্য] এই অর্থে "অস্ব" শব্দ সাধু [শুদ্ধ]। কিন্তু অশ্ব [ঘোড়া] অর্থে 'অস্ব' শব্দ অশুদ্ধ। অশ্বকে 'নির্ধন' এই অর্থে বুঝাবার অভি-

প্রায়ে 'অশ্ব' শব্দের প্রয়োগ করলে তা শুদ্ধ হবেই। পশুজাতিবিশেষ বুঝাবার অভিপ্রায়ে অশ্বে 'অশ্ব' শব্দের প্রয়োগ করলে সেই 'অশ্ব' শব্দটি অশুদ্ধ হবে। কোন বিশেষ দেশে গরুকে বুঝাবার জন্য "গোণী" এই অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার করা হোত। 'গো' অর্থে এই "গোণী" শব্দ অশুদ্ধ। কিন্তু পাত্রবিশেষ বুঝবার অভিপ্রায়ে যদি 'গোণী' শব্দের ব্যবহার করা হয়, তা হলে সেখানে "গোণী" শব্দটিকে সংস্কৃত সাধু [শুদ্ধ] শব্দ বলে বুঝতে হবে। এইভাবে সর্বত্র অর্থবিশেষ অবলম্বন করে শব্দের সাধুত্ব [শুদ্ধতা] এবং অসাধুত্ব [অশুদ্ধতা] ব্যবস্থাপিত হয়েছে (৯০)।

যিনি বিশেষ নিপুণ, তিনিই অর্থবিশেষ বুঝাতে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেন, অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়। শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে এই যে নিপুণতা তা ব্যাকবণের অধ্যয়নের দ্বারাই অর্জন করতে হয়, অন্য প্রকারে তা সম্ভব নয়। এই শ্লোকে যে "বাগ্‌যোগবিদ্" শব্দটি আছে, তার অর্থ—"বাক্ = শব্দ ; তার যোগ = অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধ; বিদ্ = তার [শব্দার্থ সম্বন্ধের] জ্ঞাতা ; অর্থবিশেষের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ, তাহা যিনি জানেন তিনি 'বাগ-যোগবিৎ'। এইরূপ অর্থগ্রহণ করলে 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দ থেকে "বৈয়াকরণ" এই অর্থ পাওয়া যায়।

"বাগ্‌যোগবিদ্" শব্দের অন্তর্গত 'যোগ' শব্দের অর্থ যদি "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার অর্থ অন্যরূপ হবে। বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্তে শব্দের দুই প্রকার স্বরূপ আছে। কার্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে শব্দের কার্য স্বরূপটি ব্যাবহারিক। যে সকল শব্দের দ্বারা আমর লৌকিক ব্যবহার ক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করি, সেই সকল শব্দ ব্যাবহারিক। ইহা শব্দের কল্পিত স্বরূপ। শব্দের যাহা নিত্যস্বরূপ তাহা পারমার্থিক। ব্যাবহারিকশব্দে বর্ণের পৌর্বাপর্যরূপ ক্রম আছে, এইক্রম বাস্তবিক পক্ষে শব্দে নাই, কিন্তু বাস্তব শব্দের

---

(৯০) "অশ্বগোণ্যাদয়ঃ শব্দাঃ সাধবো বিষয়ান্তরে।
নিমিত্তভেদাৎ সর্বত্র সাধুত্বং সমবস্থিতম্‌॥"। [বাক্যপদীয় ১।১০০]
"আবপনে গোণীতি স্ববিয়োগাভিধানে চ অশ্ব ইতি সাধ্বেব" [পুণ্যরাজটীকা]
"স এব শব্দঃ ক্বচিদর্থে কেনচিন্নিমিত্তেন প্রযুক্তঃ সাধুরন্যথাঽসাধুঃ যথাঽশ্বেঽশ্বশব্দো ধনাভাব-নিমিত্তকঃ সাধুর্জাতিনিমিত্তকোঽসাধুঃ। এবং চ গোণীশব্দঃ সাধর্ম্যাৎপ্রযুক্তঃ সাধুর্জাতিনিমিত্ত-কোঽসাধুঃ"। [মহাভাষ্যপ্রদীপ ১।১]

অভিব্যঞ্জক ধ্বনির যে ক্রম সেই ক্রম শব্দে আরোপিত হয়ে কার্যশব্দরূপে প্রতীত হয়। নিত্য স্ফোটরূপ শব্দ এই আরোপিতক্রমের দ্বারা যুক্ত হয়ে ব্যাবহারিক অবস্থায় উপস্থি হয়। শব্দের যে নিত্যস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য স্ফোটাত্মক যে শব্দ তাহাই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্তকারণ। যিনি বাগ্-যোগবিদ্, যিনি এই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ শব্দব্রহ্মে চিত্তের বৃত্তির নিরোধের সম্পাদনে অভিজ্ঞ তিনি অজ্ঞানবন্ধন অতিক্রম করে এইশব্দ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হন [বাক্যপদীয় পুণ্যরাজটীকা ১।১৩২]। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করবার জন্য পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়ের [১।১৩৩] টীকায় কোন অজ্ঞাত গ্রন্থ থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :—

প্রাণবৃত্তিমতিক্রান্তে বাচস্তত্ত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ক্রমসংহারযোগেন সংহৃত্যাত্মানমাত্মনি ॥
বাচঃ সংস্কারমাধায় বাচং জ্ঞানে নিবেশ্য চ।
বিভজ্য বন্ধনান্যস্যাঃ কৃত্বা তাং ছিন্নবন্ধনাম্ ॥
জ্যোতিরান্তরমাসাদ্য ছিন্নগ্রন্থিপরিগ্রহম্।
পরেণ জ্যোতিষৈকত্বং ছিত্ত্বা গ্রন্থীন্ প্রপদ্যতে ॥

বাক্ অর্থাৎ শব্দের যে যথার্থস্বরূপ, তাহা প্রাণবায়ুর ব্যাপারের অতীত। সুতরাং প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ করতে না পারলে, শব্দব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধান করা যায় না। যিনি বাক্তত্ত্বের উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক, তাঁকে প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা 'কুম্ভক' করে প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার রোধ করতে হবে। এই অবস্থায় তিনি বাক্তত্ত্বে অবস্থিত হতে পারবেন অর্থাৎ তাঁর শব্দব্রহ্ম বিষয়ক সবিকল্প সমাধিলাভ হবে। তারপরে যে যোগে [সমাধিতে] ক্রমের অবভাস হয় না, সেই অক্রম অর্থাৎ নির্বিকল্পক সমাধির সহায়ে আত্মাকে আত্মাতেই সংহৃত করতে হবে অর্থাৎ নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইরূপ সমাধি লাভ হলে বাক্স্বরূপ শব্দব্রহ্মে যে সকল অজ্ঞান কল্পিত মল সংসৃষ্ট হয়ে আছে, তা থেকে সেই বাক্তত্ত্বের শুদ্ধি সাধিত হয়। নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চিত্তের পূর্ণ স্থৈর্য সাধিত হওয়ায়, যথার্থ বস্তুর গ্রহণে চিত্তের যে সামর্থ্য অভিব্যক্ত হয়, তার প্রভাবে শব্দব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। এই অবস্থায় বাক্তত্ত্বের সহিত স্বরূপ চৈতন্যের যে স্বাভাবিক অভেদ বিদ্যমান, তা সেই যোগীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত

হয়ে যায়। চৈতন্যময় যে 'বাক্‌তত্ত্ব' তার থেকে অজ্ঞানকল্পিত মলের বিয়োগ হলে, সেই বাক্‌তত্ত্ব অজ্ঞান সম্বন্ধশূন্য হয়ে যায়। সর্বপ্রকার অজ্ঞানকল্পিত বন্ধন থেকে বিমুক্ত যে বাক্‌তত্ত্ব তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম। যিনি 'বাগ্‌যোগ্‌বিদ্' তিনি এই পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান শব্দব্রহ্মের সহিত ঐক্যলাভ করেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। বৈয়াকরণগণ এই 'বাক্-তত্ত্ব' ও উপনিষৎপ্রতিপাদ্য স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। অতএব বৈয়াকরণ সম্প্রদায়মতে যিনি বাক্‌তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন তিনিই ব্রহ্মতত্ত্বের সক্ষাৎকার লাভ করেছেন।

এইভাবে দেখা গেল 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দের যে অর্থটি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের সহিত সম্বদ্ধ সেই অর্থটিই এখানে গ্রহণ করলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যিনি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি ব্যবহারকালে অর্থবিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে সমর্থ। সুতরাং এখানে পতঞ্জলি 'বাগ্‌যোগবিদ্' শব্দের দ্বারা তাঁকেই লক্ষ্য করেছেন, অতএব দেখা যাচ্ছে এখানে বাগযোগবিদ্ শব্দটির বৈয়াকরণ অর্থে প্রয়োগ হয়েছে (৯৩)।

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে" ইত্যাদি শ্লোকের শেষভাগে "তুষ্যতি চাপ-শব্দৈঃ" এই বাক্যটি আছে। "তুষ্যতি" অর্থাৎ 'তুষ্ট হয়' এই ক্রিয়াপদের কোন কর্তার নির্দেশ নাই। যদিও "বাগ্‌যোগবিৎ" এই পদটি "তুষ্যতি" এই ক্রিয়া-পদের নিকটে উচ্চারিত হয়েছে তথাপি সেই "বাগ্‌যোগবিৎ" পদের সম্বন্ধ "তুষ্যতি" এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে আছে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য মহাভাষ্যকার "তুষ্যতি" ক্রিয়ার কর্তা কে—এই বিষয়ে বিচারের অবতারণা করেছেন।

---

(৯৩) নাগেশভট্ট এখানে বৈয়াকরণ অর্থেই "বাগ্‌যোগবিৎ" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—"বাচো যোগঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগেন অর্থবিশেষপরত্বম্, তদ্বেত্তীতি বাগযোগবিৎ"। (মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত) বাক্ অর্থাৎ শব্দের, যোগ—প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগের দ্বারা অর্থবিশেষের প্রতিপাদনসামর্থ্য—ইহা যিনি জানেন তিনি বাগযোগবিৎ। শব্দবিশেষের সহিত অর্থবিশেষের সম্বন্ধ আছে বলেই, কোন বিশেষ শব্দের দ্বারা কোন বিশেষ অর্থের প্রতীতি হয়। শব্দের এবং অর্থের এই যে পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগদ্বারা জানতে পারা যায়। অতএব যিনি বাগ্‌যোগবিদ্ অর্থাৎ বৈয়াকরণ, তিনি প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগের দ্বারাই শব্দের অর্থবিশেষ প্রতিপাদনের যে যোগ্যতা তাহা জানতে পারেন। বাক্=শব্দ, যোগ=সম্বন্ধ, বিৎ=জ্ঞাতা। এই সমস্ত পদটির আক্ষরিক অর্থ—শব্দের যে (অর্থের সহিত) সম্বন্ধ, তার যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের যে পরস্পর সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ যিনি জানেন।

এখানে ভাষ্যকার পূর্বপক্ষরূপে বলেছেন—যিনি বৈয়াকরণ তিনি অশুদ্ধ শব্দ থেকে পৃথগ্‌ভাবে শুদ্ধ শব্দকে জানেন বলে অশুদ্ধ শব্দেরও তাঁর জ্ঞান আছে। তিনি যেমন শুদ্ধ শব্দ জানেন, তেমনি অশুদ্ধ শব্দও জানেন। শুদ্ধশব্দের জ্ঞান থেকে বৈয়াকরণের যেরূপ ধর্মলাভ হয় সেই ধর্মের ফলে ঐহিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় [কল্যাণ] লাভ হয়, সেইরূপ অশুদ্ধশব্দের জ্ঞানের ফলে তাঁর অধর্মের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্লেষ্মার জনক স্নিগ্ধবস্তুর ভোজন করলে তা থেকে শ্লৈষ্মিক রোগ উৎপন্ন হয় এবং তার বিপরীত রুক্ষবস্তুর আহার করলে সেই শ্লৈষ্মিক রোগ দূরীভূত হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে—পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বিভিন্ন বস্তু থেকে যে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলও পরস্পর বিপরীত স্বভাবের হয়ে থাকে। সুতরাং বৈয়াকরণের সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যেমন ধর্মলাভ হয়, সেইরূপ অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মের প্রাপ্তি হবেই। ভাষ্যকার এইকথা বলে পরে আর একটা কথা বলছেন—অথবা বৈয়াকরণের ধর্ম অপেক্ষা অধর্ম বেশী হবে। কারণ সাধুশব্দের অপেক্ষা অসাধু শব্দ সংখ্যায় অনেক বেশী। এক একটি সাধু শব্দ যে অর্থের বোধক হয়, সেই অর্থের বোধক অসাধু শব্দ অনেক। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছেন "গৌঃ" এই একটি সাধুশব্দের অপভ্রংশ [অশুদ্ধ] গাবী, গোণী ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে। সাধুশব্দের জ্ঞান করতে গেলে অসাধু শব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। যে বৈয়াকরণ নয়, সে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতাই অবৈয়াকরণের অধর্ম থেকে অব্যাহতিলাভের একমাত্র হেতু। যে অজ্ঞ, শাস্ত্রের দৃষ্টিতেও সে ক্ষমার্হ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুর ব্রাহ্মণ হত্যাদি নিষিদ্ধ আচরণ থেকে কোন পাপ হয় না। এইরূপ মানুষের মধ্যে যারা অজ্ঞ, তারা পশুর সমান। তাদের পক্ষে অশুদ্ধশব্দের উচ্চারণ দোষজনক হতে পারে না। অতএব এখানে "দুষ্যতি" ক্রিয়ার কর্তা—অন্য কেউ নয় কিন্তু যিনি 'বাগ্‌যোগবিদ্' অর্থাৎ বৈয়াকরণ তিনিই ইহার কর্তা। ইহাই—এই পূর্বপক্ষাত্মক ভাষ্যের সারাংশ ॥ ১৬ ॥

মূল।

বিষম উপন্যাসঃ। নাস্ত্যস্ত্যায়াজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি।
যো হ্যজানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ,
সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—[এই] উপন্যাস [বাক্য] বিষম [অসঙ্গত]। অজ্ঞান অত্যন্ত শরণ হতে পারে না। যে না জেনে ব্রাহ্মণ বধ করে, অথবা সুরা পান করে, সেও পতিত হয়—ইহা মনে করি ॥ ১৭ ॥

পদার্থজ্ঞান :—"অত্যন্তায়" এই পদটি একটি অব্যয়, অত্যন্ত শব্দের চতুর্থী নয়। অর্থ = অত্যন্ত। বিষমঃ = [এখানে] অসঙ্গত অর্থাৎ অযুক্ত। উপন্যাসঃ = বাক্য ["অজ্ঞানং শরণম্" এই বাক্য] ॥ ১৭ ॥

বিবৃতি—অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞান থেকে বৈয়াকরণের পাপ হবে আর অবৈয়াকরণের অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ থেকেও পাপ হবে না—অজ্ঞানই অবৈয়াকরণের পাপ হতে অব্যাহতি পাবার হেতু—এই কথা পূর্বে পূর্বপক্ষী বলেছিল। পূর্বপক্ষীর বাধকরূপে এখন সিদ্ধান্তী বলছেন—"বিষম উপন্যাসঃ"। অর্থাৎ ঐ পূর্বোক্ত কথা [বৈয়াকরণের পাপ, অবৈয়াকরণের অব্যাহতিলাভ ইত্যাদি] অসমীচীন। যারা শাস্ত্রে অধিকারী তাদের শাস্ত্রানুশীলন যেমন অবশ্য কর্তব্য সেইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি ও নিষেধপরিপালনও অবশ্যকর্তব্য। যে অজ্ঞ সে দুইটি অপরাধে অপরাধী হয়। শাস্ত্রের অনুশীলন যাহা তার অবশ্যকর্তব্য তাহা না করার জন্য এক অপরাধ। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায়, অজ্ঞব্যক্তি শাস্ত্রানুকূল আচরণের বর্জন এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান করে অপরাধভাগী হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি এইভাবে তার অজ্ঞানের জন্য দ্বিগুণ পাপে পাপী হলেও তার অজ্ঞতাকে তার পাপ থেকে অব্যাহতিলাভের হেতুরূপে যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাহা কোনরূপে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না। সুতরাং ইহা বিষম উপন্যাস। যদিও অজ্ঞানবশত পাপ, জ্ঞানীর পাপ অপেক্ষা লঘু পাপ, তথাপি সেই অজ্ঞান কিরূপ, কোথায়, তাহা বিচার্য। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণহত্যা, সুরাপান, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতিকে পাপ কর্ম বলা হয়েছে। সেই সকলশাস্ত্র না জেনে যদি কেহ ব্রাহ্মণহত্যাদি কর্ম করে, তা হলে তার নিষেধশাস্ত্র না জানা হেতু যে পাপ লঘু হবে, এটা কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। এই সকল শাস্ত্রের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। যদি কেহ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে জেনে হত্যা করে, সে ক্ষেত্রে সেই ঘাতক ব্যক্তি ব্রাহ্মণহত্যার নিষেধশাস্ত্র না জানলেও তার সম্পূর্ণ পাপ হবে। তবে যদি কেহ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে না জেনে বধ করে বা সুরাকে সুরা বলে না জেনে জলভ্রমে সুরার পান করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার ব্রাহ্মণ হত্যার বা

সুরাপানের সম্পূর্ণ পাপ হবে না। এইরূপ অজ্ঞানই তার পাপের অল্পতার হেতু হবে। শাস্ত্রানুশীলন না করে যে শাস্ত্র বিষয়ক অজ্ঞান—তার দ্বারা পাপের অল্পতা সম্পাদিত হবে না। এই যুক্তি অপশব্দের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যদি কেহ নিষেধশাস্ত্র না জেনে যজ্ঞাদি কর্মে অপশব্দ প্রয়োগ করে, তাহলে তার সেক্ষেত্রে অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ জন্য যে পাপ, সে পাপ হবেই। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাকরণজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির অজ্ঞান, পাপ থেকে অব্যাহতি লাভের হেতু হতে পারে না ॥ ১৭ ॥

মূল

এবং তর্হি "সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্‌ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ"।
কঃ? অবাগ্‌যোগবিদেব। অথ যো বাগ্‌-
যোগবিদ্‌ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্‌ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তা হলে [বৈয়াকরণের পাপশঙ্কা হলে] সেই বাগ্‌যোগবিদ্‌ [বৈয়াকরণ] পরলোকে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হয় এবং অপশব্দসমূহদ্বারা দূষিত হয়। কে? [উত্তর] অবাগ্‌যোগবিদ্‌ [ব্যাকরণজ্ঞানহীন]। আর যিনি বাগ্‌যোগবিদ্‌, বিজ্ঞান তাঁর শরণ [পাপ থেকে অব্যাহতিলাভের হেতু] ॥ ১৮ ॥

বিবৃতি—পূর্বের ভাষ্যে বলা হয়েছে অবাগ্‌যোগবিদ্‌ অর্থাৎ অবৈয়াকরণ ব্যাকরণের অজ্ঞান বশত অসাধু শব্দের প্রয়োগ করে যে পাপ থেকে অব্যাহতি পাবেন তা হতে পারে না। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে বলেছিল, "অজ্ঞানই শরণ অর্থাৎ পাপ থেকে অব্যাহতি পাবার হেতু" পূর্বপক্ষীর সেই কথা খণ্ডিত হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বপক্ষী যে আর একটি আশঙ্কা করেছিল "বৈয়াকরণের সাধু শব্দের জ্ঞান থেকে যেমন ধর্ম হবে, সেইরূপ অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হবে।" এই আশঙ্কার উত্তর তো দেওয়া হয়নি। তার উত্তর কি হবে? তার উত্তর কি সিদ্ধান্তী এড়িয়ে গেলেন? না। সেই উত্তর দিবার জন্য এখন ভাষ্যকার "এবং তর্হি" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করেছেন॥ সে অর্থাৎ বৈয়াকরণ পরলোকে অনন্ত জয় অর্থাৎ দীর্ঘকাল সুখভোগাদি প্রাপ্ত হয়। এই কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যিনি বৈয়াকরণ তিনি সাধুশব্দের জ্ঞান পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করে, সেই সাধুশব্দের প্রয়োগ বশত ধর্মের লাভ করে স্বর্গাদিতে দীর্ঘকাল সুখভোগ করেন; সাধুশব্দের জ্ঞানমাত্রথেকে ধর্মলাভ পূর্বক স্বর্গাদি

লাভ করেন না। যদি সাধুশব্দের জ্ঞান থেকেই ধর্মলাভ হোত তা হলে অনুরূপ ভাবে অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মও হোত। কিন্তু এখানে তো বৈয়াকরণের অধর্মফলের কথা ভাষ্যকার বলেননি। সুতরাং অনন্তজয়প্রাপ্তি মাত্রের কথা ভাষ্যকার কর্তৃক অভিহিত হওয়ায়, ভাষ্যকারের উক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায়। আর শ্লোকের "দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ" এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বললেন "কে অপশব্দ দ্বারা দূষিত হয়? [উত্তরে] অবাগ্‌যোগবিদ্‌ই।" ভাষ্যকারের এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, বৈয়াকরণ অপশব্দ দ্বারা দূষিত হয় না। তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বৈয়াকরণ সাধুশব্দের ও অসাধুশব্দের পরিচয় জানেন বলে, অসাধুশব্দের প্রয়োগ না করে, সাধুশব্দের প্রয়োগ করেন, সেই প্রয়োগ থেকে তিনি ধর্মলাভ পূর্বক পরলোকে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হন। আর অবৈয়াকরণের সাধু অসাধুশব্দের বিবেকজ্ঞান না থাকায় সে অসাধু শব্দেরও প্রয়োগ করে বলে, সেই অসাধুশব্দ প্রয়োগজনিত দূষিত অর্থাৎ পাপপ্রাপ্ত হয়। ইহাই ভাষ্যপর্যালোচনা থেকে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বলে বুঝা যায়। অপশব্দ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রতিপাদিত যে শুদ্ধ শব্দ, সেই শুদ্ধশব্দ ব্যতীত অন্য যে সকল অশুদ্ধ শব্দ, সেই অশুদ্ধশব্দ সমূহ দ্বারা বৈয়াকরণ দূষিত হতে পারে না—ইহা উপরে বলা হলো। শুদ্ধ শব্দের জ্ঞান করতে গেলে, অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞান অবর্জনীয়। একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল যত্ন থেকে আনুষঙ্গিকরূপে অবর্জনীয়রূপে যদি কিছু সিদ্ধ হয়ে যায়, তবে সেস্থলে আনুষঙ্গিকরূপে সিদ্ধ বস্তুর পৃথক্ ফল থাকে না। কেমন বস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে গেলে চক্ষুর উন্মীলন করতে হয়। চক্ষুর উন্মীলন ব্যতীত দর্শনব্যাপার নিষ্পন্ন হয় না। এখানে দর্শনব্যাপারের যা ফল [সুখ ইত্যাদি] চক্ষুর উন্মীলনেরও তাই ফল, অন্যকোন ফল চক্ষুর উন্মীলনের সেখানে নাই। এইরূপ যিনি সাধুশব্দের জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁকে অপশব্দ থেকে পৃথক্‌করে সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করতে হয় বলে তাঁর পক্ষে অপশব্দ অর্থাৎ অসাধুশব্দের জ্ঞান অবর্জনীয় বলে সাধুশব্দের জ্ঞানের যা ফল আনুষঙ্গিকভাবে অসাধুশব্দের জ্ঞানেরও তাহাই ফল, পৃথক্‌ফল নাই। সুতরাং অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মরূপ পৃথক্‌ফল হতে পারে না। সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে সাধুশব্দের প্রয়োগ করে ধর্ম লাভ হয়, অসাধুশব্দের আনুষঙ্গিক জ্ঞানেরও সেই ধর্মলাভই ফল, অধর্ম নয়।

এইজন্য এখানে ভাষ্যকার বলেছেন—"অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্"—যিনি বৈয়াকরণ জ্ঞানই তাঁর পরিত্রাণের উপায় (২৪ ।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে—"সোঽনন্তমাপ্নোতি……বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।" এই শ্লোকে "অপশব্দৈঃ দুষ্যতি" চ" অর্থাৎ 'অপশব্দের দ্বারা দূষিত হন' এই দূষিত হওয়ার কর্তা কে? সন্নিধানে "বাগ্‌যোগবিদ্" শব্দ আছে। সুতরাং সেই "বাগ্‌যোগবিদ্" শব্দের অর্থ বৈয়াকরণেরই দূষিত ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়া উচিত বলে—"বাগ্‌যোগবিদ্ই" অর্থাৎ বৈয়াকরণই অপশব্দের দ্বারা দূষিত হবেন। অথচ ভাষ্যকার বললেন "কঃ? অবাগ্‌যোগবিদেব।" কে অপশব্দ দ্বারা দূষিত হয়? অবাগ্‌যোগবিদই।" অবাগ্‌যোগবিদের অর্থাৎ অবৈয়াকরণের দূষিত হওয়া ক্রিয়াতে অন্বয় কি করে হলো? এখানে তো শ্লোকে "অবাগ্‌যোগবিদ্" শব্দ নাই।

এর উত্তরে কৈয়ট বলেছেন—"দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ" এই "দুষ্যতি" ক্রিয়াপদের সন্নিধানে "বাগ্‌যোগবিদ্" শব্দ থাকলেও বাগ্‌যোগবিদের সঙ্গে দুষ্যতি ক্রিয়ার অন্বয়ের সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা নাই। বাগ্‌যোগবিদ্ অর্থাৎ বৈয়াকরণ অপশব্দের দ্বারা দূষিত হন না—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। বৈয়াকরণের অপশব্দদ্বারা দূষিতত্বটি বাধিত। অথবা অবাগ্‌যোগবিদেরই অপশব্দদ্বারা দূষিত হওয়ার সামর্থ্য আছে বাগ্‌যোগবিদের নাই বলে অবাগ্‌যোগবিদ্ শব্দটি অধ্যাহার করে তার সঙ্গে দুষ্যতি শব্দের সম্বন্ধ করতে হবে। মীমাংসা দর্শনে—"শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" [মীমাংসাদর্শন তৃতীয়াধ্যায়, ৩য় পাদ-১৩] ইত্যাদি অধিকরণে লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্যকে বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা থেকে বলবত্তর বলা হয়েছে। স্থানই এখানে সন্নিধি। কৈয়টে উক্ত প্রকরণ শব্দের অর্থ 'সন্নিধি' এই কথা বলেছেন নাগেশভট্ট (২৫) ॥ ৩৮ ॥

---

(২৪) মহাভাষ্যকার পরে এই পস্পশাহ্নিকেই—"জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাহ ধর্মঃ" এই পূর্বপক্ষ বার্তিকের সমাধানে পুনরায় এই বিষয়ের বিচারের অবতারণা করেছেন।

(২৫) "প্রকরণাৎ সামর্থ্যংবলীয় ইত্যাহ,—অবাগ্‌যোগবিদিতি ॥" [মহাভাষ্যপ্রদীপ ১।১]

"প্রকরণাদিতি সন্নিধেরিত্যর্থঃ" [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত ১।১]

মূল

ক্ব পুনরিদং পঠিতম্? ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ।
কিঞ্চ ভোঃ, শ্লোকা অপি প্রমাণম্? কিঞ্চাতঃ?
যদি শ্লোকা অপি প্রমাণম্, অয়মপি শ্লোকঃ
প্রমাণং ভবিতুমর্হতি—

যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎক্রতুগতং নয়েৎ।

ইতি। প্রমত্তগীত এষ তত্রভবতঃ। যস্তু প্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ইহা [এইপদ্য] কোথায় পঠিত [আছে]? ভ্রাজা নামক শ্লোকসমুদায় [আছে, তাহাদের মধ্যে এই পদ্য পঠিত আছে]। কি হে, শ্লোকও প্রমাণ? তাতে কি [শ্লোক সকল প্রমাণ হলে ক্ষতি কি?] শ্লোকসকল যদি প্রমাণ হয় [তা হলে] এই শ্লোকও প্রমাণ হতে পারে—তাম্রবর্ণ [সুরা] ঘটের বিপুল মণ্ডল [সমূহ] পীত হলেও [পান করলেও] [যদি তাহা] স্বর্গগমনের হেতু না হয়, যজ্ঞস্থিত তাহা [সুরা] কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্ত করাতে পারে? ইহা পূজ্যের [বুদ্ধদেবের] প্রমত্তগীত [বেদ বিরোধ অবলম্বন করে উক্তি]। যাহা অপ্রমত্তগীত [বেদের অবিরোধে উক্তি] তাহা প্রমাণ। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রমাণবাক্য সূচিত হয়েছিল, তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হোল] ॥ ১৯ ॥

বিবৃতি—"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি শ্লোক ভাষ্যকার প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেছেন। ইহা কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তাহা বলবার জন্য ভাষ্যকার নিজেই প্রশ্ন উঠিয়েছেন—"ক্ব পুনরিদং পঠিতম্?" কোথায় এই শ্লোক অর্থাৎ পদ্য পঠিত আছে? এই শ্লোকের প্রামাণ্যের সমর্থন অভিপ্রায়েই—এই প্রশ্নের উত্থাপন হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে 'ভ্রাজা' (৯৬)

(৯৬) এই শ্লোকটি কত্যায়ন প্রণীত বলে বুঝা যায়। কারণ সকল ব্যাখ্যাকারই ইহাকে কাত্যায়ন প্রণীত বলেছেন। কাত্যায়ন প্রণীত এইরূপ অনেক শ্লোক ছিল। ঐসব শ্লোকের নাম "ভ্রাজা" বলে অভিহিত হয়েছে। তবে "ভ্রাজাঃ" পদটি ভ্রাজ শব্দের বহুবচনান্তরূপ কিংবা "ভ্রাজা" শব্দের বহুবচনান্তরূপ তা আর এখন নিশ্চয় করা যায় না। ব্যাখ্যাকারেরা ভ্রাজাখ্যশ্লোকাঃ" এইরূপ উল্লেখ করেছেন। কেউ স্পষ্টভাবে "ভ্রাজ" এইরূপ অকারান্ত বলেন নাই বা আকারান্তও বলেন নাই। নাগেশভট্ট বলেছেন "ভ্রাজা নাম কাত্যায়ন প্রণীতাঃ শ্লোকা ইত্যাহুঃ।"

নামক কতকগুলি শ্লোক আছে, তাদের রচয়িতা কাত্যায়ন। সেই শ্লোক সমূহের মধ্যে এই শ্লোকটি পঠিত। বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণ শব্দ প্রমাণরূপে শ্রুতিকেই প্রধান বলেন। শ্রুতিভিন্ন শ্রুতির অনুকূল ও শ্রুতির অবিরোধী স্মৃতি সমূহকেও শব্দপ্রমাণরূপে বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণ গ্রহণ করেছেন। যে কোন শ্লোককে প্রমাণ বলে গ্রহণ করলে অনেক প্রকার অব্যবস্থার সম্ভাবনা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেদবিরোধীরা বৈদিক অনুষ্ঠানের নিন্দাসূচক অনেক শ্লোক রচনা করেছিলেন। শ্লোকমাত্রকে প্রমাণ স্বীকার করলে সেই সকল শ্লোকের প্রামাণ্যও অস্বীকৃত হতে পারবে না। সৌত্রামণি যাগে সুরার দ্বারা হোম করবার বিধান আছে (২৭)। সেই হোমের অবশিষ্ট সুরা পান করারও বিধি আছে। যজ্ঞে হোমাবশিষ্ট সুরার পান বেদবিহিত বলে ধর্ম, অধর্ম নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ইহার নিন্দার জন্য সে কালে একটি শ্লোক প্রচলিত ছিল :—

"যত্তুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ ॥"

এই শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থে আছে তা জানা যায় না। মহাভাষ্যকার এই শ্লোকের প্রণেতার উদ্দেশ্যে "তত্রভবতঃ" [পূজ্যস্য] এইরূপ সম্মানসূচক বিশেষণ বলেছেন। ইহাতে অনেকে মনে করেন—বুদ্ধদেব স্বয়ং সৌত্রামণিযাগের ধর্মত্ব খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই শ্লোক রচনা করেছিলেন।

পূর্বে তামার ঘটে সুরা রাখার রীতি ছিল। সেইজন্য এই শ্লোকে বলা হয়েছে, তাম্রবর্ণ ঘটের মহৎ মণ্ডলকেও [মহাসমুদায়ও] যদি কেহ পান করে অর্থাৎ যদি কেহ প্রচুর সুরাপান করে তা হলেও সেই সুরাপানকর্তা সুরাপানের ফলে স্বর্গলাভ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যজ্ঞে অল্পমাত্র সুরাপানের ফলে সেই যজ্ঞকর্তা স্বর্গে যাবেন—ইহা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। বেদবিরোধীরা এই ধরণের আরও অনেক শ্লোক রচনা করে গেছেন। শ্লোকমাত্রকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলে সেইসব শ্লোকও প্রমাণরূপে গৃহীত হবে। তাতে বেদবিহিত অনেক কর্মানুষ্ঠানের পরিত্যাগের প্রসঙ্গ হবে। সুতরাং

(২৭) কলিযুগে সৌত্রামণিযাগে সুরার ব্যবহার নিষিদ্ধ। মাধবাচার্যপ্রণীত পরাশরসংহিতা-ভাষ্য এবং নির্ণয়সিন্ধুর "কলিবর্জ্য" প্রকরণে উল্লিখিত।

শ্লোকমাত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণের দৃষ্টিতে "যদুদুম্বরবর্ণানাম্" ইত্যাদি শ্লোক অপ্রমাণ। আবার এই শ্লোকটি যদি অপ্রমাণ বলা হয়, তা হলে কাত্যায়ন প্রণীত পূর্বোদ্ধৃত "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি শ্লোকেরও প্রমাণ্য সমর্থিত হতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ভাষ্যকারের এই "যস্তু" ইত্যাদি শ্লোককে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা উচিত হয় নাই। পূর্বপক্ষীদের ইহাই বক্তব্য।

তার উত্তরে ভাষ্যকার যা বলেছেন—তার তাৎপর্য হচ্ছে, কোন শ্লোকই স্বয়ং প্রমাণ হতে পারে না। বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণ যে কোন শ্লোককে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে সম্মত না হলেও বেদমূলক শ্লোককে তাঁরা প্রমাণরূপে অবশ্যই গ্রহণ করে থাকেন। কাত্যায়ন প্রণীত "যস্তুপ্রযুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি শ্লোকের মূলরূপ একটি শ্রুতিবাক্য আছে— 'একঃ শব্দঃ সম্যগ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে (২৮) লোকে কামধুগ্ ভবতি" ইহার-তাৎপর্য এই—একটি শব্দও যদি সম্যগরূপে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে, শাস্ত্র প্রতিপাদিত সাধন প্রক্রিয়ার স্মরণপূর্বক যথাযথরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহলে সেই শব্দ প্রয়োগকারীর স্বর্গলোকে কামনার পূর্ণতা সম্পাদন করে। যথাযথভাবে শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ হয়—ইহা এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। এই শ্রুতিবাক্যে যাহা প্রতি পাদিত হয়েছে কাত্যায়ন প্রণীত "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি শ্লোকেও তাহা বলা হয়েছে।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে কাত্যায়ন প্রণীত শ্লোকটি শ্রুতিমূলক। এইজন্য ইহা প্রমাণ (২৯। সৌত্রামণি যাগে সুরাপানের নিন্দাসূচক শ্লোকটি বেদবিহিত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধবিষয়ক বলে প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে না।

---

(২৮) "একঃ পূর্বপরয়োঃ" [৬।১।৮৪] এই সূত্রের মহাভাষ্যে এই শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। এটি একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বাক্য। যে গ্রন্থ থেকে এই বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে, সে গ্রন্থ ভাষ্যকারের সময় প্রচলিত ছিল, এখন নাই। এই বাক্যটি যে একটি শ্রুতিবাক্য তাহা কৈয়টের মহাভাষ্য প্রদীপ, হরদত্তমিশ্রের পদমঞ্জরী, শব্দকৌস্তুভ, বিশ্বেশ্বরভট্ট প্রণীত ব্যাকরণসিদ্ধান্ত সুধানিধি গ্রন্থ থেকে বুঝা যায়। নাগেশভট্টের মতেও এটি শ্রুতিবাক্য। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও ইহাকে শ্রুতিরূপে গ্রহণ করেছেন।

(২৯) পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের [স্মৃতিপাদের] প্রথম অধিকরণে বেদমূলক সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থিত হয়েছে।

এইপ্রসঙ্গে একটা বিষয়ের আলোচনা এখানে করা যাচ্ছে। সুরাপান অত্যন্ত অনর্থজনক। কোন অবস্থাতে উহার সমর্থন করা যায় না। সুতরাং বেদে সৌত্রামণি যাগে যে সুরাপানের বিধান আছে, সেই সুরা যতই অল্প হোক না কেন, কোনরূপেই তার পান সমর্থনের যোগ্য হতে পারে না। এইরূপ একটি আশঙ্কা স্বভাবতই উত্থিত হয়।

এর উত্তরে বলা যায় যে— যাঁরা বেদাদিশাস্ত্রবিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন শাস্ত্রই ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয়ের একমাত্র কারণ। শাস্ত্র ব্যতীত পাপ ও পুণ্য নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রবিশ্বাসী ভর্তৃহরি আচার্যও এই কথা (১০০) বলেছেন। যাঁরা মনে করেন যুক্তির দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের নির্ণয় করা যায়, তাঁদের কথায় ভর্তৃহরি কোনরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। কুমারিল ভট্টও তন্ত্রবার্তিকে [১।২ মীমাংসা দর্শন] ধর্মও অধর্মের নির্ণয় শাস্ত্রমাত্রপ্রতিপাদ্য ইহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন। 'ধর্মাধর্মনির্ণয় যুক্তি দ্বারাই প্রতিপাদ্য এই কথা যাঁরা বলেন এইরূপ যুক্তিবাদী সম্প্রদায় যে কেবল অধুনিক যুগেই বর্তমান তা নয়। সুপ্রাচীন কালেও বেদবিরোধী যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। এইজন্য আচার্য ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডে এই যুক্তিবাদী বা অনুমানবাদী (১০১) সম্প্রদায়ের যুক্তি সমূহের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। অনুমানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যেতে পারে না। এ বিষয়ে আচার্য ভর্তৃহরির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে, তাঁর সিদ্ধান্তের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—

---

(১০০) "ইদং পুণ্যমিদং পাপমিত্যেতস্মিন্ পদদ্বয়ে।
আচণ্ডালমনুষ্যাণাং সমং শাস্ত্রপ্রয়োজনম্॥ [বাক্যপদীয় ১।৪০]

এই কর্মটি পুণ্য, এই কর্মটি পাপ এই দুটি বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তুল্যরূপে শাস্ত্রের অপেক্ষা আছে।

(১০১) 'যুক্তিশ্চার্থাপত্তিরনুমানং বা।" [ভামতী ১।১।০]।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে,—অর্থাপত্তিপ্রমাণ মীমাংসক ও অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের সম্মত। বৌদ্ধ, জৈন, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দার্শনিকগণ অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং তাঁর অনুগামী ভর্তৃহরি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। সুতরাং মীমাংসক ও অদ্বৈতবাদী ভিন্ন দার্শনিকদের মতে 'যুক্তি' শব্দের অর্থ অনুমান। ন্যায় শাস্ত্র ও বেদান্ত শাস্ত্রের টীকাদিতে অনেকস্থলে 'তর্ককে'ও যুক্তি শব্দের অর্থরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

"হস্তস্পর্শাদিনাঽন্ধেন বিষমে পথি ধাবতা।
অনুমানপ্রধানেন বিনিপাতো ন দুর্লভঃ॥" [বাক্যপদীয় ১।৪২]

কোন অন্ধ পার্বত্য পথের কিয়দংশ হস্তস্পর্শের দ্বারা সমতল অনুভব করে, অনুমানের দ্বারা পার্বত্য পথের অন্য অংশেরও যদি সমতার নিশ্চয় পূর্বক পর্বতীয় বিষম পথে ধাবিত হয়, তাহলে তার যেমন বিষম দুর্গতি হয়; সেইরূপ শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল অনুমানের সাহায্যে যারা ধর্ম ও অধর্মের মত অতীন্দ্রিয় বস্তুর নির্ণয় করে, তার অনুসরণ করে, তারাও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধের মত দুঃখভাগী হয় (১০২)।

এই হেতু আমাদের স্বীকার করতে হবে—শাস্ত্রই ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। শাস্ত্র যা কর্তব্য বলে নির্দেশ দেন, তা ধর্ম। সৌত্রামণি যাগে হোমাবশিষ্ট সুরাপানে শাস্ত্র নিষেধ করেন নাই, কিন্তু অনুজ্ঞা দিয়েছেন। এই হেতু সৌত্রামণিযাগে সুরাপান অধর্ম নয়, কিন্তু ধর্ম। যেখানে শাস্ত্র অনুজ্ঞা দেন নাই, কিন্তু নিষেধ করেছেন তাহা অধর্ম। সৌত্রামণিযাগভিন্ন স্থলে শাস্ত্র সুরাপানের নিষেধ করেছেন, অতএব অন্যত্র সুরাপান অধর্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে সৌত্রামণিযাগের সুরাপান সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—নারীর সম্বন্ধ, মাংসভক্ষণ এবং সুরাপান—এই সকল বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক আসক্তি আছে। এই জন্য এই সকল বিষয়ে মানুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে শাস্ত্রে কোন বিধান থাকতে পারে না। যে সকল বিষয়ে মানুষের স্বল্পপ্রকারে প্রবৃত্তি জন্মে না, কেবল সেই সকল বিষয়ে প্রবৃত্তি-উৎপাদনের জন্য বেদাদি শাস্ত্রের বিধি আছে। ঋতুকালে বিবাহিতা পত্নীর সম্পর্ক, যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতির অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ, সৌত্রামণিযাগে হোমের অবশিষ্ট সুরাপান—ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রে যে বিধি দেখা যায়—তার উদ্দেশ্য নিবৃত্তি। মাংসভক্ষণ, সুরাপান, স্ত্রীসম্পর্কে মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য শাস্ত্রে অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই

(১০২) যথাঽন্ধো বিষমে গিরিমার্গে চক্ষুষ্মন্তং নেতারমন্তরেণ ত্বরয়া পরিপতন্ কঞ্চিদেব মার্গৈকদেশং হস্তস্পর্শেনাবগম্যং সমতিক্রান্তস্তৎপ্রত্যয়াদপরমপি তথৈব পরিপতন্ যথা পতনং লভতে তদ্বদাগমচক্ষুষা বিনা তর্কানুপাতী কেন কেনানুমানেন কচিদাহিতপ্রত্যয়োঃ দৃষ্টফলেষু কর্মসু আগম-ক্রমং প্রবর্তমানো মহতা প্রত্যবায়েন সংযুজ্যত ইত্যর্থঃ। —বাক্যপদীয়ের পুণ্যরাজটীকা।

অনুজ্ঞার উদ্দেশ্য—যারা নারীসম্পর্ক, মাংসভক্ষণ ও সুরাপানের প্রতি আকৃষ্ট, তারা উপরে প্রদর্শিত তিনটি স্থল ব্যতীত অন্যত্র মাংসভক্ষণ, নারীসম্পর্ক বা সুরাপান করবে না। এইভাবে অন্যস্থল থেকে নিবৃত্ত করে তাদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে—উক্তশাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু যাহার ঐসকল বিষয়ে কোন আকর্ষণ নাই, তাহাকে ঐসকল বিষয়ে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। অতএব কেহ যদি সংসার ধর্মে প্রবৃত্ত না হয়ে ত্যাগের পথে যায়, কিংবা যজ্ঞ উপলক্ষে পশুহিংসা না করে, বা সৌত্রামণি যাগের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞে হোমের অবশিষ্ট সুরাপান না করে, তা হলে সে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অপরাধী হয় না (১০৩)॥ ১৯ ॥

মূল

"অবিদ্বাংসঃ"

অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ।
কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥
অভিবাদে স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

"অবিদ্বাংসঃ" ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—"অবিদ্বাংসঃ" [এই প্রতীকের (বাক্যের অবয়বের) দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছে, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে] যে সকল অবিদ্বান্ [ব্যাকরণে অবিদ্বান্ অর্থাৎ অবৈয়াকরণ] প্রত্যভিবাদনে নামের প্লুতস্বর উচ্চারণ করার পদ্ধতি জানে না। প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে [সেই সকল ব্যক্তিকে] স্ত্রীসকলে অভিবাদনের মত "অয়ম্ অহম্" [এই আমি এইরূপ] বলবে। [আমরা] অভিবাদনে নারীর মত [পরিগণিত] না হই, এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। "অবিদ্বাংসঃ" [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র বাক্য সূচিত হয়েছিল, তাহা প্রদর্শিত হলো] ॥ ২০ ॥

---

(১০৩) লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা, নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

[শ্রীমদ্ভাগবত ১১ ৫।১১]

বিবাহবিধয় এব ব্যবায়ঃ কার্যঃ যজ্ঞ এবামিষসেবা, সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্নাতীতি শ্রুতেস্তত্রৈব মদ্যসেবেতি নিয়মঃ ক্রিয়তে। আসু ব্যবায়ামিষমদ্যসেবাসু নিবৃত্তিরিষ্টা। অয়ং ভাবঃ, নায়ং নিয়মবিধিরপি তু নিত্যপ্রাপ্তত্বাদ্ অন্যতো নিবৃত্তিঃ পরিসংখ্যৈব। [শ্রীধরস্বামিটীকা]

বিবৃতি :—অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পদ্ধতি ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। 'অভিবাদন' শব্দটি অভিউপসর্গ পূর্বক নিজন্ত 'বদ্' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' [অন] প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন। এর উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়দ্বারা লভ্য অর্থ হচ্ছে— অনুকূল ভাবে যে উক্তি, সেই উক্তি করবার প্রেরণা। যেখানে কেহ কোন গুরুজনকে অভিবাদন করে, সেখানে গুরুজন তাকে আশীর্বাদ দেন অথবা তার কুশল প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন (১০৪)। অভিবাদন না করলে, সেস্থলে এইরূপ আশীর্বাদ বা কুশল প্রশ্ন করা হয় না। অতএব আশীর্বাদ প্রদানে অথবা কুশল প্রশ্নে গুরুজনের প্রেরণাই [গুরুজন যাতে আশীর্বাদ বা কুশল প্রশ্ন করেন—তার প্রবর্তনা] অভিবাদের [অভিবাদনের] অভিপ্রায়। অভিবাদন বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু বলেছেন ১০৫ —

"অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াংসমভিবাদয়ন্।
অসৌ নামাঽহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্তয়েৎ ॥

ব্রাহ্মণ গুরুজনকে অভিবাদন করার পরে নিজের নাম কীর্তন করবে। যেমন—"অভিবাদয়ে দেবদত্তোঽহম্"—আমি দেবদত্ত [আপনাকে] অভিবাদন করছি। এইরূপ নাম অথবা গোত্র উচ্চারণের দ্বারা অভিবাদন করলে, যাঁকে অভিবাদন করা হয়, সেইরূপ গুরুজনের কর্তব্য এই যে, তিনি অভিবাদয়িতাকে আশীর্বাদ করবেন। এইরূপ স্থলে আশীর্বাদবাক্যের শেষভাগে প্রযুক্ত নাম অথবা গোত্রবাচক শব্দের যে স্বরবর্ণটি সকল স্বরের অপেক্ষা পরবর্তী সেইস্বর বর্ণটিকে উদাত্ত ও প্লুত উচ্চারণ করতে হয়—

---

(১০৪) ইহারই নাম প্রত্যভিবাদ বা প্রত্যভিবাদন। নাগেশভট্ট ৮।২।৮৩ সূত্রের মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোতে ইহা বলেছেন—

"অভিবাদয়িতরি অনুগ্রহদ্যোতকমাশীরূপং কুশলাদিপ্রশ্নরূপং বা বাক্যমাত্রং প্রত্যভিবাদঃ।"

(১০৫) মনুসংহিতা [মাণ্ডলিক সংস্করণ] ২।১২২।

এখানে মনুর শ্লোকে যদিও 'বিপ্রঃ" এইরূপ আছে এবং তার অর্থ ব্রাহ্মণ, তথাপি এখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেও গ্রহণ করতে হবে। মেধাতিথি, কুল্লূক প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারেরা ইহা বলেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় অনুচিত হবে না। এই অভিবাদনের প্রকরণে মনুসংহিতার সুপ্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—পরিণত বয়স্ক শূদ্রও অভিবাদনের যোগ্য—ইহা মনুর সম্মত বলে মনে হয়। [মনুসংহিতা,মেধাতিথিভাষ্য ২।১২৬]।

"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্বাক্ষরঃ প্লুতঃ ॥"

[মঃসং ২।১২৫] মাণ্ডলিকসংস্করণ।

যিনি গুরুজন তাঁকে অভিবাদন করলে, তিনি সেই অভিবাদয়িতা ব্রাহ্মণকে বলবেন—"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য"

[হে প্রিয়দর্শন! তুমি দীর্ঘায়ু হও] ১০৬) এবং সেই অভিবাদয়িতার নামের অন্তে যে স্বরবর্ণ থাকে, তাহা প্লুত উচ্চারণ করবেন।

এইরূপ স্থলে উদাত্ত এবং প্লুতস্বর করার জন্য পাণিনি সূত্র প্রণয়ন করেছেন।

মনুর পূর্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি বলেছেন প্লুতস্বর করার বিষয়ে মনু অপেক্ষা পাণিনির প্রামাণ্য অধিক। শব্দের সাধুত্ব প্রতিপাদনের জন্য পাণিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এই জন্য এবিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং পাণিনির সূত্র গ্রহণীয় (১০৭) প্রথমে।

---

(১০৬) এখানে মেধাতিথি বলেছেন—গুরুজন উপরে প্রদর্শিত 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য' কেবল যে এইরূপই বলবেন, এমন কোন নিয়ম নাই। এইরূপ শুভেচ্ছাদ্যোতক অন্যপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করলেও তা অনুচিত হবে না। মনুর উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা মনুসংহিতার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মতানুসারে উপরে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে। পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র প্রথমে মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকারগণের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদর্শন করে পরে নিজের মতানুসারে অপর একটি ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন নাট্যশাস্ত্রে যেখানে প্রসঙ্গক্রমে অভিবাদনের রীতি প্রদর্শিত হয়েছে,—তাতে নামের পর একটি স্বতন্ত্র অকার যুক্ত করা হয়েছে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে নামের স্বরবর্ণের মধ্যে অন্তিম স্বরবর্ণ প্লুত হবে এবং সেই নামের পর একটি স্বতন্ত্র অকারের প্রয়োগ করতে হবে। "আয়ুষ্মান ভব সৌম্য দেবদত্ত৩ অ" এইরূপ প্রত্যভিবাদন বাক্যের আকার হবে। এখানে দেবদত্ত শব্দের পরে '৩' [তিন] অঙ্কটি, অন্তিম স্বরবর্ণপ্লুত হওয়ায়, তার যে তিন মাত্রা হয়েছে—তাহা সূচিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। হরদত্তআরও বলেছেন প্রত্যভিবাদন বাক্যের অন্তর্গত নামের শেষে 'শর্মন্' 'বর্মন্' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা উচিত নয়। "শর্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু। গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ" ॥ এই শ্লোকের দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ তাদের নামের শেষে 'শর্মন্' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করবেন, ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু এই 'শর্মন্ প্রভৃতি শব্দ নামের অন্তর্গত ইহা মনে করার কোন কারণ নাই। [পদমঞ্জরী —৮।২।৮৩]

(১০৭) প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে [পাঃ সূঃ ৮।২।৮৩]

"প্রত্যভিবাদো নাম যদভিবাদ্যমানো গুরুরাশিষং প্রযুঙ্ক্তে ; তত্রাশূদ্রবিষয়ে যদ্ বাক্যং বর্ততে, তস্য টেঃ প্লুত উদাত্তো ভবতি।" [কাশিকা]।

এই অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের প্রসঙ্গে মনু বলেছেন:—

"নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তথৈব চ ॥ [মঃ সঃ ২।১২৩]

যে সকল ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন বাক্যের অন্তর্গত নামের [অথবা গোত্রের] প্লুত করতে জানেন না, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অভিবাদন কালে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করে অভিবাদন করবে না, কেবল "অহম্" এইরূপ বলবে অর্থাৎ "অহমভিবাদয়ে" [এই আমি অভিবাদন করছি] এইরূপ বলবে। স্ত্রীলোক সকলকেও [প্লুত করতে জানুন বা না জানুন] এইভাবে অভিবাদন করবে।

মহাভাষ্যকারের কথায় বুঝা যাচ্ছে—যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি প্রত্যভিবাদন বাক্যে প্লুত করার রীতি জানেন না। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাঁকে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করে অভিবাদন করা যায় না। স্ত্রীলোক সকলকেও ধর্মশাস্ত্রের আদেশ অনুসারে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করে অভিবাদন করা যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি অভিবাদন বিষয়ে নারীর তুল্য [নারীকে যেরূপ অভিবাদন করা হয় ব্যাকরণজ্ঞানহীন সেই পুরুষকে সেইরূপ অভিবাদন করতে হবে]। অভিবাদনে যাহাতে নারীর সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত না হতে হয়, সেইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। মহাভাষ্যকারের উদ্ধৃত এই "অবিদ্বাংসঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি যদিও কোন স্মৃতিগ্রন্থে দেখা যায় নাই, তথাপি এটি যে শাস্ত্রবাক্য, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভাষ্যকার এর পূর্বে এবং পরে ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন দেখাতে গিয়ে শাস্ত্রবাক্যই উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং মধ্যবর্তী এই বাক্যটি শাস্ত্রবাক্য হলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। আরও কথা এই যে এই শ্লোকে 'বদেৎ" এইরূপে বিধি প্রত্যয়ান্ত শব্দ আছে। সুতরাং একটি এটি শাস্ত্রবাক্যই হওয়া উচিত ॥২০॥

মূল

"বিভক্তিং কুর্বন্তি"

যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্যা ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্তুম্, "বিভক্তিং কুর্বন্তি" ॥২১॥

অনুবাদ—"বিভক্তিং কুর্বন্তি" [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছে, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, প্রযাজসমূহকে বিভক্তি-যুক্ত করবে। ব্যাকরণ ব্যতীত প্রযাজসমূহকে বিভক্তি-যুক্ত করতে পারা যায় না। 'বিভক্তিং কুর্বন্তি" [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছিল, তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো] ॥২১॥.

বিবৃতি:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। ইহাদের বিবাহ হওয়ার পর অগ্নির আধান কর্তব্য বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই আধান দুই প্রকার শ্রৌত আধান এবং স্মার্ত আধান। আধান একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নির সংস্কার অর্থাৎ সংস্কৃত অগ্নি উৎপাদন করা হয়। বিবাহ সংস্কারের দ্বারা নারীতে 'ভার্যাত্ব' উৎপন্ন হয়। এই বিবাহিতা নারী বিবাহকারীর ভার্যা হয় বলে, তার সন্তান পবিত্র সন্তানরূপে পরিগণিত হয়। এই ভার্যা ধর্মকর্মে পতির সহকারিণী হয়। সেই জন্য বিবাহিতা নারীকে তার পতির সহধর্মিণী বলা হয়। যে নারী বিবাহ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় নাই, তাতে ভার্যাত্ব উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তার সন্তান শাস্ত্রদৃষ্টিতে পবিত্র বলে পরিগণিত হয় না এবং সে সহধর্মিণীপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। এই বিবাহ যেরূপ একটি সংস্কার, সেইরূপ আধানও একটি সংস্কার। বিবাহ সংস্কার দ্বারা যেমন নারীতে ভার্যাত্ব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আধান সংস্কারের দ্বারা অগ্নিতে 'আহবনীয়ত্ব" প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। শ্রৌত আধানের দ্বারা তিনটি অগ্নির সংস্কার সম্পাদিত হয়। এই তিনটি অগ্নির নাম,—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। এই শ্রৌত আধানের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রভৃতি প্রদান করলেই দর্শপৌর্ণমাস, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি বৈদিক যাগ সিদ্ধ হয়। অসংস্কৃত কোন অগ্নিতে এই সকল যাগ করলে, তাহা অবৈধভাবে সম্পাদিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিফল হয়। শ্রৌত আধান বেদবিহিত।

স্মার্ত আধান বেদবিহিত নয়, উহা গৃহ্যসূত্রের বিধানানুসারে সম্পাদিত হয়। গৃহ্যসূত্র শ্রুতি নয়—স্মৃতি। এই জন্য এই আধানেক স্মার্ত আধান বলা হয়। এই স্মার্ত আধানের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নির নাম 'আবসথ্য' বা 'গৃহ্য'। এই আবসথ্য অগ্নিতে গৃহ্যসূত্রে বিহিত "পক্বান্তেষ্টি" প্রভৃতিযাগের অনুষ্ঠান করারবিধান আছে। গৃহ্যসূত্র বিহিত এই সকল যাগও অসংস্কৃত যে কোন অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে না; আবার বৈদিক যাগও আবসথ্য অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে না; এইরূপ

গৃহ্যসূত্রবিহিত স্মার্তযাগসমূহ ও "আহবনীয়" প্রভৃতি শ্রৌত অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

শ্রৌত আধানের পর যদি একবৎসরের মধ্যে যজমানের গৃহে কোন মহাবিপদ্ ঘটে কিংবা আধানের পর সেই যজমান উদরব্যথায় আক্রান্ত হয়, তা হলে সেই অবস্থায় প্রথমে যে অগ্নির আধান করা হয়েছিল, সেই অগ্নিকে উদ্বাসন [পরিত্যাগ] করে পুনরায় অন্য অগ্নির আধান করার বিধান আছে (১০৮)। আধান করতে হলে যেমন "পবমানেষ্টি"র [যাগবিশেষের] অনুষ্ঠান করতে হয়, পুনরাধানের সময়ও "পুনরাধেয়েষ্টি'র অনুষ্ঠান করতে হয়। শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মেই অনুষ্ঠেয় পদার্থগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সমগ্র অনুষ্ঠেয বস্তুগুলির মধ্যে কোনটি অঙ্গ এবং কোনটি প্রধান। প্রযাজ নামক যাগগুলি অঙ্গের অন্তর্গত (১০৯)। সমস্ত ইষ্টির প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস, অন্য সকল ইষ্টিই এই দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি (১১০)। যে সকল যাগের দ্রব্য ও দেবতা শ্রুতিতে বিহিত আছে এবং যে সকল যাগে প্রাণিদ্রব্যের অপেক্ষা নাই, সেই সকল যাগের নাম "ইষ্টি" (১১১)। এই ইষ্টির অঙ্গের মধ্যে প্রযাজযাগও পরিগণিত আছে।

---

(১০৮) তৈত্তিরীয় সংহিতা—১।৫ ; যদি আধানাদনন্তরং যজমান উদরব্যথাবান্ স্যাৎ, যদি বা সংবৎসরমধ্যে তস্য মহতী বিপৎ স্যাৎ তদা নৈমিত্তিকীং পুনরাধেয়েষ্টিং বিধায়...। [শব্দকৌস্তুভ পস্পশাহ্নিক]। ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতেও এইরূপ বলা হয়েছে। যস্য যজমানস্য আধান-কালাদারভ্য সংবৎসরসমাপ্তেরর্বাক্, কস্যচিৎ পদার্থস্য হানির্ভবতি, মহারোগো বা জায়তে, অন্যানি বা অগ্ন্যননুগত্যাদীনি নিমিত্তানি ভবন্তি, স পুনরাধানং করোতি।—

[শ্রৌতপদার্থনির্বচন—ইষ্টিপ্রকরণ-৪২৫

(১০৯) প্রধানযাগাৎ পূর্বমিজ্যন্তে যেস্তে প্রযাজাঃ, ইষ্টিষু পঞ্চ পশুযাগেষ্বেকাদশ। প্রধান যাগের পূর্বে যাহাদের দ্বারা যাগ করা হয়, তাহারা প্রযাজ। সেই প্রযাজ ইষ্টি যাগে পাঁচটি, পশু-যাগে ১১টি।

(১১০) দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টীনাং প্রকৃতিঃ।—[আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্র ৩।৩১]

দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টীনাং স্বেতিকর্তব্যতাংপ্রযচ্ছন্তাবুপবৃংহতঃ।

[আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রেরকপর্দিস্বামীরভাষ্য]

(১১১) শ্রুতদ্রব্যদেবতাকা অপ্রাণিদ্রব্যকাঃ ক্রিয়া ইষ্টয় ইত্যভিধীয়ন্তে

—[আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের হরদত্তাচার্যপ্রণীত ব্যাখ্যা ৩।৩১]

দর্শপূর্ণমাসে পাঁচটি প্রযাজ বিহিত। 'পুনরাধেয়েষ্টি' দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। এইজন্য পুনরাধেয়েষ্টিতেও পাঁচটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয় (১১২) এই পুনরাধেয়েষ্টির প্রযাজযাগের যে পাঁচটি মন্ত্র, সেই বিষয়ে বিধি আছে—

"প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্যাঃ।"

ইহার অর্থ:—"প্রযাজমন্ত্রগুলিতে বিভক্তি যোগ করে দিবে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কেবল বিভক্তির প্রয়োগ কোন স্থলেই হয় না। অতএব এস্থলেও বিভক্তির প্রয়োগ করতে গেলে, তার অনুরোধে প্রকৃতির প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। যে কোন প্রকৃতির সহিত বিভক্তির প্রয়োগ করলে তার অর্থের সহিত প্রযাজের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই জন্য প্রযাজযাগের যে দেবতা, সেই দেবতার বাচক যে শব্দ, সেই শব্দের সঙ্গে বিভক্তির প্রয়োগ করতে হবে—এইরূপ সিদ্ধান্তই এখানে সমীচীন।

প্রযাজ নামক যাগগুলি প্রধান যাগের অঙ্গ—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রধান যাগের পূর্বে এই প্রযাজযাগগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়। অনুযাজ নামক আরও তিনটি যাগ আছে। এই অনুযাজও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টির অঙ্গ। প্রধান যাগের অনুষ্ঠানের পর এই অনুযাজ যাগগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়।

এই প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাবিষয়ে যাস্কের নিরুক্তের অষ্টম অধ্যায়ে বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, প্রযাজ এবং অনুযাজের দেবতা অগ্নি (১১৩)। তাহলে এখন স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রযাজ মন্ত্রে বিভক্তি প্রয়োগ করতে হলে অগ্নি শব্দের সহিতই সেই বিভক্তির প্রয়োগ করতে হবে। তৈত্তি-রীয় সংহিতায় (১১৪) বলা হয়েছে, প্রথম আধানের দ্বারা যে অগ্নির আধান করা হয়, সেইঅগ্নি যদি অধিক ভাগের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে যজমানের সন্তান এবং পশুর প্রতি উপদ্রব করে, তাহলে সেই অগ্নিকে 'উদ্বাসন' [পারিত্যাগ] করে,

---

(১১২) কোন বিকৃতি যাগে যদি কোন বিশেষবিধান থাকে, তাহলে পাঁচটির অধিক প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। বিশেষ বিধান না থাকলে পাঁচটি প্রযাজই অনুষ্ঠেয়।

(১১৩) অথ কিং দেবতাঃ প্রযাজানুযাজাঃ? আগ্নেয়া ইত্যেকে।...ছন্দোদেবতা ইত্যপরম্।...ঋতুদেবতা ইত্যপরম্।...পশুদেবতা ইত্যপরম্।...প্রাণদেবতা ইত্যপরম্।...আত্মদেবতা ইত্যপরম্।...আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ। ভক্তিমাত্রমিতরৎ। [নিরুক্ত ৮।২১–২২]

(১১৪) ভাগধেয়ং বা অগ্নিরাহিত ইচ্ছমানঃ প্রজাং পশূন্ যজমানস্যোপদোদ্রাবোদ্বাস্য পুনরাদধীত, ভাগধেয়েনৈবৈনং সমর্দ্ধয়ত্যথো শান্তিরেবাস্যৈষা। [তৈত্তিরীয়সংহিতা—১।৫,১]

প্রথমাধানেনাহিতোঽগ্নিঃসাধারণভাগবাঞ্ছয়াঽধিকোপদ্রবং চকার, তচ্ছান্তিরনেন ভবতি। তস্মাদুদ্বাসনেষ্ট্যা পূর্বাগ্নিমুদ্বাস্য পুনরপ্যগ্নিমাদধ্যাৎ।—সায়ণভাষ্য।

পুনরায় আধান করবে। এতে অগ্নিকে অধিক ভাগের দ্বারা সম্বর্ধিত করা হয় অনুষ্ঠানই অগ্নির শান্তির উপায়।

অগ্নিকে 'উদ্বাসন' [পরিত্যাগ] করতে হলে প্রথমে 'উদ্বাসনেষ্টি' নামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। তারপর 'পুনরাধেয়েষ্টি' নামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করলে পুনরাধান সম্পন্ন হয়। এই 'পুনরাধেয়েষ্টিতে প্রযাজের অনুষ্ঠানে যে প্রযাজ মন্ত্র পঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিশেষ বিধান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে অগ্নির আধান করে, পরে সেই অগ্নিকে পরিত্যাগ করেন, তাঁর গৃহে বাক্ শুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। অশুদ্ধ শব্দের সহিত সেই যজমানের গৃহের বাক্ সংসৃষ্ট হয়ে যায়। সেই সাঙ্কর্যঅবস্থা প্রাপ্ত বাক্, তার উচ্চারণের ফলে যজমানের পরাভবের কারণ হয়। যজমানের এই পরাভব যাতে না ঘটে, তার জন্য বিভক্তির প্রয়োগ করবে (১১৫)।

এই বিভক্তির প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

পূর্বে যে পাঁচটি প্রযাজের কথা বলা হয়েছে, তাদের নাম এবং মন্ত্র যথাক্রমে প্রদর্শিত হচ্ছে—(১১৬)

নাম	মন্ত্র
১। সমিধ্	'সমিধোঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু'।
[এই নামটি নিত্য বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়]	[তৈত্তিরীয় শাখায় 'ব্যন্তু' স্থানে 'বিয়ন্তু' এইরূপ পাঠ করতে হবে।]
২। তনূনপাৎ	'তনূনপাদগ্ন আজ্যস্য বেতু'।
৩। ইড্	'ইড়োঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু।'
[এই নামটিও নিত্যবহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়।]	[তৈত্তিরীয় শাখায় 'ব্যন্তু' স্থলে 'বিয়ন্তু' পাঠ করতে হয়।]
৪। বর্হিঃ	'বর্হিরগ্ন আজ্যস্য বেতু'।
৫। স্বাহা	'স্বাহাঽগ্ন আজ্যস্য বেতু'।

(১১৫) সং বা এতস্য গৃহে বাক্ সৃজ্যতে যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে, স বাচং সংসৃষ্টাং যজমান ঈশ্বরোঽনুপরাভবিতোর্বিভক্তয়ো ভবন্তি বাচো বিধৃত্যৈ যজমানস্যাপরাভবায়। [তৈত্তিরীয় সংহিতা —১।৫।২]

(১১৬) সমিধো যজতি, তনূনপাতংযজতি, ইড়ো যজতি, বর্হির্যজতি, স্বাহাকারং যজতি।— তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।৬।১

এই প্রযাজ মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি মন্ত্রে বিভক্তির যোগ করতে হয়। শেষের প্রযাজমন্ত্রে বিভক্তির যোগ করতে হয় না (১১৭)। এই সকল প্রযাজ মন্ত্রে অগ্নিশব্দের সম্বোধনে একবচন বিভক্তির রূপের প্রয়োগ আছে। প্রথম চারটি প্রযাজ মন্ত্রে সম্বোধনান্ত অগ্নিশব্দের পূর্বে যথাক্রমে সম্বোধন, সপ্তমী, তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে অগ্নিশব্দের যে রূপ হয়, তার প্রয়োগ করতে হয় (১১৮)। তা হলে দেখা যাচ্ছে 'পুনরাধেয়েষ্টি'তি প্রথম চারিটি প্রযাজমন্ত্রের পাঠ এইরূপ হবে (১১৯)।

১। সমিধ্ (যাগে)—"সমিধোঽগ্নেঽগ্নে আজ্যস্য বিয়ন্তু" [কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়শাখার পাঠ 'বিয়ন্তু' অন্যশাখায় 'বিয়ন্তু' স্থলে 'ব্যন্তু' পাঠ হবে]

২। তনূনপাৎ (যাগে)—"তনূনপাদগ্নাবগ্ন আজ্যস্য বেতু।"

৩। ইড (যাগ)—ইডোঽগ্নিনাঽগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু" [এখানেও তৈত্তিরীয় শাখার পাঠ "বিয়ন্তু" অন্যশাখার পাঠ 'ব্যন্তু' হবে]।

৪। বর্হিঃ (যাগে) "বর্হিরগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু"। পূর্বপ্রদর্শিত মন্ত্রের সঙ্গে এই পরবর্তী মন্ত্রগুলিকে লক্ষ্য করলে উহাদের পরস্পরের যে পার্থক্য তা বুঝা যাবে।

সায়ণ মন্ত্রগুলির যথাক্রমে সম্বোধনান্ত অগ্নি শব্দের পূর্বে সম্বুদ্ধি, সপ্তমী, তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত অগ্নি শব্দের প্রয়োগ করতে হবে বলেছেন। নাগেশভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে লিখেছেন—প্রযাজের পাঁচটি মন্ত্রেই সম্বোধনান্ত অগ্নিশব্দের পূর্বে যথাক্রমে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত অগ্নিশব্দের প্রয়োগ করতে হবে (১২০)। কিন্তু আপস্তম্বশ্রৌত সূত্রে

---

(১১৭) নোত্তমে।—আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র—৫।২৮।৭

(১১৮) "সমিধো অগ্ন আজ্যস্য বিয়ন্তু, ইত্যাদিষু চতুর্ষু প্রযাজমন্ত্রেষু সম্বুধ্যন্তাদগ্নিশব্দাৎপূর্বং সম্বুদ্ধিসপ্তমীতৃতীয়াদ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তানামগ্নিশব্দানাং ক্রমেণ প্রয়োগং বিধত্তে।...বিভক্তয়ঃ সূত্রে দর্শিতাঃ—অগ্নেঽগ্নেঽগ্নাবগ্নেঽগ্নিনাগ্নেঽগ্নিমগ্নে ইতি চতুর্ষু প্রযাজেষু চতস্রো বিভক্তীর্দধাতি। [তৈত্তিরীয়সংহিতা—(২।৫।২) সায়ণভাষ্য] সায়ণের উদ্ধৃতসূত্রটি আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের পঞ্চমপ্রশ্নের [২৮।৬] অন্তর্গত।

(১১৯) আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের ৫ম প্রশ্নে এই অগ্নিশব্দে বিভক্তি যোগ করবার জন্য দুইপ্রকার প্রণালী উল্লিখিত আছে।

(১২০) বিভক্তয়শ্চ প্রথমাদ্বিতীয়াতৃতীয়াষষ্ঠীসপ্তম্য এবেতি শ্রৌতসম্প্রদায়ঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত—পস্পশাহ্নিক]

দেখা যাচ্ছে—অন্তিমপ্রযাজমন্ত্রে বিভক্তির যোগ হয় না। প্রথম চারিটি মন্ত্রেই বিভক্তির যোগ হয়। নাগেশভট্ট যে পাঁচটিবিভক্তির উল্লেখ করেছেন—এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে—সম্বোধন, সপ্তমী, তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বিভক্তির কথা বলেছেন। নাগেশভট্ট সম্বোধন, বিভক্তির কথা বলেন নাই! নাগেশভট্টের উক্তিতে শ্রৌতসূত্রবিরুদ্ধার্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

এখানে প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব হচ্ছে—এই যে "পুনরাধেয়েষ্টি'তে প্রযাজ মন্ত্রে বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্ত্যন্ত শব্দের প্রয়োগ করতে হয়—যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি তো সেই বিভক্তি [বিভক্ত্যন্ত] যোগ করতে পারবেন না। না পারলে তাঁর পক্ষে ঐ "পুনরাধেয়েষ্টি" কর্ম করা সম্ভব হবে না। এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত। এই প্রযাজমন্ত্রে বিভক্তিযোগ করবার বিধি তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। সেখানে বিধিবাক্যের আকার "বিভক্তয়ো ভবন্তি" এইরূপ বর্ণিত আছে। মহাভাষ্যকার যে বিধি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন তার আকার "প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্যাঃ" এইরূপ। মহাভাষ্যকার অন্য কোন শাখা থেকে উক্ত বিধিবাক্য আহরণ করেছেন। এই বাক্য দেখে মনে হয় মহাভাষ্যকারের সময় অন্যকোন বেদশাখা প্রচলিত ছিল, যা এখন প্রচলিত নাই। তা থেকে মহাভাষ্যকার উহা উদ্ধৃত করেছেন ॥ ২১ ॥

মূল

*"যো বা ইমাম্'

যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং
বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।
আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।
"যো বা ইমাম্।" ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যিনি বাক্ অর্থাৎ শব্দকে, প্রত্যেকপদ, প্রত্যেক স্বর, প্রত্যেক অক্ষর [দ্বারা] জানেন, তিনিই আর্ত্বিজীন [ঋত্বিক্ কর্মের যোগ্য] হন। আমরা আর্ত্বিজীন হতে পারি—এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২২ ॥

পদার্থবর্ণনাঃ—পদশঃ—'পদং পদং' এইরূপ বীপ্সা অর্থে "সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্" [৫।৪।৪৩] সূত্রানুসারে 'শস্' প্রত্যয় হয়েছে। অর্থ—প্রত্যেক পদ।

* স্বরশোঽক্ষরশশ্চ বাচং" এইরূপ পাঠান্তর অনেক পুস্তকে আছে।

"স্বরশঃ" "অক্ষরশ:"— এই দুই স্থলেও পূর্বের মত শস্ প্রত্যয়ঃ। অর্থ—প্রতিস্বর প্রতিঅক্ষর।

আর্ত্বিজীনঃ = ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর 'ঋত্বিক্‌কর্মাহ'তি' এই অর্থে ' যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং তৎকর্মাহ'তীত্যুপসংখ্যানম্" [১৷৭১৷১] এই বার্তিক সূত্রে 'খঞ্' প্রত্যয় করে 'ঋত্বিক্' অর্থে 'আর্ত্বিজীনঃ' পদ সিদ্ধ হয়। আর ঋত্বিজমহ'তি অর্থাৎ ঋত্বিক্ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য যজমান এইরূপ অর্থে—"যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ" [৫৷১৷৭১] এই সূত্রানুসারে 'খঞ্' প্রত্যয় করে = যজমান অর্থে উহা নিষ্পন্ন হয়॥ ২২ ॥

বিবৃতি—"যো বা ইমাম্" এখানে 'বৈ' এই অব্যয়ের সন্ধি হয়ে 'বা' এইরূপ হয়েছে। বৈ' শব্দের অর্থ অবধারণ [নিশ্চয়]। 'বৈ' শব্দটি 'যঃ' শব্দের পর পঠিত হলেও উহার অন্বয় "সঃ" এই পরবর্তী শব্দের সঙ্গে হবে। এইজন্য এই 'বৈ' শব্দকে 'সঃ' শব্দের পর এনে অন্বয় করতে হবে। এইভাবে একস্থানে পঠিত শব্দকে যে অন্যস্থানে নিয়ে অন্বয় করা হয়, সেরূপস্থলে এইরূপ শব্দকে ভিন্নক্রম বলা হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলে শব্দটি পঠিত হওয়া উচিত ছিল, সেস্থলে পঠিত হয় নাই। সুতরাং উক্ত বাক্যটিকে অন্বয় করবার সময় এইভাবে পাঠ করতে হবে "য ইমাং বাচং পদশঃ স্বরশঃ অক্ষরশঃ বিদধাতি সঃ বৈ আর্ত্বিজীনঃ ভবতি।"

'পদশঃ' —এস্থলে "সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্" (১২১) এই সূত্র অনুসারে একবচনান্ত পদশব্দের উত্তর বীপ্সা অর্থে 'শস্' প্রত্যয় হয়েছে। এখানে 'পদ বলতে সুব্‌বিভক্তি যুক্ত বা তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত শব্দকে বুঝতে হবে। 'স্বর'শব্দ এবং 'অক্ষর' শব্দের উত্তরও এইরূপ 'শস্' [তদ্ধিত] প্রত্যয় করে যথাক্রমে 'স্বরশঃ' ও 'অক্ষরশঃ' এই দুইটি পদ সিদ্ধ হয়েছে। এখানে 'স্বর' শব্দের দ্বারা উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং একশ্রুতি স্বর (১২২) বুঝতে হবে। স্বর শব্দের

---

(১২১) [অষ্টাধ্যায়ী ৫৷৪৷৪৩]—সংখ্যাবাচিভ্যঃ প্রাতিপদিকেভ্য একবচনাচ্চ বীপ্সায়াং দ্যোত্যায়াং শস্‌প্রত্যয়ো ভবত্যন্যতরস্যাম্।—কাশিকা। সংখ্যাবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর এবং একবচনান্ত শব্দের উত্তর বীপ্সা অর্থে বিকল্পে শস্ প্রত্যয় হয়। "পদশঃ" এইস্থলে 'পদম্, পদম্,' এইরূপ বিগ্রহে বীপ্সা অর্থে শস্। 'স্বরশঃ এবং অক্ষরশঃ' এই দুই স্থলেও এইরূপ বুঝতে হবে। তিনস্থলেই একবচনান্ত শব্দের উত্তর 'শস্' প্রত্যয় হয়েছে।

(১২২) স্বর উদাত্তাদিঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং শব্দকৌস্তুভ।

দ্বারা এখানে কেবল অকার, ইকার প্রভৃতি বর্ণকে বুঝানো হয় নাই। পরবর্তী অক্ষর শব্দের দ্বারাই অকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ এখানে অক্ষর শব্দের অর্থ ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বরবর্ণ (১২৩)।

পাণিনির পূর্ববর্তী কোন বৈয়াকরণ তাঁর ব্যাকরণে বর্ণমাত্রকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করেছিলেন—ইহা মহাভাষ্যকার প্রত্যাহার আহ্নিকের শেষে [১।১।২] বলেছেন। তদনুসারে এখানে, অক্ষর শব্দের দ্বারা সমস্ত বর্ণ ই গৃহীত হতে পারে (১২৪)। অক্ষর শব্দের দ্বারা সমস্ত বর্ণের গ্রহণ হওয়ায়, শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি এখানে ভাল। এই ব্যাখ্যাটি পূর্বব্যাখ্যা থেকে ব্যাপক বলে ইহা আদরণীয় (১২৫)।

এখানে 'বিদধাতি' ক্রিয়াপদটি যদি ও 'করোতি' [করে] এই ক্রিয়াপদের সমানার্থক তথাপি অর্থের সঙ্গতির জন্য 'জানাতি' এই ক্রিয়াপদের অর্থে এখানে ব্যবহৃত। সুতরাং ইহার অর্থ 'জানে'।

"আর্ত্বিজীন" এই শব্দটি 'ঋত্বিজ্' শব্দের উত্তর "যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ" এই সূত্রের দ্বারা 'খঞ্' প্রত্যয় করে সিদ্ধ হয়েছে। এই সূত্রে 'তদর্হতি' [৫।১।৬৩] সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। এই অনুবৃত্তির সহিত পূর্ব প্রদর্শিত সূত্রের অর্থ—তাহার যোগ্য এই অর্থে 'যজ্ঞ' ও 'ঋত্বিজ্' শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'ঘ' ও 'খঞ্' প্রত্যয় হয়। 'ঋত্বিজমর্হতি' এইরূপ বিগ্রহবাক্যে ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর খঞ্ প্রত্যয় হয়ে থাকে। এই 'খঞ্' প্রত্যয়ের 'ঞ্' ইৎসংজ্ঞক হওয়ায় তার লোপ হযে 'খ' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই 'খ' এর স্থানে "আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্" [৭।১।২] এই সূত্র অনুসারে 'ঈন' আদেশ হয়। 'খঞ্'

---

(১২৩) অক্ষরং ব্যঞ্জন সহিতোঽচ্।—মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং শব্দকৌস্তুভ। শৌনকপ্রণীত ঋক্প্রাতিশাখ্যে ব্যঞ্জনসহিত অথবা অনুস্বার সহিত স্বরবর্ণকে অক্ষর বলা হয়েছে, ব্যঞ্জনরহিত ও অনুস্বাররহিত স্বরবর্ণকেও অক্ষর বলা হয়েছে। "সব্যঞ্জনঃ সানুস্বারঃ শুদ্ধো বাঽপি স্বরোঽক্ষরম্" [১৮।২৮] ব্যঞ্জনেন যুক্তোঽনুস্বারেণ সহিতোঽথবাঽনুস্বারব্যঞ্জনাভ্যাং রহিতঃ স্বরঃ" অক্ষরসংজ্ঞকো ভবতি।—উব্বট কৃত প্রাতিশাখ্য ভাষ্য।

(১২৪) "বর্ণং বাহুঃ পূর্বসূত্রে" ইতি ভাষ্যাদ্বর্ণমাত্রমিত্যন্যে।—মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত।

(১২৫) যাস্কের নিরুক্তে [২।২৩, ২।২৪, ১১।৪১] অক্ষরশব্দের বাক্ ও জল, এই দুই অর্থ স্বীকৃত হয়েছে। এখানে এই দুই অর্থের একটি অর্থেরও সঙ্গতি নাই বলে—তাদের একটি অর্থও গৃহীত হবার যোগ্য নয়।

প্রত্যয়টি 'ঞিং' বলে তদ্ধিতেষচামাদেঃ, [৭।২।১১৭] (১২৬) এই সূত্র অনুসারে ঋত্বিজ্ শব্দের আদিস্বর 'ঋ' কারের বৃদ্ধি [আর] হয়ে 'আর্ত্বিজীন' শব্দটি সিদ্ধ হয়।

এই 'আর্ত্বিজীন' শব্দের অর্থ যিনি ঋত্বিক্প্রাপ্ত হবার যোগ্য অর্থাৎ যজমান —যাগকর্তা। তাহলে দেখা যাচ্ছে—যিনি পূর্বোক্তপ্রকারে শব্দের জ্ঞান অর্জন করেছেন, যিনি শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ, তিনিই যজমান হবার যোগ্য অর্থাৎ যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠাতা হবার যোগ্য।

'আর্ত্বিজীন' শব্দের আরও একটি অর্থ আছে। "যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ" [৫।১।৭] এই সূত্রে একটি বার্তিক আছে—"যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং তৎকর্মার্হতীত্যুপসংখ্যানম্" যজ্ঞকর্ম ও ঋত্বিক্ কর্মের যোগ্য এই অর্থে—যথাক্রমে যজ্ঞ ও ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'ঘ' এবং 'খঞ্' প্রত্যয় হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে—যিনি ঋত্বিকের কর্মে যোগ্য তাঁহাকেও 'আর্ত্বিজীন' শব্দে অভিহিত করতে পারা যায়। পূর্বোদ্ধৃত বাক্যের 'আর্ত্বিজীন' শব্দের দুটি অর্থ হলো,—যজমান এবং ঋত্বিকের কর্মে যোগ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে—যিনি শব্দশাস্ত্রজ্ঞ—বৈয়াকরণ তিনিই স্বয়ং যাগের অনুষ্ঠাতা যজমান হতে পারেন এবং অন্য কর্তৃক যাগের অনুষ্ঠানে ঋত্বিক্ হতে পারেন। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত বাক্যের পর্যবসিত অর্থ হচ্ছে—যিনি বিদ্বান্—বেদার্থে অভিজ্ঞ তিনিই যাগের অনুষ্ঠান করবেন এবং তিনিই ঋত্বিকের কার্যও করবেন (১২৭)। যাঁর বেদার্থে অভিজ্ঞতা নাই তাঁর যজমান হবার বা ঋত্বিক্ হবার যোগ্যতাও নাই। বেদার্থে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব যিনি স্বর্গাদি ফলের কামনায় স্বয়ং যাগের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক এবং যিনি অন্যের অনুষ্ঠিত যাগে দক্ষিণাদি লাভেচ্ছায় ঋত্বিক্ হতে ইচ্ছুক—তাঁদের উভয়ের পক্ষেই ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২২ ॥

---

(১২৬) তদ্ধিতে ঞিতি ণিতি চ প্রত্যয়ে পরতোঽঙ্গস্যাচামাদেরচঃ স্থানে বৃদ্ধির্ভবতি।—কাশিকা।

(১২৭) 'বিদ্বান্ যজেত' 'বিদ্বান্ যাজয়েদি'তি দ্বয়োরপি বিদুষোরধিকারাৎ। [মহাভাষ্যপ্রদীপ] সকৃৎ প্রযুক্তস্যার্ত্বিজীনশব্দস্যোভয়পরত্বে যুক্তিমাহ—বিদ্বানিতি—বেদার্থজ্ঞ ইত্যর্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। যজনে যাজনে চ বিদুষ এবাধিকার ইতি ভাবঃ।—শব্দকৌস্তুভ।

'ঋত্বিজমর্হতি' ইতি 'ঋত্বিক্ কর্মার্হতি' ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা আর্ত্বিজীনপদং যাজ্যযাজকোভয়পরম্। —ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১।১।

মূল।

'চত্বারি'*

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ॥

[ঋক্‌সংহিতা ৪।৫৮।৩, বাঃ সঃ ১৭।৯১, মৈঃ সঃ ১।৬।২ কাঃ সঃ ৭০।৭]

'চত্বারি শৃঙ্গাণি' চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। 'ত্রয়ো অস্য পাদাঃ' ত্রয়ঃ কালা ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানাঃ। 'দ্বে শীর্ষে' দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ। 'সপ্ত হস্তাসো অস্য' সপ্ত বিভক্তয়ঃ। 'ত্রিধা বদ্ধঃ' ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। 'বৃষভো' বর্ষণাৎ। 'রোরবীতি' শব্দং করোতি। কুত এতৎ? রৌতিঃ শব্দকর্মা। 'মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশে'তি মহান্ দেবঃ শব্দঃ। 'মর্ত্যা' মরণধর্মাণো মনুষ্যাস্তানাবিবেশ। মহতা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥২৩॥

অনুবাদ—ইহার [শব্দের—শব্দ ব্রহ্মের] চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পদ, ইহার দুইটি মস্তক, সাতটি হাত। [এই] বৃষভ তিন প্রকারে বদ্ধ [হয়ে] রব করছেন; মহান্ দেবতা মর্ত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

'চারিটি শৃঙ্গ' চার প্রকার পদসমূহ—নাম [সুব্‌বিভক্তিযুক্তশব্দ (১২৮)] [তিঙ্‌বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়াপদ (১২৯)] উপসর্গ এবং নিপাত। 'ইহার তিনটি

---

* বর্তমান সময়ে—প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ প্রদর্শনের জন্য পুস্তকে 'প্যারাগ্রাফ' [paragraph] ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন কালে এরূপ প্যারাগ্রাফের ব্যবহার ছিল না। এই জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ দেখাবার জন্য মহাভাষ্যকার অনেকস্থলে এইরূপ প্রতীকের দ্বারা সেই সব প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ করেছেন। এইগ্রন্থে পূর্বে প্রত্যেক স্থলে এইরূপ প্রতীকের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তারদ্বারাই পাঠক 'প্রতীক' ব্যবহারের উদ্দেশ্য বুঝে নিবেন। অতএব প্রত্যেক স্থলে তার আর ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন হবে না।

(১২৮) নামশব্দেন সুবন্তম্, নমত্যাখ্যাতার্থং প্রতি বিশেষণীভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত]।

(১২৯) আখ্যাতম্—তিঙন্তম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

পদ' তিন কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান। 'দুইটি মস্তক' শব্দের দুইটি স্বরূপ—নিত্য [উৎপত্তিবিনাশশূন্য] এবং কার্য [উৎপত্তিশীল]। 'ইহার সাতটি হস্ত'—সাতটি বিভক্তি। 'তিন প্রকারে বদ্ধ'—তিন স্থানে বদ্ধ—বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠদেশে এবং মস্তকে। 'রোরবীতি' শব্দ করছেন। কি কারণে ইহা [হচ্ছে—এই অর্থ পাওয়া যাচ্ছে]? 'রু, ধাতুর অর্থ শব্দ করা [রব করা—বলা]।

'মহান্ দেবতা মর্ত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, মহান্ দেব—শব্দ, [তিনি—সেই শব্দরূপী দেবতা] মর্ত্য-মরণশীল [যে] মনুষ্য, তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

মহান্ দেবের সহিত আমোদের যাতে সাম্য হতে পারে, এই [হেতু] ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২৩ ॥

পদ পরিচয়:—এই উদ্ধৃত ঋক্‌টিতে তিনটি বৈদিক পদ আছে। —'শৃঙ্গা' 'হস্তাসঃ' এবং মর্ত্যাঁ। (১) শৃঙ্গা—ক্লীবলিঙ্গ, শৃঙ্গ শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের বৈদিক রূপ (১৩০) লৌকিক প্রয়োগে এই স্থলে 'শৃঙ্গাণি' এইরূপ হয়।

(২) হস্তাসঃ—পুংলিঙ্গ হস্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনের বৈদিক রূপ (১৩১); লৌকিক প্রয়োগে এই স্থলে 'হস্তাঃ' এইরূপ হয়।

(৩) 'মর্ত্যাঁ আবিবেশ' এস্থলে 'মর্ত্যাঁ' এইরূপ বৈদিক সংস্কৃতেই হয়। লৌকিক সংস্কৃতে ইহার স্থলে 'মর্ত্যান্' এই প্রকার প্রয়োগ হয়। 'মর্ত্যান্+অবিবেশ, এই অবস্থায় "দীর্ঘাদটি সমান পাদে" (১৩২) [৮।৩।৯] এই সূত্রে

---

(১৩০) 'শেশ্ছন্দসি বহুলম্' [৬।১।৭০]। শি ইত্যেতস্য বহুলং ছন্দসি বিষয়ে লোপো ভবতি।—কাশিকা। উদাহরণ—'যা ক্ষেত্রা' এখানে লৌকিক সংস্কৃতে 'যানি ক্ষেত্রাণি' এই রূপ হয়।

(১৩১) আজ্জসেরসুক্ [৭।১।৫০]। অবর্ণান্তাদঙ্গাদুত্তরস্য জসে রসুগাগমো ভবতি ছন্দসি বিষয়ে। কাশিকা।

উদাহরণ—'ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ', এখানে লৌকিক সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে 'ব্রাহ্মণাসঃ' এইস্থলে 'ব্রাহ্মণাঃ' এবং 'সোম্যাসঃ' এই স্থলে 'সোম্যাঃ' এইপ্রকার রূপ প্রাপ্ত ছিল।

(১৩২) ন ইত্যনুবর্ততে। দীর্ঘাদুত্তরস্য পদান্তস্য নকারস্য রুর্ভবতি অটি পরতঃ, তৌ চেন্নিমিত্ত-নৈমিত্তিনৌ সমান পাদে ভবতঃ। ঋক্ষিবতি [৮।৩।৮] প্রকৃতত্বাদ্ ঋক্‌পাদ ইহ গৃহ্যতে। কাশিকা।

অনুসারে 'ন্' স্থানে 'রু' হয়। 'রু'র উকারের ইৎ সংজ্ঞা ও তার লোপ হওয়ার পর 'র্' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তারপর "আতোঽটি নিত্যম্" [৮৷৩৷৩] (১৩৩)। এই সূত্র অনুসারে 'য' কারের পরবর্তী আকার অনুনাসিক হয়। তারপর 'ভোভগো অঘো অপূর্বস্য যোঽশি' (১৩৪) [৮৷৩৷১৭] এই সূত্র অনুসারে 'রু' র 'র' স্থানে 'য্' হয়। তারপর 'লোপঃ শাকল্যস্য' [৮৷৩৷১৯] এই সূত্র অনুসারে 'য' লোপ হয়ে 'মর্ত্যাঁ আবিবেশ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রের "মহো দেবঃ" এই অংশটিকে 'মহান্ দেবঃ' এই প্রতিশব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

'মহান্ + দেবঃ' এই অবস্থায় বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে 'মহো দেবঃ' এই প্রকার প্রযোগ সিদ্ধ করা যেতে পারে। তাতে একটু কষ্ট কল্পনা করতে হয়। এই জন্য শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার ভাষ্যকার মহীধর অন্যভাবে এই প্রয়োগের সাধন করেছেন। তিনি বলেছেন 'মহ' এই অকারান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তির একবচনে 'মহঃ' এইরূপ যে পদ হয়, তার সঙ্গে 'দেবঃ' এই শব্দের সহযোগে সন্ধি হলে 'মহোদেবঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'মহঃ' শব্দটি 'মহান্' শব্দের সমানার্থক বলে 'মহোদেবঃ, এর অর্থ 'মহান্ দেবঃ' হয় (১৩৫)॥ ২৩॥

---

(১৩৩) অটি পরতো রোঃ পূর্বস্যাকারস্য স্থানে নিত্যমনুনাসিকাদেশো ভবতি।—কাশিকা।

(১৩৪) ভো ভগো অঘো ইত্যেবং পূর্বস্য অবর্ণপূর্বস্য চ রো রেফস্য যকারাদেশোভবতি. অশি পরতঃ।—কাশিকা।

(১৩৫) মহতি=পূজয়তি, মহ্যতে বা জনৈরিতি মহো মহান্।—বাজসনেয়িসংহিতার মহীধর-ভাষ্য [১৭৷৯১]। এখানে 'মহতি' 'পূজয়তি' এই বিগ্রহে ভ্বাদি মহ্‌ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় করে 'মহ' শব্দ সিদ্ধ হয়। যদিও 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ' [৩৷১৷১৩৪] এই সূত্রে পচপ্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'অচ্' প্রত্যয়ের বিধান করা হয়েছে, তথাপি এই সূত্রের মহাভাষ্যে একটি বার্তিক পঠিত আছে—"অজ্‌বিধিঃ সর্বধাতুভ্যঃ।" এই বার্তিকের দ্বারা সমস্তধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় বিহিত হয়েছে। সুতরাং এস্থলে 'মহ' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'অচ্' প্রত্যয় করতে কোন বাধা নাই। যখন 'মহতি পূজয়তি' এইরূপ বিগ্রহকরা হয়, সে সময় মহধাতুর 'পূজা করা' এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় না। কারণ তখন ধাতুর এরূপ অর্থগ্রহণ করলে 'মহঃ' শব্দের অর্থের সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য এই স্থলে 'মহ' ধাতুর 'পূজিত হওয়া' এইরূপ অর্থগ্রহণ করতে হবে। তা হলে যিনি পূজিত হন, 'মহ' শব্দের দ্বারা তাঁকে বুঝাতে পারে। সুতরাং 'মহ' শব্দ এবং 'মহান্' শব্দ সমানার্থকরূপে পরিগণিত হতে পারে। অথবা যিনি মহান্, তিনি সকলকে পূজা করেন, কাহাকেও অনাদর করেন না.—এইরূপ অর্থও এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে কোন কষ্ট

বিবৃতি :—এই মন্ত্রে শব্দ ব্রহ্মকে বৃষভরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার—ইহাই প্রতিপাদন করেছেন। বৃষভরূপে বর্ণিত হলেও সাধারণ বৃষ অপেক্ষা শব্দব্রহ্মরূপ বৃষের কোন কোন বিষয়ে বৈলক্ষণ্যও প্রতিপাদিত হয়েছে। সাধারণ বৃষের দুটি শৃঙ্গ, এই শব্দব্রহ্ম বৃষের শৃঙ্গ চারিটি। ইতর বৃষের পশ্চাদ্ভাগে দুইটি পদ, এই বৃষের পশ্চাতে তিনটি পদ। অন্য বৃষের সম্মুখভাগে দুইটি হস্ত, এই বৃষের সম্মুখভাগে সাতটি হস্ত। এখানে একটি দ্রষ্টব্য এই যে—বৃষের হস্ত নাই, পদই আছে। এইজন্য শাস্ত্রে যেখানে যেখানে ধর্মকে বৃষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল স্থলে বৃষকে চতুষ্পদরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উদ্ধৃত "চত্বারি শৃঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষের সম্মুখবর্তী পদকে হস্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ বৃষের একটি মস্তক, এই শব্দরূপী বৃষের দুইটি মস্তক। সাধারণ বৃষকে সাধারণতঃ একস্থানে বন্ধন করা হয়, এই বৃষ তিন স্থানে বদ্ধ।

সাধারণত কোন বাক্যে যতগুলি শব্দ থাকে—সেইগুলিকে প্রাতিপদিক ও আখ্যাত—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এস্থলে মহাভাষ্যকারের ব্যবহৃত 'নাম' শব্দ 'প্রাতিপাদিক' শব্দের সমানার্থক। বিভক্তি দুই প্রকার সুপ্ বিভক্তি এবং তিঙ্ বিভক্তি ১৩৬)। যে সকল শব্দের উত্তর সুপ্ বিভক্তির বিধান আছে, তারা 'নাম' অথবা 'প্রাতিপদিক'। যে সকল শব্দের উত্তর তিঙ্ বিভক্তির বিধান আছে তাহাদিগকে ধাতু বলে। এই তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত ধাতুঘটিত পদকে আখ্যাত বলে। এখানে মহাভাষ্যকার 'নাম' থেকে

কল্পনা করতে হয় না। অমর কোষের ভানুজীদীক্ষিতের টীকায় স্বর্গবর্গের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ অচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'মহ' শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে।

'মহ্যতে জনৈঃ' এইরূপ বিগ্রহ করলে চুরাদি 'মহ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'মহ' শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে ইহা বুঝতে হবে। এই মহ ধাতু অদন্ত হওয়ায় ঘঞ্ প্রত্যয় করলে মকারের পরবর্তী অকারের স্থানে বৃদ্ধির প্রাপ্তি না থাকায় সেই অকারস্থানে আকার হবে না। এস্থলে "অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্" [৩।৩।১৯] এই সূত্র অনুসারে কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হয়েছে বুঝতে হবে। যদিও এই সূত্রে পাণিনি 'সংজ্ঞায়াম্' এই শব্দটির উপন্যাস করেছেন, তথাপি মহাভাষ্যকার সূত্রের 'সংজ্ঞায়াম্' এই অংশের প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে সংজ্ঞা না বুঝালেও 'ঘঞ্' প্রত্যয় হতে কোন বাধা হয় না।

(১৩৬) বিভক্তিশ্চ [১।৪।১০৪]।

সুপ্ তিঙৌ বিভক্তিসংজ্ঞৌ স্তঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পৃথগ্‌ভাবে 'উপসর্গ' ও 'নিপাতের' উল্লেখ করেছেন। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে যাস্কও এইরূপ নাম থেকে পৃথগ্‌ভাবে 'উপসর্গ' ও 'নিপাতের' উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ 'উপসর্গ' ও 'নিপাত' নামেরই অন্তর্গত, নাম থেকে ভিন্ন জাতীয় শব্দ নয়। রাম, হরি নদী, প্রভৃতি 'নাম' থেকে উপসর্গ ও নিপাতের কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। ধাতুর সঙ্গেই উপসর্গের প্রয়োগ হয়। ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই উপসর্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এইরূপ নিপাতের প্রয়োগও অন্যশব্দের সহিত হলেই নিপাত নিজের অর্থকে প্রকাশ করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে নিপাত কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। রাম, হরি, ঘট, পট ইত্যাদি নামগুলি নিজের অর্থ প্রকাশ করতে অন্যের অপেক্ষা করে না। এই বিশেষত্বকে লক্ষ্য করে 'নাম' থেকে 'উপসর্গ' ও 'নিপাতকে' পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'উপসর্গ' যদিও 'নিপাতের'ই অন্তর্গত, তথাপি অন্য নিপাত থেকে উপসর্গের বিশেষত্ব আছে। উপসর্গের প্রয়োগ ধাতুর সঙ্গেই হয়; নিপাতের প্রয়োগ অন্য শব্দের সঙ্গেও হয়ে থাকে। এইজন্য 'নিপাত' থেকে 'উপসর্গ' পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হয়েছে (১৩৭)।

---

(১৩৭) পদের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আচার্যগণের মতভেদ দেখা যায়। পাণিনি সুবন্ত ও তিঙন্তভেদে পদসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—"সুপ্‌তিঙন্তং পদম্‌" [১।৪।১৪] সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। রাম, ঘট, পট ইত্যাদি শব্দের মত উপসর্গ ও নিপাতের উত্তরও সুপ্‌ বিভক্তি হয় বলে পাণিনি তাদের অবান্তর বিশেষত্বকে উপেক্ষা করে পদসমূহকে দুই শ্রেণীতেই ভাগ করেছেন। অবশ্য ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাম প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'সুপ্‌' বিভক্তির সর্বত্র লোপ হয় না, কিন্তু উপসর্গ ও নিপাতের উত্তর বিহিত সুপ্‌ বিভক্তিমাত্রেরই লোপ হয়।

নিরুক্তকার যাস্ক, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, বৃহদ্দেবতাকার শৌনক উপসর্গ এবং নিপাতকে নামের অন্তর্গতরূপে গ্রহণ না করে, পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করেছেন। এইজন্য ইঁহাদের মতে পদ চারপ্রকার।

অপর এক সম্প্রদায় পদসমূহকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের মতে—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং কর্মপ্রবচনীয়ভেদে পদ পাঁচ প্রকার। যখন প্র, পরা, প্রভৃতি শব্দ, ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত বা পরিবর্তিত করে, তখন তাহাদিগকে উপসর্গ বলা হয়। আর যখন এই প্র, পরা প্রভৃতি শব্দ এই ভাবে সম্বদ্ধ হয় না, কিন্তু সম্বন্ধের দ্যোতক হয়, সেই অবস্থায় তাদের কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। [বাক্যপদীয় ২।২০৬]।

ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ের তৃতীয় কাণ্ডে পদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে এই মতভেদের উল্লেখ করেছেন—

ব্যাকরণে যে সকল ক্রিয়াপদের সাধন করা হয়েছে, সেই ক্রিয়া পদগুলি বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত—এই তিন কালকে প্রকাশ করে। এই ভাবে শব্দ-শাস্ত্রের সহিত তিনটি কালের সম্বন্ধ আছে। এইহেতু শব্দবৃষভের বর্ণনায় তিন কালকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুসারে ক্রিয়াপদ না থাকলে কোন বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। ব্যাক্যের পূর্ণতা ক্রিয়াপদের উপর নির্ভর করে। এই ক্রিয়াপদ গুলি তিনটি কালের কোন একটি কালকে প্রকাশ করে থাকে। এইজন্য তিন কালকে শব্দবৃষভের পদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পদের সাহায্যে যেমন সমস্ত শরীরের গমনাগমনাদি ব্যাপার সম্পাদিত হয়, সেইরূপ কালপ্রতিপাদক ক্রিয়া পদের উপরই সমগ্র বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিপাদন ব্যাপার নির্ভর করে। তিন কালকে শব্দবৃষভের তিন পদরূপে বর্ণনা করার এই অভিপ্রায়।

'স্ফোট' নামক যে অখণ্ডশব্দের বিষয়ে পূর্বে বলা হয়েছে, তাহাই শব্দের নিত্য স্বরূপ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে, তাহাই শব্দের কার্যস্বরূপ। যে ধ্বনিকে বৈয়াকরণ সম্প্রদায় নিত্য স্ফোটের অভিব্যক্তির কারণ স্বীকার করেছেন তাকেও শব্দের কার্যস্বরূপ বলা যায় (১৩৮)।

দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাঽপি বা।
অপোদ্ধৃত্যৈব বাক্যেভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবৎ॥

বাক্য অখণ্ড বলে তার কোন অবয়ব নাই। সুতরাং এইরূপ পদের শ্রেণীবিভাগ পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিভাগের মত কাল্পনিক।

(১৩৮) শব্দের দুইটি স্বরূপ—একটি ব্যঙ্গ্য এবং অপরটি ব্যঞ্জক। ইহাদের মধ্যে ব্যঙ্গ্য স্বরূপটি নিত্য এবং ব্যঞ্জক স্বরূপটি কার্য [অনিত্য]। কৈয়টের ব্যাখ্যা থেকে ইহা বুঝা যায়। কোনটি শব্দের ব্যঙ্গ্য স্বরূপ এবং কোনটি ব্যঞ্জক স্বরূপ, সে বিষয়ে কৈয়ট স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। মাধবাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহের পাণিনিদর্শনে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে কৈয়টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও কোনটি ব্যঙ্গ্যস্বরূপ, কোনটি ব্যঞ্জক স্বরূপ সে বিষয়ে মৌনাবলম্বন করেছেন।

ব্যাকরণ সিদ্ধান্তসুধানিধিতে বলা হয়েছে—

"ব্যঞ্জকব্যঙ্গ্যভেদেন কার্যনিত্যয়োর্বর্ণাখণ্ডস্ফোটাত্মকয়োর্দ্বয়ম্"

এর তাৎপর্য হচ্ছে—ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যভেদে শব্দ দুই প্রকার। তারমধ্যে ব্যঞ্জকশব্দ কার্য এবং ব্যঙ্গ্যশব্দ নিত্য। বর্ণাত্মক শব্দ কার্য এবং অখণ্ডস্ফোট নিত্য।

বর্ণাত্মক শব্দ বলতে প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি বুঝায়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয়াদিবিভাগ-দ্বারা অখণ্ডস্ফোটেরই প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি নিত্য অখণ্ড স্ফোটের

শব্দের এই দুইটি বিভিন্ন স্বরূপকে শব্দবৃষভের মস্তক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শরীরের মধ্যে মস্তকই প্রধান। হস্ত পদ, প্রভৃতির অভাবেও শরীরের কিছু কার্যকারিতা থাকে; মস্তকের অভাবে শরীরের কোন কার্যকারিতা থাকে না; সে অবস্থায় শরীর থাকলেও তার অবস্থা না থাকার মতই হয়। শব্দের এই দুইটি স্বরূপকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে শব্দের ও কোন কিছু থাকে না। এইজন্য নিত্য ও কার্য স্বরূপকে শব্দবৃষভের মস্তকরূপে বর্ননা করা হয়েছে।

প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি সাতটি বিভক্তিকে শব্দবৃষভের হস্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হস্ত না থাকলে শরীর বিকল হয়, শরীরের কার্যকারিতা অনেক অংশে নষ্ট হয়; এইরূপ সাতটি বিভক্তিকে ত্যাগ করলে বাক্যের অঙ্গ হানি ঘটে, বাক্যের অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য অনেক অংশে নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে এই সাতটি বিভক্তিকে শব্দবৃষভের হস্তরূপে বর্ণনা করা হযেছে।

এই শব্দবৃষভ তিন স্থানে বদ্ধ; সাধারণ বৃষভকে গোশালায় বা গোষ্ঠে বন্ধন করা হয়। কিন্তু শব্দ বৃষভ হৃদয, কণ্ঠ ও মস্তকে বদ্ধ। বর্ণের উচ্চারণ স্থান—এই তিনটি; এইজন্য শব্দবৃষভকে এই তিন স্থানে বদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পাণিনীয়শিক্ষায় বর্ণের উচ্চারণস্থান আটটি উল্লিখিত হয়েছে—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ॥

বর্ণের উচ্চারণস্থান আটটি—হৃদয, কণ্ঠ শীর্ষ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু।

এতে দেখা যাচ্ছে—মহাভাষ্যের সহিত পাণিনীয় শিক্ষার বিরোধ হচ্ছে। এই বিরোধের সমাধান করতে গেলে বলতে হয়—মহাভাষ্যে যে কণ্ঠস্থানের কথা

ব্যঞ্জক। যাহা স্ফোটের অভিব্যঞ্জক তাকে বর্ণ বলে গ্রহণ করলে স্ফোটের অভিব্যঞ্জক ধ্বনিও কার্য-শব্দরূপে গৃহীত হতে পারে। বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে ধ্বনিকে স্ফোটের অভিব্যঞ্জক বলা হয়েছে। সুতরাং ধ্বনিকে শব্দের কার্যস্বরূপ বললেও কোন দোষ হয় না।

অর্থের অভিব্যঞ্জক অখণ্ডশব্দই 'স্ফোট' নামে অভিহিত হয়—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। [৩২ পৃষ্ঠার ১৯ নং ও ২০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য]। স্ফোট শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা স্ফোটশব্দের অভিব্যঞ্জক অর্থই প্রতিপাদিত হযেছে। স্ফোট যেমন অর্থের অভিব্যঞ্জক সেইরূপ ধ্বনির ও ব্যঙ্গ্যই বটে। এই ব্যঙ্গ্য অর্থেও স্ফোট শব্দের ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

'স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ'।

[কেনোপনিষদের শাঙ্কর বাক্যভাষ্যের আনন্দগিরিটীকা ১'৪

বলা হয়েছে, তার দ্বারা কণ্ঠের সন্নিহিত মুখের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের কথাই সূচিত হয়েছে —(১৩৯)। সুতরাং মহাভাষ্যের সহিত পাণিনীয়শিক্ষার কোন বিরোধ নাই॥

মহাভাষ্যে উদ্ধৃত এই "চত্বারি শৃঙ্গা" ইত্যাদিমন্ত্রের তাৎপর্য অবলম্বন করে ভর্তৃহরি একটি শ্লোক রচনা করেছেন—

অপি প্রযোক্তুরাত্মানং শব্দমন্তরবস্থিতম্।
প্রাহুর্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্যমিষ্যতে॥ [বাক্যপদীয় ১।১৩২]

প্রযোক্তা অর্থাৎ উচ্চারণকর্তার আত্মারূপে অন্তরে অবস্থিত শব্দকে মহান্ বৃষভরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যে শব্দব্রহ্ম, সাধক, নিজের সাধনায় ইহার সহিত সাযুজ্য লাভ করেন। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শন সংগ্রহের পাণিনীয়দর্শনে —এই মন্ত্র উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় মাধাবাচার্য মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন এবং এই মন্ত্রটি যে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদক, তারও উল্লেখ করেছেন (১৪০)।

নিরুক্ত পরিশিষ্টে [নিরুক্তের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে] এই মন্ত্রটিকে যজ্ঞ প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চার বেদ, যজ্ঞরূপী বৃষভের চারিটি শৃঙ্গ। প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় সবন এই তিনটি সবন (১৪১) যজ্ঞ-বৃষভের তিনপদ। প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় (১৪২) এই দুইটি যজ্ঞবৃষভের দুইটি

---

(১৩৯) 'কণ্ঠ' ইত্যনেন মুখান্তর্গতকণ্ঠাদিস্থানমুপলক্ষ্যতে। [মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত]

(১৪০) মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'রোরবীতি' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—'শব্দং করোতি'। মাধবাচার্য বলেছেন 'শব্দ' শব্দেন প্রপঞ্চো 'বিবক্ষ্যতে'। এস্থলে 'শব্দ' শব্দের প্রতিপাদ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ। এর তাৎপর্য হচ্ছে—জগতে দুটি বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—শব্দ ও অর্থ বা নাম ও রূপ। ইহাদের মধ্যে ঘট, পট বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দ [নাম] গুলি এক অখণ্ড শব্দের নানারূপে বিকাশ। এই সকল শব্দের [নামের] সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ রূপের [ঘট, পট প্রভৃতি অর্থের] উৎপত্তির কারণও সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড শব্দব্রহ্ম। মাধবাচার্য যেমন এই মন্ত্রটিকে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন—সেইরূপ ভর্তৃহরির এই মতও তাঁর কারিকায় পাই।

(১৪১) 'সবন' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোমযাগে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে ভিন্নভিন্ন পদ্ধতি ক্রমে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তার নাম 'সবন'।

(১৪২) প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়—এই দুইটি বিভিন্ন দুটি ইষ্টির [যাগবিশেষের] নাম। সোমযাগে এই দুইটি ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়।

মস্তক। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দঃ (১৪৩), এই যজ্ঞবৃষভের সাতটি হস্ত। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কল্প [যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি], এই তিনটির দ্বারা যজ্ঞবৃষভ তিন ভাবে বদ্ধ। ঋগ্‌মন্ত্র, যজুর্মন্ত্র এবং সামমন্ত্রের দ্বারা এই মহান্ দেব যজ্ঞ মনুষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এই শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা মনুষ্যেরই যে যজ্ঞে অধিকার তাহা সূচিত হয়েছে (১৪৪)।

যদিও নিরুক্ত পরিশিষ্টে যজ্ঞের প্রতিপাদকরূপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তথাপি এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে এই মন্ত্রের দ্বারা সকল যজ্ঞেরই প্রতিপাদন করা হয়েছে ইহা বলা যায় না। যে সকল পদার্থকে যজ্ঞবৃষভের অবয়বরূপে কল্পনা করা হয়েছে সে সকল পদার্থ সোমযোগেই বিহিত আছে—ইহা দেখা যায়। সুতরাং নিরুক্ত পরিশিষ্টের এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই মন্ত্রটির তাৎপর্য সোমযাগেই পর্যবসিত হয়েছে।

মীমাংসাদর্শনের শাবর ভাষ্যেও [১।২।৪৬] এই মন্ত্রটি যজ্ঞের প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু নিরুক্ত পরিশিষ্টের ব্যাখ্যা অপেক্ষা শাবর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। নিরুক্ত পরিশিষ্টে চার বেদকে চারিশৃঙ্গরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শাবরভাষ্যে হোতা, অধ্বর্যু উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা এই চারজন প্রধান ঋত্বিক্‌কে চার শৃঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নিরুক্ত পরিশিষ্টে প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় নামক ইষ্টিদ্বয়কে শীর্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শাবরভাষ্যে যজমান এবং যজমানপত্নীকে যজ্ঞবৃষভের শীর্ষ বলা হয়েছে। নিরুক্তপরিশিষ্টে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প—এই তিনটি দ্বারা যজ্ঞবৃষভকে বদ্ধ বলা হয়েছে; শাবরভাষ্যে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদের দ্বারা যজ্ঞবৃষভকে বদ্ধ বলা হয়েছে। নিরুক্ত পরিশিষ্টে বৃষভ শব্দের কোন অর্থ প্রদর্শিত হয় নাই। শাবরভাষ্যে কাম্যফলকে বর্ষণ করে বলে যজ্ঞকে বৃষভ বলা হয়েছে। "রোরবীতি" এই অংশের কোন বিশেষ ব্যাখ্যা শবরস্বামী করেন নাই, কেবল 'রু' ধাতুর অর্থ

---

(১৪৩) বৈদিক ছন্দঃ ৭টি – গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।

(১৪৪) 'চত্বারি শৃঙ্গেতি বেদা বা এত উক্তাঃ। ত্রয়োঽস্য পাদাঃ সবনানি ত্রীণি। দ্বে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে। সপ্ত হস্তাসঃ সপ্ত ছন্দাংসি। ত্রিধা বদ্ধস্ত্রিধা বদ্ধো মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈঃ। বৃষভো রোরবীতি সবনক্রমেণ ঋগ্‌ভিঃ যজুর্ভিঃ সামভির্যদেনমৃগ্‌ভিঃশংসন্তি যজুর্ভির্যজন্তি সামভিঃ স্তুবন্তি, মহোদেব ইত্যেষ হি মহান দেবো যদ্‌যজ্ঞঃ। মর্ত্যা আবিবেশেতি এষ হি মনুষ্যানাবিশতি যজনায়।
[নিরুক্তপরিশিষ্ট ১৩।৭।১]

শব্দ করা (১৪৫) এইটুকু বলেছেন। ঋগ্বেদভাষ্যের উপোদ্ঘাতে যেখানে মীমাংসাসূত্র উদ্ধৃত করে—মন্ত্রের অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য আছে ইহা সমর্থন করা হয়েছে—সেইখানে সায়ণ—এই মন্ত্রটির শবরস্বামীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন। শবরস্বামী "রোরবীতি" এই অংশের কোন বিশেষ ব্যাখ্যা না করলেও সায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করেছেন। সায়ণ বলেছেন—যজ্ঞে যে স্তোত্র ও শস্ত্রাদির পাঠ করা হয় (১৪৬)। এই যজ্ঞবৃষভ পুনঃপুনঃ স্তোত্র ও শস্ত্রাদি শব্দ করে থাকেন (১৪৭)। এই মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার ১৭ অধ্যায়ে ৯১ সংখ্যক মন্ত্র। ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন—এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য যজ্ঞপুরুষ। শুক্ল যজুর্বেদের দুইজন ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ—উব্বট ও মহীধর। এঁরা উভয়েই প্রথমে এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য যজ্ঞ পুরুষকে ব্যাখ্যা করে শেষে শব্দব্রহ্মের প্রতি-পাদকরূপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। বিস্তার ভয়ে তাহা এখানে উল্লিখিত হলো না।

মীমাংসাশাস্ত্রে পরমাচার্য কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবার্তিকে এই মন্ত্রকে সূর্যের প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তন্ত্রবার্তিকে প্রথমে শবরস্বামীর ব্যাখ্যার তাৎপর্য প্রদর্শিত হয়েছে। তারপর ভট্টপাদ নিজের মতে ব্যাখ্যা করেছেন এই মন্ত্রকে। তিনি যা বলেছেন—তার তাৎপর্য এই—গবাময়ন নামক সত্রে (১৪৮)

---

(১৪৫) চত্বারো হোত্রা শৃঙ্গাণীবাস্য। ত্রয়োঽস্য পাদাঃ সবনাভিপ্রায়ম্। দ্বে শীর্ষে পত্নীযজমানৌ। সপ্ত হস্তাস ইতি ছন্দাংসি অভিপ্রেত্য। ত্রিধা বদ্ধ ইতি ত্রিভির্বেদৈঃ বদ্ধঃ। বৃষভঃ কামান বর্ষতীতি। রোরবীতি শব্দকর্মা। মহো দেবো মর্ত্ত্যানাবিবেশ ইতি মনুষ্যাধিকারাভিপ্রায়ম্। [মীমাংসা দর্শন শাবরভাষ্য ১।২।৪৬]

(১৪৬ প্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং স্তোত্রম্। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং শস্ত্রম্। মীমাংসাদর্শন কুতুহলবৃত্তি ২।১।১০। যে সকল মন্ত্র গানরূপ, তাদের দ্বারা গুণীবস্তুর [দেবতাদির] গুণের কথনকে স্তোত্র বলে। যে সকল মন্ত্র গান নয়, তাদের দ্বারা গুণীর গুণ কীর্ত্তনের নাম শস্ত্র। অর্থাৎ সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তুতির নাম স্তোত্র। ঋগ্‌মন্ত্রের দ্বারা স্তুতির নাম শস্ত্র। 'স্তোত্র' শব্দে সাধারণভাবে স্তুতি বুঝালেও যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ে স্তোত্র শব্দ উক্তার্থক।

(১৪৭) রোরবীতি স্তোত্রশস্ত্রাদিশব্দান্ পুনঃ পুনঃ করোতি। [ঋগ্বেদভাষ্যোপদ্ঘাত সায়ণ]

(১৪৮) সোমযাগ বিশেষের নাম 'সত্র'। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অন্যান্য সোমযাগে ষোলজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এই ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই চারজন ঋত্বিক্‌ই প্রধান। এতদ্ব্যতীত মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা, প্রস্তোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, সুব্রহ্মণ্য, প্রতিহর্ত্তা এবং পোতা নামক বারজন সহকারী ঋত্বিক্ সোমযাগে বৃত হয়ে থাকেন।

'বিষুবৎ' নামক একাহে (১৪৯) এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ হয়। এই 'বিষুবৎ' নামক একাহের দেবতা সূর্য। এই 'বিষুবৎ' নামক একাহে হোতার অনুষ্ঠেয় 'আজ্য' নামক স্তোত্রে এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ আছে। এই স্তোত্রের দেবতা অগ্নি। যে মন্ত্রের যে কর্মে বিনিয়োগ হয়, সেইমন্ত্র সেই সেই কর্মের সহিত সংসৃষ্ট দেবতা বা দ্রব্য প্রভৃতির প্রতিপাদন করে। এস্থলে যেটি যাগ তার দেবতা সূর্য অথচ হোতার অনুষ্ঠেয় 'আজ্য' নামক স্তোত্রের দেবতা অগ্নি। এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ভট্টপাদ বলেছেন—এই মন্ত্রে যাগের দেবতা সূর্যের সহিত অভিন্নরূপে স্তোত্রের দেবতা অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। অগ্নি ও আদিত্য উভয়ই তেজঃস্বরূপ হওয়ায় এই মন্ত্রে উভয়ের ঐক্য কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে (১৫০)। দিবসের চারিপ্রহর, এই আদিত্যরূপী বৃষভের চারি শৃঙ্গ। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা—বৎসরের মধ্যে এই তিনটি ঋতু প্রধান। শীত ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু এবং বর্ষা ঋতুর মধ্যে শরৎ ঋতুকে অন্তর্ভূত করলে তিন ঋতুতেই বৎসরের পর্যবসান হয়

কিন্তু 'সত্রে' এই ষোলজন ঋত্বিক্ব্যতীত 'গৃহপতি' নামক আর একজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এইভাবে 'সত্রে' ১৭জন ঋত্বিকের আবশ্যকতা আছে। সত্রের আর একটি বিশেষত্ব আছে। জ্যোতিষ্টোমাদি অন্য যাগে যিনি যজমান, তিনিই যজ্ঞের ফলভাগী হন। যাঁরা ঋত্বিক্, তাঁরা যজ্ঞে বৃত হয়ে যজ্ঞের সহায়তা করেন এবং যজ্ঞান্তে দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। অন্য সোমযাগে যাঁরা ঋত্বিক্ হন তাঁদের 'আহিতাগ্নি' অর্থাৎ অগ্নির আধান করতে হবে একরূপ নিয়ম নাই। সত্রে যাঁরা ঋত্বিক্ হন তাঁদের প্রত্যেককে 'আহিতাগ্নি' হতে হবে। আর সত্রে যাঁরা ঋত্বিক্ হন তাঁরা যজমানও হন। এই সত্রে ঋত্বিক্ ও যজমানের কোন ভেদ নাই। সত্রের অনুষ্ঠানে সকলে নিজ নিজ অগ্নি মিলিত করে একত্র নিজেরাই যজমান ও ঋত্বিক্—এই উভয়ের কার্যের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সায়ণভাষ্যের উপোদ্ঘাত, মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম অধিকরণ এবং দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদের ১৪শ ও ১৫শ অধিকরণে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত।

(১৪৯) 'একেনাহ্না যেষু সুত্যাপরিসমাপ্তিস্ত একাহাঃ

[আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের কপর্দিস্বামীর ব্যাখ্যা ৪।৩]

'একেনাহ্না সুত্যাপরিসমাপ্তির্যেষাং তে একাহাঃ—'

[আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের হরদত্তকৃতব্যাখ্যা ৪।৩]

যে সকল সোমযাগে 'সুত্যার' পরিসমাপ্তি একদিনে হয়, তাদের নাম একাহ। সোমলতার রসের দ্বারা সোমযাগে আহুতি দিতে হয়। রস বাহির করবার জন্য বেদবিহিত পদ্ধতি অনুসারে সোমলতাকে কুটতে হয়। ইহাকে 'সুত্যা' বলে।

(১৫০) মীমাংসাকৌস্তুভ [১।২।৩৮]

(১৫১)। এই তিনটি ঋতু আদিত্যরূপী বৃষভের তিনটি পদ। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুইটি অয়ন এই বৃষভের দুইটি শীর্ষ। আদিত্যের সপ্ত অশ্ব [সাতটি ঘোড়া বা সাতবর্ণের সাতটি কিরণ] এই বৃষভের সপ্ত হস্ত। আদিত্যের উদয়, আকাশের মধ্যভাগে অবস্থান এবং অস্তকে উপলক্ষ্য করে সোমযাগে তিনটি সবনের অনুষ্ঠান করা হয়। এই তিনটি সবনে এই আদিত্যরূপী বৃষভ বদ্ধ। 'বৃষভ' শব্দ বর্ষণার্থক 'বৃষ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন (১৫২)। সূর্য থেকে বৃষ্টি হয়। সূর্য বৃষ্টির হেতু। এইজন্য তাঁকে 'বৃষভ' রূপে স্তুতি করা হয়েছে। মেঘের দ্বারা এই আদিত্যরূপী বৃষভ শব্দ [গর্জন] করে থাকেন। ইহার উদয়ে সকল মানুষ উৎসাহ সহকারে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই উৎসাহ সম্পাদন ব্যাপারে ইনি সকল পুরুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন (১৫৩)। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র। অগ্নি, সূর্য, অপ্ [জল] গো এবং ঘৃত ইহাদের অন্যতম (১৫৪)। এই সূক্তের দেবতা বলে কীর্তিত হয়েছে। যিনি সূক্তের প্রতিপাদ্য তিনিই সূক্তের দেবতা। সুতরাং এই মন্ত্রকে পাঁচ প্রকারে ব্যাখ্যা করা উচিত। সায়ণ তা না করে দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিরুক্তপরিশিষ্টের অনুসরণ করে যজ্ঞরূপী অগ্নির স্তুতিরূপে এই মন্ত্রের প্রথমে ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তন্ত্র-

---

(১৫১) ঋগ্বেদ সংহিতার ২য় অষ্টক ৩য় অধ্যায়ে 'অস্যবামীয়' সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে তিনটি ঋতুর কথা বলা হয়েছে। যাস্ক এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বৎসরে যে তিনটি মাত্র ঋতু তাহা বলেছেন। [নিরুক্ত ৪।২৭]। ঋক্‌সংহিতায় [২।৩।১৬।৩] পাঁচটি ঋতুর কথাও আছে। সেখানে হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে একটি ঋতু বলে গ্রহণ করা হয়েছে।—ইহা সায়ণাচার্য এবং যাস্ক [৪।২৭ নিরুক্ত] বলেছেন। ঋক্‌সংহিতায় স্থলবিশেষে [২।৩।১৬।১২] ছয় ঋতুর কথাও বলা হয়েছে। মলমাস বা অধিক মাসকে একটি অতিরিক্ত ঋতুরূপে গ্রহণ করে বেদে [ঋক্‌সংহিতা ২।৩।১৬।১৫ এবং অথর্বসংহিতা ৯।১৫।২৬] সাতটি ঋতুর কথাও বলা হয়েছে।

(১৫২) ঋষিবৃষিভ্যাং কিৎ [উণাদিসূত্র ৩ ১২৩] এই সূত্র অনুসারে বৃষ+অভচ্=‘বৃষভ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। এই অভচ্ প্রত্যয় কিৎ হওয়ায় এখানে ঋকারের গুণ হয় নাই।

(১৫৩) চত্বারি শৃঙ্গেতি রূপকদ্বারেণ যাগস্তুতিঃ কর্মকালে উৎসাহং করোতি। হৌত্রে ত্বয়ং বিষুবতি হোতুরাজ্যে বিনিযুক্তঃ। তস্য চ আগ্নেয়ত্বাদঙ্গশ্চাদিত্যদৈবতত্বসংস্তবাদাদিত্যরূপেণাগ্নিস্তুতিরূপবর্ণ্যতে। তত্র চত্বারি শৃঙ্গেতি দিবসযামাণাং গ্রহণম্। ত্রয়োঽস্য পাদা ইতি শীতোষ্ণবর্ষাকালাঃ। দ্বে শীর্ষে ইত্যয়নাভিপ্রায়ম্। সপ্ত হস্তা ইত্যশ্বস্তুতিঃ। ত্রিধা বদ্ধ ইতি সবনাভিপ্রায়েণ। বৃষভ ইতি বৃষ্টিহেতুত্বেন স্তুতিঃ। রোরবীতি স্তনয়িত্নুনা। সর্বলোকপ্রসিদ্ধের্মহান্ দেবো মর্ত্যানাবিবেশেতি উৎসাহকরণোপকারেণ সর্বপুরুষহৃদয়ানুপ্রবেশাৎ। [তন্ত্রবার্তিক ১।২।৩৮]

(১৫৪) 'অগ্নিঃসূর্যাব্‌গোঘৃতানামন্যতমো দেবতা' [সায়ণভাষ্য ৩।৮।১৩]

বার্তিকের অনুসরণে সূর্যের স্তুতিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সায়ণ উক্ত দুইটি গ্রন্থের অনুসরণে ব্যাখ্যা করলেও সম্পূর্ণভাবে তাহাদের অনুসরণ করেন নাই। কোন কোন অংশ তিনি নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছেন। সায়ণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এই মন্ত্রকে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করেছেন। অন্য কেহ কেহ এই মন্ত্রকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (১৫৫)। সায়ণ এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাতার নাম এবং ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

পণ্ডিতম্মন্য কোন কোন ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেছে একটা মন্ত্রের বা বেদবাক্যের অনেক অর্থ-করলে কোন অর্থটা ঠিক [ন্যায্য] তা আমরা কিকরে বুঝবো। আর কোন্ অর্থটাই বা আমরা গ্রহণ করবো ইত্যাদি। বেদের একটা অর্থই হওয়া উচিত। একটা বেদ বাক্যের যে অনেক অর্থ করা হয় সেটা পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাকৌশল মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে একটি মন্ত্রের বা একটি বেদবাক্যের এরূপ বিভিন্ন ভাবের নানা অর্থে তাৎপর্য থাকতে পারে না। এর উত্তরে আমরা সেই সব প্রতীচ্যবিদ্যাভিমানীদের বলবো আধুনিক যুগের অধ্যাত্ম সম্রাট্ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সাধনার দ্বারা বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মধর্ম পর্যন্ত সকল ধর্মমতের প্রতিপাদ্য বস্তুসাক্ষাৎকার পূর্বক বলে গেছেন সমস্ত উপায়ের [পথের] দ্বারা সেই এক ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। অতএব দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, শিবাদ্বৈত, শিববিশিষ্টাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত, কেবলাদ্বৈত, ইত্যাদি যত বাদ আছে সে সকলই সত্য, কোনটি মিথ্যা নয়। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বলেছেন অনেক আচার্য বেদব্যাখ্যায় বিষম ভ্রমে পতিত হন তাঁরা নিজেদের মতটিকে সকল বেদবাক্যের অর্থরূপে গ্রহণ করেন। এথেকে বুঝা যাচ্ছে সব মতই বেদবাক্য থেকে নিজ নিজ অভিমত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। বেদ একদেশীর শাস্ত্র নয়, কিন্তু কল্পতরু। অতএব বেদের একপ্রকার অর্থ করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাষার মতুযার বুদ্ধি করা নির্বুদ্ধিতার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। একবস্তু কি করে নানা রূপ হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন ঈশ্বর সাকার, নিরাকার আবার সাকার

---

(১৫৫) শাব্দিকাস্তু শব্দব্রহ্মপরতয়া চত্বারি শৃঙ্গেতি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গ নিপাতাশ্চেত্যাদিনা ব্যাচক্ষতে। অপরেত্বপরথা [ঋগ্বেদসংহিতা সায়ণভাষ্য ৩।৮।১৩।৩]

নিরাকারের পার কত কিছু। এর তাৎপর্য হচ্ছে জাগতিক বস্তুর দৃষ্টান্তে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে বুঝতে যাওয়া বা বুঝানো সম্ভব নয়। যে বস্তু মনবুদ্ধির অতীত তাকে শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারাও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। যিনি যেভাবে কথঞ্চিদ্ জেনেছেন তিনি তাঁকে দ্বৈত অদ্বৈত ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। এক ঈশ্বর নানারূপ হতে পারেন এবিষয়ে তিনি দৃষ্টান্তও দিয়ে গেছেন বহুরূপীর। এবিষয়ে বহু বিচারের অবকাশ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসমূহও আলোচ্য। সুতরাং এবিষয়ে আর কিছু না বলে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করি। কেবল একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

প্রাচীন বেদ ব্যাখ্যাতা মহর্ষি যাস্ক স্থল বিশেষে এক একটি মন্ত্রের নানা-প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন (১৫৬)। পূর্বাচার্য-গণের এইরূপ একটি মন্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা অনভিমত নয। সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের দেশের প্রাচীন পরম্পরাগত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণ কখনও অশ্রদ্ধার ভাব আনতে পারেন না॥ ২৩॥

মূল

অপর আহ

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"

'চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি।' চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতো-

---

(১৫৬) নিরুক্তের তৃতীয় অধ্যায়ে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে—

"যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ।"

এই মন্ত্রটির আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এইরূপ নিরুক্তের পঞ্চম অধ্যায়ে

"একয়া প্রতিধা পিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতম্।
ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা"

এই মন্ত্রের যাজ্ঞিক পক্ষে ও নৈরুক্ত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দুটি ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে।

পসর্গনিপাতাশ্চ ॥ 'তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।' মনস ঈষিণো মনীষিণঃ। 'গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি।' গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে। ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ॥ 'তুরীয়ং' বাচো মনুষ্যা বদন্তি, তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ততে চতুর্থমিত্যর্থঃ। চত্বারি ॥ ২৪ ॥ [ঋক্‌সংহিতা ১।১৬৪।৪৫]

অনুবাদ :—অপরে বলেন। শব্দের চার শ্রেণী পরিমিত [বিভক্ত] [শব্দের পরিচ্ছিন্ন চার প্রকার পদ সমূহ]। যাঁহারা মনকে বশীভূত করেন [এরূপ] ব্রাহ্মণগণ [বৈয়াকরণগণ] সেইসকল [পদকে] কে জানেন। [অজ্ঞানরূপ] গুহায় অবস্থিত তিনটি [তিনপ্রকার] পদ স্পন্দিত হয় না [প্রকাশিত হয় না]। মনুষ্যসকল [অবৈয়াকরণগণ] শব্দের চতুর্থ [রূপটিকে] বলে। "চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি" [এই অংশের অর্থ] চার প্রকার পদসমূহ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত [এবং পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী]। "তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ" [এই অংশের অর্থ] = মনের বশীকরণকর্তৃগণ। "গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি" [এই অংশের অর্থ] হৃদয়রূপগুহায় এবং অজ্ঞানরূপগুহায় তিনটি [তিন প্রকার শব্দ] অবস্থিত [হয়ে] ইঙ্গন করে না—চেষ্টা করে না প্রকাশিত, হয় না ইহাই ভাবার্থ। "তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" [এই অংশের অর্থ] = শব্দের ইহা তুরীয় [রূপ] ই যাহা মনুষ্যসমূহে [অজ্ঞমনুষ্যসমূহে] অবস্থান করে – চতুর্থ [তুরীয় ইহার অর্থ চতুর্থ] ইহাই অর্থ। "চত্বারি" [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র বাক্য সূচিত হয়েছিল তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হল] ॥২৪॥

বিবৃতি :—'চত্বারি'—এই প্রতীকের দ্বারা পূর্বে যে শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শিত হয়েছিল, সেই শাস্ত্র 'শব্দব্রহ্ম' অর্থের যেমন প্রতিপাদক সেইরূপ, যজ্ঞ, যজ্ঞপুরুষ ইত্যাদিরও প্রতিপাদক। সুতরাং সেই পূর্বোক্ত "চত্বারি শৃঙ্গা" ইত্যাদি শাস্ত্র ঐকান্তিকভাবে ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করতে নাও পারে। অথচ এখানে ভাষ্যকার ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করবার জন্যই নানা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। ঐ প্রয়োজন প্রদর্শন করতে যে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে অন্যান্য অনেক অর্থ প্রদর্শিত হওয়ায় প্রকৃত প্রসঙ্গ থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়ে গেছে। এইরূপ আশাঙ্কা করে মহাভাষ্যকার 'চত্বারি' এই প্রতীকের দ্বারা অপর কেহ যে অন্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করেন তাহা প্রদর্শন

করবার জন্য বলছেন 'অপর আহ' অপরে বলেন। এই অপর বলতে কে, সঠিকভাবে তাঁর নাম প্রভৃতি জানা যায় না। ভাষ্যকারও তাঁর নামের উল্লেখ করেন নাই। টীকাকারগণও এ বিষয়ে নীরব।

এই মন্ত্রে শব্দকেই বুঝানো হয়েছে। ইহাই অপরের বক্তব্য। ভাষ্যকারও এই অপরের মত মেনে নিয়েছেন, এটা ভাষ্যকারের বচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায়। 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি' এখানকার 'পদানি' শব্দের অর্থ 'শব্দ' বলাই অভিপ্রেত। সুপ্‌তিঙন্তং পদম্ [১।১৪] এই সূত্রানুসারে সুব্‌বিভক্তিযুক্ত ও তিঙ্‌বিভক্তিযুক্তকে পদবলে গ্রহণ করলে এই মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অর্থের সঙ্গতি হয় না। তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বলা হয়েছে তিন প্রকার পদ অজ্ঞান গুহায় অবস্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় না, মানুষ চতুর্থ পদকে বলে। এখানকার তিন প্রকার পদ বলতে যদি নাম, আখ্যাত. উপসর্গ এই তিন প্রকার পদ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই তিন প্রকার পদ অবৈয়াকরণদের নিকট যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ চতুর্থ নামক 'নিপাত' ও প্রকাশিত হয় না বলে তিনপ্রকার পদ প্রকাশিত হয় না—এই উক্তির সামঞ্জস্য থাকে না। এবং মানুষ চতুর্থ পদ বলে এই চতুর্থ বলতে যদি নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতের অন্যতমকে ধরা হয় তাহলেও অসঙ্গতি হয়। মানুষ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারপ্রকার সব শব্দইতো বলে অর্থাৎ উচ্চারণ করে, এদের মধ্যে কেবল একটিকে উচ্চারণ করে এমন তো নয়। এইজন্য 'পদানি' এই শব্দের অর্থ শব্দ বলেই গ্রহণ করতে হবে। শব্দ বললে পরা, পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী এই চারপ্রকার শব্দকে যেমন বুঝায় সেইরূপ নাম, আখ্যাত প্রভৃতিকেও বুঝাবে। এদের মধ্যে তিনপ্রকার শব্দ অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এই তিন প্রকার শব্দ অজ্ঞদের নিকট প্রকাশিত হয় না—। মানুষ বৈখরীরূপ চতুর্থ শব্দই বলে—এই কথার সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয়। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতকার নাগেশভট্ট বলেছেন নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারপ্রকার পদের প্রত্যেকেই চার অংশ বিশিষ্ট (১৫৭)। নাম—মধ্যমা—পশ্যন্তী—পরা, আখ্যাত—মধ্যমা পশ্যন্তী—পরা। উপসর্গ—মধ্যমা—পশ্যন্তী—পরা। নিপাত—মধ্যমা—পশ্যন্তী—পরা। 'চত্বারি বাক্‌পরিমিতা' এখানে 'বাক্' শব্দটি পৃথক বা অসমস্ত নয়। কিন্তু 'বাচঃ

(১৫৭) একৈকস্য নাম্নাদিরূপস্য চতুর্থং ভাগম্। একৈকস্য চতুরংশত্বাৎ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত—পস্পশাহ্নিক]

পরিমিতা, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে—'বাক্‌পরিমিতা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে (১৫৮)। 'পরিমিত' শব্দের উত্তর নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তি করে বৈদিক প্রয়োগে 'পরিমিতা' পদ সিদ্ধ হয়েছে (১৫৯)। তার অর্থ হচ্ছে 'পরিমিতানি'। তাহালে দেখা যাচ্ছে—"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি" এই ঋক্‌পাদের [চতুর্থ-ভাগ] অর্থ হচ্ছে—"শব্দের চারটি পরিমিত পদ (সমূহ)।" 'পরিমিত' এর অর্থ হচ্ছে পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু শব্দের চারিটি পদ পারিছিন্ন বললে অর্থের অসঙ্গতি হয়। পরিছিন্ন বলতে সীমাবিশিষ্ট বা সীমিত বুঝায়। শব্দের বৈখরী বা মধ্যমা পরিচ্ছিন্ন হলেও পশ্যন্তী বা পরা তো পরিচ্ছিন্ন নয়। পশ্যন্তী বা পরা বাক্ অনাদি ও অনন্ত (১৬০) বলে অপরিছিন্ন। অতএব এখানে 'পরিমিতা' এর অর্থ হচ্ছে এই পরিমিত অর্থাৎ চারসংখ্যায় পরিমিত। পাঁচ প্রকার শব্দ নাই। সুতরাং নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতরূপ শব্দের প্রত্যেকের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারসংখ্যায় পরিমিত বা প্রত্যেকের এই চার চার অংশ আছে ইহাই "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি" এই বাক্যের অর্থ।

"তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।" এই দ্বিতীয়পাদে 'তানি' এই সর্বনামপদটি প্রথম পাদোক্ত 'পদানি' কে বুঝাচ্ছে। সেই পদসকল অর্থাৎ শব্দ সকলকে [পদশব্দের 'শব্দ' অর্থ ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে] ব্রাহ্মণেরা জানেন—যে ব্রাহ্মণেরা মনীষী। কিন্তু সেই শব্দ সকলকে ব্রাহ্মণেরা জানেন—ইহা অসঙ্গত। ক্ষত্রিয়েরা বা বৈশ্যেরাই বা সেই শব্দকে জানবেন না কেন? শব্দজ্ঞানের প্রতি ব্রাহ্মণত্ব জাতি তো প্রয়োজক নয়। এই জন্য এখানে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদ জানেন যাঁরা তাঁরা। এখানে 'ব্রহ্মন্' শব্দটি বেদার্থক 'ব্রহ্ম [বেদ] বিদন্তি' এইরূপ বিগ্রহে অণ্ প্রত্যয় হয়। "ব্রাহ্মোঽজাতৌ" [৬।৪।১৭১] এই সূত্রানুসারে টি [ব্রহ্মন্ শব্দের অন্] র লোপ না হওয়ায়' আদিস্বরের বৃদ্ধি করে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এইজন্য তার অর্থ হল বেদজ্ঞ। বেদজ্ঞ মাত্রই শব্দের সকল স্বরূপ জানতে পারেন না। এইজন্য বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—"যে মনীষিণঃ"

(১৫৮) বাক্‌পরিমিতানীতি ষষ্ঠীতৎ পুরুষঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

(১৫৯) পরিমিত+জস্—শেশ্ছন্দসি বহুলম্ [৬।১.৭০] এই সূত্রে—শির লোপ হয়েছে। লৌকিক প্রয়োগে 'পরিমিতানি' এইরূপ হয়। বৈদিক প্রয়োগে পরিমিতা।

(১৬০) যদনাদি অনন্তং চ পরং ব্রহ্ম চিদ্রূপং তদক্ষরং নির্বিকারং শব্দরূপম্। সৈব পশ্যন্তীসংজ্ঞা পরা বাক্॥ [শিবদৃষ্টিবৃত্তি ২।২]

যাঁরা মনীষী। মহাভাষ্যকার "মনীষীর" অর্থ বলেছেন "মনস ঈষিণঃ" মনের নিয়ন্ত্রণকারিগণ। ঈষ উঞ্ছে অথবা ঈশ ঐশ্বর্যে [অদাদি] ঈষ্ বা ঈশ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইনি প্রত্যয় করে ঈষিন্' শব্দ সিদ্ধ হয়। ঈশ্ ধাতুর 'শ্' স্থানে পৃষোদরাদিত্ব বশত 'ষ্' হয়। যদিও এই দুটি ধাতুর অর্থের সঙ্গে এখানে নিয়ন্ত্রণকারিত্ব অর্থের সামঞ্জস্য হয় না তথাপি "ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ" ধাতুর অনেক অর্থ হয় এই নিয়মে এখানে ঈষ ধাতুর বশীভূত করা রূপ অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং "মনীষিণঃ" এই শব্দের অর্থ হলো মনকে যাঁরা বশীভূত করেন তাঁরা। "মনসঃ" এই পদে কর্মে ষষ্ঠীবিভক্তি বুঝতে হবে। এখন মনকে বশীভূত করেন কাঁহারা? এই প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ বলেছেন বৈয়াকরণেরা (১৬১)। যাঁরা ব্যাকরণ জানেন তাঁরা বেদের অর্থ বুঝতে পারেন। তাঁরা বেদের অর্থ জানেন বলে বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে শুদ্ধচিত্ত হন। শুদ্ধচিত্ত হয়ে সেই বেদে চিত্ত [মন] জয়ের যে সকল উপায় বিহিত হয়েছে সেই উপায় অবলম্বন করে মনকে বশীভূত করেন। কিন্তু যারা ব্যাকরণ জানে না তারা বেদাদি-শাস্ত্রের অর্থ জানতে পারে না। অর্থ না জানার ফলে মনকে বশীভূত করবার কৌশলও তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে 'মনীষী' হচ্ছেন বৈয়াকরণ। মনীষী বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্যক্তিই শব্দের সেই সকল রূপ জানেন—ইহাই "তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা, যে মনীষিণঃ।" এই দ্বিতীয় পাদের অর্থ।

"গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি," এই তৃতীয় পাদের অর্থ প্রকাশ করবার জন্য ভাষ্যকার বলেছেন "গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি, ন চেষ্টন্তে—ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ।"

শ্রুতিবাক্যে পঠিত 'গুহা' এই শব্দটি সপ্তমীবিভক্তিযুক্ত গুহা শব্দের বৈদিক রূপ। 'গুহা' শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি [ঙি] করে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রানুসারে সেই সপ্তমী বিভক্তির লোপ করে 'গুহা' এই বৈদিক রূপ সিদ্ধ হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে এর আকার হয় 'গুহায়াম্'। এই জন্য ভাষ্যকার ব্যাখ্যাতে 'গুহায়াম্' বলেছেন। এই গুহা শব্দের অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট

---

(১৬১) চিত্তশুদ্ধিক্রমেণ বশীকর্তারো বিষয়ান্তরেভ্যো ব্যাবৃত্ত্যা হিংসকা বা, তে চ বৈয়াকরণাঃ।
[মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত]

বলেছেন "অজ্ঞানমেব গুহা" এখানে অজ্ঞানই হচ্ছে গুহা। নাগেশ বলেছেন—'অজ্ঞান এবং হৃদয়াদি। (১৬২) 'হৃদয়াদি—' এখানকার 'আদি' শব্দে নাভি, ও মূলাধার বুঝতে হবে। শারদাতিলকের টীকায় এবং অন্যত্র আছে পরাবাক্ মূলাধারে অবস্থিত, পশ্যন্তী নাভিচক্রে স্থিত আর মধ্যমা হৃদয়ে স্থিত। সুতরাং হৃদয়, নাভি ও মূলাধারে অজ্ঞানে আবৃত হয়ে মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা নামক তিনটি রূপ [শব্দের তিনটি রূপ] 'নেঙ্গয়ন্তি—' স্পন্দিত হয় না—চেষ্টা করে না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। উক্ত মন্ত্রের তৃতীয় পাদের অন্তর্গত যে 'নিহিতা' শব্দটি আছে, সেটি 'নিহিত' শব্দের নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনের রূপ। 'নিহিত' শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে 'জস্' করে জস্‌শসোঃশিঃ [৭।১।২০] সূত্রে নপুংসক-লিঙ্গে 'জসের' স্থানে 'শি' করে 'শেশ্ছন্দসি বহুলম্' [।১।৭০] সূত্রানুসারে 'শি'র লোপ করে 'নিহিতা' এই রূপটি বৈদিক প্রয়োগে সিদ্ধ হয়েছে—। লৌকিক সংস্কৃতে তার রূপ হয় নিহিতানি' অর্থাৎ অবস্থিত [হৃদয়াদি গুহাতে উক্ত তিন প্রকার শব্দ অবস্থিত]। 'নেঙ্গয়ন্তি' শব্দের অর্থ করেছেন ভাষ্যকার 'ন চেষ্টন্তে' চেষ্টা করে না। শব্দের চেষ্টাই সম্ভব নয়, অতএব চেষ্টা না করা অর্থও অসঙ্গত হয়। এই জন্য ভাষ্যকার বললেন "ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ" অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। উক্ত তিন প্রকার শব্দ হৃদয়াদিতে অজ্ঞানাবৃতরূপে অবস্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় না—এই অর্থই "গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি।" এই তৃতীয় পাদ থেকে পাওয়া গেল। কিন্তু এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে বলা হয়েছে মনীষী ব্রাহ্মণেরা শব্দের চারিটি রূপ [স্বরূপ] জানেন। আর তৃতীয় পাদে বলা হলো শব্দের তিনটি স্বরূপ হৃদয়াদি গুহাতে অবস্থিত থেকেও প্রকাশিত হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থের পরস্পর বিরোধের প্রসঙ্গ হলো। এই বিরোধের পরিহারের জন্য কৈয়ট বলেছেন "ব্যাকরণপ্রদীপেন তু তানি প্রকাশন্তে" ব্যাকরণরূপ প্রদীপের দ্বারা সেই তিনপ্রকার শব্দ প্রকাশিত হয়। এই কথার দ্বারা বুঝা গেল তৃতীয় পাদে যে বলা হয়েছে—শব্দের তিনটি রূপ গুহাতে অবস্থিত হয়েও প্রকাশিত হয় না। সেটা অবৈয়াকরণের নিকট। তৃতীয় পাদে 'অবৈয়াকরণদের বা অজ্ঞদের' এইরূপ উল্লেখ না থাকলে ও অর্থাৎ সেটা বুঝিয়ে যাচ্ছে। অতএব তৃতীয় পাদে 'অজ্ঞানাম্' বা অবৈয়াকরণানাম্' এইরূপ পদের অধ্যাহার করতে হবে। তাতে তৃতীয় পাদের সম্পূর্ণ অর্থ এইরূপ হবে—

(১৬২) গুহা অজ্ঞানং হৃদয়াদিরূপা চ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

"অজ্ঞগণের [অবৈয়াকরণগণের] হৃদয়াদিগুহাতে অজ্ঞানাবৃত তিনপ্রকার শব্দ প্রকাশিত হয় না।" এইরূপ অর্থগ্রহণ করলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থের বিরোধ হয় না। এইজন্য নাগেশ তৃতীয় পাদের অর্থব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—বৈয়াকরণেরা শাস্ত্রজ্ঞানবলে এবং শাস্ত্রজ্ঞানজনিত যোগাভ্যাসবলে অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণ করে শব্দের সমস্ত স্বরূপ জানতে পারেন (১৬৩)। "তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।" এই চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেছেন 'তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ততে চতুর্থ মিত্যর্থঃ।' শব্দের এই চতুর্থ রূপ যাহা মনুষ্যসকলে অবস্থান করে। চতুর্থ স্বরূপ হচ্ছে 'বৈখরী' যাহা আমরা উচ্চারণ করি বা স্পষ্টভাবে শুনি। সেই বৈখরীরূপ শব্দের আশ্রয় হচ্ছে আকাশ। মহাভাষ্যকার "তস্য ভাবস্তত্বলৌ [৫।১।১১৯] সূত্রে বৈখরী শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন। সুতরাং এই বৈখরী শব্দ মনুষ্যে থাকবে কি করে অর্থাৎ মানুষ তার আশ্রয় হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ বলেছেন "জ্ঞানবিষয়তয়া তদ্বাচশ্চতুর্থমিত্যন্বয়ঃ" [পস্পশাহ্নিক মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত]। জ্ঞানের বিষয়রূপে মানুষেতে অবস্থান করে যে শব্দ তাহা শব্দের চতুর্থ স্বরূপ এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে। বৈখরী শব্দ সকল মানুষের জ্ঞানবিষয় হয় অর্থাৎ কি বৈয়াকরণ কি অবৈয়াকরণ সকলেরই জ্ঞানের বিষয়রূপে বৈখরীরূপ চতুর্থ শব্দ যাহা বিদ্যমান [আকাশে] তাহা মনুষ্যসকল বলে—উচ্চারণ করে—বৈখরী শব্দবিষয়ক জ্ঞানবান্ মানুষ—ইহাই চতুর্থ পাদের অর্থ। নাম, আখ্যাত, উপসর্গ নিপাতের চতুর্থ অংশ বা রূপ বৈখরী শব্দ অবৈয়াকরণও উচ্চারণ করে। কৈয়টে বলা হয়েছে—অবৈয়াকরণ চতুর্থ শব্দ বলে। এখানে 'অবৈয়াকরণ' ইহা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ চতুর্থ বৈখরী শব্দ সকলেই [সকল মনুষ্য] যখন বলেন তখন 'অবৈয়াকরণ' বলে কার ব্যাবৃত্তি করা হবে। সুতরাং চতুর্থ শব্দটি মানুষ উচ্চারণ করে অপর তিনটি উচ্চারণ করতে পারে না। বৈয়াকরণ সকল শব্দ জানতে পারেন, অবৈয়াকরণ তিনপ্রকার শব্দ জানে না। চতুর্থ শব্দকে কানের দ্বারা শুনে শুনে বলতে পারে কিন্তু চতুর্থশব্দকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকায় প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগের জ্ঞান না থাকায় প্রকৃত পক্ষে জানতে পারে না। অবৈয়াকরণ এই বৈখরী

---

(১৬৩) বৈয়াকরণস্তু শাস্ত্রবলেন তদ্বলজন্যযোগেন চ গুহান্ধকারং বিদার্য সর্বংজানাতীতি ভাবঃ। —মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত পস্পশাহ্নিক।

শব্দকে বললেও শুদ্ধভাবে বলতে পারে না—ইহাও এখানে না বলা থাকলেও বুঝে নিতে হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলে সকল শব্দকে জানা যায় না, ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান থাকলে সকল শব্দ জানতে পারা যায়। অতএব সকলশব্দের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর্তব্য। ইহাই—এই মন্ত্রের তাৎপর্য। 'চত্বারি' এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র সূচিত হয়েছিল সেই শাস্ত্রপ্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো। [পূর্বমন্ত্রে সমাপ্ত হয় নাই কারণ এই শাস্ত্রও 'চত্বারি' দ্বারা বুঝা যায়] ॥২৪॥

মূল

উতত্বঃ

> উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ
> মুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
> উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
> জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ [ঋঃ সং-১০.৭১।৪]

'উতত্বঃ' অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি বাচম্, অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনামিত্যবিদ্বাংসমাহার্ধম্। 'উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে' তনুং বিবৃণুতে। 'জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।' তদ্ যথা জায়া পত্যে কাময়মানা স্বম্ আত্মানং বিবৃণুতে, এবং বাগ্ বাগ্‌বিদে স্বাত্মানং বিবৃণুতে। বাঙ্‌নো বিবৃণুযাদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥ উতত্বঃ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ :—'উতত্বঃ' [এই প্রতীকের দ্বারা সূচিত শাস্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে]. অপরে শব্দকে দেখেও দেখে না। আবার অন্যে ইহাকে [শব্দকে] শুনেও শোনে না। [পতির] কামনা করে উত্তম বস্ত্র পরিহিতা জায়া [পত্নী] যেমন পতিকে [পতির নিকট] প্রকটিত [নিজেকে] করে, সেইরূপ [বাক্-শব্দ] কিন্তু অন্যের [বৈয়াকরণের] নিকট শরীর [নিজ স্বরূপ] প্রকাশিত করে। 'উতত্বঃ' [উতত্ব, ইত্যাদি প্রথম পাদের অর্থ প্রদর্শিত হচ্ছে] অপরে, কেহ কেহ [বৈয়াকরণ ভিন্ন] শব্দকে দেখেও দেখে না [অর্থজ্ঞানের অভাব বশত প্রকৃত পক্ষে জানে না]। অপর কেহ ইহাকে [বাক্‌কে] শুনেও শোনে না [অর্থ-

জ্ঞানাভাবে শোনে না]। [মন্ত্রের] (এই) অর্ধভাগ অজ্ঞকে [অজ্ঞের লক্ষণ] বলছে। 'উত ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে' [এই তৃতীয় পাদের অর্থ বলা হচ্ছে] শরীরকে [স্বরূপকে] বিবৃত করে [প্রকটিত করে], 'জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ' [চতুর্থপাদের অর্থ বলা হচ্ছে], যেমন [পতির] কামনা করে উত্তমবস্ত্র পরিহিতা পত্নী পতির নিকট নিজের আত্মাকে [স্বরূপকে] বিবৃত করে, এইরূপ বাক্ [শব্দ] বাগ্‌বিদের [বৈয়াকরণের] নিকট নিজের আত্মাকে [স্বরূপকে] বিবৃত [প্রকটিত] করে। বাক্ আমাদের নিকট নিজেকে প্রকটিত করুক—এই হেতু ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। 'উতত্বঃ' [প্রতীকের দ্বারা যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল তাহা সমাপ্ত হলো] ॥ ২৫ ॥

বিবৃতিঃ—মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৭১ তম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকরূপে উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত মন্ত্রের-প্রথম পাদে যে 'উত' শব্দটি আছে, সেটি একটি নিপাত। 'অপি' শব্দের যা অর্থ, এখানে উত' শব্দেরও সেই অর্থ। অর্থাৎ অপি = ও। এই 'উত' শব্দটির ক্রম ভিন্ন অর্থাৎ এই 'উত' শব্দকে 'পশ্যন্' এই শব্দের পর বসাতে হবে। তাহলে এইরূপ ক্রম হবে— ত্বঃ বাচম্ পশ্যন্ উত ন দদর্শ।'

'ত্ব' শব্দটির অর্থ অন্য বা অপর। এখানে বৈযাকরণ থেকে অন্য। এই প্রথম পাদের অর্থ হবে—যে, শব্দের অর্থ জানে না—এইরূপ অন্য ব্যক্তি [অবৈয়াকরণ] শব্দকে দেখেও—অর্থাৎ গুরুর নিকট থেকে বেদাদিশ্রবণ করে প্রত্যহ উত্তম রূপে তার অভ্যাস করেও অর্থ না জানার ফলে দেখে না। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করায় বেদাদির অর্থ জানতে পারে না। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তি বেদ [বেদাদি শাস্ত্র] অভ্যাস করেও প্রকৃত পক্ষে শব্দকে জানে না। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের ফল হচ্ছে অর্থজ্ঞান। অর্থজ্ঞান না করে যে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে, তার সেই অধ্যয়ন শুকপাখীর বুলি পড়ার মত ব্যর্থ।

'উত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্' এই দ্বিতীয় পাদেও সেই পূর্বকথিত 'ত্বঃ' শব্দটি 'অন্য' অর্থে প্রযুক্ত। সুতরাং দ্বিতীয় পাদের অর্থও পূর্বের মত—অর্থাৎ বৈয়াকরণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি এই শব্দকে গুরুর নিকট থেকে বা অন্যের নিকট থেকে শুনেও অর্থজ্ঞান না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শোনে না। অর্থজ্ঞানহীনভাবে শব্দ শোনা ঢাক ঢোল প্রভৃতির শব্দের [ধ্বনির] শোনার মত ব্যর্থপ্রায়।

মন্ত্রের এই প্রথম পাদ বা অর্ধভাগে অর্থজ্ঞানশূন্য বা অবৈয়াকরণের নিন্দা করা হয়েছে।

'উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে' এই তৃতীয় পাদে যে 'উতো' এইরূপ শব্দটি দেখা যাচ্ছে সেটি উত+উ এই দুটি শব্দের সন্ধি করে ঐ নিষ্পন্ন রূপ বুঝতে হবে। দুটি নিপাত মিলে ঐরূপ 'উতো' হয়েছে। এই দুটি নিপাতের সমুদিত অর্থ হচ্ছে—'কিন্তু'।

'ত্বস্মৈ' এই পদটি অন্যার্থক সর্বনাম 'ত্ব' শব্দের চতুর্থীর একবচনের রূপ। অন্যকে অর্থাৎ বৈয়াকরণকে=বৈয়াকরণের উদ্দেশ্যে। ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি [বাঃ সূঃ ১০৮৫] সূত্র অনুসারে এখানে অন্যকে অভিপ্রায় করে—উদ্দেশ্য করে—এই অর্থে চতুর্থী হয়েছে।

'তন্বং' এই পদটি বৈদিক রূপ। 'তনূ' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে 'অম্' করে "বাচ্ছন্দসি" [৩।৪।৮৮] সূত্রের অনুবৃত্তি বশত 'অমি পূর্বঃ' [৬।১।১০৭] সূত্রে 'অম্' এর অকারের পূর্বরূপ না হওয়ায় উকারের 'যণ্' আদেশ করায় 'তন্বম্' এই রূপসিদ্ধ হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে এর রূপ হয় 'তনূম্'। এর অর্থ হচ্ছে 'শরীর'কে' অর্থাৎ স্বরূপকে।

"বিসস্রে" এই শব্দটি 'বি' উপসর্গ পূর্বক সৃ ধাতুর উত্তর বৈদিক নিয়মে বর্তমান কাল অর্থে লিট্ 'ত' হয়ে (১৬৪) সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে—বিবৃত করে=প্রকটিত করে। বিবৃতকরে—এই ক্রিয়ার কর্তার বোধক কোন পদ—এই তৃতীয় পাদে নাই। এইজন্য—প্রথম পাদস্থিত 'বাচম্' পদটি প্রথমা বিভক্তিতে পরিবর্তিত করে এখানে অন্বয় করতে হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ তৃতীয় পাদটির আকার হবে—'বাক্ উত উ ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে।' শব্দ, কিন্তু অন্যের=বৈয়াকরণের নিকট নিজের শরীর অর্থাৎ স্বরূপকে বিবৃত [প্রকাশিত] করে—ইহাই সমগ্র তৃতীয় পাদের অর্থ। যাহার ব্যাকরণের জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি সেই জ্ঞানের সাহায্যে শব্দের স্বরূপ জানতে পারে—ইহাই তাৎপর্য।

বাক্ [শব্দ] নিজের শরীরকে অর্থাৎ স্বরূপকে অন্য বৈযাকরণের নিকট বিবৃত করে কিরূপ ভাবে—ইহা বুঝাবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন শ্রুতি চতুর্থপাদের দ্বারা—'জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ'।

---

(১৬৪) ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ।—[পাঃ সূঃ ৩.৪।৬]

বশ্ কান্তৌ অর্থাৎ ইচ্ছা অর্থের বোধক বশ্ ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করে তার স্ত্রীলিঙ্গে 'উশতী' পদটি সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং 'উশতী' পদের অর্থ হলো 'কামনাবতী'। পতির কামনাবতী—পতির কামনা করে যে পত্নী। ভাষ্যকার এর ব্যাখ্যায় 'কাময়মানা' ইহা বলেছেন। তাহলে পতির কামনাবতী জায়া—পত্নী। আর কিরূপ বিশেষণযুক্তা পত্নী? তার উত্তরে বলছেন 'সুবাসাঃ' উত্তম বস্ত্র যাহার। ঋতু স্নানের পর উত্তমবস্ত্র পরিহিতা ইহাই অর্থ। এইরূপ বিশেষণবিশিষ্টা পত্নী, 'পত্যে' পতির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পতির নিকট। তৃতীয় পাদ হতে 'বিসস্রে' পদটির অনুষঙ্গ করতে হবে এই চতুর্থপাদে। সেই 'বিসস্রে পদের অনুষঙ্গ [সম্বন্ধ] করে 'স্বম্ বা আত্মানম্' এইরূপ একটি দ্বিতীয়ান্ত পদ অধ্যাহার করতে হবে। সুতরাং চতর্থ পাদের সম্পূর্ণ আকার হবে—"উশতী সুবাসাঃ জায়া স্বম্ পত্যে বিসস্রে ইব।" এর অর্থ হচ্ছে "ঋতুস্নাতা উত্তমবস্ত্র পরিহিতা পতির কামনাবতী পত্নী যেমন পতির নিকট নিজেকে বিবৃত করে"

[এই দৃষ্টান্ত অনুসারে] সেইরূপ বাক্ [শব্দ] ও অন্য বৈযাকরণের নিকট নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করে। এইরূপ তৃতীয় পাদে বাক্যের অর্থের সমাপ্তি হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে—এইমন্ত্র বলছেন—বৈয়াকরণের নিকটই শব্দের সমস্ত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা বৈযাকরণ, শব্দের অর্থ জেনে শাস্ত্রীয় কর্মাদির অনুষ্ঠান এবং বেদার্থজ্ঞান হতে যোগরূপ উপায় জেনে যোগাভ্যাস করে শব্দের সমস্ত স্বরূপ জানতে পারেন। 'অবৈয়াকরণ' বেদাদিশাস্ত্র শুনে বা অভ্যাস করেও অর্থজ্ঞানের অভাবে শব্দকে দেখে না বা শুনে না—তার শব্দের অধ্যয়নাভ্যাস ও শ্রবণ ব্যর্থ হয়। অতএব শব্দ যাতে আমাদের নিকট তার স্বরূপ বিবৃত করে—অর্থাৎ যাতে আমরা শব্দের স্বরূপ জানতে পারি—সেই হেতু আমাদের ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য—মহাভাষ্যকার ইহাই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রদর্শন করেছেন। 'উতত্বঃ', এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র সূচিত হয়েছিল সেই শাস্ত্রের অর্থ করা হলো বা তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো ॥২৫॥

মূল

'সক্তুমিব'—

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে
ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি॥ [ঋ সং ১০।৭১।২]

'সক্তুঃ' সচতেদুর্ধাবো ভবতি, কসতে র্বা বিপরীতাদ বিকসিতো ভবতি। 'তিতউ' পরিপবনং ভবতি ততবদ্বা তুন্নবদ্বা। 'ধীরাঃ' ধ্যানবন্তঃ। 'মনসা' প্রজ্ঞানেন। 'বাচমক্রত' বাচমকৃষত। অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে। ক? য এষ দুর্গো মার্গঃ, একগম্যো বাগ্বিষয়ঃ। কে পুনস্তে? বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ? 'ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি' এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি। লক্ষ্মীর্লক্ষণাদ ভাসনাৎ পরিবৃঢা ভবতি। 'সক্তুমিব'॥২৬॥

অনুবাদঃ—'সক্তুমিব' [এই প্রতীকের দ্বারা সূচিত প্রয়োজন প্রদর্শিত হচ্ছে]। 'সচ' ধাতু থেকে [নিষ্পন্ন 'সক্তু' [শব্দের অর্থ] দুর্ধাব [দুঃশোধ যাকে পরিষ্কৃত করা অতি কষ্টসাধ্য] হয়। বিপরীত 'কস্' ধাতু থেকে [নিষ্পন্ন] [অর্থাৎ 'কস্' ধাতুর 'ক কার ও 'স' কারের বৈপরীত্যে নিষ্পন্ন]। [সক্তু শব্দের অর্থ] বিকসিত [যাহা ফুলে উঠে] হয়। 'তিতউ' [শব্দের অর্থ] পরিপবন হয়। [এই] তিতউ ততবৎ [বিস্তার বিশিষ্ট] অথবা [এই তিতউ] তুন্নবৎ [বহুছিদ্রবিশিষ্ট]। 'ধীরগণ' ধ্যানযুক্ত [ব্যক্তিগণ]। মনের দ্বারা [মনের কার্য] প্রজ্ঞারদ্বারা। 'বাক্‌কে করে থাকেন'—অশুদ্ধশব্দ থেকে [শুদ্ধ শব্দকে] পৃথক্ করে থাকেন। এখানে সখা হয়ে সখ্যকে প্রাপ্ত হয়—এখানে [অর্থাৎ এই শব্দে] সমদৃষ্টি লাভ করে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কোথায় [কাহার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়]? এই যে দুর্গম মার্গ [অর্থাৎ কঠিন উপায়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য] একের [একমাত্র জ্ঞানের] দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য 'বাকের' বিষয় [অর্থাৎ শ্রুতিরূপ বাকের বিষয়]। তাহারা কারা [যারা এই একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রপ্তিযোগ্য ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়' তারা কারা]? বৈয়াকরণগণ। কিহেতু ইহা [বৈয়াকরণগণ কেন ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন]? ভদ্রা ইঁহাদের লক্ষ্মী নিহিতা [আছেন] 'অধিক (১৬৫)

(১৬৫) মহাভাষ্যে উদ্ধৃত এই মন্ত্রে যে 'অধি' শব্দটি আছে, নাগেশভট্ট তার অর্থ করেছেন 'অধিক'। সেই অনুসারে এখানে 'অধি' শব্দের 'অধিক' এই অর্থ গ্রহণ করে অনুবাদ করা হয়েছে। মহাভাষ্যে এই মন্ত্রের চতুর্থপাদের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার পর্যালোচনা করলে মনে হয়—মহাভাষ্যকার এই 'অধি' শব্দের এরূপ 'অধিক' অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি অধিশব্দের অধিকরণ রূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। 'অধি' শব্দের 'অধিক' এই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে;

বাকে'—ইহাদের বাকে ভদ্রা [কল্যাণময়ী লক্ষ্মী নিহিতা আছেন। লক্ষ্মী লক্ষণের দ্বারা প্রকাশনের দ্বারা [অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করতে] সমর্থ হয়। 'সক্তুমিব' [এই প্রতীকের দ্বারা সূচিত কার্য সমাপ্ত হলো] ॥২৬॥

ভাবার্থ ঃ—চালনীর দ্বারা যেরূপ তুষ থেকে পৃথক্ করে সক্তুকে [ছাতু—যবের ছাতু] গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ শব্দশাস্ত্রজ্ঞ [বৈয়াকরণ] ব্যক্তিগণ অপশব্দ [অশুদ্ধ অপভ্রংশ শব্দ] থেকে বাক্‌কে পৃথগ্‌ভাবে জানতে পারেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা 'বাক্‌স্বরূপের পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করায় তাঁরা [বৈয়াকরণেরা] একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব—যাহা বাক্যের যথার্থস্বরূপ তাঁহাকে অবগত হয়ে, সকল বস্তুর স্বরূপকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপে দর্শন করে সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করেন এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। যেহেতু এই বৈয়াকরণদের অনুশীলনের বিষয়ীভূত বাক্‌তত্ত্বে সর্বপ্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ সংবিৎ সন্নিহিত আছেন ॥ ২৬ ॥

বিবৃতি ঃ—এই মন্ত্রে 'অক্রত' এবং 'অত্রা' এই দুইটি বৈদিক প্রয়োগ আছে। 'অক্রত' এই প্রয়োগটি কৃ ধাতুর উত্তর লুঙের প্রথম পুরুষের বহু বচনে [আত্ম-

---

কি 'অধি' শব্দের 'অধিকরণ' এই অর্থও অপ্রসিদ্ধ নয়। 'অধিহরি' এই অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন পদে 'অধি' শব্দটি অধিকরণ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে; ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর অব্যয়ীভাব সমাস প্রকরণে দেখা যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে—এই মন্ত্রের চতুর্থপাদে 'বাচি' এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ আছে। এস্থলে এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই 'অধিকরণ' রূপ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এখানে 'অধি' শব্দের 'অধিকরণ' রূপ অর্থ গ্রহণ করলে এই 'অধি' শব্দের কোন সার্থকতা থাকে না। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ ক্ষেত্রে সার্থকতা না থাকলেও বেদে এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই। "উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" [১।৩।২] এই সূত্রের মহাভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে একটি বৈদিক বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে—"অভ্র আঁ অপিতঃ" এস্থলে 'আঁ' শব্দটি 'আঙ্' এই অব্যয়ের একটি বৈদিক রূপ [৬।১।১২৬]। এখানে অভ্রে' এই সপ্তম্যন্তপদের সহিত প্রযুক্ত হয়েও 'আঙ্' শব্দ অর্থাৎ 'আঁ' শব্দটি সপ্তমী বিভক্তির অর্থ' অধিকরণের দ্যোতন করেছে। ইহা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর বৈদিক স্বর প্রকরণের সুবোধিনী টীকায় এবং পদমঞ্জরী [৬।১।১২] তে উল্লিখিত আছে। এই মন্ত্রের সায়ণ ভাষ্যে এই 'অধি' শব্দ অধিকরণ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই মন্ত্রে 'বাচি' এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই অধিকরণ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে বলে অধিকরণ অর্থের দ্যোতক 'অধি' শব্দের কোন আবশ্যকতা নাই—ইহা সূচিত করবার উদ্দেশে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় 'অধি' শব্দ কিংবা তার কোন প্রতিশব্দের উল্লেখ করা হয় নাই।

নেপদে] 'ঋ' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন (১৬৬)। লৌকিক সংস্কৃতে এস্থলে 'অকৃষত' এইরূপ প্রয়োগ হয়। 'অত্রা' এই বৈদিক প্রয়োগটি 'এতদ্' শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিতে 'ত্রল্' প্রত্যয় করে 'ত্র' এর অকারের দীর্ঘ (১৬৭) করে নিষ্পন্ন হয়। লৌকিক সংস্কৃতে এস্থলে 'অত্র' এইরূপ প্রয়োগ হয়। 'তিতউ' শব্দটি অমর কোষে পুংলিঙ্গ বলে নির্দিষ্ট আছে। মহাভাষ্যকার এই শব্দকে নপুংসকলিঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং ইহা নপুংসক লিঙ্গও।

এই মন্ত্রের প্রথমেই যে 'সক্তু' শব্দ আছে, মহাভাষ্যকার তার দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন।

প্রথমে 'সচ্' [ষচ্] ধাতু থেকে (১৬৮) 'সক্তু' শব্দ সিদ্ধ করেছেন। 'সচ্' [ষচ্] ধাতুর অর্থ সমবায়। এখানে সমবায় শব্দের অর্থ কোন বস্তুর সঙ্গে মিলিত হওয়া। সক্তু তার তুষের সঙ্গে মিলিত থাকে। এই তুষ থেকে সক্তুকে পৃথক্ করা কষ্টসাধ্য। সেইজন্য ভাষ্যকার বলেছেন—সচ্ ধাতু থেকে যে সক্তু নিষ্পন্ন হয়, তার অর্থ 'দুর্ধাব' অর্থাৎ দুঃশোধ – যাকে শুদ্ধ করতে বিশেষ প্রয়াস করতে হয়, তাহাই সক্তু [ছাতু]। কস্ ধাতু থেকেও সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, ইহাও মহাভাষ্যকার বলেছেন। প্রথমে ষচ্ ধাতু] সচ্] থেকে 'সক্তু'

---

(১৬৬) 'মন্ত্রে ঘসহ্বরণশবৃহদহাদ্বৃচকৃগমিজনিভ্যো লেঃ' [২।৪।৮০] এই বিশেষ সূত্রে লুঙ্ লকারে বিহিত চ্লি প্রত্যয়ের লুক্ হয়ে—'ঋ' স্থানে 'অন্ত' পক্ষে অত হয়ে সন্ধি করে 'অক্রন্ত প্রয়োগ সিদ্ধ হয়েছে। লৌকিক প্রয়োগে এখানে 'চ্লি' প্রত্যয়ের লুক্ হয় না। সেইজন্য 'অক্রত' এর পরিবর্তে অকৃষত হয়।

(১৬৭) ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাম্ [৬।৩।১৩৩] এই বৈদিক সূত্র অনুসারে 'অত্র' এই পদের অন্তর্গত 'ত্র' এর অকারের দীর্ঘ হয়ে 'অত্রা' এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। লৌকিক প্রয়োগে দীর্ঘবিধায়ক এই সূত্রের প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য লৌকিক সংস্কৃতে 'অত্র' এইরূপই হয়।

(১৬৮) ধাতুপাঠে সচ্ ধাতু মূর্ধন্যষকারাদি 'ষচ্' এইরূপ পাঠ আছে। 'ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ' [৬।১।৬৪] এই সূত্রানুসারে ষে' এর স্থানে 'স' করে নিতে হবে। 'ষচ্' সমবায়ে এই উভয়পদী ধাতু ধাতু বহুসম্মত হলেও সর্বসম্মত নয়। [মাধবীয় ধাতুবৃত্তিভবাদি দ্রষ্টব্য], যাঁদের মতে এই উভয়পদী নাই, তাঁদের মতে 'ষচ্ সেবনে' এই ধাতুই সমবায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক একটি ধাতু অনেকার্থ হওয়ায়, এরূপ প্রয়োগ দোষাবহ নয়। উজ্জ্বলদত্ত প্রণীত উণাদিবৃত্তিতে [১।৭০] সেচনার্থক সচ ধাতু থেকে সক্তু শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে। 'সচ্যতে স্নেহেন সিচ্যতে ইতি সক্তু র্যববিকারঃ।"

শব্দ সিদ্ধ করেছেন (১৬৯)। পরে কস্ ধাতু থেকে 'সক্তু' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। কস্ ধাতুর অর্থ গতি—ইহা পাণিনীয় ধাতু পাঠে আছে। ধাতু-সমূহ অনেকার্থক (১৭০)। এইজন্য এই কস্ ধাতুর বিকাস [প্রস্ফুটিত হওয়া —এখানে ফুলে উঠা] অর্থও অনুচিত নয়। বিকাস অর্থে বর্তমান এই কস ধাতুর উত্তর 'উণাদয়ো বহুলম্' [৩৩।১] এই সূত্রানুসারে তুন্' প্রত্যয় হয়ে, তার অন্তর্গত সকার ও ককারের পরস্পর বৈপরীত্য হয়ে (১৭১) 'সক্তু' পদ নিষ্পন্ন হতে পারে। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করলে সক্তু শব্দের অর্থ হয়—যাহা বিকসিত হয় [বিকসিতো ভবতি] যাহা ফুলে উঠে। তিতউ' শব্দের অর্থ পরিপবন [চালনী]। ভাষ্যকার এই শব্দটি 'তন্' ধাতু অথবা তুদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করেছেন (১৭২)। 'তন্' ধাতু থেকে তিতউ শব্দ সিদ্ধ করলে তার অর্থ হয়, বিস্তারযুক্ত [ততবৎ]। তুদ্ ধাতু থেকে তিতউ শব্দ সিদ্ধ করলে তার অর্থ হবে ছিদ্রযুক্ত [তুন্নবৎ]। চালনী বিস্তারযুক্ত ও ছিদ্রযুক্ত হওয়ায়—এই দুইটি অর্থের সঙ্গতি এখানে আছে। তারপর মহাভাষ্যকার ধীর শব্দের অর্থ করেছেন—ধ্যানযুক্ত [ধ্যানবন্তঃ] ; ধ্যা [ধ্যৈঞ্ চিন্তায়াম্] ধাতু থেকে ধীর শব্দ সিদ্ধ করেছেন। কিন্তু উণাদিসূত্রে [২।২৪] ধা ধাতু থেকে ধীর শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

মনঃশব্দের অর্থ ভাষ্যকারের মতে 'প্রজ্ঞান'। সুতরাং এখানে মনঃশব্দের মনোব্যাপারে লক্ষণা করা হয়েছে—বুঝতে হবে। লক্ষ ধাতু থেকে লক্ষ্মী শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যার লক্ষণ—ভাসন—অর্থাৎ প্রকাশ আছে, তাহাই লক্ষ্মী। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করে এখানে স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মকেই লক্ষ্মী শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। ভাষ্যকার ইহা সূচিত করেছেন। কৈয়ট প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ মহাভাষ্যের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা করেছেন।

---

(১৬৯) ষচ্ [সচ্] + তুন = সক্তু ; সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ক্রুশিভ্যস্তুন্ [উণাদিসূত্রম অধ্যায়। এখানে এই 'তুন' প্রত্যয়ের 'ন্' এর ইৎ সংজ্ঞা হয়। সুতরাং ইহার লোপ হয়। প্রত্যয়ের নকারের ইৎ সংজ্ঞাবশতঃ এই নিৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়। [ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্ ৬।১।১৯৭]। এখানে সক্তু শব্দের আদি অকার উদাত্ত।

(১৭০) মাধবীয় ধাতুবৃত্তির = ভূধাতু দ্রষ্টব্য।

(১৭১) পৃষোদরাদিত্বাদ্ বর্ণব্যত্যয়ঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

(১৭২) উণাদিসূত্রে এই 'তিতউ' শব্দটিকে বিস্তারার্থক তন্ ধাতুর দ্বারাই সিদ্ধ করা হয়েছে। তনোতের্ডউঃ সন্বচ্চ। [উণাদি ৫ম অধ্যায় ৫৪০]।

এই মন্ত্রটির সংক্ষেপে এইরূপ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করা যায়—চালনীর দ্বারা যেরূপ তুষের নিষ্কাসন করে সক্তুর সারভাগের গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্যে অপশব্দ [অশুদ্ধ শব্দ] থেকে শুদ্ধশব্দকে পৃথক্ করে থাকেন। এই বৈয়াকরণগণ শব্দের সূক্ষ্ম বিচার করতে করতে, ইহার মূল তত্ত্ব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে সর্বত্র সমদৃষ্টি প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান (১৭৩)।

এই মন্ত্রটি নিরুক্তের চতুর্থ অধ্যায়ে দশম খণ্ডে 'তিতউ' শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শনের উদ্দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। যাস্কমুনি এই প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যাও করেছেন (১৭৪) সেখানে তিনি তিতউ শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন, মহাভাষ্যকার তা থেকে ঈষৎ ভিন্নভাবে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। যাস্ক বলেছেন—"তিতউ পরিপবনং ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা তিলমাত্রতুন্নমিতি বা।" মহাভাষ্যকার "ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা" এই অংশটুকু বলে শেষাংশ পরিত্যাগ করেছেন। কৈয়ট 'ততবদ্' এই অংশের ব্যাখ্যা করেছেন—"বিস্তারযুক্তম্"—যার বিস্তার আছে। তন্‌ধাতুর বিস্তার অর্থ থাকায় কৈয়টের এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত হয় নাই। নিরুক্তের টীকাকার 'তত' শব্দের চর্ম অর্থ গ্রহণ করে ব্যাখ্যা করেছেন—"ততেন চর্মণা নদ্ধম্"—তত অর্থাৎ চর্ম, তার দ্বারা বদ্ধ। (১৭৫) "তিলমাত্রতুন্নম্" এই অংশের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য বলেছেন—যাতে তিলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে—"তিলমাত্রাণি তুন্নানি বা তস্মিন্নিতি তিতউ"। যাস্ক ও মহাভাষ্যকার সক্তু শব্দের ব্যাখ্যায় সমান রীতি অনুসরণ করেছেন। মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রটিকে বৈয়াকরণগণের প্রশংসারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যাস্ক একটু ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (১৭৬)। দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে যাস্কের

---

(১৭৩) প্রথমে মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতে এই প্রকার তাৎপর্য প্রদর্শিত হয়েছে।

(১৭৪) সক্তুমিব পরিপবনেন পুনন্তঃ। সক্তুঃ সচতের্দুর্ধাবো ভবতি। কসতের্বা স্যাদ্ বিপরীতস্য বিকসিতো ভবতি। যত্র ধীরা মনসা বাচমকৃষত, প্রজ্ঞানম্। ধীরাঃ প্রজ্ঞানবন্তো ধ্যানবন্তঃ। তত্র সখায়ঃ সখ্যানি সংজানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি ইতি।—নিরুক্ত ৪।১০।

(১৭৫) মনে হয় দুর্গাচার্যের সময় চালনী চর্মনির্মিত রজ্জু দ্বারা বাঁধা হোত।

(১৭৬) এখানে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়—যাস্কের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা থেকে যেন একটু স্বতন্ত্র। যাস্ক 'বাক্' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজ্ঞান' [বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্]। যাস্ক বর্তমান সময়ে প্রচলিত 'বাক্'শব্দের শব্দ অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এইরূপ, সক্তুকে [ছাতুকে] যেরূপ চালনী দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয় সেইরূপ যে যজ্ঞে বা সমাজে জ্ঞানী অর্থাৎ বিচারশীল মনীষিগণ মনের সাহায্যে বাক্‌কে পরিষ্কৃত করে প্রয়োগ করেন, সেই যজ্ঞে বা সমাজে একই শাস্ত্রে পরিশ্রমশীল এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরস্পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ জানতে পারেন। যেহেতু এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বাক্যে প্রশংসনীয় লক্ষ্মী [বিজ্ঞান] নিহিত আছে। এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান উন্নত হওয়ায়, সেই জ্ঞানের দ্বারা তারা অপরের জ্ঞানের উৎকর্ষ বুঝতে পারেন। যাদের জ্ঞান উন্নত নয়, তারা পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না— ইহাই এখানকার অভিপ্রায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে একটি বেদমন্ত্রের অনেকপ্রকার ব্যাখ্যা ভারতীয় পূর্বাচার্যগণের অসম্মত নয়। বেদের "সর্বানুক্রমসূত্রের" ভাষ্য পর্যালোচনা করলে, উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ অনুসারে অন্যপ্রকার অর্থ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রামাণিক মহাভাষ্যকার যে অর্থ প্রদর্শন করেছেন—সেই অর্থে যে এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য নাই, তাহা অতি সাহসিক ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বলতে পারেন না (১৭৭) ॥ ২৬ ॥

মূল

'সারস্বতীম্'

যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি 'আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদ্' ইতি। প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।' সারস্বতীম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—'সারস্বতীম্' [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের সূচনা করা হয়েছে, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]।

যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন—'আহিতাগ্নি অপশব্দের প্রয়োগ করলে প্রায়শ্চিত্তের অনুকূল 'সারস্বতী ইষ্টি'র অনুষ্ঠান করবে।' আমরা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই —এই কারণে ব্যাকরণের অধ্যয়ন [আমাদের] কর্তব্য। সারস্বতীম্ [প্রতীকের দ্বারা সূচিত প্রয়োজনবর্ণন সমাপ্ত হলো] ॥ ২৭ ॥

(১৭৭) "এতে চ মন্ত্রাঃ সর্বানুক্রমভাষ্যেঽন্যত্র বিনিযুক্তা অপি ভাষ্যপ্রামাণ্যাদেতত্তাৎপর্যকা অপীতিবোধ্যম্। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

বিবৃতি—যিনি শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্নির আধান করেন তাঁকে আহিতাগ্নি বলা হয়। আহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি [যজ্ঞাদিতে] অশুদ্ধ [অপভ্রংশ] শব্দ উচ্চারণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয়। সেই পাপের নিবৃত্তির জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত রূপে 'সারস্বতী' নামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। পাপক্ষয়-মাত্রের সাধনীভূত কর্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়। প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি 'প্রায়' ও 'চিত্ত' এই দুইটি শব্দের সম্মেলনে সিদ্ধ হয়েছে (১৭৮)। প্রপূর্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ ৩।৩।১১৮" এই সূত্রানুসারে 'ঘ' প্রত্যয় করে অথবা "অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ ৩।৩।১৯" এই সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয় করে 'প্রায়' শব্দটি সিদ্ধ হয়। এখানে প্রায়শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ। 'চিতী [চিৎ' সংজ্ঞানে' এই ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'চিত্তি' শব্দ এবং 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা 'চিত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (১৭৯)। এইভাবে নিষ্পন্ন যে 'প্রায়শ্চিত্ত শব্দ, তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে করা হয়েছে। 'তপঃ' শব্দের অর্থ কৃচ্ছ্রসাধ্য ক্রিয়া। এই কৃচ্ছ্রসাধ্য ক্রিয়ার নিশ্চয় [স্থির সঙ্কল্প] পূর্বক যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তার নাম প্রায়শ্চিত্ত। এই ব্যাখ্যার অনুকূল একটি স্মৃতিবাক্য পদমঞ্জরীতে উদ্ধৃত হয়েছে,—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযোগাৎ প্রায়শ্চিত্তমিতিস্মৃতম্ ॥"

'প্রায়' শব্দের অর্থ তপঃ, 'চিত্ত' শব্দের অর্থ নিশ্চয়; যে ব্যাপারে এই 'তপঃ' এর নিশ্চয়ের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ প্রথমে কৃচ্ছ্রসাধ্যব্যাপারের অনুষ্ঠানের স্থির নিশ্চয় করে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলে।

ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদীর "প্রৌঢ়মনোরমা" নামক টীকায় এই প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যার অনুকূল একটি স্মৃতিবাক্য প্রদর্শন করেছেন,—

---

(১৭৮) এখানে অকারান্ত 'প্রায়' শব্দের পর 'চিত্ত' শব্দ থাকার 'প্রায়' শব্দের পর 'সুটে'র ['স্' র] আগম হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে 'সমাসাশ্রয়বিধি' নামক প্রকরণের শেষে একটি বচন পঠিত আছে। তাতে বলা হয়েছে—'প্রায়' শব্দের পর 'চিত্তি' বা 'চিত্ত' শব্দ থাকলে প্রায় শব্দের পর 'সুটে'র আগম হয়। "প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ"। মহাভাষ্যে উক্ত বাক্যের পরিবর্তে অন্যরূপ বাক্য পঠিত আছে—"প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ সুডস্কারো বা" এর অর্থ—প্রায় শব্দের পর চিত্তি বা চিত্ত শব্দ থাকলে প্রায় শব্দের সুট্ আগম হয় অথবা প্রায় শব্দের অন্ত্য অকারের স্থানে 'অস্' আদেশ হয়। [মহাভাষ্যপ্রদীপ—৬।১।১৫৭]

(১৭৯) চিতীসংজ্ঞানে ক্তিন্ নপুংসকে ভাবে ক্তঃ।—পদমঞ্জরী

'প্রায়ঃ পাপং বিনির্দিষ্টং চিত্তং তস্য বিশোধনম্"

'প্রায়' শব্দের অর্থ পাপ, যে ক্রিয়ার দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, তার নাম প্রায়শ্চিত্ত। উপরি উদ্ধৃত দুটি স্মৃতিবাক্য থেকে 'প্রায়:' শব্দের পরস্পর বিভিন্ন দুইটি অর্থ জানা গেল,—এক অর্থ তপঃ, অপর অর্থ পাপ। উদ্ধৃত দুইটি বাক্যেরই প্রামাণ্য আছে, সুতরাং দুইটি অর্থই প্রামাণিক (১৮০)।

উপরে প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যৌগিক অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি কেবল যৌগিক নয়, যোগরূঢ়। এই জন্য প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারগণ এই শব্দের পর্যবসিত যে অর্থ গ্রহণ করেছেন—সেই অর্থই গ্রহণীয়। কেবল মাত্র পাপ ক্ষয়ের উদ্দেশে শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হয়েছে, তার নাম প্রায়শ্চিত্ত (১৮১)। 'প্রায়শ্চিত্তি' শব্দটির অর্থও প্রায়শ্চিত্তশব্দের অর্থের অনুরূপ।

উপরি উদ্ধৃত "আহিতাগ্নিপরশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ" এই বাক্যটি কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বাক্য। মহাভাষ্যকার অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ বাক্য উদ্ধৃত করবার আরম্ভে 'যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি' এইরূপ প্রয়োগ করেছেন। এখানেও এইরূপ 'যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি' এইরূপ আরম্ভে বলেছেন। তাতে নিশ্চয় করা যায় যে এই শ্রুতিবাক্যটি একটি ব্রাহ্মণ বাক্য। তবে কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে মহাভাষ্যকার এই বাক্যটিকে উদ্ধৃত করেছেন তা এখনও জানা যায় নাই।

এই বাক্যের প্রথমে যে 'প্রায়শ্চিত্তীয়া' শব্দটিআছে, তার অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের অর্থ পাপক্ষালন ; ইহা কৈয়ট ও নাগেশভট্টের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়। পাপক্ষালনের সাধন যে ইষ্টি তাকেই এখানে প্রায়শ্চিত্তীয়া ইষ্টি (১৮২) বলা হয়েছে। তার পরবর্তী বাক্যে মহাভাষ্যকার প্রায়শ্চিত্তশব্দের কর্মবিশেষ অর্থ গ্রহণ করে 'প্রায়শ্চিত্তীয়' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন (১৮৩)। এই ব্রাহ্মণবাক্যে

(১৮০) প্রায়স্যেতি নির্দেশাদকারান্তপুংলিঙ্গতপোবাচী প্রায়শব্দঃ. 'প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। 'প্রায়ঃ পাপমিতি' স্মৃত্যন্তরাৎ পাপবাচ্যপি। লঘুশব্দেন্দুশেখর—সমাসাশ্রয়বিধি।

(১৮১) পাপক্ষয়মাত্রসাধনত্বেন বিধিবোধিতং কর্ম প্রায়শ্চিত্তম্। স্মার্তরঘুনন্দন কৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

(১৮২) প্রায়শ্চিত্তীয়ামিতি তদর্থে বৃদ্ধাচ্ছঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ। তদর্থ ইতি। প্রায়শ্চিত্ত সাধনত্বেন তদর্থম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

(১৮৩) প্রায়শ্চিত্তায় পাপশোধনায় শ্রুতিস্মৃতিবিহিতায় কর্মণে হিতাভন্নিমিত্তোৎপাদনা যা ভূমেত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

বলা হয়েছে,—আহিতাগ্নি অশুদ্ধশব্দ উচ্চারণ করলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হবেন। পাপ জন্মালে তার ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আহিতাগ্নির পক্ষে অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে—সকল অবস্থায় অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক নয়, যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালেই অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ পাপজনক। মহাভাষ্যকার পরে এই পস্পশাহ্নিকেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যারা ব্যাকরণের অধ্যয়ন করে নাই, তাদের নিকট শুদ্ধ ও অশুদ্ধ শব্দের পার্থক্য অজ্ঞাত। এইজন্য তাহাদের পক্ষে যে কোন অবস্থায় অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ অসম্ভাবিত নয়। সুতরাং অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য ॥ ২৭ ॥

মূল

"দশম্যাং পুত্রস্য"

যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি 'দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরি প্রতিষ্ঠিতং তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্যান্ন তদ্ধিতমি'তি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। 'দশম্যাং পুত্রস্য' ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—'দশম্যাং পুত্রস্য' [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত হয়েছে তাহা বলা হচ্ছে]।

যাজ্ঞিকেরা পাঠ করেন—[পুত্রজন্মাবার] দশদিন পরে [নব] জাত পুত্রের নাম করবে [নাম রাখবে]। যে নামের আদিতে ঘোষবান্ বর্ণ [থাকবে] মধ্যে অন্তঃস্থ (১৮৪) বর্ণ থাকবে; [যে নাম] 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞক শব্দ হবে না। [নামকরণ সংস্কারের যিনি অধিকারী—পিতা তাঁর] তিন পুরুষের অভিধায়ক [শব্দের অনুরূপ] হবে। অরি অর্থাৎ শত্রুতে যে নাম প্রতিষ্ঠিত নয়—সেইরূপ নাম অতিশয় প্রতিষ্ঠিত [প্রসিদ্ধ] হয়, দুই অক্ষর অথবা চার অক্ষর কৃদন্ত নাম রাখবে, তদ্ধিত [নাম] করবে না। ব্যাকরণ [জ্ঞান] ব্যতীত কৃৎ বা

---

(১৮৪) য, র, ল, বকে সাধারণতঃ অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। এথা ন এই শব্দট অকারান্ত নয়, কিন্তু আকারান্ত অন্তঃস্থাশব্দ। "অন্তঃস্থা শব্দ আদন্তঃ" লঘুশব্দেন্দুশেখর সংজ্ঞাপ্রকরণ।

তদ্ধিত জানতে পারা যায় না। 'দশম্যাং পুত্রস্য' [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত হয়েছিল তাহা সমাপ্ত হোল] ॥ ২৮ ॥

বিবৃতি—আমাদের শাস্ত্রে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত কতকগুলি 'সংস্কার' বিহিত আছে। সেই সংস্কার সকলের মধ্যে 'নামকরণ' ও একটি সংস্কাররূপে প্রচলিত আছে। শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে 'নামকরণ' সংস্কারের দ্বারা নবজাত বালকের নাম রাখা হয়ে থাকে। পুত্রের জন্মের অশৌচ সমাপ্ত হলে একাদশ দিনে এই নামকরণ সংস্কার করা হয়। 'নামকরণ' সংস্কারে পুত্রের যে নাম রাখা হয়, সেই নাম কিরূপ হবে, তাহা উপরে উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যে বলা হয়েছে। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব—এই বর্ণগুলি ঘোষবান্। নামের আদিতে এই বর্ণগুলির কোন একটি বর্ণ থাকবে। নামের মধ্যবর্তী বর্ণ অন্তঃস্থা অর্থাৎ অন্তস্থ হবে (১৮৫)। ব্যাকরণে-আকার, ঐকার ও ঔকারকে বৃদ্ধিসংজ্ঞা করা হয়েছে (১৮৬)। যে শব্দের আদিস্বর এই বৃদ্ধিসংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ যে শব্দের প্রথম স্বরটি আ, ঐ বা ঔ হয়, তার নাম 'বৃদ্ধ' (১৮৭) হয়। যেমন 'রাম' শব্দটি বৃদ্ধসংজ্ঞক। কারণ রাম শব্দে দুটি স্বর আছে, 'র্' এর পর 'আ' এবং 'ম্' এর পর অ'। এই দুটি স্বরের মধ্যে আদি স্বর আটি বৃদ্ধিসংজ্ঞক। এইরূপ 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞক শব্দ নাম রাখবে না। তারপর 'ত্রিপুরুষানূকম্' শব্দটির দ্বারা এখানে ইহাই সূচিত হয়েছে—যিনি নামকরণ সংস্কারের কর্তা [পিতা], তাঁর পূর্ববর্তী তিনপুরুষের যে নাম, সেই নামের অনুকৃতি অর্থাৎ সাদৃশ্য যে শব্দে থাকে, সেইরূপ নাম রাখবে। যদি পূর্বপুরুষের নামের সহিত 'চন্দ্র' কি 'নাথ' শব্দ সংসৃষ্ট থাকে, তা হলেনবজাত কুমারের নামেও সেইরূপ শব্দ সংযোজিত করতে হবে। পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে কাহারও নাম 'হরচন্দ্র' কাহারও বা নাম 'জীবনাথ' হবে। 'ত্রয়াণাং পুরুষাণাং, সমাহারঃ এইরূপ সমাহার দ্বিগু সমাস

---

(১৮৫) ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণের নাম স্পর্শবর্ণ; শ, ষ, স হ এই গুলি উষ্ম বর্ণ। স্পর্শ ও উষ্মের মধ্যবর্তী বলে য র ল ব কে অন্তঃস্থাবর্ণ বলা হয়। "স্পর্শোষ্মণোর্মধ্যে তিষ্ঠন্তীতি তদর্থঃ। লঘু শব্দেন্দুশেখর সংজ্ঞাপ্রকরণ।

(১৮৬) বৃদ্ধিরাদৈচ্ [১।১।১]। আকার ঐকার ঔকারশ্চ আদেশানাদেশসাধারণ্যেন বৃদ্ধি সংজ্ঞঃ স্যাৎ। ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি।

(১৮৭) বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্ [১।১।৭৩]। যৎসমুদায়ঘটকানামচাং মধ্যে পূর্বোহচ্ বৃদ্ধি-সংজ্ঞঃ, স বৃদ্ধস জ্ঞঃ স্যাৎ।......বহুত্বমবিবক্ষিতম্।....ব্যপদেশিবদ্ভাবাদেকস্যাপি। ব্যাকরণ-সিদ্ধান্তসুধানিধি।

করে প্রথমে ত্রিপুরুষম্' এই শব্দ সিদ্ধ হয়। তারপর ত্রিপুরুষম্ অনুকারবতীতি ত্রিপুরুষ উপপদ পূর্বক অনু উপসর্গের উত্তর কৈ শব্দে কৈ ধাতুর উত্তর মূলবিভুজাদিত্বাৎ 'ক' প্রত্যয় করে 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে। এই সূত্রানুসারে 'অনু' শব্দের উ কারের দীর্ঘ হয়ে—'ত্রিপুরুষানূকম্' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'অনরি প্রতিষ্ঠিতম্'—এই অংশের দুইটি অর্থ হতে পারে। (১) নৃশব্দের অর্থ মানুষ। নৃ শব্দের সহিত নঞ্ সমাসে—'অনৃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তার সপ্তমীর একবচনে 'অনরি' এইরূপ হয়। অনরি প্রতিষ্ঠিতম্—এই অংশের অর্থ যাহা মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ দেবতার যে নাম সেইরূপ নাম রাখবে। (২) অরিশব্দের অর্থ শত্রু। অরিশব্দে 'নঞ্' তৎপুরুষ করলে 'অনরি' রূপ সিদ্ধ হয়। অনরৌ প্রতিষ্ঠিতম্ এইরূপ বিগ্রহ করে অনরি প্রতিষ্ঠিতম্ শব্দ সিদ্ধ হয়। অথবা ন অরিপ্রতিষ্ঠিতম—এইরূপ নঞ্ সমাস করে 'অনরিপ্রতিষ্ঠিতম্' সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হচ্ছে—যে নাম শত্রুর নাম নয় সেইরূপ নাম রাখতে হবে (১৮৮)। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নাম রাখতে হবে, যেমন 'দেবদত্ত', 'দেবদত্ত' শব্দের শেষে 'দত্ত' শব্দ দা+ক্ত [ক্ত রূপ কৃৎপ্রত্যয়] কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হওয়ায় ঐ নাম রাখার যোগ্য। তদ্ধিতান্ত নাম রাখা নিষেধ—যেমন 'তনুশৌক্ল্য' এই নামের শেষে 'শৌক্ল্য' শব্দটি তদ্ধিতান্ত [শুক্ল শব্দের উত্তর "গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ' সূত্রে 'ষ্যঞ্' তদ্ধিত প্রত্যয়] হওয়ায় এইরূপ নাম রাখলে পুণ্য হবে না অথচ পাপ হবে। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন, তাঁর পুত্র জন্মাবার সম্ভাবনা থাকায় পুত্রজন্মে তাঁরপক্ষে নামকরণ সংস্কার অবশ্য কর্তব্য। এই নামকরণ সংস্কারে উপযুক্ত নাম নির্বাচনে ব্যাকরণের অপেক্ষা আছে বলে, গার্হস্থ্যব্যাপারের অন্তর্গত কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদনের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত;—ইহাই এখানে মহাভাষ্যকার এই শাস্ত্রবাক্যপ্রদর্শনের দ্বারা সূচিত করেছেন॥ ২৮॥

মূল।

'সুদেবো অসি'

> 'সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
> অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব॥ [ঋ সং ৮।৬১।১২]

(১৮৮) অমনুষ্যোঽরিভিন্নে ইতি বার্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

"সুদেবো অসি বরুণ।" সত্যদেবোঽসি।
'যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ' সপ্তবিভক্তয়ঃ।
'অনুক্ষরন্তি কাকুদম্।' কাকুদং তালু। কাকুর্জিহ্বা,
সাঽস্মিন্নুদ্যত ইতি কাকুদম্। 'সূর্ম্যং সুষিরামিব।'

তদ্ যথা—শোভনামূর্মিং সুষিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিশ্য দহতি, এবং তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্তবিভক্তয়স্তাবনুক্ষরন্তি। তেনাসি সত্যদেবঃ। সত্যদেবাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। 'সুদেবো অসি' ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—'সুদেবো অসি' [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত হয়েছে তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]

হে বরুণ! তুমি সুদেব হয়েছ। যেহেতু সপ্ত সমুদ্র [তোমার] কাকুদকে [তালুকে] [আশ্রয় করে] প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি, যেরূপ ছিদ্রবহুল শোভনা লৌহপ্রতিমাকে [মলহীন করে]। 'বরুণ সুদেব হয়েছ' সত্যদেব হয়েছ। 'যেহেতু তোমার সপ্ত সমুদ্র' সপ্ত বিভক্তি। 'কাকুদকে [আশ্রয় করে] প্রবাহিত হচ্ছে'—কাকুদ—তালু। কাকু—জিহ্বা, সেই [জিহ্বা] ইহাতে উৎক্ষিপ্ত হয়, এইজন্য [ইহা] কাকুদ। 'যেরূপ ছিদ্রবহুল শোভনা লৌহপ্রতিমাকে'—যেরূপ শোভনা সুষিরা [ছিদ্রবহুল] লৌহ প্রতিমাকে, অগ্নি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দগ্ধ করে, এইরূপ তোমার সপ্তসমুদ্র=সপ্তবিভক্তি তালুকে [আশ্রয় করে] প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জন্য তুমি সত্যদেব হয়েছ। আমরা সত্যদেব হতে পারব, এইহেতু ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। 'সুদোবো অসি' [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের সূচনা করা হয়েছিল তাহা সমাপ্ত হল] ॥২৯॥

বিবৃতি—'যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ' এইস্থলে 'যস্য' এই ষষ্ঠী বিভক্তিটি পঞ্চমীর স্থানে হয়েছে। বেদে এইরূপ বিভক্তিব্যত্যয় অনেকবার লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বে এবিষয়ে ব্যকরণের প্রমাণও উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে। সুতরাং 'যস্মাৎ' এই অর্থে 'যস্য' এইরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'সূর্মীম্' এই প্রকার রূপ হয়। বৈদিক সংস্কৃতে 'সূর্ম্যম্' এইরূপ ও হয় (১৮৯)। সূর্মী শব্দের অর্থ লৌহ প্রতিমা ইহা অমরকোষে দেখা যায় (১৯০)। মহাভাষ্যকার এখানে

(১৮৯) সূর্মীমিতিপ্রাপ্তে 'অমিপূর্বঃ' [৬।১।১০৭] ইত্যত্র 'বা ছন্দসি' [৬।১।১০৬] ইত্যনুবৃত্ত্যা যণাদেশঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ। শব্দকৌস্তুভেও এর অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১৯০) সূর্মী স্থূণাঽয়ঃপ্রতিমা।—অমরকোষ শূদ্রবর্গ-৩৫।

'সূর্মী' শব্দের 'শোভনা ঊর্মী' [শোভনামূর্মীম্] এইরূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোতে 'সূর্মী' শব্দের 'শোভনা অয়ঃ [লৌহ] প্রতিমা' [১৯১] এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইহা পর্যালোচনা করলে মনে হয় এখানে 'সু' শব্দের অর্থ শোভন এবং 'ঊর্মী' শব্দের অর্থ লৌহ প্রতিমা—এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসারে 'ঊর্মী' শব্দের অর্থ লৌহ প্রতিমা—ইহা স্বীকার করতে হবে। 'সুষি' শব্দের অর্থ ছিদ্র। এই সুষি শব্দের উত্তর ভূমা অর্থে [বাহুল্য অর্থে] মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয়ের দ্বারা (১৯২) 'সুষির' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এই 'সুষির' শব্দের অর্থ হচ্ছে বহুল ছিদ্রযুক্ত।

এই মন্ত্রটি বরুণের স্তুতি। বরুণের ব্যাকরণজ্ঞানকে লক্ষ্য করে তাঁকে সত্যদেব বলে প্রশংসা করা হয়েছে। সাত বিভক্তির প্রত্যেক বিভক্তিতে অনন্ত শব্দরাশি সিদ্ধ হয়। এইজন্য এই মন্ত্রে সপ্ত বিভক্তিকে সপ্ত সমুদ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্ত্রের শেষাংশের উপমার [সূর্ম্যং সুষিরামিব] দ্বারা বলা হয়েছে এই যে—অগ্নি যেমন সচ্ছিদ্র লৌহপ্রতিমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে দগ্ধ করে; দগ্ধ করার ফলে সেই প্রতিমা সকল প্রকার মল কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ হয়; সেইরূপ যাঁহার শব্দজ্ঞান হয়েছে, তাঁর সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়ে যায়, তিনি পবিত্র হয়ে স্বর্গ প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দজ্ঞানের একমাত্র উপায়। অতএব ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দজ্ঞান উৎপাদনের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন—ইহা এই মন্ত্রে উপমাদ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে। স্বর্গপ্রাপ্তি- রূপ ফলের উদ্দেশে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য (১৯৩)।

ইহা প্রতিপাদনের উদ্দেশে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে এই মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন॥ ২৯॥

---

(১৯১) সূর্মীং শোভনাময়ঃপ্রতিমাম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

(১৯২) ঊষ-সুষি মুষ্ক-মধোরঃ [৫।২।১০৭]

ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।

সম্বন্ধেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥ মহাভাষ্য ৫।২.৯৪

(১৯৩) অনেন স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলমিত্যুক্তম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

মূল

কিং পুনরিদং ব্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ
প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে, ন পুনরন্যদপি কিঞ্চিৎ ?
ওম্ ইত্যেবমুক্ত্বা * বৃত্তান্তশঃ শমিত্যেবমাদীঞ্
শব্দান্ পঠন্তি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—কি কারণে ব্যাকরণই অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুকগণকে [ব্যাকরণের] প্রয়োজন বলা হচ্ছে ; অন্য কিছুর [বেদের] অধ্যয়নেচ্ছুগণকে [প্রয়োজন বলা হয় না] । 'ওম্' এইরূপ উচ্চারণ করে প্রপাঠক ক্রমে 'শম্' প্রভৃতি শব্দরাশির অধ্যয়ন করে থাকে ॥ ৩০ ॥

বিবৃতি—অধিপূর্বক অধ্যয়নার্থক 'ইঙ্' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করে, সেই সনন্ত 'অধিজিগাংস' ধাতুর উত্তর 'শানচ্' প্রত্যয় করে—"আধিজিগাংসমানেভ্যঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। ইচ্ছা অর্থে সাধারণত 'সন্' প্রত্যয় হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হয়েছে। যাদের ব্যাকরণ অধ্যয়নের ইচ্ছা আছে, তাদের সেই ইচ্ছা থেকেই ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হবে। এরূপ অবস্থায় ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে প্রয়োজন বর্ণনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এইজন্য এখানে 'সন্' প্রত্যয়ের অন্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আশঙ্কা বা সম্ভাবনা অর্থেও 'সন্' প্রত্যয় হয় (১২৪)। এখানে সেই সম্ভাবনা অর্থে 'সন্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে—এইরূপ ব্যাখ্যা করতে হবে। তা হলে "ব্যাকরণম্ অধিজিগাংসমানেভ্যঃ" ইত্যাদি অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা হবে—যাদের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ যারা ব্যাকরণের প্রয়োজন অবগত হলে, ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হতে পারে, তাদের উদ্দেশে প্রয়োজন বলা হচ্ছে। বস্তুতঃ যাদের যোগ্যতা না থাকায় কোন কালে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাদের উদ্দেশে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনা নিরর্থক। সন্ প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইজন্য এখানে অনুবাদে 'সন্' প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুত এখানে যে সম্ভাবনা অর্থেই 'সন্' প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করা উচিত, তার যুক্তি উপরে প্রদর্শিত হল।

---

* 'ওম্ ইত্যুক্ত্বা'—পাঠান্তর।
(১২৪) মহাভাষ্য—৩।১।৭ দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয়সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে 'প্রপাঠক' দেখা যায়। এক একটি অধ্যায়কে বিভিন্ন 'প্রপাঠকে' বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রপাঠককেই এখানে মহাভাষ্যকার 'বৃত্তান্ত' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করেছেন। এক একটি প্রপাঠকে প্রায় এক একটি বিষয়ের আলোচনা আছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণভাবে এক একটি প্রপাঠক এক একটি বিষয়ের প্রকরণ। ইহা লক্ষ্য করে মহাভাষ্যকার 'প্রপাঠক' শব্দের পরিবর্তে 'বৃত্তান্ত' শব্দের ব্যবহার করেছেন। 'বৃত্তান্ত' শব্দের প্রকরণ অর্থে ব্যবহার যুক্তিহীন নয়।

যারা বেদের অধ্যয়ন করে, তাদের অধ্যয়নের পূর্বে এবং পরে প্রণব [ওঁ] উচ্চারণ করবার বিধান আছে—

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতে ॥ [মনু ২য় অঃ]

বেদের পাঠের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ করবে। আরম্ভে প্রণব উচ্চারণ না করলে বেদক্ষরিত হয় এবং সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ না করলে বেদ বিশীর্ণ হয়ে যায়। ওঁকারটি আবার স্বীকৃতির সূচক। এই কারণে বেদের অধ্যয়নের পূর্বে প্রণবের উচ্চারণের দ্বারা গুরুর প্রতি শিষ্যের আনুগত্যও সূচিত হয়। এই কারণে বেদের অধ্যয়নের পূর্বে প্রণবের উচ্চারণের প্রথা আছে। সেই প্রথাকে লক্ষ্য করে এখানে পতঞ্জলি 'ওমিত্যুক্ত্বা' ইহা লিখেছেন।

এখানে ভাষ্যে যে আশঙ্কা করা হয়েছে—তার অভিপ্রায় এই—যারা বেদের অধ্যয়ন করে, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বর্ণনা করে তাদের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদন করতে হয় না। তারা কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না করেই বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে বিস্তৃতভাবে প্রয়োজনের বর্ণনা করা হয়েছে। ইহার দ্বারা দ্বারা ব্যাকরণের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষই দ্যোতিত হচ্ছে। ভাষ্যে 'শমিত্যেবমাদীন্' বলা হয়েছে। এস্থলে 'শম্' শব্দটি অথর্ববেদের "শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে" ইত্যাদি বুঝাচ্ছে। ভাষ্যকার প্রথমে বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রসঙ্গেও অথর্ববেদের প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। এখানেও সেই রীতির অনুসরণ করেছেন ॥৩০॥

মূল।

পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকালং* ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং

* 'সংস্কারকালোত্তরম্' পাঠান্তর।
+ 'তত্তৎস্থানকরণ নাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো' পাঠান্তর।

স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে। তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ, লোকাচ্চ লৌকিকা অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে ইমানি প্রয়োজনানি অধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পূর্বকালে এই [রীতি] ছিল, [উপনয়ন] সংস্কারের উত্তরকালে ব্রাহ্মণগণ ব্যাকরণের অধ্যয়ন করতেন। সেই সেই [উচ্চারণ] স্থান, করণ [আভ্যন্তর প্রযত্ন], এবং অনুপ্রদানে [বাহ্য প্রযত্নে] অভিজ্ঞ সেই সকল [ব্যক্তি] কে বৈদিক শব্দ সমূহের [বেদের] উপদেশ করা হোত। বর্তমান সময়ে তাহা সেরূপ নাই। বর্তমান সময়ে [প্রথমে] বেদ অধ্যয়ন করে [বিবাহাদি ব্যাপারে] ত্বরাযুক্ত [ব্যগ্র] হয়ে বক্তা হন [বলতে আরম্ভ করেন]—বেদ থেকে বৈদিক শব্দ সকল আমাদের [কাছে] জ্ঞাত হয়েছে; লৌকিক শব্দ সকল লোক থেকে [আমাদের জ্ঞাত হয়েছে] [অতএব] ব্যাকরণ অনর্থক [নিষ্প্রয়োজন]। এইরূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন সেই অধ্যেতৃগণকে আচার্য [অধ্যাপক—মহাভাষ্যকার] সুহৃদ্ হয়ে [বন্ধু ভাবে] এই [প্রয়োজন প্রতিপাদক শাস্ত্রের অন্বাখ্যান [বর্ণনা] করেন; [ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের] এই সকল প্রয়োজন [আছে, অতএব] ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ৩১ ॥

বিশেষবক্তব্য :—'তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্ঞেভ্যঃ' এই অংশে 'তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যঃ' এইরূপ পাঠান্তর প্রচলিত পুস্তকে আছে। সেই পাঠ শুদ্ধ নয়। অনু-প্রদান শব্দের অর্থ বাহ্য প্রযত্ন। নাদ বাহ্য প্রযত্নের অন্তর্গত। নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোতে 'অনুপ্রদান' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—'অনুপ্রদানং নাদাদিবাহ্যপ্রযত্নঃ' সুতরাং প্রচলিত পাঠে 'নাদ' শব্দটির আধিক্য সমর্থন যোগ্য নয় ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি :—পূর্বমহাভাষ্যে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনার বিরুদ্ধে যে আশঙ্কা উত্থাপিত হয়েছিল, সেই আশঙ্কার সমাধান করা হচ্ছে। মুখের যে অংশে বায়ুর সংযোগ হয়ে, যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাকে সেই বর্ণের স্থান বলে। বর্ণের উচ্চারণ করতে হলে, ঐ সকল স্থানে বায়ুর সংযোগ সম্পাদনের জন্য মুখের

মধ্যে কণ্ঠ, তালু, প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা বায়ুতে ক্রিয়া উৎপাদন করতে হয়। মুখের মধ্যে এই যে ব্যাপার হয়, সেই সকল ব্যাপারের নাম 'করণ' বা আভ্যন্তর প্রযত্ন'। এই আভ্যন্তর প্রযত্নের দ্বারা প্রথমে বর্ণ উচ্চারিত হলেও তাতে স্পষ্টতা আসে না। এই স্পষ্টতা সম্পাদনের জন্য অন্য প্রকার ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে, এই ব্যাপারের নাম 'অনুপ্রদান' বা বাহ্য প্রযত্ন। এই বাহ্য প্রযত্ন মুখের বাহিরে শরীরের অভ্যন্তরে নিষ্পাদিত হয়। মুখের বাহিরে এই প্রযত্ন হয় বলেই ইহাকে বাহ্যপ্রযত্ন বলে। স্থান, করণ এবং অনুপ্রদানের বিষয় সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্যাকরণে আলোচিত না হলেও, যাহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, তাহাদের এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকলে, ব্যাকরণের অধ্যয়ন কোন রূপে চলতে পারে না। এই সকল বিষয়ে 'শিক্ষায় আলোচিত হয়েছে। অতএব যাহারা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের 'শিক্ষা' অধ্যয়ন করতে হয়। ইহা লক্ষ্য করেই মহাভাষ্যকার বলেছেন প্রথমেই যারা ব্যকরণ অধ্যয়ন করত, তারা স্থান, করণ এবং অনুপ্রদানে অভিজ্ঞ হয়ে বেদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হত। "তুল্যাস্য প্রযত্নং সবর্ণম্" [১।১।৯] এই সূত্রের মহাভাষ্যে স্থান, করণ ও অনুপ্রদানের আলোচনা করা হয়েছে ॥৩১॥

মূল

উক্তঃ শব্দঃ। স্বরূপমপ্যুক্তং ; প্রয়োজনান্য

প্যুক্তানি। শব্দানুশাসনমিদানীং কর্তব্যম্ ॥৩২॥

অনুবাদ :—শব্দ বলা হয়েছে। [শব্দের] স্বরূপও বলা হয়েছে। [ব্যাকরণ অধ্যয়নের] প্রয়োজনও বলা হয়েছে। এখন শব্দানুশাসন [শব্দের উপদেশ] করতে হবে ॥৩২॥

বিবৃতি :—এখানে মহাভাষ্যকার বলছেন—শব্দ, তাহার স্বরূপ এবং ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন বলা হয়েছে। ইহাদের মধ্যে "গৌরশ্বঃ পুরুষঃ হস্তী" ইত্যাদি গ্রন্থে শব্দ বলা হয়েছে। "যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গূলককুদ খুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি"। এই বাক্যে শব্দের স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। আর "রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্" এইখান থেকে আরম্ভ করে "সত্যদেবাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্" এই পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ

অধ্যয়নের প্রয়োজন বলা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এইগ্রন্থে প্রথম থেকে আরম্ভ করে এতদূর পর্যন্ত যা কিছু বলেছেন, তার উপসংহার করবার জন্য এখানে বললেন—"উক্তঃ শব্দঃ" ইত্যাদি। প্রথম থেকে এপর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় শব্দ এবং ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হয়েছে—ইহা পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যেই এই উপসংহার করা হয়েছে।

নাগেশ ভট্ট এস্থলে মহাভাষ্যের উক্তরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন বিষয় এবং প্রয়োজন নিরূপণ করাতেই সম্বন্ধ এবং অধিকারীও নিরূপিত হয়ে গেছে। এই জন্য মহাভাষ্যকার পৃথগ্‌ভাবে সম্বন্ধ ও অধিকারী বলেন নাই (১২৫)

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার যোগ্য—যে বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে' তার উল্লেখ করে, এর পর যা বলা হবে, তরে সূচনা করার উদ্দেশে গ্রন্থের মধ্যে পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপে বর্ণনা করে, পরবর্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করার রীতি আছে (১২৬)। ইহার দ্বারা পূর্ববর্তী সন্দর্ভের সহিত পরবর্তী সন্দর্ভের সঙ্গতি সূচিত হয় এবং শিষ্যের বুদ্ধি পরবর্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ে অবহিত হয়। এই স্থলে মহাভাষ্যকার 'উক্তঃ শব্দঃ......উক্তানি' এই অংশের দ্বারা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলন করে 'শব্দানুশাসনমিদানীং কর্তব্যম্' এই বাক্যের দ্বারা পরবর্তী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সূচিত করেছেন ॥৩২॥

মূল

তৎ কথং কর্তব্যম্? কিং শব্দোপদেশঃ কর্তব্যঃ, আহোস্বিদপশব্দোপদেশঃ, আহোস্বিদুভয়োপদেশ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ :—সেই [শব্দানুশাসন] কি প্রকারে করতে হবে? শব্দের উপদেশ

---

(১২৫) অয়মুপসংহারো গ্রন্থস্য বিষয়প্রয়োজননিরূপণমেতাবতা কৃতমিতি বোধয়িতুম্। তেনৈব সম্বন্ধাধিকারিণাবুক্তাবিতি তৌ পৃথঙ্‌নোক্তৌ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

শাস্ত্রের দুইপ্রকার সম্বন্ধ আছে—(১) শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং (২) বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ। শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তার নাম প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ। বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধের নাম প্রয়োজ্যপ্রয়োজকভাবসম্বন্ধ। যে প্রয়োজনের সিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র রচিত হয়, যিনি সেই প্রয়োজনের প্রার্থী, তিনিই শাস্ত্রের অধিকারী।

(১২৬) ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য ১।১।৫; দেখা যায়, এই রীতি শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে। শাঙ্করভাষ্যে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের আরম্ভে ও এইরীতি আছে।

করতে হবে ? অথবা অপশব্দের উপদেশ [করতে হবে] কিংবা উভয়ের উপদেশ [করতে হবে] ॥৩৩॥

বিবৃতি :—এখানকার মূলের 'কিম্' শব্দটি প্রশ্নের সূচক। 'অপশব্দ' এই শব্দটির অর্থ অসাধু অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ। 'এই অপশব্দের' প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে এখানে 'শব্দ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং এখানে 'শব্দ' এই শব্দটির অর্থ শুদ্ধ শব্দ—সাধুশব্দ। যদি ব্যাকরণে কেবল শুদ্ধ শব্দের উপদেশ করা হয় অর্থাৎ সমস্ত শুদ্ধ শব্দ সংগ্রহ করে ব্যাকরণে পাঠ করা হয়, তা হলে সেই সকল শুদ্ধশব্দ ব্যতীত অন্যশব্দগুলি যে অপশব্দ, তা বুঝতে পারা যাবে। এইরূপ কেবল অপশব্দগুলির যদি ব্যাকরণে পাঠ করা হয়, তা হলে সেই সকল অপশব্দ ভিন্ন অন্য যে সকল শব্দ অবশিষ্ট থাকবে, সেগুলিই শুদ্ধ শব্দ – ইহা বুঝতে পারা যাবে। ব্যাকরণে শুদ্ধশব্দ এবং অপশব্দ—এই উভয় প্রকার শব্দের পৃথগ্‌ভাবে পাঠ করলে, অনায়াসে শুদ্ধ ও অশুদ্ধশব্দকে স্পষ্টভাবে জানতে পারা যাবে। এখানে পূর্বোক্ত তিনটি ভিন্নভিন্ন প্রশ্ন এইরূপ বিভিন্ন তিনটি অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে উত্থাপিত হয়েছে ॥ ৩৩ ॥

মূল

অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ। তদ্‌ যথা,—ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্য-প্রতিষেধো গম্যতে। 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' ইত্যুক্তে গম্যত এতদ্‌ অতোঽন্যে অভক্ষ্যা ইতি। 'অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্যনিয়মঃ। তদ্‌ যথা 'অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ' 'অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ' ইত্যুক্তে গম্যত এতদ্‌ 'আরণ্যো ভক্ষ্য' ইতি। এবমিহাপি। যদি তাবচ্ছব্দোপ-দেশঃ ক্রিয়তে, 'গৌরিত্যেতস্মিন্নুপদিষ্টে গম্যত এতদ্‌ 'গাব্যাদয়োঽ-পশব্দাঃ' ইতি। অথাপ্যপশব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে, গাব্যাদিষূপদিষ্টেষু-গম্যত এতদ্‌ গৌরিত্যেষ শব্দঃ' ইতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ :—[শব্দ এবং অপশব্দের মধ্যে] অন্যতরের উপদেশের দ্বারা [প্রয়োজন] সিদ্ধ হবে। যেমন ভক্ষ্যের নিয়মের দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ প্রতীয়মান হয়।—'পাঁচটি পঞ্চনখযুক্ত প্রাণী ভক্ষ্য' এইরূপ বললে—ইহা বুঝতে পারা যায় যে,—ইহারা ভিন্ন অন্য [পঞ্চনখবিশিষ্টপ্রাণী] অভক্ষ্য। অথবা অভক্ষ্যের নিষেধের দ্বারা, ভক্ষ্যের নিয়ম [প্রতীত হয়]। যেমন—'গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য' 'গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য' এইরূপ বললে—ইহা বুঝতে পারা যায় যে,

আরণ্য [বনে জাত] [কুক্কুট বা শূকর] ভক্ষ্য। এখানেও [শব্দানুশাসন স্থলেও] এইরূপ। যদি শব্দের উপদেশ [পাঠ] করা হয়, 'গৌঃ' এইশব্দ উপদিষ্ট হলে,—ইহা বুঝতে পারা যায় যে,—গাবী প্রভৃতি অপশব্দ। আর যদি অপশব্দের উপদেশ করা হয়—'গাবী' প্রভৃতি শব্দ উপদিষ্ট হলে ইহা বুঝতে হয় যে—'গৌঃ' এইটি শব্দ ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি – শব্দ এবং অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশ [পাঠ] করলে যদিও স্পষ্টভাবে উভয়ের জ্ঞান হতে পারে, তথাপি উভয়ের উপদেশ অধিক প্রয়াস সাপেক্ষ বলে গৌরবগ্রস্ত। এই কারণে মহাভাষ্যকার বলছেন,—উভয়ের উপদেশের প্রয়োজন নাই। শব্দ ও অপশব্দ—এই উভয়ের মধ্যে একতরের উপদেশ করলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। মহাভাষ্যকার এখানে দুটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন। তিনি বলেছেন—ভক্ষ্যের নিয়ম করলে, তার দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ প্রতীত হয়। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" —গণ্ডার, শ্বাবিধ [সজারু], গোধা, শশক, এবং কূর্ম এই পাঁচটি পঞ্চনখ যুক্ত প্রাণী ভক্ষ্য (১৯৭), ইহা বললে, এই পাঁচটি ব্যতীত ইহাদের সমানশ্রেণীর পঞ্চনখযুক্ত অপর প্রাণী—বানরাদি অভক্ষ্য, ইহা অনায়াসেই বুঝতে পারা। এইরূপ 'গৌঃ" প্রভৃতি সাধুশব্দের উপদেশ করলে, ইহা ব্যতীত, ইহার সমানার্থক 'গাবী' 'গোণী' 'গোতা' 'গোপোতলিকা' প্রভৃতি শব্দ যে অপশব্দ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অথবা অভক্ষ্যের নিষেধ করলে, তার দ্বারা ভক্ষ্যের নিয়ম প্রতীত হয়। 'গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য' 'গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য' এরূপ বললে, গ্রাম্যকুক্কুট ও গ্রাম্য শূকরের অভক্ষ্যতা প্রতীতির

---

(১৯২) পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ ॥
[বাল্মীকিরামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড] ১৭।৩৯

শল্যকঃ খড়্গী। শুক্তিকাকারশল্যাবৃতসর্বাঙ্গো জন্তুবিশেষঃ ইত্যন্যে। [রামাভিরামীয়টীকা]

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈবিশঃ।
যথাশাস্ত্রং প্রমাণং তে মা ভক্ষ্যে মানসং কৃথাঃ ॥ [মহাভারত শান্তিপর্ব ১৪১।৭০]

ন ভক্ষয়েদেকচরানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্ সর্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা ॥
শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গ কূর্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ ॥ [মনুসংহিতা ১৭—১৮]

সঙ্গে সঙ্গে আরণ্য অর্থাৎ বন্যকুক্কুট এবং বন্যশূকর যে ভক্ষ্য তাহাও বুঝতে পারা যায়। এইরূপ 'গাবী' প্রভৃতি অপশব্দের উপদেশ করলে 'গৌঃ' প্রভৃতি শব্দ যে শুদ্ধ তাহা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যাকরণে শুদ্ধশব্দ এবং অপশব্দ—এই উভয়ের উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ব্যাকরণে উপদেশ করতেই হয়, তাহলে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির উপদেশ করলেই অনায়াসে ঈপ্সিত প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। মহাভাষ্যকার "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই বাক্যকে নিয়ম বলেছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা নিয়মবিধি নয় কিন্তু পরিসংখ্যাবিধি, মীমাংসকদের মতে বিধি তিন প্রকার—(১) অপূর্ববিধি, ২ নিয়মবিধি এবং (৩) পরিসংখ্যাবিধি,—

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥ [তন্ত্রবার্তিক]

(১) যাহা অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে বিষয় পূর্বে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই, তদ্বিষয়ে যে বিধি হয়, ইহাকে 'অপূর্ব বিধি বলে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি'। কুমারিলভট্টের অনুবর্তী মীমাংসকদের মতে - ইহার অর্থ অগ্নিহোত্র নামক হোমের দ্বারা ইষ্ট [ইচ্ছার বিষয়ীভূত] বস্তু উৎপাদন করবে (১৯৮)। এই বাক্যের দ্বারা ইষ্ট [স্বর্গ] বস্তুর উৎপাদনের প্রতি 'অগ্নিহোত্র' নামক হোমের করণতা, প্রতীত হয়ে থাকে। ইষ্টবস্তুর প্রতি হোমের এই করণতা এই বাক্যের অর্থজ্ঞানের পূর্বে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই। অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপক হওয়ায় 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যটি অপূর্ববিধি। (২) যে স্থলে অন্য প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন দুইটি পক্ষ বৈকল্পিক ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়ে আছে, সে স্থলে যদি বিধিবাক্যের দ্বারা প্রমাণান্তর প্রাপ্ত দুই পক্ষের মধ্যে অন্যতর পক্ষে পর্যবসান ঘটে, তবে সে স্থলে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়ে থাকে। দর্শ এবং পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে পুরোডাশ দ্বারা হোম করা হয়। তণ্ডুল অথবা যবের চূর্ণের সঙ্গে উষ্ণ জল (১৯৯) মিশ্রিত করে সেই চূর্ণকে কূর্মাকৃতি পিণ্ড করতে হয়।

---

(১৯৮) "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যের উক্তপ্রকার অর্থ ভাট্টমীমাংসকসম্প্রদায়ের সম্মত। যেহেতু তাঁরা এই বাক্যের "অগ্নিহোত্রহোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" এইরূপশাব্দবোধ স্বীকার করেছেন।

(১৯৯) এই উষ্ণজলকে 'মদন্তী' শব্দে অভিহিত করা হয়। যে পাত্রে এই জল রেখে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়, সেই পাত্রের নাম ও 'মদন্তী'। [শ্রৌতপদার্থনির্বচন, ইষ্টি প্রকরণ]

গার্হপত্য নামক অগ্নিতে মৃত্তিকানির্মিত কপালে (২০০) এই পিণ্ডকে ভর্জন করলে, সেই কূর্মাকৃতি পিণ্ড পুরোড়াশ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এইরূপ পুরোড়াশ নির্মাণ করতে যে চূর্ণের প্রয়োজন হয়, সেই চূর্ণ করবার পূর্বে ধান্য কিংবা যবকে তুষ-রহিত করে নিতে হয়। ধান্য বা যবের উপরিভাগ থেকে তুষের অপসারণ নখের দ্বারা করতে পারা যায়, আবার উদূখলে ধান্য বা যব রেখে তাতে মুষলের আঘাত করলে ও তুষের অপসারণ হতে পারে। যে স্থলে নখের দ্বারা চিরে তুষের অপসারণ করা হয়ে থাকে, সে স্থলে মুষলাঘাতের প্রয়োজন হয় না। আবার যে স্থলে মুষলাঘাতের দ্বারা তুষের অপসারণ করা হয়, সে স্থলে নখ বিদলনের [নখের দ্বারা তুষ চিরার] অপেক্ষা থাকে না। অতএব এরূপ স্থলে অবঘাতের [মুষলাঘাতের] পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে। নিয়ত প্রাপ্তি নাই। এইরূপ অবস্থায় "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই বিধির দ্বারা অবঘাতের নিয়ত প্রাপ্তি সম্পাদন করা হয়েছে। পুরোডাশের জন্য যে তণ্ডুল প্রস্তুত করতে হবে, সেই তণ্ডুল কোন অবস্থাতেই নখবিদলনাদি অন্য প্রকারে নিষ্পাদন করা চলবে না, সকল অবস্থাতেই সেই তণ্ডুল অবঘাতের দ্বারা সম্পাদন করতে হবে। এই নিয়ম বিধির কোন দৃষ্টফল সম্ভাবিত নয়। অবঘাতব্যতীত নখবিদলনাদি দ্বারা ও তুষের নিবৃত্তি করা যেতে পারে। এইজন্য নিয়মবিধির অদৃষ্ট ফল স্বীকার করা হয়। এই অবঘাত [মুষলাঘাত] থেকে একটি অপূর্ব [অদৃষ্ট] উৎপন্ন হয়। এই অপূর্বটি, দর্শপূর্ণমাসাদি প্রধানযাগ জন্য পরমাপূর্বের [দর্শপূর্ণমাসাদি প্রধান যাগ হতে যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, সেই অপূর্ব স্বর্গাদি ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলে তাকে পরমাপূর্ব বলে] উৎপত্তিতে সহায়তা করে। এই অবঘাতজনিত অপূর্ব না থাকলে সেই পরমাপূর্বের উৎপত্তি হতে পারে না। এস্থলে এই অবঘাত বিধির দ্বারা অবঘাতের অভাবপক্ষে প্রাপ্ত নখবিদলনাদির নিবৃত্তি হয়। (৩) যে স্থলে একই বিষয়ে একাধিক বস্তুর অন্য কোন প্রকারে যুগপৎ প্রাপ্তি ঘটে, সেই স্থলে বিধিবাক্যের দ্বারা অন্যের নিবৃত্তি করে কোন একটি পদার্থের নিশ্চিতরূপে প্রাপ্তির সম্পাদন করলে, সেইরূপ স্থলে পরিসংখ্যাবিধি স্বীকৃত হয়। যেমন পান ভোজনাদি মানুষের স্বাভাবিক রাগের [কামনার] বস্তু। এই স্বাভাবিক রাগের বশে গণ্ডার, কূর্ম, শশক, সজারু এবং গোধা এই পাঁচটি পঞ্চনখযুক্ত

(২০০) পুরোডাশের ভর্জনে ব্যবহৃত দুই অঙ্গুলি উচ্চ অগ্নিপক্ক মৃত্তিকানির্মিত পাত্রবিশেষের নাম কপাল।

প্রাণীর ভক্ষণে যেরূপ মানুষের প্রবৃত্তি হতে পারে, সেইরূপ এই পাঁচটি ভিন্ন বানর প্রভৃতি অন্য পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ভোজনেও মানুষের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণই মানুষের রাগপ্রাপ্ত। এস্থলে "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এইপ্রকার বিধিবাক্যের দ্বারা উক্ত পাঁচটি পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণ বিহিত হয়েছে। এই বিধি উক্ত পাঁচটি প্রাণীর ভক্ষণের বিধান করছে এরূপ মনে করলে—এই বিধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ এই বিধি ব্যতিরেকেও স্বাভাবিক রাগের বশে বানরাদি অন্য পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর মত উক্ত 'শল্যক' প্রভৃতি পাঁচটি প্রাণীর ভক্ষণও প্রাপ্ত আছে। যাহা অন্যপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য বিধির কোন অপেক্ষা না থাকায় সেরূপ স্থলে বিধিব ব্যর্থতায় পর্যবসান হওয়া ব্যতীত অন্য কোন গতি থাকে না। এইজন্য এই ক্ষেত্রে বিধির ব্যাপার প্রবৃত্তির দিকে স্বীকার না করে নিবৃত্তির দিকেই স্বীকার করা হয়। উক্ত পাঁচটি পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী ব্যতীত অন্য পঞ্চনখবিশিষ্ট বানরাদি প্রাণী ভক্ষণ করবে না, এইরূপ নিষেধের অনুকূলে 'পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষ্যাঃ' এই বিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে বিধির ব্যর্থতা নিবারিত হয়ে থাকে। যে স্থলে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়, সে স্থলে অন্যের নিবৃত্তি হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সেই নিবৃত্তি শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না। অন্য একটি বস্তুর [অবঘাতের] নিয়ত ভাবে শব্দের দ্বারা বিধান করলে অন্য বস্তুর [নখবিদলন প্রভৃতির] পক্ষান্তরে যে প্রাপ্তি আছে, সেই প্রাপ্তির আপনা থেকেই নিবৃত্তি ঘটে। এই নিবৃত্তিকে আর্থিক নিবৃত্তি বলে। পরিসংখ্যা বিধিস্থলে সেই বিধির ব্যর্থতানিবারণের জন্য সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অন্যের নিবৃত্তি স্বীকার করতে হয়। অতএব নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যা বিধির মধ্যে মূলত পার্থক্য এই যে, নিয়মবিধিস্থলে অন্যের নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ, সাক্ষাৎ শব্দপ্রতিপাদ্য নয়। পরিসংখ্যাবিধিস্থলে অন্যের নিবৃত্তি সাক্ষাৎ শব্দেরই প্রতিপাদ্য,—অর্থসিদ্ধ নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' এই বিধি বাক্যটি পূর্বমীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিসংখ্যাবিধি, নিয়মবিধি নয় (২০১)। এখন এখানে এই প্রশ্ন উঠে যে মহাভাষ্যকার 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' এইরূপ বিধি-

(২০১) নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যাবিধির পার্থক্য কেবল যে নব্যমীমাংসকদেরই সম্মত তা নয়। ইহা পূর্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনি ও ভাষ্যকার শবরস্বামী প্রভৃতিরও সম্মত।

[মীমাংসাদর্শন ১।২।৩৭]

বাক্যকে পরিসংখ্যা বিধির অন্তর্গত না বলে ‘নিয়ম’ রূপে উল্লেখ করেছেন কেন? এখানে তাঁর অভিপ্রায় কি? এর উত্তরে মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে নাগেশ ভট্ট বলেছেন পরিসংখ্যাস্থলে সাক্ষাদ্ভাবে অন্যের নিবৃত্তি হয়। নিয়মস্থলে সাক্ষাদ্ ভাবে অন্যের নিবৃত্তি না থাকলেও, অন্যের নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ ইহা স্বীকৃত হয়েছে। তা হলে ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যা’ এই দুই প্রকার বিধিতেই কোন না কোন ভাবে অন্যের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। এই অন্যনিবৃত্তি অংশে ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যার’ যে সাম্য আছে, সেই সাম্যকে অবলম্বন করে ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যার, অভেদ আশ্রয় করে মহাভাষ্যকার এখানে ‘পরিসংখ্যাকে’ ও ‘নিয়ম’ বলে উল্লেখ করেছেন (২০২) ॥৩৪॥

মূল

কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ? লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশঃ।

লঘীয়াঞ্ছব্দোপদেশঃ, গরীয়ানপশব্দোপদেশঃ।

একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্ যথা ‘গৌ’—রিত্যস্য শব্দস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ। ইষ্টান্বাখ্যানং খল্বপি ভবতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ :—এখানে [শব্দ ও অপশব্দের উপদেশের মধ্যে] কোন্‌টি প্রশস্ততর? লাঘববশত শব্দের [শুদ্ধ শব্দের] উপদেশ [প্রশস্ততর]। শব্দের [সাধুশব্দের] উপদেশ লঘুতর; অপশব্দের [অসাধুশব্দের] উপদেশ গুরুতর। এক একটি [সাধু] শব্দের বহু অপভ্রংশ [অসাধুশব্দ] [আছে]। যেমন ‘গৌঃ’ এই [সাধু] শব্দের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা ইত্যাদি প্রকার অপভ্রংশ সকল [আছে]। ঈপ্সিত বস্তুর [শুদ্ধ শব্দের] বর্ণনা ও [সিদ্ধ] হয় ॥৩৫॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার শব্দের উপদেশ বিষয়ে প্রথমে তিনটি বিকল্প উঠিয়েছিলেন। শব্দের উপদেশ অথবা অপশব্দের উপদেশ কিংবা শব্দ ও অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশ। সেই তিনটি বিকল্পের মধ্যে যখন তার ব্যাখ্যা

---

(২০২) ননু পরিসংখ্যাত্বাৎ কথং নিয়মত্বেন ব্যবহারঃ? অস্তি চ নিয়মপরিসংখ্যায়োর্ভেদঃ। পাক্ষিকাপ্রাপ্তিকাপ্রাপ্তাংশপরিপূরণফলো নিয়মঃ, অন্যনিবৃত্তিফলা চ পরিসংখ্যা ইতি চেৎ। ন। নিয়মেঽপ্যপ্রাপ্তাংশপরিপূরণরূপফলবোধনদ্বারা’ অর্থাদন্যনিবৃত্তেঃ সত্ত্বেনাভেদমাশ্রিত্যোক্তেঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

করেছিলেন তখন দুটি বিকল্পেরই ব্যাখ্যা করেছিলেন। ভক্ষ্যের নিয়মের দ্বারা যেমন অভক্ষ্যের নিষেধ বুঝায় সেইরূপ শব্দের [সাধুশব্দের] উপদেশের দ্বারা অসাধুশব্দেরও পরিচয় হয়ে যায়। এইটি প্রথম বিকল্পের ব্যাখ্যা। অভক্ষ্যের নিষেধের দ্বারা যেমন ভক্ষ্যের নিয়ম হয় সেইরূপ অপশব্দের উপদেশের দ্বারা তদতিরিক্ত শব্দগুলি সাধুশব্দ ইহা জানা যায়। এইটা দ্বিতীয় বিকল্পের ব্যাখ্যা। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বে তৃতীয় বিকল্পটি উঠালেও তার ব্যাখ্যা করেন নাই। উত্তর প্রদানকালেও দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিকল্পের কোন প্রসঙ্গ উঠান নাই। এই ভাবে তৃতীয় বিকল্প উঠিয়ে তার সম্বন্ধে কিছু বললেন না কেন? এইরূপ একটা আশঙ্কা হতে পারে। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি নিজেই উক্ত তৃতীয় পক্ষের অনাবশ্যকতার সূচনা করেছেন। তিনি পূর্বেই "অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ।" অন্যতরের উপদেশের দ্বারা শব্দানুশাসন সিদ্ধ হয়ে যায়। সাধুশব্দের উপদেশ অথবা অসাধুশব্দের উপদেশের দ্বারা শব্দানুশাসন সিদ্ধ হয়ে যায়। ভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তিনি তৃতীয় পক্ষটি হেয় বলেই পূর্বেই সূচিত করে দিয়েছেন। শব্দের উপদেশ বা অপশব্দের উপদেশের দ্বারা শব্দের জ্ঞান সিদ্ধ হলে—উভয়ের [সাধু ও অসাধু শব্দের] উপদেশ অত্যন্ত গৌরবগ্রস্ত বলে ব্যর্থ। এই জন্য এখানে ভাষ্যকার প্রশ্ন উঠিয়েছেন "কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ" "জ্যায়ঃ" প্রশস্য শব্দের উত্তর ঈয়সুন্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন। প্রশস্য শব্দের স্থানে জ্যা আদেশ এবং 'ঈয়সুন্' এর ঈকার লোপ করে 'জ্যায়স্' শব্দ সিদ্ধ হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে একের অতিশয় উৎকর্ষ বুঝালে তদ্ বাচকশব্দের উত্তর তরপ্ বা ঈয়সুন্ প্রত্যয় হয়। এখানে শব্দের উপদেশ এবং অপশব্দের উপদেশ এইদুটি বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাবার জন্য প্রশস্য শব্দের উত্তর ঈয়সুন্ প্রত্যয় করায় উক্ত দুইটি পক্ষের কোন্ পক্ষটি প্রশস্যতর ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য রূপে পর্যবসিত হয়েছে।

এর উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন "লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশ."। শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের উপদেশই প্রশস্যতর, যেহেতু সাধুশব্দের উপদেশে লাঘব আছে। অপশব্দ বা অসাধুশব্দের উপদেশ অপেক্ষা সাধুশব্দের উপদেশে লাঘব আছে। ইহারই ব্যাখ্যা করেছেন—'লঘীয়াঞ্ছব্দোপদেশঃ" শব্দের উপদেশ লঘুতর। "গরীয়ানপশব্দোপদেশঃ" অপশব্দের উপদেশ গুরুতর। অপশব্দের উপদেশ কেন গুরুতর? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽ

পভ্রংশাঃ।" এক একটি সাধুশব্দের অনেক অপশব্দ আছে। যেমন একটি 'গৌঃ' এই সাধুশব্দের গাবী, গোণী, ইত্যাদি অনেক অপশব্দ আছে। অতএব সাধুশব্দের উপদেশে যে লাঘব আর অসাধুশব্দের উপদেশে গৌরব ইহা স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে। এইভাবে সাধুশব্দের উপদেশে লাঘব আছে বলে, সাধুশব্দের উপদেশ করলে, তদ্ভিন্ন শব্দগুলি যে অপশব্দ অর্থাৎ অসাধুশব্দ তাহা অনায়াসে জানা যাবে। তার পর মহাভাষ্যকার বলেছেন—এই সাধুশব্দের উপদেশে কেবল লাঘব আচে বলেই যে সাধুশব্দের উপদেশ 'জ্যায়ান্' অর্থাৎ প্রশস্ততর, তা নয় কিন্তু এই সাধুশব্দের উপদেশ করলে ইষ্টের অন্বাখ্যানও হয় বলে সাধুশব্দের উপদেশ [জ্যায়ান্] প্রশস্ততর। "ইষ্টের অন্বাখ্যান" ইষ্ট অর্থাৎ ঈপ্সিত হচ্ছে শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞান। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'অথ শব্দানুশাসনম্' এই প্রথম ভাষ্যের দ্বারা "শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের জ্ঞানই শব্দানুশাসন [ব্যাকরণ] শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন" ইহা প্রতিপাদিত করেছেন। অতএব সাধুশব্দের জ্ঞান ইষ্ট। তার অন্বাখ্যান অর্থাৎ বর্ণনা বা প্রতিপাদন করা হয়, যদি সাধুশব্দের উপদেশ করা হয়। সাধুশব্দের উপদেশ থেকে সাক্ষাদ্ ভাবে ঈপ্সিত সাধুশব্দের জ্ঞান হবে। যে ব্যক্তি নিজের ঈপ্সিত বস্তু চায়, সে সেই ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিতে বিলম্ব সহ্য করে না, তাহাতে সে ত্বরান্বিত হয়। সাধুশব্দের জ্ঞান যাহার ঈপ্সিত সে অপরের [আচার্যের] নিকট থেকে সাধুশব্দের উচ্চারণ শুনে সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করবে। কিন্তু অসাধুশব্দের উপদেশ করলে অসাধুশব্দগুলি থেকে ভিন্ন শব্দই সাধু শব্দ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হতে বিলম্ব হবে। ইহা সাধুশব্দজ্ঞানের ইচ্ছুক ব্যক্তির ঈপ্সিত নয়। সুতরাং সাধুশব্দের উপদেশই তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ইষ্টের প্রতিপাদক—ইহা বুঝতে হবে। কৈয়ট আর একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে ধর্ম হয়। তা হলে সাধুশব্দের উপদেশ করলে, তা থেকে সাধুশব্দের জ্ঞান হবে, সেই সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম হবে। ধর্ম ইষ্ট। অতএব সেই ইষ্টধর্মের কারণ সাধুশব্দের বর্ণনাটিও ইষ্ট বর্ণনা। ইষ্টের সাধনও ইষ্ট ॥ ৩১ ॥

মূল

অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতি-

পদপাঠঃ কর্তব্যঃ—গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইত্যে-বমাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ? নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এব শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ। এবং হি শ্রূয়তে—"বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ-নান্তং জগাম।" বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা, ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা, দিব্যং বর্ষসহস্র-মধ্যয়নকালো, ন চান্তং জগাম, কিং পুনরদ্যত্বে। যঃ সর্বথা চিরং জীবতি স বর্ষশতং জীবতি। চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি। আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি। তত্র চাস্যাগমকালেনৈবায়ুঃ কৃৎস্নং পর্যুপযুক্তং স্যাৎ। তস্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ :- এখন এই শব্দের [সাধুশব্দের] উপদেশ [কর্তব্যরূপে নিশ্চিত হলে, শব্দসমূহের জ্ঞানে [জ্ঞানের উপায়রূপে] কি প্রত্যেক পদের পাঠ কর্তব্য [হবে]—গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষো, হস্তী, মৃগঃ ব্রাহ্মণঃ—ইত্যাদি প্রকারে শব্দের পাঠ করা হবে? না—এই উত্তরে দিচ্ছেন। এই প্রত্যেক পদের পাঠ শব্দ সকলের প্রতিপত্তিতে [জ্ঞানে] উপায় নয়। এইরূপ শোনা যায় [শ্রুতি আছে]—বৃহস্পতি দিব্য [দেবতাদের সম্বন্ধী] একসহস্র বৎসর ইন্দ্রকে, প্রতিপদে পঠিত শব্দ সমূহের শব্দপারায়ণ [শব্দপারায়ণ নামক শাস্ত্র] বলেছিলেন, [তাথাপি] শেষ প্রাপ্ত হন নাই [শেষ করতে পারেন নাই]। বৃহস্পতি প্রবক্তা [অধ্যাপক], ইন্দ্র অধ্যেতা, অধ্যয়নের কাল দেবতা সম্বন্ধী এক হাজার বৎসর, অথচ শব্দের শেষ প্রাপ্ত হন নাই [শব্দ শেষ করতে পারেন নাই], আধুনিক কালে আর কি [কথা]। অধুনা যে সর্বথা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে [বাঁচে] সে [বড়জোর] একশত বৎসর জীবিত থাকে। চার প্রকারে বিদ্যা উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। আগম কালের দ্বারা [গুরুর নিকট থেকে গ্রহণ কালে] স্বাধ্যায়কালের দ্বারা [অধীত শাস্ত্রের অভ্যাস কালে] প্রবচন অর্থাৎ অধ্যাপনা কালের দ্বারা, এবং ব্যবহারকালের [যজ্ঞাদি কর্মে প্রয়োগকাল] দ্বারা [বিদ্যা উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়]। সে স্থলে [সেই চার প্রকারের মধ্যে] আগমকালেই [গ্রহণ কালেই] ইহার [প্রতিপদে শব্দগ্রহণকামী আধুনিক

ব্যক্তির] সমস্ত আয়ু সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং শব্দ সমূহের জ্ঞানে [জ্ঞান নিমিত্ত] প্রতিপদ পাঠ উপায় নয় ॥ ৩৬ ॥

বিবৃতি :—শব্দ ও অপশব্দের উপদেশের মধ্যে শব্দের উপদেশে লাঘব এবং ইষ্টের অন্বাখ্যান হয় ইহা মহাভাষ্যকার পূর্বে বলেছেন। এখন এর উপর আশঙ্কা হতে পারে—শব্দের [সাধু শব্দের] উপদেশ কি ভাবে করা হবে? যত সাধু শব্দ আছে তারএক একটি করে উপদেশ করা হবে অথবা অন্য কোন উপায়ে সেই সাধুশব্দের উপদেশ করা হবে তার মধ্যে প্রথম উপায়ে· অর্থাৎ প্রত্যেক সাধুশব্দের উপদেশ করলে, এই পক্ষে কিদোষ হতে পারে তাহা প্রদর্শন করবার জন্য বলছেন—'অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে'' ইত্যাদি। এখানে 'অথ' শব্দটি প্রশ্ন বুঝবার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রশ্ন 'অথ' শব্দের বাচ্যার্থ নয়. কিন্তু 'অথ' শব্দ প্রয়োগে স্থলবিশেষে প্রশ্নের ভাবটি দ্যোতিত হয়। যদিও প্রশ্নার্থক 'কিম্' শব্দটি উক্তবাক্যে আছে, তথাপি 'কিম্' শব্দের দ্বারা প্রশ্নার্থটি স্পষ্ট করা হয়েছে 'অথ' শব্দের দ্বারা প্রশ্ন অর্থ দ্যোতিত হয় বলে প্রশ্নার্থটি অস্পষ্টভাবে প্রতীত হয় ; সেই অস্পষ্টতা দূর করবার জন্য পুনরায় 'কিম্' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা এখানে 'অথ' শব্দটি আনন্তর্যার্থকও বলা যেতে পারে। পূর্বে, শব্দের উপদেশের কর্তব্যতা প্রস্তাবিত হয়েছে তাকে অপেক্ষা করে, শব্দের উপদেশের প্রকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়েছে, পূর্ব প্রস্তাবিত কোন বিষয়কে অপেক্ষা করে পরবর্তী কোন বস্তুর কথনেও অথ শব্দটি ফলত আনন্তর্য-অর্থের বোধক হয় (২০৩)। 'অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি' এই বাক্যাংশটির যথাশ্রুত অর্থ—[অনন্তর] [এখন] ''এই শব্দোপদেশ হলে'। কিন্তু শব্দের উপদেশ 'হলে প্রতিপদের পাঠ কর্তব্য—এইরূপ বাক্যার্থ অসঙ্গত হয়ে যায়, এইজন্য 'এতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি' এই বাক্যাংশের অর্থ করতে হবে—"এই শব্দের উপদেশ কর্তব্যরূপে নিশ্চিত হলে—অর্থাৎ সাধুশব্দেরই উপদেশ করতে হবে—ইহা নিশ্চিত হলে।" এইরূপ অর্থের সঙ্গে "কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্তব্যঃ" এই পরবর্তী বাক্যাংশের অর্থের সঙ্গতি অব্যাহত থাকে।

"শব্দানাং প্রতিপত্তৌ" ''এই স্থলে "শব্দানাং" এই শব্দের অর্থ 'সাধু শব্দ সকলের'। 'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ এখানে "জ্ঞান"। যদিও 'প্রতিপত্তি' শব্দের 'লাভ' এইরূপ একটি অর্থ আছে, তথাপি শব্দের লাভটি জ্ঞানভিন্ন আর

(২০৩) পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্যাব্যতিরেকাৎ। [ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য ১।১।১]

কিছুই নয় বলে সোজাসুজি 'প্রতিপত্তি' শব্দের 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। "প্রতিপদপাঠঃ" এখানে 'পদং পদং' এইরূপ বীপ্সা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস করে 'প্রতিপদম্' এই পদ নিষ্পন্ন হয়। "প্রতিপদং [অর্থাৎ প্রত্যেকপদের] পাঠঃ" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করে 'প্রতিপদপাঠ' শব্দটি সিদ্ধ হয়। প্রত্যেক পদের পাঠ অর্থাৎ উচ্চারণ করে কি সাধুশব্দের উপদেশ করা হবে ?—ইহাই এখানে প্রশ্নের অভিপ্রায়। ইহাই বুঝাবার জন্য পরে বলেছেন—"গৌরশ্বঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ।" 'গৌঃ, অশ্বঃ' ইত্যাদি রূপে কি এক একটি শব্দের পাঠ [উচ্চারণ] করা হবে ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন 'নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠ.'। না। শব্দসকলের জ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রত্যেক পদের পাঠ উপায় নয়। এখানে "প্রতিপত্তৌ" এই শব্দে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ 'নিমিত্ত', নিমিত্তার্থে সপ্তমী "চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি" এইস্থলে যেমন চর্মন্ শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে সপ্তমী। "শব্দানাং প্রতিপত্তৌ" এইস্থলে 'শব্দানাং' এখানে কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি। প্রত্যেক পদের [সাধুশব্দের], পাঠ, শব্দসকলের জ্ঞানের উপায় নয় কেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই যেন বলেছেন—"এবং হি শ্রূয়তে 'বৃহস্পতিরিন্দ্রায়......কিং পুনরদ্যত্বে।" এখানে "বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।" এটি একটি শ্রুতিবাক্য। ইহা অর্থবাদ বাক্য। অর্থবাদ বাক্য ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত। ইহা কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্গত? তাহা জানা যায় না। মহাভাষ্যকারও এই বাক্যটি কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে, তাহা জানতেন না মনে হয়। কারণ তিনিও বলেছেন "এবং হি শ্রূয়তে" এইরূপ শোনা যায়। এই অর্থবাদ বাক্যটি যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা যদি মহাভাষ্যকার জানতেন তাহলে—"এবং হি শ্রূয়তে" এইরূপ না বলে "যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি" বলতেন অথবা কিছু না বলে কেবল এই শ্রুতি বাক্যটি উদ্ধৃত করতেন। সুতরাং মহাভাষ্যকারও ইহা কিম্বদন্তীর মত লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন। "দিব্যং বর্ষসহস্রম্" = দেবলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকের এক হাজার বৎসর। আমাদের মনুষ্যলোকের এক বৎসর বা ৩৬৫ দিনে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। সেই অহোরাত্রের পরিমাণে এক হাজার বৎসর বৃহস্পতি ইন্দ্রকে 'শব্দপারায়ণ' শাস্ত্র বলেছিলেন। মনুষ্যলোকের ৩৬৫০০০ হাজার

বৎসর পরিমিত হচ্ছে দেবতাদের এক হাজার বৎসর। এতদিন বলেও বৃহস্পতি সেই শব্দপারায়ণ শাস্ত্র শেষ করতে পারেন নাই। "শব্দপারায়ণ" এই শব্দটি কেবল যৌগিক নয়। যে শব্দ থেকে কেবলমাত্র প্রকৃতিও প্রত্যয়ের অর্থই বুঝা যায় তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন 'পাচক' শব্দটি যৌগিক। কারণ 'পাচক' শব্দের অর্থ পাককর্তা। এই 'পাককর্তা' অর্থটি প্রকৃতি-প্রত্যয় লভ্য। পচ্ ধাতুরূপ প্রকৃতির অর্থ 'পাক'। আর ণ্বুল [অক] প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। সেইরূপ এই 'শব্দপারায়ণ শব্দটি যদি যৌগিক হয়, তাহলে "শব্দানাংপারায়ণম্" 'শব্দানাং পারম্ ঈয়তে অনেন' অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দ সকলের] সাধুশব্দের] পারপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ অর্থে "শব্দ-পারায়ণম্" এই শব্দটিকে গ্রহণ করলে, তার দ্বারা বুঝা যায়—যে শাস্ত্রে শব্দ সকলের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্র। তাহলে "শব্দানাং শব্দপারায়ণম্" এস্থলে সমাসের অন্তর্গত নয় এমন "শব্দানাং" এই শব্দটি ব্যর্থ হয়ে যায়। 'শব্দপারায়ণ' শব্দ থেকেই তো বুঝা যাচ্ছে—যে শব্দ সকলের পারগামী শাস্ত্র। এইজন্য এই "শব্দপারায়ণম্" শব্দটিকে 'যোগরূঢ়" বলতে হবে। যে শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়,—পৃথগ্ভাবে অর্থ না বুঝিয়ে সম্মিলিত ভাবে কোন প্রসিদ্ধ অর্থকে বুঝায় সে শব্দকে রূঢ় বলে। আর যে শব্দের সেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থে প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থেরও অন্বয় হয় প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ পরিত্যক্ত হয় না— সেই শব্দটিকে 'যোগরূঢ' বলে। এখানে 'শব্দপারায়ণ" শব্দটি সমুদিতভাবে শাস্ত্রবিশেষকে বুঝাচ্ছে, যে শাস্ত্রের দ্বারা সকল শব্দের জ্ঞান হয়। এই অর্থে এখানে যৌগিক বা প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থেরও সমন্বয় হওয়ায় এই শব্দটি যোগরূঢ় হয়েছে (২০৩)। এখন এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে— "শব্দপারায়ণম্" এই যোগরূঢ় শব্দের দ্বারা বুঝা গেল যে "শাস্ত্রবিশেষ" ই উক্ত শব্দের অর্থ। "শব্দানাং শব্দপারায়ণম্" এর অর্থ হলো শব্দসমূহের বোধক শাস্ত্রবিশেষ। এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় এখানে পৃথক্ "শব্দানাং" এই শব্দটিতে পুনরুক্তি দোষ হলো না। কিন্তু "শব্দপারায়ণম্ এই শব্দ থেকে যে শাস্ত্রবিশেষ বুঝা গেছে সেই শাস্ত্রটি শব্দ সকলের বোধক শাস্ত্র—এই

---

(২০৪) শব্দানামিতি। শব্দপারায়ণশব্দো যোগরূঢ়ঃ শাস্ত্রবিশেষস্য।

[কৈয়ট—পস্পশাহ্নিক-মহাভাষ্য প্রদীপ]

অর্থটিও বুঝা গেছে। কারণ ঐ শব্দটি যোগরূঢ় বলে—তাতে যৌগিক অর্থ হচ্ছে যে শব্দ সকলের পারগামী অর্থাৎ বোধক শাস্ত্র। সুতরাং শব্দপারায়ণম্" এই শব্দের দ্বারা যে অর্থ [শব্দসকলের বোধক] পাওয়া গেছে, সেই অর্থের একাংশ যে "শব্দ সকলের"—সেই অর্থটিকে "শব্দানাং" এই শব্দটি বুঝাচ্ছে বলে 'অর্থের পুনরুক্তি' হয়ে গেল। শব্দের পুনরুক্তি নিবারিত হলেও অর্থের পুনরুক্তি দোষ থেকে গেল। এর উত্তরে কৈয়ট বলেছেন উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে "প্রতিপদোক্তানাম্" এই শব্দটি আছে—তার অর্থ হচ্ছে "প্রত্যেকপদে পঠিত"। প্রত্যেকপদে পঠিত কে? এখানে বিশেষ্য কে? 'প্রতিপদোক্তানাম্' এই শব্দটি বিশেষণ বলে বুঝা যাচ্ছে, এই বিশেষণের বিশেষ্য হচ্ছে শব্দ। প্রত্যেক পদে পঠিত হচ্ছে শব্দ। এই শব্দরূপ বিশেষ্যটি যদিও 'শব্দপারায়ণম্" এই শব্দ থেকে অর্থসিদ্ধ রূপে গম্যমান হয় তথাপি স্পষ্ট করে সেই বিশেষ্যকে বুঝাবার জন্য 'শব্দানাম্' এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। 'শব্দ' রূপ বিশেষ্যকে বুঝানো এই "শব্দানাম্" শব্দের কার্য বলে অর্থের পুনরুক্তি হয় নাই (২০৫)।

মোটকথা—এই অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা ইহাই জানা গেল প্রত্যেক পদের পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পাঠ করে সাধু শব্দসকলের উপদেশক একগ্রন্থ ছিল, তারনাম "শব্দপারায়ণ"। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দেবতাদের পরিমাণে এক হাজার বৎসর ঐ শাস্ত্র শুনিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নাই। মহাভাষ্যকার বলেছেন—যেখানে বৃহস্পতি উপদেষ্টা আর ইন্দ্র অধ্যেতা বা শ্রোতা—উভয়েই বহুবর্ষজীবী। তবুও প্রত্যেক পদের পাঠ করে সকল শব্দ শেষ করতে পারেন নাই, সেখানে আধুনিক কালের মানুষ যে প্রত্যেক পদের পাঠ করে শব্দজ্ঞান লাভ করতে পারবে না—তাতে আর বলার কি আছে। এখনকার মানুষের পক্ষে ঐভাবে শব্দজ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। "অন্ততে" শব্দটি একটি অব্যয়। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের আয়ুঃ প্রাচীনকালের মানুষের চেয়েও অনেক বেশী। সেই দেবতারা শব্দপারায়ণ শাস্ত্র শেষ করতে পারেন নাই। সুতরাং প্রাচীন কালের মানুষও সেই শাস্ত্র শেষ করতে পারেন নাই। আর আজকালকার মানুষের তো কথাই নাই। আজকালকার মানুষের মধ্যে

---

(২০৫) তত্র প্রতিপদোক্তানামিতি বিশেষ্যাভিধানায় গম্যমানার্থস্যাপি শব্দানামিত্যস্য প্রয়োগঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত-পস্পশাহ্নিক]

যদি কোন মানুষ সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে, সে একশত বৎসরই বাঁচে ; তার বেশী বাঁচে না। আবার এই সাধুশব্দের জ্ঞান কেবল গুরুর নিকট থেকে শুনলেই বা অধ্যয়ন করলেই যে সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তা নয়। প্রথমে গুরুর নিকটে শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে শব্দের প্রাথমিক জ্ঞান হয়। তারপর নিজে সেই শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ সেই শব্দগুলি আয়ত্তকরা এবং তার অর্থ নিশ্চয় করা রূপ দ্বিতীয় স্তরে শব্দের জ্ঞান, আরও পরিপক্ক হয়। তারপর অধ্যাপনা করলে তৃতীয়স্তরে আরও শব্দের জ্ঞান সুপরিপক্ক হয়। শেষে সেই শব্দজ্ঞান, ব্যবহারের দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মে মন্ত্রাদির প্রয়োগ এবং মন্ত্রাদি ব্যতীতও কতকগুলি ক্ষেত্রে লৌকিক প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, শব্দজ্ঞান দ্বারা বেদের অর্থ জেনে যোগাদি অভ্যাসরূপ ব্যবহারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে, তখন শব্দজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। মহাভাষ্যকার বলেছেন এই ভাবে চার অবস্থায় বিদ্যার উপযোগিতা আছে। চার প্রকারে বিদ্যার উপযোগিতা প্রাপ্ত হলে তবেই বিদ্যার সার্থকতা বা পূর্ণতালাভ হয়। "চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি, আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি।" এখানে 'আগম' শব্দের অর্থ অধ্যয়ন—গুরুর নিকট থেকে শ্রবণ। 'স্বাধ্যায়' শব্দের অর্থ অভ্যাস। "প্রবচন" শব্দের অর্থ অধ্যাপনা। আর 'ব্যবহার' শব্দের অর্থ যজ্ঞাদি কর্মে প্রয়োগ। চারটি প্রকারের দ্বারা বিদ্যা উপযুক্ত হয়। এখানে এই প্রকার শব্দের অর্থ 'কাল' এই কথা নাগেশ ভট্ট বলেছেন। চারটি কালের দ্বারা বিদ্যা উপযুক্ত অর্থাৎ উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার উপযোগিতার অধিকরণ হচ্ছে কাল, এই কাল বিদ্যার উপযোগিতার অধিকরণ হলেও বিদ্যারও অধিকরণ হয়। সুতরাং "চতুর্ষু প্রকারেষু বা চতুর্ষু কালেষু বিদ্যা উপযুক্তা ভবতি" এইরূপ বলা উচিত ছিল। তা না বলে "চতুর্ভিঃ" ইত্যাদিরূপে তৃতীয়া কেন বললেন। তার উত্তরে নাগেশ বলেন সেই আধারভূতকালকে করণ বিবক্ষা করায় তৃতীয়ার নির্দেশ করেছেন। তার ফলিত অর্থ হচ্ছে "চতুর্ষু কালেষু' অর্থাৎ চারিটি বিভিন্ন কালে বিদ্যার উপযোগ হয়। নাগেশ আরও বলেছেন—আগমকালে ও স্বাধ্যায়কালে অর্থাৎ অধ্যয়নকালে ও অভ্যাসকালে লোকে বিদ্যার্থীকে 'এই বিদ্যার্থী বুদ্ধিমান' বলে আদর পূর্বক অন্নবস্ত্রাদি দান করে। অতএব আগমকাল ও স্বাধ্যায়কালে অন্নবস্ত্রাদির লাভই বিদ্যার উপযোগ। আর তৃতীয় অর্থাৎ অধ্যাপনাকালে অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠা হয়, উত্তম শিষ্যপ্রাপ্তি হচ্ছে

তার দ্বারা দক্ষিণালাভ ও সৎকার প্রভৃতি হয়, এই প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিই তৃতীয়কালে বিদ্যার উপযোগ। আর চতুর্থ কালে বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকালে অপশব্দের প্রয়োগজনিত যে প্রায়শ্চিত্ত, সেই প্রায়শ্চিত্তের অভাব, যজ্ঞাদির সহিত কর্মানুষ্ঠান, দক্ষিণালাভ ও প্রতিষ্ঠা এইগুলি বিদ্যর উপযোগিতা। সাধুশব্দের জ্ঞানবশত বিদ্বান্ ব্যক্তি যজ্ঞে অপশব্দ প্রয়োগ করেন না। অতএব অপশব্দের প্রয়োগ করলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, তা আর বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে করতে হয় না। এইভাবে চারকালে বিদ্যার উপযোগিতা হলে তবেই সম্পূর্ণ অধ্যয়ন হয়। কেবলমাত্র গুরুর নিকট থেকে শ্রবণ করলেই অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। প্রত্যেক পদের পাঠের দ্বারা যদি শব্দের জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তাহলে শব্দজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব হয়। যেহেতু আধুনিক কালের অল্পায়ুঃ মানুষের শব্দের শ্রবণ কালেই আয়ুঃ সমাপ্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক শব্দের শ্রবণ করতে করতেই তার মৃত্যু উপস্থিত হবে; তার আর অভ্যাস, অধ্যাপনা ও যজ্ঞাদিকর্ম করা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। অথচ অভ্যাসাদি না করলে বিদ্যা সম্পূর্ণ হবে না।

সুতরাং প্রত্যেক পদের পাঠ, শব্দের জ্ঞানে উপায় হতে পারে না।

প্রত্যেক শব্দ পাঠ করে যে সমস্ত শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞান সম্ভব নয়, এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে ভরদ্বাজ নামক ঋষি ইন্দ্রের আরাধনা করে ইন্দ্রেকে সন্তুষ্ট করে তাঁর অনুগ্রহে তিনশত বৎসর আয়ুঃ লাভ করেছিলেন। সেই তিনশত বৎসরের সমস্ত বৎসরই তিনি গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বেদাধ্যয়ন করলেন। তিনশত বৎসরের শেষে জরাজীর্ণ হয়ে ভরদ্বাজ বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হয়ে শুয়ে আছেন দেখে, ইন্দ্র এসে ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করলেন ভরদ্বাজ! তোমাকে যদি আরও একশত বৎসর আয়ু দিই, তা হলে কি করবে? ভরদ্বাজ উত্তর দিলেন—বেদ অধ্যয়ন করব। তখন ইন্দ্র নিজের যোগবলে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদকে তিনটি বিশাল পর্বতরূপে পরিণতকরে পূর্বে ভরদ্বাজের অজ্ঞাত অবস্থায় সেই তিনটি পর্বতকে পৃথক্ পৃথক্ তিন স্থানে স্থাপিত করে ভরদ্বাজকে দেখিয়ে বললেন। এই দেখ ভরদ্বাজ এই তিনটি পর্বত সমূহ বেদ। তারপর ইন্দ্র সেই তিনটি পর্বত থেকে তিন মুঠো ধূলা এনে ভরদ্বাজকে দেখিয়ে বললেন এই দেখ ভরদ্বাজ এই তিন মুঠো ধূলা হল, তিন বেদ, সুতরাং তিনটি পর্বত

রূপ আরও অনন্ত বেদ আছে। তুমি তিনশত বৎসরে এই তিন মুষ্টি ধূলা পরিমিত বেদমাত্র অধ্যয়ন করেছ। এর অতিরিক্ত এই বিশাল বেদ তোমার অজ্ঞাত। সুতরাং সমস্ত বেদের অধ্যয়ন অসম্ভব। এই বলে ইন্দ্র ভরদ্বাজকে সবিতৃসম্বন্ধী অগ্নিবিদ্যার উপদেশ দিলেন। ভরদ্বাজ সেই বিদ্যালাভ করে অমৃত হয়ে স্বর্গে গেলেন (২০৬)॥ ৩৬॥

মূল

কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ? কিঞ্চিৎসামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্যম্। যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্। কিং পুনস্তৎ? উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদুৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কশ্চিদপবাদঃ। কথংজাতীয়কঃপুনরুৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কথংজাতীয়কোঽপবাদঃ? সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্তব্যঃ। তদ্‌যথা—"কর্মণ্যণ্" [৩.২।১]। তস্য বিশেষেণাপবাদঃ। তদ্ যথা—"আতোঽনুপসর্গে কঃ" [৩।২।৩]॥ ৩৭॥

অনুবাদ:—তা হলে [প্রতিপদপাঠ, শব্দজ্ঞানের উপায় না হলে] কি রূপে এইসকল [প্রতিপদ পাঠে দুর্জ্ঞেয়] শব্দের জ্ঞানলাভ হবে? কিছু সামান্য ও বিশেষ বিশিষ্ট লক্ষণ [শাস্ত্র] প্রবর্তন করতে *হবে। যাহাতে অল্প প্রযত্নে বিশাল [বড], বিশাল শব্দসমূহ [অধ্যেতৃগণ] জানতে পারবে [বিশাল থেকে বিশালতর শব্দ সমূহ জানতে পারবে]।

তাহা [সামান্য বিশেষের স্বরূপ] কি? উৎসর্গ ও অপবাদ [সাধারণ এ বিশেষ]। কোন্ কোন্ [লক্ষণ বা শাস্ত্র] টি সাধারণ [ভাবে] করতে হবে, কোন্ কোন্ [শাস্ত্র] টি বিশেষ ভাবে [প্রণয়ন] করতে হবে। কি

---

(২০৬) ভরদ্বাজো হ ত্রিভিরায়ুর্ভি র্ব্রহ্মচর্যমুবাস। তংহজীর্ণং স্থবিরং শয়ানমিন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ ভরদ্বাজ, যত্তে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাম্, কিমনেন কুর্যা ইতি। ব্রহ্মচর্যমেবৈনেন চরেয়মিতি হোবাচ। তং হ ত্রীন্ গিরিরূপানবিজ্ঞাতানিব দর্শয়াঞ্চকার। তেষাং হৈকৈকস্মান্মুষ্টিমাদদে। স হোবাচ ভরদ্বাজেত্যামন্ত্র্য। বেদা বা এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ। এতদ্বা এতৈস্ত্রিভিরায়ুর্ভিরন্ববোচথাঃ। অথ ত ইতরদননূক্তমেব। এহীমং বিদ্ধি। অয়ংবৈ সর্ববিদ্যেতি। তস্মৈ হৈতমগ্নিং সাবিত্রমুবাচ। তং স বিদিত্বামৃতো ভূত্বা স্বর্গং লোকমিয়ায়। [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১১।৩।৫] গৌতম ধর্মসূত্রের ব্যাখ্যায় হরদত্ত ও বলেছেন—

আনন্ত্যাদ্যাচারাণাং প্রতিপদপাঠো ন শক্যঃ। [গৌতমধর্মসূত্র ১।৬।৬২]

প্রকারে উৎসর্গ [সাধারণ] করতে হবে, কি প্রকারে অপবাদ [বিশেষ করতে হবে] ? সামান্যের [সামান্য শাস্ত্রের] দ্বারা উৎসর্গ [সাধারণ-নিয়ম] করতে হবে। যেমন "কর্মণ্যণ্" [৩।২।১]। বিশেষের [বিশেষ শাস্ত্রের] দ্বারা তার বাধ [করতে হবে]। যেমন "আতোঽনুপসর্গে কঃ" [৩।২।১] ॥ ৩৭ ॥

বিবৃতি :—প্রতিপদের পাঠ দ্বারা সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ অসম্ভব বলা হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসা হওয়াই স্বাভাবিক যে তাহলে কি উপায়ে সমস্ত সাধুশব্দের জ্ঞান অর্জন করা যাবে। লোকের এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাই, মহাভাষ্যকার প্রশ্নবাক্যে সূচিত করেছেন "কথং তর্হি ইমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ ?" কি প্রকারে বা কি উপায়ে তা হলে এই সকল শব্দ জ্ঞাতব্য হবে ? প্রত্যেক পদের পাঠের দ্বারা যদি শব্দ সমূহের জ্ঞান লাভ অসম্ভব হয়, তা হলে অন্য কি উপায়ে এই প্রতিপদপাঠে দুর্জ্ঞেয় শব্দ সমূহের জ্ঞান অর্জিত হবে ? ইমে—শব্দের এই বিশেষণটির দ্বারা "এই সকল প্রতিপদ পাঠে দুর্জ্ঞেয়" এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—"কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্যম্, যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্।" সামান্য বিশেষযুক্ত কিঞ্চিৎ লক্ষণ প্রবৃত্ত করতে হবে ; যার দ্বারা অল্প যত্নে বিশাল শব্দ সমূহ লোকে জানতে পারবে। এই বাক্যে 'সামান্যবিশেষবৎ' এই শব্দটি 'লক্ষণ' এর বিশেষণ। লক্ষণের আর একটি বিশেষণ হচ্ছে 'কিঞ্চিৎ'। এই 'সামান্যবিশেষবৎ' বলতে কি ইবার্থে 'বতুপ্' প্রত্যয় করে সামান্য ও বিশেষের' মত এই অর্থ গ্রহণ করতে হবে অথবা 'সামান্যবিশেষৌ' এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস যুক্ত শব্দের উত্তর অস্তি অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করে -'সামান্যবিশেষবিশিষ্ট' এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে ? এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে কৈয়ট বলেছেন—"সামান্যবিশেষৌ যস্মিং স্তৎসামান্য-বিশেষবৎ" সামান্য এবং বিশেষ আছে যাতে তাহা সামান্যবিশেষবৎ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে ভাষ্যর এই শব্দটি "সামান্যবিশেষৌ" এই দ্বন্দ্ব সমাসযুক্ত শব্দের উত্তর অস্তি অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। সামান্য ও বিশেষ যাহাতে আছে এইরূপ যে লক্ষণ তাহা সামান্যবিশেষবৎ। কিন্তু যাহা সামান্য বিশেষ তাহাই তো লক্ষণ হয় ; লক্ষণটি সামান্য বিশেষাত্মক। যেমন গরুর লক্ষণ সাস্নাদি। সাস্না বা গলকম্বল প্রভৃতি গরুর লক্ষণ। এই গলকম্বল প্রভৃতি সমস্ত

গরুর সামান্যধর্ম, আর গো মহিষ অশ্বাদির মধ্যে গরুর বিশেষধর্ম। গরুব্যতীত মহিষাদিতে এই সাস্নাদি নাই, গরুমাত্রে আছে, এই জন্য উহা [সাস্নাদি] বিশেষ। আর সকল গোসাধারণ বলে সাস্নাদি সকল গরুর সামান্য ধর্ম। এইভাবে দেখা যাচ্ছে লক্ষণটি সামান্যবিশেষাত্মক। অথচ মহাভাষ্যে "সামান্য বিশেষবল্লক্ষণং" সামান্যবিশেষযুক্ত লক্ষণ এই কথা বললেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় মহাভাষ্যে "সামান্যবিশেষবল্লক্ষণম্" এই স্থলে লক্ষণ শব্দের অর্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরূপ শাস্ত্র। যাহার দ্বারা লক্ষিত হয় তাহা লক্ষণ। সূত্র বা শাস্ত্রের দ্বারা সাধুশব্দ লক্ষিত হয়, এই জন্য সূত্ররূপ-শাস্ত্রই এখানে লক্ষণ; আর লক্ষ্য হচ্ছে সাধুশব্দ। এখন সূত্রে বা শাস্ত্র যখন লক্ষণ শব্দের অর্থ হলো, তখন এই সূত্র বা শাস্ত্রে সামান্যের এবং বিশেষের উল্লেখ আছে বলে শাস্ত্র বা সূত্র সামান্যবিশেষবৎ হতে পারল (২০৭)।

এইভাবে সামান্য বিশেষবিশিষ্ট সূত্ররূপশাস্ত্র প্রবর্তন করতে হবে, যার দ্বারা মহৎ মহৎ শব্দ সমূহ লোকে অল্প যত্নে জানাতে পারবে। ভাষ্যে যে "মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্" এই কথা বলা হয়েছে এখানে মহৎ বলতে 'বড়' এইরূপ অর্থ নয়। বড় বড় শব্দ জানা যাবে ছোট, ছোট শব্দ জানা যাবে না এইরূপ তাৎপর্যে "মহতঃ" শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু এখানে 'মহৎ' শব্দের অর্থ অনেক। এক একটি সূত্রের দ্বারা অনেক সংখ্যক শব্দ সংগৃহীত হয়ে যাবে। প্রত্যেক পদের পাঠ করে করে শব্দের জ্ঞান করতে গেলে যে গুরুতর প্রয়াস করতে হত, সামান্য বিশেষবিশিষ্ট সূত্রের দ্বারা শব্দের জ্ঞানে অনেক কম পরিশ্রম করতে হবে। হয়ত একটা সূত্রের দ্বারা হাজার খানিক কি তার চেয়েও বেশী শব্দের জ্ঞান হয়ে যেতে পারে। "মহতো মহতঃ" এস্থলে 'মহত্' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত রূপটি "শব্দৌঘান্" ইহার বিশেষণ। বীপ্সা অর্থে দ্বিত্ব হয়েছে। অনেক অনেক শব্দ রাশি = সামান্য-বিশেষবান্ লক্ষণের দ্বারা জানা যাবে। অথবা পূর্বের 'মহতঃ' এই শব্দটি 'মহৎ' শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ আর দ্বিতীয় 'মহত' শব্দটি উক্ত শব্দের দ্বিতীয়ার বাহুবচনের রূপ—এইভাবে গ্রহণ করাও যেতে পারে। মহৎ থেকে মহৎ অর্থাৎ অনেক থেকে অনেক শব্দ সংগৃহীত হয়ে যাবে।

---

(২০৭) ননু তস্য কথং লক্ষণস্য মহতোঽনুপপত্তিরত আহ সামান্যবিশেষবদিতি। লক্ষণং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত, পস্পশাহ্নিক]

এখন এর উপরে মহাভাষ্যকার প্রশ্ন উঠিয়েছেন "কিং পুনস্তৎ" তাহা কি? অর্থাৎ যে সামান্যবিশেষবিশিষ্ট লক্ষণের প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে সেই সামান্যও বিশেষ্যের স্বরূপটি কি? এর উত্তরে মহাভাষ্যকার নিজেই বলেছেন—"উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদুৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কশ্চিদপবাদঃ।" সাধারণ ও বাধক। কোন সাধারণ নিয়ম করতে হবে, আবার কোন বাধক বা বিশেষ নিয়ম করতে হবে। সামান্যের স্বরূপ হচ্ছে উৎসর্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তি। যাহা অধিক স্থলে ব্যাপ্ত তাহা সামান্য। আর বিশেষের স্বরূপ হচ্ছে অপবাদ অর্থাৎ বাধক। "অপোদ্যতে অনেন" বাধিত হয় যার দ্বারা এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অপপূর্বক বদধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে অপবাদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ বাধক। যাহা সামান্যকে বাধা দেয় তাহা অপবাদ! এই ভাবে সামান্য ও বিশেষের স্বরূপ বলে মহাভাষ্যকার বলেছেন কোন উৎসর্গ করতে হবে অর্থাৎ কতক কতক সাধারণ নিয়ম করতে হবে, আর কতক কতক বিশেষ নিয়ম করতে হবে।

এই কথার উপরেই ভাষ্যকার নিজে প্রশ্ন উঠিয়েছেন 'কথংজাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গঃ কর্তব্যঃ. কথংজাতীয়কোঽপবাদঃ' কিপ্রকারে সামান্যনিয়ম করা হবে, কি প্রকারে বিশেষ নিয়ম করা হবে। "কথংজাতীয়কঃ" এই শব্দে "প্রকারবৎ" অর্থে 'জাতীয়র্' প্রত্যয় হয়েছে এবং প্রকার অর্থে কিম্ শব্দের উত্তর 'থমু' প্রত্যয় হয়েছে। এই জন্য এখানে "কথংজাতীয়কঃ" শব্দের অর্থ কিরূপ-প্রকারবিশিষ্টক, তাৎপর্যার্থ হচ্ছে কিপ্রকারে—কিরূপে।

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন "সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্তব্যঃ। তদ্ যথা—কর্মণ্যণ্ তস্য বিশেষণাপবাদঃ। তদ্ যথা—আতোঽনুপসর্গে কঃ।"

সামান্যসূত্রের দ্বারা সাধারণ নিয়ম করা হবে। যেমন 'কর্মণ্যণ্"॥ বিশেষ সূত্রের দ্বারা সেই সাধারণ নিয়মের বাধ করা হবে। যেমন 'আতোঽনুপসর্গে কঃ।' 'উৎসর্গশব্দের অর্থ সামান্য বা সাধারণ। আর সামান্য শব্দের অর্থও সামান্য। তা হলে ভাষ্যের 'সামান্যেন উৎসর্গঃ কর্তব্যঃ" এই অংশের অর্থ হবে "সামান্যের দ্বারা সামান্য করবে।" এইরূপ অর্থ অনুপপন্ন। পুনরুক্তিদোষও আছে। এইজন্য "সামান্যেন" এই শব্দের অর্থ করতে হবে সামান্য শাস্ত্র বা সূত্র। আর "উৎসর্গঃ" এই শব্দের অর্থ হবে সামান্য নিয়ম।

এরূপ অর্থ করলে আর অনুপপত্তি হয় না। সামান্য সূত্রের দ্বারা সামান্য নিয়ম করতে হবে।

আর বিশেষসূত্রের দ্বারা সেই সামান্যের বা সামান্য নিয়মের অপবাদ অর্থাৎ বাধ করতে হবে। এখানে "অপবাদ" শব্দটি ভাববাচ্যে ঘঞন্ত বলে এর অর্থ হবে বাধ। সামান্য সূত্র কি? ইহা বুঝাবার জন্য তদ্ যথা 'কর্মণ্যণ্'? আর বিশেষ সূত্র কি ইহা বুঝাবার জন্য 'তদ্ যথা—'আতোঽনুপসর্গে কঃ' ইহা ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রদর্শন করেছেন।

'কর্মণ্যণ্' এইটি সামান্য সূত্র, কর্মরূপ [কর্মকারকরূপে দ্বিতীয়ান্ত] উপপদ পূর্বক ধাতুর উত্তর + অণ্ প্রত্যয় হয়। যেমন 'কুম্ভং করোতি' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে কুম্ভম্ এই কর্মরূপ উপপদ পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় করলে 'কুম্ভকার' শব্দ সিদ্ধ হয়। এই একটি সামান্য সূত্রের দ্বারা কুম্ভকার, কাণ্ডলাব, শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ ইত্যাদি অনেক শব্দের জ্ঞান হয়ে যায়। আর "আতোঽনুপসর্গে কঃ" এইটি বিশেষ সূত্র। উপসর্গ পূর্বে না থাকলে অর্থাৎ উপসর্গরূপ উপপদ না থাকলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর 'ক', প্রত্যয় হয়।

কর্মণ্যণ্ সূত্রে বলা হয়েছে কর্মরূপ উপপদ পূর্বে থাকলে যে কোন ধাতুর উত্তর অর্থাৎ সকল ধাতুর উত্তরই অণ্ প্রত্যয়ের প্রাপ্তি আছে বলে উক্ত প্রত্যয়ের স্থল অনেক ব্যাপক হওয়ায় ইহা সামান্য নিয়ম হলো। আর "আতোঽনুপসর্গে কঃ" এইসূত্রে বলা হলো উপসর্গ ভিন্ন উপপদ পূর্বে থাকলে কেবল মাত্র আকারান্ত ধাতুর উত্তর, ক প্রত্যয় হবে। সুতরাং এইসূত্রের স্থল [কার্য] অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল বলে এই সূত্রটি বিশেষ সূত্র। এর দ্বারা সামান্য নিয়মের বাধ হবে। "কর্মণ্যণ্" এই সামান্য সূত্রের দ্বারা সব ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ থাকায় আকারান্ত ধাতুর উত্তরও "অণ্" প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু "আতোঽনুপসর্গে কঃ" এই সূত্র আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয়ের বিধান করায় আকারান্ত ধাতুর উত্তর প্রাপ্ত অণ্ প্রত্যয় বাধিত হয়ে যাবে অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয় হবে না। এই জন্য বিশেষ সূত্র সামান্যের অপবাদ অর্থাৎ বাধক হয় বলা হয়েছে। এই বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধ বিষয়ে বহু বিচারের অবকাশ আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তার বর্ণনা করা হলো না। যাই হোক এই "আতোঽনুপসর্গে কঃ" এই বিশেষ সূত্রের দ্বারাও ধনদ, ধান্যদ, গোদ, ইত্যাদি বহুশব্দের জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। অতএব

এইভাবে সামান্ত ও বিশেষ সূত্রের প্রবর্তন করলে ব্যাকরণের দ্বারা অল্প যত্নে সমুদায় সাধুশব্দের জ্ঞান লাভ হবে, প্রতিপদ পাঠের দ্বারা শব্দের জ্ঞানলাভ অসম্ভব—ইহাই এখানে মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ॥ ৩৭ ॥

মূল

কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থ আহোস্বিদ্‌দ্রব্যম্‌? উভয়মিত্যাহ। কথং জ্ঞায়তে? উভয়থা হ্যাচার্যেণ সূত্রাণি পঠিতানি। আকৃতিং পদার্থং মত্বা "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্‌ বহুবচনমন্যতরস্যাম্‌" [১।২।৫৮] ইত্যু-চ্যতে। দ্রব্যং পদার্থং মত্বা 'সরূপাণাম্‌' [১।২।৬৪] ইত্যেকশেষ আরভ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ :—পদের অর্থ কি জাতি অথবা দ্রব্য [ব্যক্তি]? উভয় [জাতি এবং ব্যক্তি উভয়]—ইহা বলেন [বৈয়াকরণ]। কিরূপে জানা যায়? [উভয়ই যে পদের অর্থ তাহা কিরূপে জানলে]। আচার্য [পাণিনি] উভয় প্রকারেই সূত্র সকল পাঠ করেছেন [উচ্চারণ করেছেন]। জাতি পদার্থ [ইহা] মনে করে "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্‌ বহুবচনমন্যতরস্যাম্‌" ইহা [এই সূত্র] বলেছেন। দ্রব্য [ব্যক্তি] পদার্থ [ইহা] মনে করে 'সরূপাণাম্‌' [সরূপাণা-মেকশেষ একবিভক্তৌ] এই [এইসূত্রে] একশেষ আরম্ভ করেছেন ॥ ৩৮ ॥

বিবৃতি :—শব্দানুশাসনের প্রয়োজন বলা হয়েছে। কিভাবে শব্দের অনুশাসন করতে হবে তাহাও বলা হয়েছে। সামান্যসূত্র ও বিশেষসূত্রের দ্বারা শব্দের উপদেশ করা হবে—ইহাই মহাভাষ্যকার পূর্বে বলে এসেছেন। শব্দের স্বরূপ অনেক পূর্বে বলেছেন। এখন জিজ্ঞাসা হয়—সামান্য সূত্র বা বিশেষ সূত্রগুলি বাক্যাত্মক বলে—সেই সূত্রবাক্যের ঘটক পদের অর্থ কি। এই জিজ্ঞাসা হওয়ায় প্রশ্ন করছেন—'কি পুনরাকৃতিঃ পদার্থ অহোস্বিদ্‌ দ্রব্যম্‌?' পদের অর্থ কি জাতি অথবা ব্যক্তি? এখানে প্রশ্নবাক্যের অন্তর্গত 'আকৃতি' শব্দের অর্থ জাতি। 'আকৃতি' শব্দটি জাতি অর্থেই যে সমধিক প্রসিদ্ধ তাহা এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। যে পদার্থ দ্বারা সকল ব্যক্তিতে একাকার জ্ঞান হয়, সেই পদার্থকে জাতি বলা হয়। সকল গোব্যক্তিতে ইহা গরু, ইহা গরু, এইভাবে একাকার জ্ঞান আমাদের হয়; একাকার জ্ঞান একটি অনুগত পদার্থ ব্যতীত হতে পারে না। এই অনুগত পদার্থটি জাতি। গোত্বটি সকল গরুতে অনুগত। এইজন্য উহা জাতি। এইরূপ অন্যত্রও বুঝতে হবে।

এই ভাষ্যে যে 'দ্রব্য' শব্দটি উল্লিখিত আছে, তার অর্থ ব্যক্তি। অসাধারণ এক একটি পদার্থকে ব্যক্তি বলা হয়। যেমন প্রত্যেক গরু এক একটি ব্যক্তি। এই জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে কোনটি, পদের অর্থ? ইহাই প্রশ্নের অভিপ্রায়। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"উভয়মিত্যাহ"। উভয়ই অর্থাৎ জাতি এবং ব্যক্তি এই উভয়ই পদের অর্থ। উভয়ই পদের অর্থ—মহাভাষ্যকার ইহা বলাতে—পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করছেন—"কথং জ্ঞায়তে"? জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ই যে পদের অর্থ, তাহা জানলে কিরূপে? সূত্রকার পাণিনি যে সকল সামান্যসূত্র এবং বিশেষ সূত্র রচনা করেছেন, সেই সূত্রঘটক পদের অর্থ জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ই—ইহা কি করে [সিদ্ধান্তী] জানলে? এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"উভয়থা হ্যাচার্যেণ সূত্রাণি পঠিতানি। আকৃতিং পদার্থং মত্বা 'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যামি'ত্যুচ্যতে। দ্রব্যং পদার্থং মত্বা 'সরূপাণাম্'—ইত্যেকশেষ আরভ্যতে।" আচার্য [পাণিনি] উভয় প্রকারে অর্থাৎ জাতিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করে এবং ব্যক্তিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করে সূত্রপাঠ করেছেন অর্থাৎ সূত্রের রচনা করেছেন। জাতিকে পদার্থ বলে নিশ্চয় করে 'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্"—এই সূত্র রচনা করেছেন। এই সূত্রের অর্থ হচ্ছে জাতি বুঝালে একত্ব অর্থে শব্দের উত্তর বিকল্পে বহুবচন হয়। কেবলমাত্র ব্যক্তিই যদি পদের অর্থ রূপে সর্বত্র সিদ্ধ হত, তাহলে 'সম্পন্নাব্রীহয়:" ইত্যাদি প্রয়োগে ব্রীহি [ধান্য] ব্যক্তি অনেক বলে 'ব্রীহি' শব্দের উত্তর অনায়াসে বহুবচন সিদ্ধ হয়ে যেত। সেই বহুবচনের জন্য "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্" ইত্যাদি সূত্র রচনা করবার প্রয়োজন হত না। অথচ পাণিনি এই সূত্র রচনা করেছেন। এই সূত্র রচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে জাতিও পদের অর্থ হয়। "সম্পন্নাব্রীহয়:" এস্থলে 'ব্রীহি" পদের অর্থ ব্রীহিত্ব জাতি। জাতি একটি বলে সেই একত্ব অর্থে বহুবচন হতে পারতো না। বিকল্পে বহুবচন করবার জন্য এখানে পাণিনি উক্ত সূত্র রচনা করেছেন। আবার ব্যক্তিকে পদার্থ বলে নিশ্চয় করে পাণিনি—"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ" এই স্থলে একশেষ অর্থাৎ একশেষের প্রতিপাদক সূত্র আরম্ভ করেছেন। কেলমাত্র জাতিই যদি সর্বত্র পদার্থ বলে সিদ্ধ হত তা হলে 'জাতি' এক বলে সেই একত্ববিশিষ্ট জাতি বুঝাতে স্বভাবতই একটি শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ হয়ে যেত। এই একটি শব্দের প্রয়োগ অবশিষ্ট

করবার জন্য 'সরূপাণাম্' ইত্যাদি সূত্র রচনার প্রয়োজন হত না। অভিপ্রায়: এই যে—একপ্রকার বিভক্তি পরে থাকলে সমান আকারের দুই বা বহুশব্দের মধ্যে একটি শব্দ অবশিষ্ট থাকবে—ইহাই হচ্ছে সরূপাণামিত্যাদি সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। যেমন দুটি গরু বুঝাবার জন্য দুইবার একই প্রথমাবিভক্ত্যন্ত গৌশ্চ গৌশ্চ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করলে সেই দুইটি শব্দের একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকবে—সেখানে 'গাবৌ' এইরূপ প্রয়োগ হবে। এইরূপ অনেক গরুকে বুঝাবার জন্য তিনবার বা তার অধিক ঐ এক আকারের শব্দের প্রয়োগ করলেও তার মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকবে। "গৌশ্চ গৌশ্চ গৌশ্চ" এইরূপ উল্লেখ করলে ঐ তিনটি শব্দের একটি অবশিষ্ট থেকে "গাবঃ" এইরূপ প্রয়োগ হবে। এখন কেবলমাত্র জাতিই যদি সর্বত্র পদের অর্থ হয়, তাহলে গোত্বজাতি তো একটি। সেই একটি পদার্থ বুঝাবার জন্য একবার 'গো' শব্দের প্রয়োগ তো এমনিই সিদ্ধ হয়ে যেত। তার জন্য 'সরূপাণাম্' ইত্যাদি সূত্র ব্যর্থ হয়ে যেত। জাতি দুই নয় যাতে "গৌঃ গৌঃ" এইরূপ দুইবার বা তিন চারবার শব্দের প্রয়োগের অবকাশ হত এবং এই দুই তিন শব্দের একটিকে অবশিষ্ট করবার আবশ্যকতা থাকত। কিন্তু 'ব্যক্তি' পদার্থ হলে একটি গো ব্যক্তিকে বুঝাবার জন্য একটি গো শব্দের, আর একটি গোব্যক্তিকে বুঝাবার জন্য আর একটি গোশব্দের, এইরূপ তিন চার গো ব্যক্তি বুঝাবার জন্য তিন বা চারবার গোশব্দের উল্লেখ করতে হয়। সেইখানে পাণিনির সূত্রের সার্থকতা থাকলো যে এইরূপ সমান আকারের একবিভক্ত্যন্ত অনেক শব্দের মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকবে। অতএব এখানে ব্যক্তি পদের অর্থ বলে বুঝা যাচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে স্থলবিশেষে জাতি, পদের অর্থ হচ্ছে আবার কতকগুলি স্থলে ব্যক্তি, পদের অর্থ হচ্ছে। পাণিনির সূত্র থেকে ইহা বুঝা যাচ্ছে। লক্ষ্য অর্থের অনুরোধে পাণিনি লক্ষণ [সূত্র] করেছেন। সর্বত্রই যে ব্যক্তি ও জাতি এই উভয়ই পদের অর্থ হচ্ছে তা নয়। কিন্তু কোথায়ও কোন পদের অর্থ হচ্ছে জাতি। আর কোথায়ও বা অপর পদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি। এইভাবে লক্ষ্যের অনুরোধে এক একটি পক্ষ [জাতি বা ব্যক্তিরূপ পক্ষ] স্বীকার করতে হয়। অতএব পাণিনি একটি মাত্র পক্ষ আশ্রয় করলে সর্বত্র ব্যবস্থা সিদ্ধ হতে পারে না বলে—পর্যায়ক্রমে উভয়পক্ষ স্বীকার করে সূত্র রচনা করেছেন।

পদের অর্থ ব্যক্তি কি জাতি—এই বিষয়ে বাদীদের মধ্যে বহু বিবাদ আছে। কেহ কেহ জাতিই পদের বাচ্যার্থ স্বীকার করেন। কেহবা ব্যক্তিই পদের অর্থ বলেন। আবার কেহ জাতি, আকৃতি [অবয়বসংস্থান] বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদার্থ বলেন। যাঁহারা কেবলমাত্র জাতিকে পদার্থ [বাচ্যার্থ] স্বীকার করেন তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই—ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করলে কোন একটি ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করবে অথবা সকল ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করবে। কোন একটি ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করলে—পদ থেকে অন্য ব্যক্তিরও বোধ হয় দেখা যায় অথচ অন্য ব্যক্তিতে শক্তি নাই। পদ থেকে পদের অর্থের উপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞান একটি কারণ। যেখানে পদ থেকে অন্য ব্যক্তির উপস্থিতি হচ্ছে, সেখানে শক্তি না থাকায় শক্তির জ্ঞানও নাই। শক্তির জ্ঞান না থেকে ব্যক্তির উপস্থিতি হচ্ছে বলে শক্তির জ্ঞানকে আর পদার্থ উপস্থিতির কারণ বলা যায় না। যাহা না থেকে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার কারণ হতে পারে না। সুতরাং কোন একটি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা যেতে পারে না। আর যদি সমস্ত ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে ব্যক্তি অনন্ত বলে, শক্তিও অনন্ত স্বীকার করতে হয়। তাতে মহাগৌরব হয়ে যায়। আর অনন্ত ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তির জ্ঞানও সম্ভব নয়। এই জন্য জাতিতেই শক্তি স্বীকার করতে হবে। জাতি এক বলে শক্তিজ্ঞান সহজেই হয়ে যায়। সমস্ত গরুতে অনুগত একাকার জ্ঞান হয়ে থাকে বলে গোত্ব নামক জাতি সিদ্ধ হয়। সেই গোত্ব গোরূপ দ্রব্যে অবস্থিত। গোপদের শক্তি গোত্বে আছে জানলে সর্বত্র গোপদ থেকে গোত্বের উপস্থিতি হয়ে যায়। গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে শক্তি না থাকলেও গোত্বজাতির সঙ্গে গোব্যক্তির সমবায় সম্বন্ধ থাকায় জাতির জ্ঞান হতে গেলে ব্যক্তির জ্ঞান না হয়ে জাতির জ্ঞান হতে পারে না বলে জাতির জ্ঞানে ব্যক্তি তুল্যজ্ঞানজ্ঞেয় হয়ে যায়। সুতরাং ব্যক্তির জ্ঞান অনুপপন্ন হয় না। এইভাবে গোপ্রভৃতি শব্দ যেমন গোপ্রভৃতিতে স্থিত গোত্বাদি জাতির বাচক। সেইরূপ শুক্ল প্রভৃতি শব্দ ও শুক্লাদি গুণগত শুক্লত্বাদি জাতির বাচক। ডিত্থ ডবিত্থ প্রভৃতি সংজ্ঞাববোধক শব্দও ডিত্থত্ব ডবিত্থত্ব জাতির বাচক। যদিও একব্যক্তিতে স্থিত ধর্ম, জাতি হয় না, তথাপি ডিত্থ [কাঠের হাতী] ডবিত্থ [কাঠের হরিণ] প্রভৃতিরও প্রতিদিন পরিণাম ভেদ হয় বলে বিভিন্ন

পরিণাম বা অবস্থা ভেদেও সেই এই ডিথ ইত্যাদি জ্ঞান হয় বলে ডিথত্ব—প্রভৃতি জাতি স্বীকার করা হয়। এইরূপ ক্রিয়াতেও জাতি স্বীকার করা হয়। 'পচতি পচতঃ পচন্তি" প্রভৃতি থেকে অভিন্ন জ্ঞান হয় বলে ধাতুর বাচ্যার্থকে জাতি বলে স্বীকার করা হয়। যাঁরা ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করেন—তাঁদের যুক্তি হচ্ছে—গোপ্রভৃতি শব্দ থেকে গো ব্যক্তিরই বোধ হয়। "গামানয়" "গাং বধান" ইত্যাদি বাক্য থেকে লোকে গোব্যক্তির আনয়ন, গোব্যক্তির বন্ধন অর্থ বুঝে ব্যক্তির আনয়ন প্রভৃতি করে থাকে। গোত্বজাতির আনয়ন বা বন্ধন কেহ করে না বা তাহা সম্ভবও নয়। সুতরাং ব্যক্তিই পদের অর্থ। পদের শক্তি ব্যক্তিতে থাকে। ব্যক্তি অনন্ত হলেও অনন্ত ব্যক্তিতে অনন্তশক্তি স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নাই। অনন্ত ব্যক্তিতে একটি শক্তি স্বীকার করা হয়। অনন্ত গো ব্যক্তিতে গোপদের একটি শক্তি আছে, বলে গৌরব দোষ হয় না। আর অনন্ত গো ব্যক্তিতে গোপদের শক্তি জ্ঞানও অসম্ভব নয়। গোত্ব জাতিই উক্ত শক্তি জ্ঞানে উপলক্ষণ হয়। অর্থাৎ গোত্বরূপে গো ব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান হয়। 'গোত্ব' সকল গরুতে আছে বলে সকল ব্যক্তিতে গোত্বের দ্বারা শক্তিজ্ঞান হয়ে যায়। গোত্ব প্রভৃতি জাতি উক্ত শক্তিজ্ঞানে বা গো প্রভৃতি পদজন্য ব্যক্তির জ্ঞানে অনুগমক হয় বলে কোন দোষ নাই (২০৮)। জাতিশক্তি ও ব্যক্তিশক্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল গ্রন্থে অল্পবিস্তর বহু বিচারের অবতারণা দেখা যায়। সে সকলের সংগ্রহ করলে—একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। বিস্তার ভয়ে এবং প্রয়োজনাভাবে তার বিবরণ এখানে করা হল না। জিজ্ঞাসু পাঠক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ইচ্ছা করলে জানতে পারেন। এখানে পাণিনির সূত্র থেকে মহাভাষ্যকার দেখিয়েছেন—জাতি এবং ব্যক্তি—উভয়ই স্থলভেদে পদের অর্থ। মহাভাষ্যকার পাণিনির এই মতের উপর কোন মন্তব্য করেন নাই, প্রত্যুত পরে এই পস্পশা আহ্নিকেই তিনিও এই উভয়কে পদের অর্থ বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি বৈয়াকরণদের মতে জাতি ও ব্যক্তি উভয়ই পদার্থ ॥ ৩৮ ॥

---

(২০৮) তস্মাৎ লক্ষ্যসিদ্ধয়ে কচিৎপ্রদেশে কশ্চিৎপক্ষঃ পরিগৃহ্যতে। তত্র জাতিবাদিন আহুঃ:—জাতিরেব শব্দেন প্রতিপাদ্যতে, ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সম্বন্ধগ্রহণাসম্ভবাৎ।...ব্যক্তিবাদিনস্ত্বাহুঃ:—শব্দস্য ব্যক্তিরেব বাচ্যা, জাতেরুপলক্ষণভাবেনাশ্রয়ণাদানন্ত্যাদিদোষানবকাশঃ।
[মহাভাষ্যপ্রদীপ—কৈয়ট—পস্পশাহ্নিক]

মূল

কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎকার্যঃ ? সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্—নিত্যো বা স্যাৎ কার্যো বেতি। তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ—যদ্যেবং নিত্যঃ, অথাপি কার্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্যম্ ইতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ :—শব্দ কি নিত্য অথবা কার্য [ক্রিয়াসম্পাদ্য] ? সংগ্রহে ব্যাড়ি রচিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থে] ইহা [শব্দের নিত্যত্বও কার্যত্ব বিষয়ে] প্রধান ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে [বিচার করা হয়েছে]—[শব্দ] নিত্য হবে অথবা কার্য [হবে]। সেইখানে [সংগ্রহগ্রন্থে] দোষ সকল [শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে এবং কার্যত্ব পক্ষে সম্ভাব্যমান দোষ সমূহ] অভিহিত হয়েছে এবং প্রয়োজন সমূহও অভিহিত হয়েছে। সেখানে [সংগ্রহে] এইরূপ নিশ্চয় [করা হয়েছে]। যদিও [শব্দ] নিত্য, তথাপি কার্য। উভয় প্রকারেও [দুই পক্ষেও] লক্ষণ [ব্যাকরণশাস্ত্র] প্রবর্তন করার যোগ্য [প্রবর্তন করা যেতে পারে] ॥ ৩৯ ॥

বিবৃতি :—শব্দের স্বরূপ বলা হয়েছে। সামান্য বিশেষ সূত্রের দ্বারা শব্দের জ্ঞান উৎপাদন করা হবে—একথাও বলা হয়েছে। জাতিও ব্যক্তি উভয়ই শব্দের অর্থ ইহাও বলা হয়েছে। ব্যাকরণের সূত্রের দ্বারা শব্দজ্ঞান করা হবে—ইহা বলা হয়েছে। এর উপর আশঙ্কা হয় এই যে—শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহলে ব্যাকরণ সূত্র ব্যর্থ। কারণ নিত্যকে সূত্রের দ্বারা উৎপাদন করা যাবে না। আর যদি শব্দ কার্য [উৎপাদ্য] হয়, তাহলে ব্যাকরণের দ্বারা তার উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করে—জিজ্ঞাসা করেছেন—"কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎকার্যঃ ?" শব্দ নিত্য অথবা কার্য ? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্য-কার বলছেন—'সংগ্রহএতৎপ্রাধান্যেন পরীক্ষিতংনিত্যো বা স্যাৎকার্যোবেতি।" ব্যাড়ি কর্তৃক রচিত সংগ্রহ নামক পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাত্মকগ্রন্থ ছিল। তাতে একলক্ষ শ্লোক ছিল। সেই গ্রন্থ অতিশয় বিস্তৃত বলে কালক্রমে তার অধ্যয়ন অধ্যাপনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মহাভাষ্যকার যখন বলছেন সংগ্রহে ইহা বিচার করা হয়েছে, তখন বুঝা যাচ্ছে যে মহাভাষ্যকার ঐ গ্রন্থ দেখেছিলেন বা পূর্বতন বৈয়াকরণদের নিকট থেকে ঐ সংগ্রহ গ্রন্থের বিষয় বস্তু শুনেছিলেন।

সেইজন্য মহাভাষ্যকার বলছেন 'শব্দ নিত্য অথবা কার্য' এই বিষয়টি সংগ্রহগ্রন্থে প্রধানভাবে বিচার করা হয়েছে। এই বিষয়টি প্রধান ভাবে বিচার করা হয়েছে বলায় বুঝা যাচ্ছে শব্দের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় সেই সংগ্রহ গ্রন্থে অপ্রধান ভাবে বিচার করা হয়েছে, নিত্যত্ব ও কার্যত্ব বিষয়ে প্রধান ভাবে বিচার করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার 'শব্দ নিত্য অথবা কার্য" এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং না দিয়ে, এইভাবে যে বললেন—ইহা সংগ্রহে বিচারিত হয়েছে তার অভিপ্রায় এই যে—এখানে আর বিচার করবার প্রয়োজন নাই ; সেখানে [সংগ্রহ গ্রন্থে] বিচার করা হয়েছে এবং বিচারের দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়েছে। অতএব সেই সংগ্রহ গ্রন্থে বিচারের দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়েছে তাহাই "শব্দ নিত্য অথবা কার্য" এই প্রশ্নের উত্তর। সেই সংগ্রহগ্রন্থে কি ভাবে বিচার করা হয়েছে—তার অতি সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র বলছেন—মহাভাষ্যকার—"তত্রোক্তাঃ দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি" অর্থাৎ শব্দ নিত্য হলে কি, দোষ হয় কার্য হলে বা কি দোষ হয় এবং শব্দ নিত্য হলে ব্যাকরণ শাস্ত্রের কিভাবে কি প্রয়োজন সম্পাদিত হয়, শব্দ কার্য হলেই বা ব্যাকরণের কিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এই সব বিষয় সেই সংগ্রহ গ্রন্থে বিচার করা হয়েছে। এই কথা থেকে আশঙ্কা হতে পারে সংগ্রহ গ্রন্থে যদি শব্দের নিত্যত্ব ও কার্যত্ব বিষয়ে দোষ এবং উভয় পক্ষের প্রয়োজন বিচারিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিচারের কি সার্থকতা আছে। বিচারের দ্বারা নির্ণয়ই হচ্ছে বিচারের ফল। অথচ সেখানে উভয় পক্ষেই দোষ এবং প্রয়োজনের বিচার করা হয়েছে। কোন একতর পক্ষের নির্ণয় করা হয় নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—'তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ, যদ্যেব নিত্যঃ তথাপি কার্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণংপ্রবর্ত্যম্।" যদিও শব্দ নিত্য তথাপি কার্য [উৎপাদ্য]—উভয় প্রকারে লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র প্রবর্তন করা যাবে। বৈয়াকরণদের মতে স্ফোটরূপ শব্দ [বাক্যস্ফোট] নিত্য। আর ঐ স্ফোটের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি বা বর্ণরূপ শব্দ অনিত্য। মীমাংসক মতে শব্দ বর্ণাত্মক। বর্ণসকল নিত্য, সেই বর্ণের অভিব্যঞ্জক বায়বীয় সংযোগ বা সংযোগ বিভাগ যুক্ত বায়ু অনিত্য বলে সেই ব্যঞ্জকের অনিত্যতা বর্ণে আরোপিত হওয়ায় বর্ণকেও অনিত্য বলে মনে হয়। বস্তুত বর্ণ অনিত্য নয়, কিন্তু নিত্য। বর্ণমাত্রই বিভু, নিত্য দ্রব্য। বর্ণসমূহ নিত্য বলে বর্ণসমূহাত্মক পদও নিত্য। যদিও পৌর্বাপর্যরূপ ক্রম অনিত্য

তথাপি ক্রমবিশিষ্ট বর্ণই পদস্বরূপ বলে পদও নিত্য। পদসমুদায়াত্মক বাক্য দুই প্রকার লৌকিক এবং বৈদিক। তন্মধ্যে বৈদিক বাক্য নিত্য, যেহেতু তাতে পুরুষের প্রবেশ নাই। লৌকিক বাক্য মানুষের পদের পৌর্বাপর্যাত্মক পদবিন্যাস বশত অনিত্য। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বর্ণ অনিত্য। কণ্ঠতালু প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা বর্ণ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হয়ে তৃতীয় ক্ষণে নষ্ট হয়। সুতরাং বর্ণসমুদায়াত্মক পদও অনিত্য বা কার্য এবং পদসমুদায়াত্মক বাক্যও কার্য। বৈয়াকরণমতে পরা বা পশ্যন্তী বাক্ নিত্য। মধ্যমা ও বৈখরী অনিত্য বা কার্য। আবার সেই বৈয়াকরণদের অনেকের মতে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা নিত্য। বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে বাক্যস্ফোটকে নিত্য বলে স্বীকার করা হয়। ঐ বাক্যস্ফোট বস্তুত অখণ্ড। তার কোন অবয়ব নাই। তবে যে পদগুলিকে আমরা বাক্যের অবয়ব মনে করি তাহা কল্পনা। এইভাবে কল্পিত পদরূপ অবয়ব বাক্যস্ফোটে স্বীকার করলেও কোন বিরোধ হয় না। বাস্তব অবয়ব বললেই বিরোধ হয়। কোন কোন বৈয়াকরণ নিত্য বর্ণস্ফোট স্বীকার করেন। আবার কোন কোন বৈয়াকরণ বর্ণব্যতিরিক্ত নিত্য পদস্ফোট স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক ধ্বনিকে শব্দ বলেন। সেই ধ্বনি দুই প্রকার অবর্ণাত্মক শঙ্খাদিশব্দ এবং বর্ণাত্মক সংস্কৃত ভাষাদি। এই উভয়ই অনিত্য কার্য।

মহাভাষ্যকার বলছেন—সংগ্রহে যদিও শব্দকে নিত্য স্বীকার করা হয়েছে, তথাপি কার্য শব্দও স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ফোটরূপ নিত্যশব্দ যেমন স্বীকার করা হয়েছে, সেইরূপ প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি অনিত্য বর্ণাত্মক কার্যরূপ শব্দও স্বীকার হয়েছে। এই বর্ণই ধ্বনি। এখানে দ্রষ্টব্য এই—যদিও মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে স্ফোটই মুখ্যশব্দ, তথাপি লোকব্যবহারে ধ্বনি বা বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যাকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যুৎপাদন করা হয় বলে, তাকেও শব্দ বলে ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রতিপাদন করা হয়। এই ধ্বনি বা কার্যশব্দের দ্বারা পরম্পরা ক্রমে আসল স্ফোটাত্মক শব্দকে জানা যায়। এখন এই উভয় বিধ শব্দ স্বীকার করলে কিরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হয়? এর উত্তরে বলা হয়। যে পক্ষে শব্দ নিত্য সে পক্ষে ব্যাকরণের প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দের ব্যুৎপাদন করা সম্ভব না হলেও, ব্যাকরণের দ্বারা সেই নিত্যশব্দ যে সাধু ইহা জানিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং ব্যাকরণের প্রয়োজন শব্দের নিত্যত্ব পক্ষেও সিদ্ধ হয়ে যায়। আর শব্দ অনিত্য এই পক্ষে অনিত্যধ্বনিরূপ শব্দ যেমন কণ্ঠ,

তালু প্রভৃতির সাহায্যে উৎপন্ন হয়; কণ্ঠতালু প্রভৃতি সেই অনিত্য শব্দের কারণ; সেইরূপ ব্যাকরণও প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণের দ্বারা সেই অনিত্য শব্দের উৎপত্তিতে কারণ হয় বলে শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষেও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। এই জন্য বলা হয়েছে [সংগ্রহে] "উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যম্" শব্দ নিত্য এই পক্ষে এবং অনিত্য এই পক্ষেও ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রবর্তন করতে হবে, ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে॥ ৩৯॥

মূল

[মহাভাষ্য]

কথং পুনরিদং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্?

[বার্তিক]

["সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতো হর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ, যথা লৌকিকবৈদিকেষু"—বার্তিকগ্রন্থ॥ ১॥]।

[বার্তিক]

সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে—

[মহাভাষ্য]

সিদ্ধে শব্দেহর্থে সম্বন্ধে চেতি। অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থঃ? নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ। কথং জ্ঞায়তে? যৎকূটস্থেষবিচালিষু ভাবেষু বর্ততে; তদ্ যথা—সিদ্ধা দ্যৌঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকাশমিতি। ননু চ ভোঃ কার্যেষ্বপি বর্ততে; তদ্ যথা—সিদ্ধ ওদনঃ, সিদ্ধঃ সূপঃ, সিদ্ধা যবাগূরিতি। যাবতা কার্যেষ্বপি বর্ততে, তত্র কুত এতন্নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণম, ন পুনঃ কার্যে যঃ সিদ্ধ-শব্দ ইতি। সংগ্রহে তাবৎ কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্ মন্যামহে নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি। ইহাপি তদেব।

অথবা সন্ত্যেকপদান্যপ্যবধারণানি। তদ্ যথা—অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি। অপ এব ভক্ষয়তি, বায়ুমেব ভক্ষয়তি ইতি গম্যতে। এবমিহাপি সিদ্ধ এব, ন সাধ্য ইতি।

অথবা পূর্বপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ—অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্ যথা—দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি।

অথবা 'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমি'তি নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ :—ভগবান্ আচার্য পাণিনির কিরূপে এই লক্ষণ [ব্যাকরণস্থত্র] প্রবৃত্ত হয়েছে ?

[সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে ধর্মনিয়মঃ যথা লৌকিকবৈদিকেষু"—এই বার্তিক বাক্যকে মহাভাষ্যকার চারভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই আদি বার্তিকবাক্য একটি। ইহা পরে জানা যাবে]

"শব্দার্থ সম্বন্ধ সিদ্ধ থাকায়।" শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধ থাকায়। [আচ্ছা] সিদ্ধ শব্দের [সিদ্ধ এই শব্দের] পদার্থ [অর্থ] কি ? সিদ্ধ [এই] শব্দটি, নিত্য [অর্থের] পর্যায় [প্রতিশব্দ] [রূপে] [নিত্যঅর্থের] বাচক।

কিরূপে জানলে [সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্যায় ইহা কিরূপে জানলে] ? যেহেতু [সিদ্ধ শব্দটি], কূটস্থ, অবিচল ভাব [পদার্থ] সমূহে বর্তমান থাকে [কূটস্থ অবিচল পদার্থকে বুঝায়]। যেমন স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধ আকাশ সিদ্ধ। ওহে, কার্যরূপ অর্থসমূহেও [সিদ্ধ শব্দ] বর্তমান থাকে [কার্য অর্থকেও বুঝায়]। যেমন অন্ন সিদ্ধ [হয়েছে] স্থপ [ডাল] সিদ্ধ, যবাগূ [যবের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য] সিদ্ধ। যেহেতু কার্যেও বর্তমান থাকে [কার্যকেও বুঝায় —সিদ্ধ শব্দ] তাহলে কি হেতু এই নিত্যের পর্যায়রূপে বাচকে [সিদ্ধ শব্দের]র গ্রহণ [করা হচ্ছে] ; কার্যে [কার্য অর্থের বাচক] যে সিদ্ধ শব্দ [তাহার গ্রহণ করা] হচ্ছে না।

সংগ্রহে [সংগ্রহ গ্রন্থে] কার্যের প্রতিপক্ষভাবহেতুক [কার্যের প্রতিপক্ষ পদার্থরূপে সংগৃহীত হওয়ায়] নিত্য অর্থের বাচক পর্যায়ের [সিদ্ধ শব্দের] গ্রহণ হয়েছে—ইহা মনে করি। এখানেও [বার্তিক বাক্যেও] তাহাই [নিত্য অর্থের বাচক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ]।

অথবা অবধারণগুলি [নিশ্চয়গুলি] একপদযুক্ত আছে [একটি পদের দ্বারাও অবধারণ বুঝায় এইরূপ প্রয়োগ আছে]। যেমন "অব্ভক্ষঃ বায়ুভক্ষঃ" এইরূপ স্থলে জলই ভক্ষণ করে, বায়ুই ভক্ষণ করে—ইহা গম্যমান [অসাক্ষাদ্

ভাবে জ্ঞাত] হয়। এইরূপ এখানেও [বার্তিকগ্রন্থেও] সিদ্ধই, সাধ্য নয় [সিদ্ধই এইরূপ অবধারণ হয়]।

অথবা এখানে [উক্তবার্তিকগ্রন্থে] পূর্বপদের লোপ [করে প্রয়োগ করা হয়েছে, ইহা] বুঝতে হবে। অত্যন্তসিদ্ধ [কে] [অত্যন্তপদলোপকরে] সিদ্ধ [ইহা বলা হয়েছে]। যেমন দেবদত্ত [দেবদত্ত শব্দ প্রয়োগকরতে] দত্ত [এই রূপ বলা হয়] সত্যভামা [কে বুঝাতে] ভামা [এইরূপ বলা হয়]। অথবা 'ব্যাখ্যা হতে বিশেষপ্রতীতি হয়, সন্দেহবশত অলক্ষণ [কোন লক্ষণ অলক্ষণ অথবা সূত্র অসূত্র] হয়ে যায় না' এই হেতু [সিদ্ধ শব্দটিকে] নিত্য অর্থের বাচক [পর্যায়] রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, ইহা [এইরূপ] ব্যাখ্যা করণ ॥ ৪০ ॥

বিবৃতি :—শব্দের অনুশাসন শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে বলে এযাবৎ ভাষ্যকার শব্দের স্বরূপ, প্রয়োজন, শব্দের অর্থের স্বরূপ, কি ভাবে শব্দের উপদেশ করা হবে এইসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তার পর বলেছেন শব্দ নিত্যও বটে এবং কার্যও বটে। ব্যাকরণের সূত্রের দ্বারা শব্দের জ্ঞান উৎপাদন করা হবে। এরউপর প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে "কথং পুনঃ ইদং ভগবতঃ পাণিনে রাচার্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্।" মহাভাষ্যকার পাণিনিমুনিকে পূজার্হ বলে ভগবৎ শব্দে বিশেষিত করেছেন। আর তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের আচার্যও। তিনি [পাণিনি] কিরূপে এই লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাকরণসূত্র প্রবৃত্ত করেছেন—রচনা করেছেন। শব্দের ব্যুৎপাদনের জন্য তিনি শাস্ত্ররচনা করেছেন। এখন শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহলে তো পাণিনি সেই শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন না। আর যদি শব্দ কার্য হয়, তাহলে অবশ্য পাণিনি সেই শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন। সন্দেহবশত জিজ্ঞাসা হয়েছে—পাণিনি শব্দসকলের স্রষ্টা অথবা স্মর্তা, এইরূপ সন্দেহে জিজ্ঞাসা বশত প্রশ্ন করা হয়েছে পাণিনি কিভাবে এই ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মহাভাষ্যকার বার্তিক বাক্যের অবতারণা করেছেন 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে ইত্যাদি', বার্তিক গ্রন্থ পাণিনির সূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ। যদিও বার্তিককার তাঁর বার্তিকের দ্বারা পাণিনির সূত্রের অক্ষর ব্যাখ্যা করেন নাই, তথাপি সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' ইত্যাদি বাক্যটি বার্তিককারের প্রথম বাক্য। এর পূর্বপর্যন্ত যাকিছু বলা হয়েছে সেগুলি মহাভাষ্যকারেরই বাক্য। সুতরাং

অথ শব্দানুশাসনম্' থেকে আরম্ভ করে 'কথং পুনরিদমিত্যাদি বাক্য পর্যন্ত গ্রন্থ মহাভাষ্য। "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম নিয়মঃ, যথা লৌকিকবৈদিকেষু।" এই বার্তিক গ্রন্থটি একটি সম্পূর্ণ বাক্য হতে পারে, কিন্তু মহাভাষ্যকার উহাকে চারিটি বাক্যে ব্যবস্থাপিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন (১) সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" শব্দ, অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য হলেও ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রবৃত্ত হতে পারে। ইহাই প্রথম বাক্যের অর্থ। (২) "লোকতঃ।" শব্দ, অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য ইহা কি করে জানলে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "লোকতঃ" লোক হতে জানলাম। (৩) 'লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম নিয়মঃ।" "লোকতঃ" এই শব্দটি একবার উল্লিখিত হলেও, তার আর একবার আবৃত্তি করে তৃতীয় বাক্যটি পূরণ করতে হবে। লোকে অর্থজ্ঞানের জন্য শব্দপ্রয়োগ করে, ইহা লোকে ব্যবহার সিদ্ধ। শাস্ত্র [ব্যাকরণাদি শাস্ত্র] ধর্মের জন্য কেবল নিয়ম করে দেয় [শাস্ত্র শব্দ উৎপাদন করে না]। কিরূপে ধর্ম নিয়ম করা হয় এই প্রশ্নের উত্তরে উদাহরণ বলেছেন (৪) যথা লৌকিকবৈদিকেষু" যেমন লোকে এবং বেদে ধর্মের নিয়ম করা হয়।

এখন যে প্রশ্ন প্রথমে উঠেছিল 'পাণিনি কি ভাবে সূত্রের প্রবর্তন করেছেন, তিনি কি সূত্রের দ্বারা শব্দের সৃষ্টি করেছেন অথবা বিদ্যমান শব্দের স্মরণ করেছেন', এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই প্রথম বার্তিকের অবতারণা করেছেন। এই বার্তিকের সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে; শব্দ, অর্থ এবং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এই তিনটি সিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য। এই বার্তিক থেকে প্রশ্নের উত্তর অর্থসিদ্ধ হয়ে গেল। যেহেতু শব্দ অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ নিত্য, সেইহেতু পাণিনি সূত্রের দ্বারা শব্দের উপদেশে শব্দের বা শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের স্মরণই করেছেন। তিনি শব্দের স্রষ্টা নয় কিন্তু স্মর্তা। "সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে" এই বার্তিক স্থিত 'শব্দার্থসম্বন্ধে' পদটি শব্দশ্চ অর্থশ্চ সম্বন্ধশ্চ এইরূপ বিগ্রহে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করে "শব্দার্থসম্বন্ধ" শব্দ নিষ্পাদন পূর্বক, তার উত্তর সপ্তমীর একবচন করে নিষ্পন্ন হয়েছে। সমাহারদ্বন্দ্বে একবচন এবং নপুংসকলিঙ্গ হয়। ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাস করলে উক্ত বার্তিকের আকার হত "সিদ্ধেষু শব্দার্থসম্বন্ধেষু"। মহাভাষ্যকার উক্ত বার্তিকের অর্থ বুঝাবার জন্য বলেছেন —'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি'। মহাভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা 'শব্দার্থসম্বন্ধে' এই পদের বিগ্রহ বাক্য সূচিত হয়ে গেছে।

সিদ্ধ শব্দ নিত্য অর্থের বাচক আবার "নিষ্পন্ন" অর্থেরও বাচক হয়। এখানে বার্তিকস্থিত সিদ্ধ শব্দের কোন্ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে—ইহা জানাবার জন্য প্রশ্ন করেছেন—'অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থঃ ?' এখানে পদার্থ শব্দটি অভিধেয় অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ইহা বুঝতে হবে। সিদ্ধ শব্দের অর্থ কি ? এইরূপই প্রশ্নের তাৎপর্য। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন— "নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধ-শব্দঃ" 'পর্যায়েণবক্তুং শীলমস্য' এই ভাবে প্রথমে উপপদ তৎপুরুষ সমাস করে, তারপর নিত্যস্য [নিত্যরূপ অর্থের] পর্যায়বাচী এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করে 'নিত্যপর্যায়বাচী' শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। "সিদ্ধ ইতি শব্দঃ" এইরূপ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (শাকপার্থিবাদিবৎ) সমাস করে —'সিদ্ধ শব্দটি' নিষ্পন্ন হয়েছে। নিত্য অর্থের পর্যায় ক্রমে বাচক হচ্ছে সিদ্ধ শব্দ। কখন ও 'নিত্য' এই শব্দটি নিত্য অর্থের বাচক হয় আর কখনও বা 'সিদ্ধ' এই শব্দট নিত্য অর্থের বাচক হয় (২০৯)। মোট কথা হচ্ছে ভাষ্যকার 'নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধ শব্দঃ' এই ভাষ্যের দ্বারা বলেছেন এখানে সিদ্ধ শব্দটি নিত্য অর্থের বাচক, সিদ্ধ শব্দের অর্থ 'নিত্য'। মহাভাষ্যকার পূর্বে— "সিদ্ধ শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এই ভাষ্যের দ্বারা 'সিদ্ধ' এই শব্দটি—'শব্দ' [শব্দ এই শব্দের] 'অর্থ' ও 'সম্বন্ধ' এই তিনের সঙ্গে অন্বিত (সম্বদ্ধ—ইহা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারপর আবার 'নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ এই ভাষ্যের দ্বারা 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্যার্থক—ইহা বলে দিলেন। তাতে বুঝাগেল শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য; এবং ঐ উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য। বাক্যস্ফোটাত্মক শব্দ এবং পদস্ফোটাত্মক শব্দ নিত্য। জাতিস্ফোটও নিত্য ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা শব্দকে কার্য বলেন যেমন নৈয়ায়িক বৈশেষিক প্রভৃতি। আর বৈয়াকরণদেরও কেহ কেহ ধ্বনিকে [বর্ণাত্মকধ্বনিকে] শব্দ বলেন, ধ্বনি কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন হয়। এঁদের মতে কিরূপে শব্দ নিত্য হবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট বলেছেন কার্যরূপ শব্দ স্বরূপত নিত্য না হলেও প্রবাহ রূপে নিত্য। একরকম শব্দ নষ্ট হযে যাচ্ছে, আবার সেই প্রকার শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে, এইভাবে প্রবাহরূপে শব্দ নিত্য। যাঁরা জাতিকে শব্দের অর্থ বলেন তাঁদের মতে জাতি নিত্য বলে অর্থও (শব্দের অর্থও)

---

(২০৯) নিত্যলক্ষণস্যার্থস্য পর্যায়েণ বাচকত্বমেবার্থঃ কদাচিন্নিত্যশব্দ আহ কদাচিৎ সিদ্ধ শব্দ ইত্যর্থঃ। কৈয়ট. মহাভাষ্যপ্রদীপ।

নিত্য। আর যাঁদের মতে ব্যক্তিই শব্দের অর্থ তাঁদের মতে ব্যক্তি স্বরূপত অনিত্য হলেও প্রবাহরূপে নিত্য। অতএব অর্থও নিত্য হলো। শব্দ এবং অর্থ নিত্য হওয়ায় তাদের সম্বন্ধও নিত্য। সর্ব সম্বন্ধী নিত্য হলে সম্বন্ধও নিত্য হবে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ন্যায়বৈশেষিকমতে শক্তি। মীমাংসক মতে প্রত্যায্য প্রত্যায়ক। বৈয়াকরণ মতে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ শক্তি; তবে এই শক্তিরস্বরূপ হচ্ছে 'তাদাত্ম্য' (২১০)। যাহা হউক—প্রথম বার্তিকের দ্বারা জানা গেল—শব্দ ও অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধ নিত্য। এই তিনটি নিত্য হওয়ায় পাণিনি সেই শব্দার্থসম্বন্ধের স্মরণকর্তা মাত্র, স্রষ্টা নয় ইহাই প্রতিপাদিত হয়।

সিদ্ধশব্দ নিত্যার্থক—একথা মহাভাষ্যকার পূর্বেই বললেন। তার উপর পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করছেন "কথং জ্ঞায়তে?" মহাভাষ্যকারই পূর্বপক্ষীর প্রশ্ন নিজে উঠিয়েছেন। 'সিদ্ধ শব্দ যে নিত্য অর্থেক বুঝায়—ইহা কিকরে জানলে'—ইহাই এই প্রশ্নের অভিপ্রায়।

এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—"যৎ কূটস্থেষবিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে; তদ্‌যথা সিদ্ধা দ্যৌঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকাশমিতি।" এই ভাষ্যবাক্যে যে 'যৎ পদটি আছে এটি একটি অব্যয়শব্দ। সর্বনাম 'যৎ' শব্দ নয়। অব্যয় 'যৎ' শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি করে, অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ" (পাঃ সূঃ ২।৪।৮২।) সূত্রানুসারে সেই পঞ্চমীর লুক্ করে 'যৎ' পদ সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ যেহেতু [যস্মাৎ]। কূটের (কামারদের নেই) মত অবস্থান করে যে তাকে কূটস্থ বলে (২১১)। কূটস্থ শব্দের তাৎপর্যার্থ নির্বিকার, অবিনাশী। "বিচলিতুং শীলমস্য' এইরূপ অর্থে বি উপসর্গ পূর্বক চল্ ধাতুর উত্তর ণিনিপ্রত্যয় করলে—'বিচালিন্' শব্দ সিদ্ধ হয়। ন বিচালী—অবিচালী নঞ্ তৎপুরুষ। অবিচালিন্ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে 'অবিচালিষু' এইরূপ হয়েছে। বিচলন বা স্পন্দন শূন্য হলো অবিচালী। 'ভাবেষু" এখানে 'ভাব' শব্দের অর্থ পদার্থ। যেহেতু সিদ্ধ

---

(২১০) শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধশ্চ শক্তিরূপঃ তাদাত্ম্যমেবেত্যেবাত্র প্রপঞ্চিতম্। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত-পস্পশাহ্নিক।

(২১১) কূটবদোষন [কূট অর্থ ঘনীভূত লোহা—অর্থাৎ নেই] অবতিষ্ঠতি যে, তেষু, সংসর্গিনাশেঽপি স্বয়মনষ্টেষ্বিত্যর্থঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত—পস্পশাহ্নিক]

শব্দটি কূটস্থ ও অবিচালি অর্থাৎ নিত্য পদার্থে বর্তমান—নিত্যপদার্থকে বুঝায়। যেমন স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধ, আকাশ সিদ্ধ এইরূপ ব্যবহার হয়। কোন কোন যাজ্ঞিক স্বর্গকে নিত্য স্বীকার করেন। পৃথিবী ব্যাবহারিক ভাবে নিত্য ইহা অনেকে স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক বৈশেষিক আকাশকে নিত্য স্বীকার করেন। মহাভাষ্যকারের মতেও আকাশ ব্যাবহারিক নিত্য। সুতরাং এইসব নিত্য পদার্থকে বুঝাবার জন্য যেহেতু 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়; অতএব সিদ্ধ শব্দের অর্থ নিত্য—ইহা জানা গেল।

মহাভাষ্যকারের এইরূপ উত্তরে কোন পূর্বপক্ষী অশঙ্কা করছেন—"নমু চ ভোঃ কার্যেম্বপি বর্ততে। …………নপুনঃ কার্যে যঃ সিদ্ধ শব্দ ইতি?" যার উৎপত্তি আছে তাকে কার্য বলে। উৎপত্তি থাকলে ভাব পদার্থ অবশ্যই বিনাশী হয়। সিদ্ধ শব্দটি যেমন নিত্য পদার্থকে বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ কার্য অর্থাৎ অনিত্যবস্তুকে বুঝাবার জন্যও প্রয়োগ করা হয়। যেমন অন্নসিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ, যবাগূ [যাউ] সিদ্ধ। তাহলে "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিকে নিত্য অর্থের বাচকরূপে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে কার্য বা অনিত্য অর্থের বাচকরূপে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই—ইহা কিরূপ বুঝা যাবে? সিদ্ধ শব্দ যখন উভয় অর্থ [অনিত্য ও নিত্য] বুঝায় তখন কেবল নিত্য অর্থে তাকে [সিদ্ধ শব্দকে] গ্রহণ করা চলে না। ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। পূর্বপক্ষীর এইরূপ বক্তব্যের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"সংগ্রহে তাবৎ কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্ মন্যামহে নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ইহাপি তদেব।"

ব্যাডিকৃত সংগ্রহ নামক গ্রন্থে কার্যের প্রতিপক্ষভূত পদার্থকে বুঝান হয়েছে বলে, সেই গ্রন্থে সিদ্ধ শব্দটিকে নিত্য অর্থের বাচক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে—ইহাই মনে করি। কার্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে অকার্য অর্থাৎ নিত্য। সংগ্রহে সিদ্ধ শব্দকে কার্যের বিরোধিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে বলে সিদ্ধ শব্দটি সেখানে নিত্য অর্থের বাচক হয়েছে। "কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্ মন্যামহে" এখানে "কার্য প্রতিদ্বন্দ্বিভাবাৎ" এইরূপ পঞ্চম্যন্ত পদ বুঝতে হবে দ্বিতীয়া বহুবচনান্ত পদ নয়। কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাব হেতুক নিত্য পর্যায়বাচক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ সংগ্রহ গ্রন্থে করা হয়েছে। এখানে অর্থাৎ বার্তিকবাক্যেও সেই নিত্যার্থক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ করা হয়েছে—ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

সংগ্রহ গ্রন্থে নিত্য অর্থে সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধ শব্দ নিত্য অর্থকে যেমন বুঝায় তেমন অনিত্য [কার্য] অর্থকেও বুঝায়, নিত্য অথে যেমন সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় অনিত্য অর্থেও সেইরূপ সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তা হলে সংগ্রহ গ্রন্থের অনুসারে এখানে নিত্য অর্থেই সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ করলে, তাতে কোন একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি পাওয়া যায় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার নিত্যঅর্থে সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ বিষয়ে এখানে আর একটি পক্ষ উপস্থাপিত করছেন—"অথবা সন্ত্যেকপদান্যব ধারণানি.........সিদ্ধ এব ন সাধ্য ইতি।"

'এব' পদ অবধারণকে দ্যোতিত করে। অন্যযোগের ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ যার সঙ্গে 'এব' শব্দ উচ্চারিত হয় সেইশব্দের অর্থ ভিন্নকে ব্যাবৃত্ত [নিবৃত্ত] করে। যেমন 'পার্থএব' বললে অর্জুন ভিন্ন অপরে নয় এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। এই 'এব' পদ পঠিত না হয়েও অনেক সময় একটি শব্দ সেই অবধারণ অর্থকে বুঝিয়ে দেয়। শব্দের সামর্থ্য বশত এইরূপ অর্থ প্রতীত হয়। যেমন "পতিম্ অনুসরতি পতিব্রতা" এইরূপ বললে পতিব্রতা পতিকেই অনুসরণ করে এইরূপ অবধারণ বুঝায়। 'এব' শব্দ 'পতি' শব্দের সন্নিধিতে পঠিত না হলেও এখানে 'পতি' শব্দ অবধারণ অর্থকে বুঝায়। এইরূপ অবধারণ অর্থের বোধক পদকে একপদ অবধারণ বলে। এইরূপ স্থলকে লক্ষ্য করে মহাভাষ্যকার বলেছেন—অবধারণার্থক একপদ সকল আছে। তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন অব্ভক্ষঃ, 'বায়ুভক্ষঃ'। এইরূপ শব্দের সোজাসুজি অর্থ [শ্রুত অর্থ] হচ্ছে জলভক্ষণকারী, বায়ুভক্ষণকারী। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করলে এখানে "অব্ভক্ষঃ" এবং "বায়ুভক্ষঃ" শব্দের প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ সকলেই জল পান করে, সকলেই বায়ুগ্রহণ করে। জল বায়ু গ্রহণ না করে কেউ বাঁচে ইহা দেখা যায় না। সুতরাং কোন মুনি ঋষি বা এক বিশেষপ্রাণীকে বুঝাবার জন্য ঐরূপ অব্ভক্ষঃ বা বায়ুভক্ষঃ শব্দের যখন প্রয়োগ করা হয় তখন সেই শব্দ দুটির অর্থ এইরূপ বুঝা যায়—জলই ভক্ষণকরে, জলভিন্ন অন্যকিছু ভক্ষণ করে না। বায়ুই ভক্ষণ করে, বায়ুভিন্ন অন্যকিছু ভক্ষণ করে না। এইরূপে শব্দ দুইটির সার্থকতা রক্ষিত হয়। এখানে 'অপ্ শব্দটি' বা 'বায়ু' শব্দটি একটি থাকলেও অবধারণ অর্থ বুঝাচ্ছে বলে "একপদ অবধারণ" হয়েছে। এইরূপ "সিদ্ধে-শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিক-গ্রন্থে"এব' পদ না থাকলেও কেবল এক 'সিদ্ধ'

পদই 'সিদ্ধই' 'নিত্যই' এইরূপ অবধারণ অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। সাধ্য অর্থাৎ কার্য অর্থকে এখানে 'সিদ্ধ' শব্দটি বুঝায় না। কার্য অর্থের ব্যাবর্তক হচ্ছে, এই সিদ্ধ শব্দটি। সুতরাং এই বার্তিকে সিদ্ধ শব্দটি নিত্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, কার্য অর্থে নয়—ইহাই মহাভাষ্যকারের উক্ত বাক্যের অর্থ।

মহাভাষ্যকার বার্তিকবাক্যস্থিত 'সিদ্ধ' শব্দের নিত্যঅর্থে গ্রহণ করা হয়েছে ইহা বুঝাবার জন্য আর একটি কল্প [পক্ষ] উপস্থাপিত করেছেন—"অথবা পূর্বপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্ যথা দেবদত্তো দত্তঃ, সত্যভামা ভামেতি।"

কোন একটি শব্দ যে অর্থকে বুঝায়—অনেক সময় লোকে, সেই শব্দের একাংশ প্রয়োগ করেও সেই অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন আজকালও এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। কোন লোকের নাম 'কৃষ্ণচন্দ্র'। তাকে 'কৃষ্ণচন্দ্র' নামেও লোকে বুঝায় আবার 'কৃষ্ণচন্দ্র' শব্দের একদেশ 'কৃষ্ণ' শব্দের দ্বারাও তাকে বুঝায়। এখানে 'কৃষ্ণচন্দ্র' শব্দের উত্তর পদ 'চন্দ্র' লোপ করে বুঝানো হয়। আবার কোথায়ও পূর্বপদের লোপ করে সমুদায় শব্দের অর্থ বুঝানো হয়। যেমন 'হরিশ্চন্দ্র' কে 'চন্দ্র' শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়। এখানে 'হরি' এই পূর্বপদের লোপ করা হয়। পূর্বেও সম্পূর্ণ শব্দের একাংশ দিয়ে সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ বুঝানো হোত। এইজন্য বার্তিককার একটি সূত্র রচনা করেছিলেন —"বিনাপি প্রত্যয়ং পূর্বোত্তরপদয়োর্বা লোপো বাচ্যঃ" [বাঃ ৩২৯৯] প্রত্যয়ের লোপ না হয়েও পূর্ব বা উত্তরপদের বিকল্পে লোপ বলতে হবে। মহাভাষ্যকার এর দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—'দেবদত্ত' ইহা একজনের নাম। 'দেবদত্ত' শব্দের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা বা বুঝানো হয়। আবার 'দেবদত্ত' এই শব্দের 'দেব' এই পূর্বপদলোপকরে 'দত্ত' অংশের দ্বারাও সেইব্যক্তিকে বুঝানো হয়। এইরূপ সত্যভামাকে 'ভামা' এই অংশের দ্বারাও বুঝানো হয়। এইরূপে লোকে যেমন পূর্বপদের লোপ করে শব্দের প্রয়োগ করে সেইরূপ 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' এই বার্তিকে যে 'সিদ্ধে' পদটি আছে সেটি বার্তিককার 'অত্যন্তসিদ্ধে' এইরূপ একটি সম্পূর্ণ শব্দের পূর্ববর্তী 'অত্যন্ত' পদটি লোপকরে 'সিদ্ধে' এইরূপ একাংশ দ্বারা সেই 'অত্যন্তসিদ্ধ' শব্দের অর্থকেই বুঝিয়েছেন। 'সিদ্ধ' শব্দ নিত্য অর্থ এবং কার্য অর্থকে বুঝালেও এখানে বার্তিকে 'অত্যন্তসিদ্ধ' পদার্থকে বুঝাবার জন্যই বার্তিককার 'সিদ্ধ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাতে আর কার্য অর্থকে বুঝা

যাবে না। কারণ কার্য পদার্থ অত্যন্ত সিদ্ধ নয়। "অন্তম্ অতিক্রান্তঃ" অর্থাৎ যাহা বিনাশকে অতিক্রম করে অবিনাশী; তাহাকে অত্যন্ত বলা যেতে পারে। অবিনাশী অর্থে 'অত্যন্ত' শব্দটিকে গ্রহণ করলে 'অত্যন্তসিদ্ধ' শব্দের অর্থ হয় যাহা অবিনাশী সিদ্ধ। কার্য পদার্থকে সিদ্ধ শব্দের দ্বারা বুঝানো হলেও কার্য পদার্থ বিনাশী বলে অত্যন্তসিদ্ধ হতে পারেনা। নিত্য পদার্থই অত্যন্তসিদ্ধ। সুতরাং 'অত্যন্তসিদ্ধ' এই শব্দের 'নিত্য' এই অর্থ লাভ হওয়ায়, সেই অত্যন্তসিদ্ধ শব্দের একদেশ 'সিদ্ধ' শব্দের দ্বারা এখানে নিত্য পদার্থকেই বুঝানো হয়েছে, কার্য পদার্থকে বুঝানো হয় নাই। ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য। 'অত্যন্তসিদ্ধ' শব্দের একদেশ 'অত্যন্ত' লোপ করে বার্তিককার 'সিদ্ধ' শব্দের দ্বারা এখানে 'অত্যন্তসিদ্ধ'কে বুঝিয়েছেন অথবা কার্য অর্থের বাচক সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার নিশ্চায়ক প্রমাণ বা যুক্তি কিছু বুঝা যাচ্ছে না—এইরূপ যদি আশঙ্কা হয়; তাতে সিদ্ধ শব্দের এখানে 'অত্যন্তসিদ্ধ' ই অর্থ ইহা নিশ্চয় করা যাবে না। ফলতঃ সন্দেহই থেকে যাবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার আর একটি কল্পের [পক্ষের] উত্থাপন করেছেন—"অথবা "ব্যাখ্যানতো বিশেষ-প্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্" ইতি নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ।" কোন লক্ষণ বাক্যে বা সূত্রে অর্থবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে সেই লক্ষণ বাক্যকে বা সূত্রকে ব্যাখ্য করে তার বিশেষ অর্থের নিশ্চয় করতে হবে। বিশেষ নিশ্চয় সন্দেহের নিবর্তক। সন্দেহ হয় বলে যে সেই আপ্তরচিত লক্ষণ বাক্যকে পরিত্যাগ করা বা সূত্রকে [ঋষি প্রণীত সূত্র] পরিত্যাগ করা—তা কোন মতেই চলবে না। ঋষি প্রণীত সূত্রে বা প্রামাণিক আপ্তব্যক্তির বাক্যে সন্দেহ হলে তাকে ব্যাখ্যা করে তার বিশেষঅর্থ নিশ্চয় করে সন্দেহ দূর করতে হবে। সন্দেহ হয় বলে সেই আপ্তব্যক্তি কর্তৃক উক্ত লক্ষণ অলক্ষণ হয়ে যায় না বা ঋষিপ্রণীত সূত্র বা অনুশাসন বাক্য অপ্রমাণ হতে পারে না। এখানে "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বাক্যটি বার্তিককারের অনুশাসন বাক্য। এই বাক্যে 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ নিত্য অথবা কার্য এইরূপ সন্দেহ হচ্ছে বলে এই বার্তিক বাক্যকে অপ্রমাণ বলে পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কিন্তু এইবাক্যকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাকরে বাক্যের অর্থের বিশেষ নিশ্চয় করতে হবে। মহাভাষ্যকার এই কথা বলে তরেপর বলছেন 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকস্থিত 'সিদ্ধ' শব্দটিকে নিত্য অর্থের পর্যায় [প্রতিশব্দ] বলে ব্যাখ্যা করব। তাতে এই শব্দটি নিত্যার্থক

এইরূপ নিশ্চয় হয়ে যাবে। নিশ্চয় হয়ে যাওয়ায় তদ্বিষয়ে সন্দেহের নিবৃত্তি হয়ে যাবে। সন্দেহের নিবৃত্তি হলে বার্তিক বাক্যটি স্বতঃপ্রামাণ্যের প্রতিবন্ধকমুক্ত হবে।

এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি স্থলের উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করে—এখানে উপন্যাস করছি। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার আরম্ভে ভগবান্ শঙ্করাচার্য অধ্যাসের লক্ষণ করেছেন—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।" এই বাক্যটি বেদান্তমতে অধ্যাসের লক্ষণ বাক্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন এটা কোন প্রকারেই বেদান্তমতে অধ্যাসের লক্ষণ হতে পারে না। কারণ বেদান্তমতে মায়া এবং মায়ার কার্য সমস্ত জগৎ অনির্বাচ্য—মিথ্যা। এই জন্য তাঁদের মতে রজ্জুতে যে সর্পের অধ্যাস হয়; সেস্থলে রজ্জু বা রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্য হচ্ছেন অধিষ্ঠান। সেই অধিষ্ঠানে সর্প হচ্ছে আরোপ্য। এই আরোপ্য সর্পটি ভ্রমকালে অভিনব অনির্বাচ্য রূপে রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যে উৎপন্ন হয়। এই সর্প রজ্জুভিন্ন অন্যত্র কোথায়ও থাকে না। রজ্জুতে বা রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যে ভ্রমকালে থাকে প্রাতিভাসিকরূপে; পারমার্থিক ভাবে থাকে না। সুতরাং ঐ সর্প মিথ্যা। অন্যস্থানে স্থিত লোক ব্যবহারে পারমার্থিক সর্প --রজ্জুতে অন্যথা অন্যপ্রকারে ভাসমান হয়—ইহা নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, ভাট্ট, পাতঞ্জল, প্রভৃতি বলেন। তাঁদের মতে আত্মা সত্য, জগৎ ও সত্য। দেহ প্রভৃতি সত্য বস্তুতে সত্য আত্মার অন্যপ্রকারে অবভাস হয়ে আমি মানুষ, সংসারী ইত্যাদি ব্যবহার হয়। এইভাবে অধ্যাস বা ভ্রম স্বীকারে তাঁদের দ্বৈতবাদে কোন হানি হয় না। যেহেতু অধিষ্ঠানও সত্য এবং আরোপ্য ও সত্য। কেবল আরোপ্য বস্তুটার অন্য ভাবে আরোপ বা জ্ঞান হয় বলে জ্ঞানটি ভ্রম। বেদান্ত মতে যদি এইরূপ স্বীকার করা হয়, তাহলে ব্রহ্মরূপ আত্মাতে অন্যত্র স্থিত বা সত্য দেহাদি অন্যপ্রকারে প্রকাশমান হয় এইরূপ অর্থলাভ হওয়ায় দেহাদি জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। তাতে অদ্বৈতমতের হানি হয়। এইজন্য বেদান্তমতে ব্রহ্ম বা আত্মাতে অনির্বাচ্য [সদসদনির্বাচ্য] পদার্থের অধ্যাস হয়। সেই অনির্বাচ্য পদার্থ অন্যত্র থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মে, প্রতীত হয়, ততক্ষণ তাহা সেই ব্রহ্মে থাকে। বাধজ্ঞান হলে যখন বুঝা যায় উহা ব্রহ্মে নাই, তখন সর্বথা তার [জগতের] অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। এখন—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ" এই ভগবচ্ছঙ্করোক্ত অধ্যাসলক্ষণ বাক্যটির যথাশ্রুত অর্থ হচ্ছে

ভিন্ন বস্তুতে পূর্বদৃষ্ট ভিন্নবস্তুর অসন্নিহিতের অবভাস—অর্থাৎ জ্ঞান বা জ্ঞায়মান। লক্ষণ বাক্যটির এইরূপ অর্থ গ্রহণ করলে শুক্তিতে রজতের অধ্যাসটির স্বরূপ এইরূপ হবে—রজত থেকে ভিন্ন বস্তু যে শুক্তি, সেই শুক্তিতে ; পূর্বে, হাটে বা নিজের ঘরের মধ্যে বাক্সে দৃষ্ট যে ভিন্ন [শুক্তিথেকে ভিন্ন] রজতরূপ বস্তু তার জ্ঞান হয়, আর সেই শুক্তিতে রজতটি অসন্নিহিত [অবর্তমান]। অধ্যাসের এই স্বরূপ হলে ভাষ্যোক্ত লক্ষণটি অন্যথাখ্যাতিবাদীদের মতানুসারে সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদে এইরূপ অধ্যাস সিদ্ধ হয় না। কারণ তাঁরা পূর্বদৃষ্ট অন্যত্রস্থিত রজতের অবভাস ভিন্নবস্তু শুক্তিতে হয়—ইহা স্বীকার করতে পারেন না। ইহা স্বীকার করলে আরোপ্য রজতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। অনুরূপ ভাবে আত্মাতে আরোপ্যমান অনাত্মার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় অনাত্মার সত্যত্ব-সিদ্ধির প্রসঙ্গ হওয়ায় অদ্বৈতবাদ শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। অতএব সন্দেহ হয় যে ভাষ্যকার "স্মৃতিরূপঃ" ইত্যাদি লক্ষণটিকি দ্বৈতবাদীদের মতানুসারে করেছেন অথবা নিজমতে করেছেন এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় উক্ত অধ্যাসলক্ষণটি অলক্ষণ হয়ে যায় অর্থাৎ এই লক্ষণটিকে অনির্বাচ্যবাদীদের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যায় না। এর উত্তরে এই মহাভাষ্যকারের উক্তিটি এখানে স্মরণ করতে হবে "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ভগবচ্ছঙ্করোক্ত "স্মৃতিরূপঃ" ইত্যাদি লক্ষণ বাক্যকে ব্যাখ্যা করে বিশেষ অর্থ জ্ঞান লাভ করতে হবে। উক্ত লক্ষণ বাক্যের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এইরূপ করলে বিশেষজ্ঞান বশত সন্দেহ নিবৃত্তি হবে। যথাঃ 'পরত্র' পদের অর্থ ভিন্ন বস্তুতে। "স্মৃতিরূপঃ" পদের অর্থ অসমানসত্তাক "পূর্বদৃষ্ট" শব্দের অর্থ পূর্বজ্ঞানজন্যসংস্কারবিষয়ীভূত। "অবভাসঃ" শব্দের অর্থ জ্ঞায়মান ও জ্ঞান। অর্থের অধ্যাস এবং জ্ঞানের অধ্যাস—এই দ্বিবিধ অধ্যাস সংগ্রহ করবার জন্য 'অবভাস' শব্দটিকে কর্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ঘঞন্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। ফলত "অধিষ্ঠানাসমান সত্তাকাবভাস" এইরূপ ফলিত অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত ভগবৎপাদোক্ত অধ্যাস লক্ষণ সঙ্গত হবে। কল্পতরুপরিমলে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥৪০॥

মূল

কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন ? কিং ন মহতা কণ্ঠেন নিত্যশব্দ এবোপাত্তঃ, যস্মিন্নুপাদীয়মানেঽসন্দেহঃ স্যাৎ ?

মঙ্গলার্থম্ মাঙ্গলিক আচার্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীর পুরুষাণি চ ভবন্ত্যায়ুস্মৎপুরুষাণি চ, অধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্যুরিতি।

অয়ংখল্বপি নিত্যশব্দো নাবশ্যং কূটস্থেষ্ববিচালিষূ ভাবেষু বর্ততে। কিং তর্হি? আভীক্ষ্ণ্যেহপি বর্ততে; যথা নিত্যপ্রহসিতঃ, নিত্য-প্রজল্পিত ইতি। যাবতা আভীক্ষ্ণ্যেহপি বর্ততে, তত্রাপ্যনেনৈবার্থঃ স্যাৎ—ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ন হি সন্দেহাদলক্ষণমিতি। পশ্যতি ত্বাচার্যো মঙ্গলার্থশ্চৈব সিদ্ধশব্দ আদিতঃ প্রযুক্তো ভবিষ্যতি, শক্ষ্যামি চৈনং নিত্যপর্যায়বাচিনং বর্ণয়িতুমিতি। অতঃ সিদ্ধশব্দ এব উপাত্তো ন নিত্যশব্দ ইতি ॥৪১॥

অনুবাদ :— এই বর্ণনীয়ের [ব্যাখ্যেয় সিদ্ধ শব্দের দ্বারা কি [প্রয়োজন] [সিদ্ধ হবে]? উচ্চ কণ্ঠে 'নিত্য' এই শব্দ কেন গৃহীত হলো না, যাহা [যে নিত্য শব্দ] গৃহীত হলে অসন্দেহ [সন্দেহের প্রাগভাব রক্ষিত] হোত?

মঙ্গলের জন্য। মঙ্গলরূপ প্রযোজনবান্ আচার্য [বররুচি—বার্তিককার] বিশাল শাস্ত্রসমূহের [বার্তিকসমুদায়াত্মক গ্রন্থের] মঙ্গলের জন্য প্রথমে [বার্তিক গ্রন্থের প্রথমে] 'সিদ্ধ' এই শব্দের প্রযোগ করেছেন। যে সকল শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গল থাকে, সেই সকল শাস্ত্র বিস্তার লাভ করে [লোকে প্রচারিত হয়], সেই সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নঅধ্যাপনাকারিগণ শাস্ত্রবিচারে বিজয়ী হন, দীর্ঘায়ু হন এবং সেই সকল শাস্ত্রের অধ্যেতৃগণ সিদ্ধকাম হন। 'নিত্য' এই শব্দটিও যে অবশ্য [ঐকান্তিকভাবে] অবিনাশী ও দেশান্তরপ্রাপ্তিশূন্য পদার্থকে বুঝায়, তা নয়। তা হলে কি? [আর কাকে বুঝায়]। পৌনঃপুন্য অর্থকেও বুঝায়; যেমন পুনঃ পুনঃ হাস্য করেছিল, পুনঃ পুনঃ জল্পনা [কথাবলা] করেছিল। যেহেতু [নিত্যশব্দ] আভীক্ষ্ণ্য [পৌনঃপুন্য] অর্থকেও বুঝায়, সেখানেও [সেই নিত্যশব্দ প্রয়োগেও] ইহার দ্বারাই [এই রীতিতেই] অর্থ [নিশ্চিত অর্থ গৃহীত] হবে— 'ব্যাখ্যার দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হয়, যেহেতু সন্দেহ বশত অলক্ষণ হয় না।' 'আদিতে প্রযুক্ত [ব্যবহৃত] সিদ্ধশব্দ মঙ্গল প্রয়োজনকই হবে ইহাকে [সিদ্ধশব্দকে] নিত্য অর্থের বাচক পর্যায় রূপে ব্যাখ্যা করতে পারব—[ইহা] আচার্য

[বার্তিককার] দেখেছিলেন [নিশ্চয় করেছিলেন]। এইহেতু সিদ্ধ শব্দকেই গ্রহণ করেছেন, নিত্যশব্দকে [গ্রহণ করেন] নাই ॥৪১॥

পদপরিচয় ঃ—'বর্ণ্যেন' = চুরাদিগণীয় বর্ণ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে যৎপ্রত্যয় করে [বর্ণি + যৎ] 'বর্ণ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয় ; তার তৃতীয়ার একবচনের রূপ। ইহার অর্থ—যাকে—যে সিদ্ধ শব্দকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেই ব্যাখ্যেয় [সিদ্ধ শব্দ] দ্বারা। 'কিম্' = প্রশ্নার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'কি প্রয়োজন' - ইহাই প্রশ্নার্থ।

মাঙ্গলিকঃ = অনিন্দিত ঈপ্সিত বস্তুর সিদ্ধিকে মঙ্গল বলে। মঙ্গল শব্দের উত্তর "মঙ্গলং প্রয়োজনমস্য" এইরূপ অর্থে 'ঠক্' প্রত্যয় করে 'ঠ এর স্থানে 'ইক' করে মাঙ্গলিক শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ মঙ্গল যাঁর প্রয়োজন এমন আচার্য। আচার্যের বিশেষণ হয়েছে মাঙ্গলিকটি।

নিত্যপ্রহসিতঃ = প্রউপসর্গ পূর্বক হস্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করে 'প্রহসিতঃ' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হাস্য করেছিল [যে কর্তা]। 'প্রহসিতঃ' শব্দের সঙ্গে 'নিত্য' শব্দের সমাস করে [নিত্যং] প্রহসিতঃ "নিত্য "প্রহসিতঃ" শব্দসিদ্ধ হয়েছে। অর্থ হচ্ছে = পুনঃপুনঃ হেসেছিল। এইরূপ "নিত্য প্রজল্পিতঃ" শব্দেরও ব্যুৎপত্তি বুঝতে হবে। জল্পধাতুর অর্থ কথা বলা। ॥৪১॥

বিবৃতি ঃ—'সিদ্ধ' এই শব্দটি নিত্য অর্থকে বুঝায়, আবার কার্য বা উৎপাদ্য অর্থকেও বুঝায়। যেমন 'সিদ্ধমাকাশম্' এইরূপ প্রয়োগ ; আবার সিদ্ধ মন্নম্' এইরূপও প্রয়োগ হয়। 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকে 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, অথবা কার্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এইরূপ সন্দেহ হলে মহাভাষ্যকার নানাভাবে এখানকার সিদ্ধ শব্দটিকে নিত্যার্থক বলেছেন। শেষে বললেন সন্দেহ স্থলে ব্যখ্যার দ্বারা নিশ্চয় উৎপাদন করে সন্দেহ দূর করা হয়। অতএব উক্ত বার্তিক বাক্যস্থ সিদ্ধ শব্দটির ব্যাখ্যা করে নিত্য অর্থ গ্রহণ করা হল। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলছেন— "কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন।...অসন্দেহঃ স্যাৎ।" বার্তিককার যদি নিত্য অর্থ বুঝাবার জন্য সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন, তা হলে তাঁর তাহা উচিত হয় নাই। কারণ সিদ্ধ শব্দটি যখন দ্ব্যর্থ বোধক শব্দ, নিত্য ও কার্য এই দুই অর্থের বোধক, তখন সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করলে পাঠকদের সন্দেহ হবেই, উক্ত বার্তিকবাক্যে সিদ্ধ শব্দ নিত্যার্থক কি কার্যার্থক ? সন্দেহ

হলে মহাভাষ্যকার বললেন ব্যাখ্যা করে একতর অর্থের অর্থাৎ এখানে নিত্য অর্থের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন কি? যে 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থনিশ্চয়ের জন্য ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, সেইরূপ ব্যাখ্যেয় 'সিদ্ধ' শব্দ বার্তিককার প্রয়োগ করলেন কেন? 'নিত্য' অর্থ বুঝাবার যদি তাঁর প্রয়োজন ছিল, তাহলে তিনি 'নিত্য' এই শব্দটি কেন প্রয়োগ করলেন না। "নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে" এইরূপ বার্তিক বাক্য রচনা করলে তো আর সন্দেহের অবকাশ থাকতো না। সুতরাং সেই সন্দেহ দূর করবার জন্য আর ব্যাখ্যারও আবশ্যকতা হতো না। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—'মঙ্গলার্থম্' মঙ্গলের জন্য। এইটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা নিজেই মহাভাষ্যকার 'মাঙ্গলিক আচার্যো.........যথা স্যুরিতি' এই গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন। ভাষ্যের লক্ষণেই আছে "স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে" অর্থাৎ ভাষ্যকার নিজের কথিত সংক্ষিপ্ত পদগুলিকে নিজেই ব্যাখ্যা করেন। সেই জন্য এখানে মহাভাষ্যকার 'মঙ্গলার্থম্' এই সংক্ষিপ্ত পূর্ববর্ণিত পদটির নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে কাত্যায়ন, পাণিনি সূত্রের উপর প্রায় চারহাজার বার্তিকবাক্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর বার্তিক গ্রন্থটি বিশাল গ্রন্থ। এইরূপ একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করতে গেলে তার প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা শিষ্ট সম্প্রদায়ের আবশ্যকীয় রীতি। বার্তিককার এই মঙ্গলাচরণ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। তিনি বিলক্ষণভাবে জানতেন যে শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ করতে হয়। বার্তিককারের মঙ্গলেরও প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলের দ্বারা গ্রন্থসমাপ্তি হয় অথবা গ্রন্থসমাপ্তির বিঘ্নধ্বংস হয়। এতদ্ব্যতীতও শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ করা হলে যে শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গল বর্ণিত হয় সে শাস্ত্র লোকে প্রচারিত হয়, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করেন বা অধ্যাপনা করেন তাঁদের শাস্ত্রবিচারে জয় হয়, সেই শাস্ত্র যাঁরা অধ্যয়নাদি করেন তাঁরা দীর্ঘায়ু হন, এবং অধ্যয়নকারীরা তাঁদের কাম্য ফল লাভ করেন। বার্তিককার এই সমস্ত জানতেন। সেই জন্য তিনি তাঁর বার্তিক গ্রন্থের আদিতে 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ না বরে সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'সিদ্ধ' শব্দ শ্রবণ করলে বা উচ্চারণ করলে মঙ্গল হয়। এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি পূর্বপক্ষী সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে না পারেন তাঁর মনে যদি সেই পূর্বোক্ত ভাব উদিত হয় অর্থাৎ বার্তিককার গ্রন্থারম্ভের প্রথমে মঙ্গলার্থক অন্যকোন 'অথ'

শব্দাদির প্রয়োগ করে অসন্দিগ্ধ 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ কেন করলেন না। 'অথ নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই ভাবে যদি বার্তিক গ্রন্থ রচনা করতেন তা হলে তো আর কোন দোষ থাকতো না। মঙ্গলাচরণও করা হোত আর সন্দেহের অবকাশও হোত না। এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন "অয়ং খল্বপি নিত্যশব্দ............অতঃ সিদ্ধ শব্দ এবোপাত্তো ন নিত্যশব্দ ইতি।" মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীকে বলছেন দেখ। তুমি বলছ বার্তিককার জোর গলায় অসন্দিগ্ধ 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ করলেন না কেন? সিদ্ধ শব্দটি সন্দিগ্ধ, কারণ উহা দ্ব্যর্থবোধক বলে লোকের সন্দেহ হয়। আবার সেই সন্দেহ নিরাসের জন্য ব্যাখ্যা করতে হয়। কিন্তু দেখ! যে 'নিত্য'শব্দের কথা তুমি বলছিলে সেই নিত্য শব্দও কেবল মাত্র অবিনাশী ও উৎপত্তি রহিত নিত্য অর্থকে যে বুঝায় তা নয়। কিন্তু 'নিত্য' এই শব্দটিও দ্ব্যর্থক। এই নিত্য শব্দটি পৌনঃপুন্য অর্থকেও বুঝায়। যেমন "নিত্য আত্মা" এখানে অবস্থান্তর-শূন্য অবিনাশী জন্মরহিত নিত্য অর্থকে নিত্য শব্দটি বুঝাচ্ছে। আবার "নিত্য প্রহসিতঃ" এইরূপ প্রয়োগও হয়। এখানে 'নিত্য' শব্দের উৎপত্তি বিনাশশূন্য অর্থ হতে পারে না। কারণ হাস্যক্রিয়া কখনও উৎপত্তি বিনাশ শূন্য নয়। কিন্তু এখানে 'নিত্য' শব্দের আভীক্ষ্ণ্য অর্থাৎ পৌনঃপুন্যই অর্থ। পুনঃ পুনঃ হাসছে ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং বার্তিককার যদি তাঁর বার্তিক গ্রন্থের প্রথমে 'নিত্য' এই শব্দ প্রয়োগ করতেন "নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে" এইরূপ বলতেন তা হলেও লোকের সন্দেহ হোত 'নিত্য' এই শব্দটি এখানে কি উৎপত্তি বিনাশ শূন্য অর্থকে বুঝাচ্ছে অথবা পৌনঃপুন্য অর্থকে বুঝাচ্ছে। সন্দেহ হলে আবার সেই "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিঃ" অর্থাৎ ব্যাখ্যা করতে হোত, ব্যাখ্যা করে, তবে বিশেষ নিশ্চয় পূর্বক সন্দেহ দূর করতে হোত। তাতে লাভ কি হোত। লাভ তো হোত না বরং ক্ষতিই হোত। ক্ষতি এই যে প্রথমেই 'নিত্য' এই শব্দের প্রয়োগ করলে বার্তিককারের মঙ্গলাচরণ করা হোত না। 'নিত্য' শব্দটি মঙ্গল জনক নয়। 'সিদ্ধ' শব্দটি মঙ্গলজনক। বার্তিককার ইহা বিশেষভাবে জেনে আদিতে 'সিদ্ধ এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন। আর তিনি ইহা জানতেন যে এই সিদ্ধ শব্দটিকে নিত্যের পর্যায় রূপে ব্যাখ্যা করতে পারব। সুতরাং বার্তিককারের এই আদিতে 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ অতীব বুদ্ধিমত্তার সূচনা করে দিচ্ছে। এক প্রয়োগে দুইকার্য সিদ্ধি মঙ্গলাচরণ করা

এবং শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যত্ব বুঝান। 'নিত্য' শব্দের আদিতে প্রয়োগ করে, ব্যাখ্যা করে নিত্য অর্থের বাচকত্ব বলে প্রতিপাদিত করলেও মঙ্গলাচরণ কার্য নিষ্পন্ন হোত না। তার জন্য অন্য কোন 'অথ' শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হলেও গৌরব দোষ হয়ে যেত। 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ. আর 'নিত্য শব্দের দ্বারা নিত্য অর্থ বুঝানো, এতে গৌরব দোষ হোত। আদিতে 'সিদ্ধ এই শব্দের প্রয়োগে একটি শব্দের দ্বারা উভয় কার্য সিদ্ধ হওয়ায় লাঘব রক্ষিত হয়েছে। এইজন্য বার্তিককার আদিতে 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন, 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই ॥ ৪১ ॥

মূল

অথ কং পুনং পদার্থং মত্বৈষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে—"সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ" ইতি? আকৃতিমিত্যাহ। কুত এতৎ? আকৃতির্হি নিত্যা দ্রব্যমনিত্যম্। অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্তব্যঃ? সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চেতি। নিত্যো হ্যর্থবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ ॥৪২॥

অনুবাদ ঃ—[আচ্ছা] কাকে [কোন বস্তুকে] পদের অর্থ মনে করে 'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এইরূপ বিগ্রহ [সমাস বাক্য] করছ? আকৃতিকে [পদের অর্থ মনে করে] ইহা বলেন। কিহেতু ইহা [আকৃতি পদের অর্থ]? আকৃতি নিত্য, দ্রব্য [ব্যক্তি] অনিত্য। দ্রব্য [ব্যক্তি], পদের অর্থ হলে কিপ্রকার বিগ্রহ করবে? 'সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চ' এইরূপ [বিগ্রহ করব]। অর্থের সহিত অর্থবানের [শব্দের] সম্বন্ধ নিত্য ॥৪২॥

বিবৃতি ঃ—'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকবাক্যস্থিত 'সিদ্ধ' শব্দটি 'নিত্য' অর্থের বাচক ইহা মহাভাষ্যকার বহু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করে এলেন। তার পূর্বে মহাভাষ্যকার 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বাক্যের বিগ্রহ বাক্য প্রদর্শন করেছেন সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ ইতি। অবশ্য 'সিদ্ধে' এই শব্দটি সমাসের অন্তর্গত নয় বলে বিগ্রহ বাক্যে 'সিদ্ধে' এই শব্দের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নিষ্প্রয়োজন নয়। কারণ মহাভাষ্যকার "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিক বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থের সম্বন্ধ কিরূপ হবে তাকে লক্ষ্য করেই ঐরূপ বিগ্রহ বাক্য প্রদর্শন করেছেন দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বে বা পরে যে পদ থাকে, সেই পদটি দ্বন্দ্বসমাসের অন্তর্গত

প্রত্যেক পদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় এইরূপ নিয়ম আছে (২০৮)। "শব্দার্থসম্বন্ধে" এইপদটি সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসযুক্ত পদ। তার পূর্বে 'সিদ্ধে' এই পদটি আছে। উক্ত নিয়ম অনুসারে 'সিদ্ধে' এই পদটি 'শব্দ অর্থ ও সম্বন্ধ' এই তিনের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে। 'শব্দ' নিত্য এবং কার্য এই উভয় প্রকার আছে ইহা মহাভাষ্যকার ৩৯ সংখ্যক গ্রন্থে দেখিয়েছেন। অবশ্য সেখানে কার্যাত্মক শব্দকে প্রবাহরূপে নিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন কৈয়ট। আর অর্থ [পদের অর্থ] জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ই পাণিনির সম্মত ইহা ৩৮ সংখ্যক গ্রন্থে দেখানো হয়েছে। এখন বার্তিককারের 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকে সিদ্ধ শব্দটির অর্থ যখন নিত্য বলেই গৃহীত হয়েছে, তখন "সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এইরূপ বিগ্রহে সিদ্ধ শব্দ যদি 'শব্দ অর্থও সম্বন্ধ' এই তিনের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহলে শব্দ ও নিত্য, অর্থ ও নিত্য, এবং সম্বন্ধ [শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ] ও নিত্য ইহাই পাওয়া যায়। অর্থ নিত্য বললে সেই অর্থ অর্থাৎ পদের অর্থটি কি যাকে নিত্য বলা হচ্ছে, সেই অর্থটি কি জাতি অথবা ব্যক্তি এইরূপ সন্দেহ করে প্রশ্ন করছেন "অথ কংপুনঃপদার্থং মত্বা······ সম্বন্ধে চেতি"। আপনি [মহাভাষ্যকার] কোন্ বস্তুকে পদের অর্থ মনে করে বার্তিক বাক্যের 'সিদ্ধে শব্দে, অর্থে সম্বন্ধে চ' এইরূপ বিগ্রহ করেছেন?

এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন 'আকৃতিমিত্যাহ।' 'আকৃতিম্' এইপদের পর "পদার্থং মত্বা এষ" বিগ্রহঃ ক্রিয়তে সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ ইতি।" এই পূর্ববাক্যাংশটির অনুষঙ্গ করে অর্থ বুঝতে হবে। তাহলে সমগ্র বাক্যটি এইরূপ হবে "আকৃতিং পদার্থং মত্বা সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি বিগ্রহঃ ক্রিয়তে ইতি আহ।" তার অর্থ হবে "আকৃতিকে পদার্থ মনে করে সিদ্ধে, শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এইরূপ বিগ্রহ করা হয়েছে' ইহা বলেন।" কে বলেন' তার কোন কর্তার নির্দেশ নাই। সুতারাং বলা ক্রিয়ার কর্তা কে? এইরূপ প্রশ্ন হলে তার উত্তরে বলবো মহাভাষ্যকারই বলা ক্রিয়ার কর্তা। মহাভাষ্যকার "ব্রূমঃ" "বদামঃ" এইভাবে প্রত্যক্ষ [স্পষ্টভাবে] উত্তমপুরুষের প্রয়োগ না করে নিজেকে প্রায়শঃ প্রথম পুরুষরূপে উল্লেখ করেন। ইহা অনেকস্থলে দেখা যাচ্ছে। তিনি নিজের অহঙ্কার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে, সর্বত্র অতিবিনীত ভাবেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করেন। 'আকৃতিমিত্যাহ'

(২০৮) 'দ্বন্দ্বাৎ পূর্বং পরং বা উচ্চার্যমাণং পদং প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে।

এই বাক্যে 'আকৃতিম্' পদের পর ঐরূপ পূর্ববাক্যাংশের অনুষঙ্গ না করলে এখানে অর্থের সামঞ্জস্য হবে না। 'ইতি' নিপাতের যোগে 'আকৃতিম্' এইরূপ দ্বিতীয়া না হয়ে প্রথমা হয়ে যাবে। এখানে 'আকৃতি' শব্দের অর্থ পূর্বের মত 'জাতি' বলেই বুঝতে হবে। পরবর্তী ভাষ্য গ্রন্থের দ্বারাও ইহা বুঝা যাবে। আকৃতি অর্থাৎ জাতিকে পদার্থ মনে করে ঐরূপ [পূর্বোক্ত প্রকারে] বিগ্রহ করা হয়েছে, ব্যক্তিকে পদার্থ মনে করে বিগ্রহ করা হয় নাই কেন? এইরূপ আশঙ্কা করে পূর্বপক্ষী বলছেন 'কুত এতৎ'? কি হেতু ইহা অর্থাৎ আকৃতিকে পদার্থ মনে করে উক্ত বিগ্রহ করা হয়েছে, ব্যক্তিকে পদার্থ মনে করে বিগ্রহ করা হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলছেন 'আকৃতির্হি নিত্যা দ্রব্যমনিত্যম্।' যেহেতু জাতি নিত্য, দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তি অনিত্য। ব্যক্তিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করলে "সিদ্ধে অর্থে" এইরূপ অন্বয় অসঙ্গত হয়ে যাবে। অথচ 'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধেচ' এইরূপ বিগ্রহে নিত্য শব্দ, নিত্য অর্থ, নিত্য সম্বন্ধ এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। ব্যক্তি অনিত্য, জাতিনিত্য এইজন্য জাতিকে পদের অর্থরূপে গ্রহণ করে উক্ত বিগ্রহ করা হয়েছে।

অনন্তর ভাষ্যকার ব্যক্তিকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেও 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' এই বার্তিক গ্রন্থের সমন্বয় করা যাবে এই অভিপ্রায়ে পূর্বপক্ষ উঠিয়েছেন "অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্তব্যঃ?" দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করলে 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এখানে কিরূপে বিগ্রহ করা যাবে? এর উত্তরে বলেছেন "সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চ ইতি" সিদ্ধ শব্দ, সিদ্ধ অর্থসম্বন্ধ। এইরূপ বিগ্রহে সিদ্ধে শব্দটির 'শব্দ' এই শব্দের সঙ্গে এবং 'অর্থসম্বন্ধ' এই শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে। তার মানে "শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিকের পদটিকে এইভাবে ব্যুৎপাদন করতে হবে 'অর্থানাং সম্বন্ধঃ' 'অর্থসম্বন্ধঃ' এইভাবে প্রথমে অর্থশব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ শব্দের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করতে হবে। তৎপুরুষ সমাসে সাধারণতঃ উত্তর পদের অর্থ প্রধান হয়। এই জন্য 'অর্থসম্বন্ধঃ' এই শব্দটির ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করলে 'সম্বন্ধ' শব্দটির অর্থ প্রধান হবে, অর্থ অপ্রধান হয়ে যাবে। তার পর 'শব্দশ্চ অর্থসম্বন্ধশ্চ অনয়োঃ সমাহারঃ" এইরূপ বিগ্রহে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করতে হবে। সমাহার দ্বন্দ্ব হলে সমাহারে একবচন ও নপুংসকলিঙ্গ হওয়ায় 'শব্দার্থসম্বন্ধম্' এইরূপ প্রথমাবিভক্তিতে

রূপ হবে। সেই 'শব্দার্থসম্বন্ধ' রূপ সমাহার দ্বন্দ্বসমাসযুক্ত শব্দের সপ্তমীতে "শব্দার্থসম্বন্ধে" এইরূপ সিদ্ধ হয়েছে। এইরূপ সিদ্ধ হওয়ায় "সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে" এই বার্তিক বাক্যের অন্তর্গত অসমস্ত 'সিদ্ধে' এই পদটির অর্থ [নিত্য] 'শব্দার্থসম্বন্ধে' এই সমাসান্ত শব্দের অন্তর্গত 'শব্দ' এই শব্দের অর্থে এবং 'অর্থসম্বন্ধ' এই শব্দের অর্থে অন্বিত হবে, 'অর্থসম্বন্ধে'র অন্তর্গত 'অর্থ' এই শব্দের অর্থে অন্বিত হবে না। কারণ "পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি নতু পদার্থৈকদেশেন" পদের [একটি পদের] অর্থ, অপর পদার্থের [অপর পদের প্রধান অর্থের] সহিত অন্বিত হয়, পদার্থের [অপর পদার্থের] একাংশের সহিত অন্বিত হয় না। এইরূপ নিয়ম আছে। শব্দশ্চ অর্থসম্বন্ধশ্চ এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস [সমাহার দ্বন্দ্ব] করাতে দ্বন্দ্বসমাসে সকল পদের অর্থ প্রধান বলে "সিদ্ধে" এই পদের অর্থটি 'শব্দ' পদের অর্থের সঙ্গে এবং 'অর্থসম্বন্ধ' পদের অর্থের সঙ্গে অন্বিত হবে। "অর্থসম্বন্ধ" শব্দটি ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস নিষ্পন্ন হওয়ায় 'অর্থ' এইশব্দটি 'অর্থসম্বন্ধ' শব্দের একদেশ [একাংশ] হয়ে গেছে বলে 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ সেই 'অর্থসম্বন্ধ' শব্দের একাংশ 'অর্থ' শব্দের অর্থের সহিত অন্বিত হবে না। সুতরাং "সিদ্ধঃ শব্দঃ" অর্থাৎ নিত্য শব্দ, "সিদ্ধঃ অর্থসম্বন্ধঃ" অর্থাৎ নিত্য অর্থসম্বন্ধ [পদের অর্থের সম্বন্ধ] এইরূপ অর্থে শব্দের নিত্যত্ব এবং অর্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় অর্থ বা পদের অর্থকে ব্যক্তি বলে গ্রহণ করলে ব্যক্তি অনিত্য হলেও কোন দোষ হয় না। কারণ 'সিদ্ধ' এই শব্দের অর্থটি তো "অর্থসম্বন্ধের" অন্তর্গত ব্যক্তিরূপ অর্থে অন্বিত হচ্ছে না। এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকার বললেন ব্যক্তিকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলে 'সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চ' এইরূপ বিগ্রহ করা হবে।

কিন্তু এইরূপ বললেও এর উপর প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক এই যে—অর্থ পদের অর্থ ব্যক্তি হলে, সেই ব্যক্তি অনিত্য বলে অর্থও অনিত্য হল। অর্থ যদি অনিত্য হয় তাহলে অর্থের সম্বন্ধ কি করে নিত্য হবে? অর্থ অনিত্য হলে সেই অর্থের বিনাশ হওয়ায়, তার সম্বন্ধও অনিত্য হয়ে যাবে। অথচ মহাভাষ্যকার 'সিদ্ধে অর্থসম্বন্ধে' এইরূপ বিগ্রহ প্রদর্শন করে, অর্থসম্বন্ধকে নিত্য বলে সূচিত করেছেন। ইহা তো অনুপপন্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট মহাভাষ্য-প্রদীপে বলেছেন অর্থ অনিত্য হলেও অর্থের সঙ্গে শব্দের যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ হচ্ছে যোগ্যতা। সেই যোগ্যতার আশ্রয় হচ্ছে শব্দ। শব্দ নিত্য

বলে তাতে আশ্রিত যোগ্যতারূপ সম্বন্ধও নিত্য হতে পারে(২০৯)। এই যোগ্যতা হচ্ছে অর্থজ্ঞানজনকত্বযোগ্যতা। শব্দ, অর্থজ্ঞানের জনক হয়, শব্দের অর্থজ্ঞান জনকতার যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতা হচ্ছে তাদাত্ম্য। পদের অর্থ নষ্ট হলে বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হলেও শব্দ, সেই নষ্ট বা ভাবী অর্থের জ্ঞান জন্মিয়ে দেয় বলে নষ্ট বা ভাবী পদার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। সেইবুদ্ধিতে উপস্থিত অর্থের সঙ্গে শব্দের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নিত্য হতে পারে। যেহেতু শব্দে স্থিত সম্বন্ধটি অর্থেস্থিত সম্বন্ধ থেকে অভিন্ন বলে শব্দের নিত্যতা নিবন্ধন তাদাত্ম্য সম্বন্ধটিও নিত্য হয়। আকাশ যেমন নিত্য সেইরূপ আকাশবৃত্তি শব্দও নিত্য (২১০)। এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকারও বলেছেন "নিত্যো হ্যর্থবতা-মর্থৈরভিসম্বন্ধঃ"। অর্থ আছে যাদের সেই শব্দসমূহের; অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য ॥ ৪২ ॥

মূল

অথবা দ্রব্য এব পদার্থ এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ—সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি। দ্রব্যং হি নিত্যমাকৃতিরনিত্যা। কথং জ্ঞায়তে? এবং হি দৃশ্যতে লোকে মৃৎ কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তা পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য ঘটিকাঃ ক্রিয়ন্তে, ঘটিকাকৃতিমুপমৃদ্য কুণ্ডিকাঃ ক্রিয়ন্তে। তথা সুবর্ণং কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তং পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য রুচকাঃ ক্রিয়ন্তে, রুচকাকৃতি-মুপমৃদ্য কটকাঃ ক্রিয়ন্তে। কটকাকৃতিমুপমৃদ্য স্বস্তিকাঃ ক্রিয়ন্তে! পুনরাবৃত্তঃ সুবর্ণপিণ্ডঃ পুনরপরয়াকৃত্যা যুক্তঃ খাদিরাঙ্গারসবর্ণে কুণ্ডলে ভবতঃ। আকৃতিরন্যা চান্যা চ ভবতি, দ্রব্যং পুনস্তদেব। আকৃত্যুপমর্দেন দ্রব্যমেবাবশিষ্যতে ॥৪৩॥

অনুবাদ :—অথবা দ্রব্য [উপাদান দ্রব্য ও ব্যক্তি] পদার্থ হলেই 'সিদ্ধে

---

(২০৯) অনিত্যেঽর্থে কথং সম্বন্ধস্য নিত্যতেতি চেন্, যোগ্যতালক্ষণত্বাৎ সম্বন্ধস্য, তস্যাশ্চ শব্দাশ্রয়ত্বাচ্ছব্দস্য চ নিত্যত্বাদদোষঃ।

(২১০) নন্বু তাদাত্ম্যস্য সম্বন্ধত্বে কথং তস্য নিত্যত্বমিতি চেন্ন। নষ্টভাবিবস্তুনোঽপি বোধাদ্বৌদ্ধার্থেন তস্য তাদাত্ম্যং নিত্যমিত্যাশয়াৎ। শব্দবৃত্তিধর্মস্যেবার্থ বৃত্তিধর্মাভেদমাপন্নস্য তাদাত্ম্যত্বেনাদোষত্বাচ্চ। 'শব্দস্য চ নিত্যত্বাদি'তি। আকাশবত্তন্নিষ্ঠশব্দোঽপি নিত্যঃ। ব্যঞ্জকাভাবাত্তু ন সর্বদোপলম্ভ ইতি। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত]

শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এই [এইরূপ] বিগ্রহ যুক্তিযুক্ত। যেহেতু দ্রব্য নিত্য, আকৃতি [অবয়বসন্নিবেশ] অনিত্য। কিরূপে জানলে? [দ্রব্য নিত্য, আকৃতি অনিত্য—ইহা কিরূপে জানলে]। লোকে এইরূপ দেখা যায়—মৃত্তিকা কোন এক আকার বিশেষ বিশিষ্ট হলে পিণ্ড হয়; পিণ্ডাকারকে নষ্ট করে ছোট ঘট করা হয়। ছোট ঘটের আকারকে নষ্ট করে হাঁড়ি উৎপাদন করা হয়। সেইরূপ সুবর্ণ কোন এক আকারের দ্বারা যুক্ত হলে পিণ্ড হয়; পিণ্ডাকারকে নষ্ট করে রুচক [অলঙ্কারবিশেষ] করা হয়, রুচকাকারকে নষ্ট করে কটক [সুবর্ণালঙ্কারবিশেষ] করা হয়, কটকাকারকে নষ্ট করে স্বস্তিক [সোনার আর এক প্রকার অলঙ্কার] করা হয়।

[সেই রুচকাকারাদি থেকে] পুনরায় সুবর্ণ, পিণ্ডাকারে আবর্তিত [হয়]। পুনরায় অপর আকারের দ্বারা যুক্ত হয়ে [সুবর্ণপিণ্ড] খদির কাষ্ঠের অগ্নির বর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট কুণ্ডল যুগল হয়]। আকৃতি [অবয়বসন্নিবেশরূপ আকার] ভিন্ন ভিন্ন হয়; কিন্তু দ্রব্য তাহাই [থাকে]। আকারের বিনাশে দ্রব্যই অবশিষ্ট থাকে ॥ ১৩ ॥

বিবৃতি:—মহাভাষ্যকার, কোন শ্রুতি বাক্য বা সূত্র বা বার্তিক প্রভৃতির ব্যাখ্যায় নানাপ্রকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। নানা পক্ষ অবলম্বন করে ব্যাখ্যার কৌশল প্রদর্শন পূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা, মহাভাষ্যকারের এক অদ্ভুত প্রতিভার কার্য। পূর্বে 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় আকৃতি অর্থাৎ জাতিকে পদের অর্থ স্বীকার করে বিগ্রহ বাক্য প্রদর্শন করেছেন। আকৃতি বা জাতির নিত্যতা নিবন্ধন তাতে 'সিদ্ধ' এই বিশেষণের অন্বয় দেখিয়েছেন। এখন দ্রব্যকে পদের অর্থ স্বীকার করে তাতে [দ্রব্যে] 'সিদ্ধ' এই বিশেষণের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের জন্য বলছেন—'অথবা দ্রব্যে এব পদার্থে" ইত্যাদি। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে—মহাভাষ্যকার পূর্বে দ্রব্যকে অনিত্য বলেছিলেন আর আকৃতিকে নিত্য বলেছিলেন,—আর এখন ঠিক তার বিপরীত বলছেন—দ্রব্য নিত্য আর আকৃতি অনিত্য। এতে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কথন রূপ দোষ ভাষ্যকারের উপর আপতিত হয়। কিন্তু বস্তুত তা নয়। তিনি এই ভাবে বিরুদ্ধার্থবাদী নন। তাঁর বাক্যের অর্থ গম্ভীর। পূর্বে তিনি আকৃতি শব্দে জাতি এবং দ্রব্য শব্দে ব্যক্তিকে বুঝিয়েছিলেন। জাতি নিত্য, গবাদি ব্যক্তি অনিত্য—ইহা শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণ ও অদ্বয় ব্রহ্মবাদী বেদান্তি ভিন্ন—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

আর এখন আকৃতি শব্দে আকার, বা সংস্থান [অবয়বসন্নিবেশ] এবং দ্রব্য শব্দে কার্যের উপাদান দ্রব্যকে বুঝিয়েছেন। মহাভাষ্যকারের এখানকার বাক্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে ইহা বুঝা যায়—ঘটাদি কার্যের উপাদান মৃত্তিকাদি দ্রব্য নিত্য, আর মৃৎপিণ্ড, কপালাদি আকার [অবয়বসন্নিবেশ] অনিত্য। মৃত্তিকা পিণ্ডের আকারে কখন অবস্থান করে, আবার পিণ্ডাকার নষ্ট হয়ে কখনও কপালাকারে, কখনও ঘটাকারে অবস্থান করে; সুতরাং পিণ্ড, কপাল, ঘটাদি আকার [অবয়ববিন্যাস] অনিত্য। মৃত্তিকারূপ দ্রব্য নিত্য। পিণ্ড, চূর্ণ, কপাল, ঘট প্রভৃতি আকৃতি [অবয়বসন্নিবেশ বা সংস্থান] গুলি পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হলেও সর্বত্র মৃত্তিকা কিন্তু অনুগতভাবে থাকে। সুতরাং মৃত্তিকারূপ দ্রব্য নিত্য; পিণ্ডাদি আকৃতি অনিত্য। এইরূপ সুবর্ণ দ্রব্য নিত্য —কটক কুণ্ডল প্রভৃতি আকৃতি অনিত্য। তবে মৃত্তিকারূপ দ্রব্য বা সুবর্ণরূপ দ্রব্যও বাস্তবিক নিত্য নয়। কোন সময় প্রলয়াদিকালে মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যেরও বিনাশ হয়। তাহলে মহাভাষ্যকার কি করে এই মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যকে নিত্য বললেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দুই প্রকারে করা যায়। প্রথমত নিত্য মানে আপেক্ষিক নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ী। পিণ্ড, কপালাদি আকারের অপেক্ষা মৃত্তিকা অনেক অধিক কালস্থায়ী। এই হেতু মৃত্তিকারূপ দ্রব্য নিত্য, আর পিণ্ড কপালাদি আকৃতি অনিত্য—অল্পকালস্থায়ী। দ্বিতীয় উত্তর এই—পিণ্ড, কপাল প্রভৃতি বিকার পদার্থকে বিচার করলে দেখা যায় উহারা অর্থাৎ এই বিকার, মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছু নয়—উহারা কেবল নাম মাত্র। উহাদের স্বরূপ মৃত্তিকাই। এইভাবে মৃত্তিকাকে গ্রহণ করে বিচার করলে দেখা যাবে, ঐ মৃত্তিকাও তার কারণ দ্রব্য ভিন্ন কিছু নয়। সুতরাং মৃত্তিকা, জল, তেজঃ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ শেষ পর্যন্ত তাদের মূল কারণ শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। বৈয়াকরণদের মতে ঐ শব্দ ব্রহ্মই বিবর্তিত হয়ে সমস্ত গবাদি শব্দ ও পৃথিব্যাদি অর্থ রূপে জগতে প্রতিভাত হয়। অতএব সেই শব্দব্রহ্মই সত্য বা নিত্য, অন্যসমস্তই অনিত্য। এই শব্দব্রহ্মকেই মহাভাষ্যকার এখানে 'দ্রব্য' শব্দের দ্বারা গূঢ়ভাবে বুঝাতে চেয়েছেন। আর সেই শব্দব্রহ্মের সমস্ত কার্যকে 'আকৃতি' শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন। সুতরাং 'আকৃতি অনিত্য, দ্রব্য নিত্য', মহাভাষ্যকারের এই উক্তি উপপন্ন হয়। সমস্ত শব্দের অর্থ ব্রহ্মতত্ত্ব বলে অর্থ নিত্য হতে পারে। ঘট শব্দের অর্থ ঘটোপাধ্যবচ্ছিন্ন

ব্রহ্ম। মৃত্তিকাশব্দের অর্থ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এইভাবে অসত্য উপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বই দ্রব্যপদের দ্বারা বোধ্য হওয়ায় "দ্রব্য নিত্য" এবং কারণীভূত ব্রহ্মবস্তুতে আরোপিত আকৃতি বা আকার অসত্য বলে অনিত্য, এইরূপ মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করা যায় ॥ ৪৩ ॥ (২১১)।

মূল

আকৃতাবপি পদার্থ এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ—সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি। ননু চোক্তমাকৃতিরনিত্যেতি। নৈতদস্তি। নিত্যাকৃতিঃ। কথম্? ন ক্বচিদুপরতেতি কৃত্বা সর্বত্রোপরতা ভবতি, দ্রব্যান্তরস্থা তূপলভ্যতে। অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্—ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যত্তন্নিত্য-মিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে। কিং পুনস্তত্ত্বম্? তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে ॥৪৪॥

অনুবাদ—আকৃতি [সংস্থান], পদের অর্থ হলেও "সিদ্ধে শব্দে, অর্থে, সম্বন্ধে চ" এই বিগ্রহ ন্যায্য [যুক্তিযুক্ত]। আকৃতি অনিত্য, ইহা [আপনি] বলেছেন। ইহা হয় না [না, উহা ঠিক নয়]। আকৃতি নিত্য। কিরূপ [আকৃতি কিরূপে নিত্য]? কোন স্থলে উপরত [জ্ঞানের অবিষয়] হলো বলে সর্বত্র উপরত হয় না! অন্য দ্রব্যে—[আশ্রয় দ্রব্যান্তরে] স্থিত রূপে কিন্তু উপলব্ধ হয়। অথবা 'যাহা ধ্রুব, কূটস্থ, বিচলনশূন্য, বিনাশ, পরিণাম ও বিকার রহিত, উৎপত্তিরহিত, বৃদ্ধিরহিত ও অব্যয়যোগী তাহা নিত্য' ইহাই নিত্যের লক্ষণ নয়। [কিন্তু] যাহাতে [যাহা বিনষ্ট হলেও] তত্ত্বের বিঘাত [বিনাশ] হয় না—তাহাও নিত্য। তত্ত্ব কি? তাহার [বস্তুর] ভাব তত্ত্ব। আকৃতিতেও [আকৃতি নষ্ট হলেও] তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না ॥ ৪৪ ॥

বিবৃতি—মহাভাষ্যকার "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিক গ্রন্থের বিগ্রহ দেখিয়েছিলেন—"সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ"। এইরূপ বিগ্রহে পদের অর্থও

---

(২১১) এইভাবে সেই সেই অসত্য উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বকে 'দ্রব্য' শব্দের অর্থ বলে স্বীকার করলে—দ্রব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সেই ব্রহ্মতত্ত্বে কল্পিত সংস্থানরূপ আকৃতি যেমন অনিত্য হয়, সেইরূপ জাতিও আকৃতিশব্দের বাচ্য বলে—সেই জাতিও অনিত্য হয়। সুতরাং এই পক্ষে এখানে আকৃতি শব্দের দ্বারা সংস্থান এবং জাতি—উভয়কে গ্রহণ করলে কোন অনুপপত্তি হয় না।

নিত্য বলে প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করেছিলেন পদের অর্থ কি? তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছিলেন—'আকৃতি' পদের অর্থ। সেখানে 'আকৃতি' শব্দের দ্বারা জাতিকেই তিনি অভিপ্রেত করেছিলেন। কারণ অদ্বৈতবাদী ভিন্ন সকল আস্তিক দর্শনানুসারীরা জাতিকে নিত্য বলেন। সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশকে কেহ নিত্য বলেন না। সুতরাং মহাভাষ্যকারের প্রথম উক্তিতে আকৃতি শব্দটি জাতির বাচক। তারপর দ্বিতীয় উক্তিতে মহাভাষ্যকার 'দ্রব্যকে' পদের অর্থ বলে দ্রব্যের নিত্যতা এবং আকৃতির অনিত্যতা দেখিয়েছিলেন। সেই দ্বিতীয় উক্তিতে মহাভাষ্যকার পিণ্ড, ঘটিকা প্রভৃতিকে আকৃতি বলেছিলেন। তাতে আকৃতি শব্দে তিনি অবয়বসন্নিবেশকে বুঝিয়েছিলেন। যেহেতু অবয়ব সন্নিবেশ অনিত্য। কিন্তু সেই দ্বিতীয় উক্তিতে তিনি 'জাতিকে' আকৃতি শব্দে লক্ষ্য করেন নাই। কারণ জাতিরূপ আকৃতির নিত্যতা তিনি প্রথমে বলে এসে আবার তার অনিত্যতা বললে—তাঁর উক্তিতে পরস্পর বিরোধের প্রসক্তি হয়ে যেত। মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'দ্রব্যকে' পদের অর্থ বলে, তার [দ্রব্যের] নিত্যতা বলেছেন। সেখানে দ্রব্য বলতে তাঁর দৃষ্টান্ত দ্বারা মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারণ দ্রব্যকে বুঝা গেছে। মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ দ্রব্য বস্তুত নিত্য না হলেও মৃত্তিকাদির বিকার পিণ্ড, চূর্ণ, কপালাদির তুলনায় মৃত্তিকাদি দ্রব্য দীর্ঘকাল স্থায়ী বলে আপেক্ষিক নিত্য।

এখন তৃতীয় পর্যায়ে মহাভাষ্যকার বলছেন—আকৃতিকেও পদের অর্থ বলে স্বীকার করলেও "সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ" এইরূপ বিগ্রহ করা যাবে, তার মানে আকৃতি নিত্য ইহাই স্বীকার করতে হচ্ছে। এখানে অর্থাৎ এই তৃতীয় পর্যায়ে মহাভাষ্যের উচ্চারিত 'অকৃতি' শব্দের অর্থ 'জাতি' ইহা বলা যায় না। কারণ এই জাতিরূপ আকৃতি যে নিত্য তাহা মহাভাষ্যকার প্রথম পর্যায়ে বলে, এসেছেন। তার অনিত্যতার আশঙ্কাই উঠে নাই; যার জন্য এই তৃতীয় পর্যায়ে সেই জাতির অনিত্যতার খণ্ডন করে নিত্যতা বলতে পারেন। সুতরাং এই তৃতীয় পর্যায়ে মহাভাষ্যকারের "আকৃতাবপি পদার্থে" এইস্থলে "আকৃতি' শব্দের অর্থ—সংস্থান [অবয়বসন্নিবেশ] বলেই গ্রহণ করতে হবে। এই সংস্থানরূপ আকৃতিকে এখন নিত্য বলায় পূর্বপক্ষী আক্ষেপ করছেন—"ননু চোক্তমাকৃতিরনিত্যেতি।" 'আকৃতি অনিত্য' এই কথা মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছিলেন। সেই দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত 'আকৃতি' শব্দের অর্থ যে

সংস্থান [জাতি নয়] তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কথিত 'আকৃতি' শব্দের সংস্থান অর্থ গ্রহণ করলে, এই তৃতীয় পর্যায়োক্ত 'ননুচোক্ত মাকৃতিরনিত্যেতি' এই পূর্বপক্ষীর কথাও সঙ্গত হয়। নতুবা দ্বিতীয়পর্যায়ে কথিত আকৃতি শব্দের 'জাতি' অর্থগ্রহণ করলে মহাভাষ্যকারের কথার বিরোধ হয় [ইহা পূর্বেই দেখান হয়েছে] বলে, তৃতীয় পর্যায়ে সেই মহাভাষ্যকারের উক্তির উপর পূর্বপক্ষীর আক্ষেপও অযুক্ত হয়ে যায়। পূর্বপক্ষীর এই আক্ষেপের উত্তরে মহাভাষ্যকার বললেন—"নৈতদস্তি, নিত্যাকৃতিঃ" 'না, ইহা নয় অর্থাৎ আকৃতি অনিত্য নয়, কিন্তু আকৃতি নিত্য।' মহাভাষ্যকারের এই উত্তরবাক্য থেকেও বুঝা যায় যে, তিনি এখানে সংস্থানরূপ আকৃতির অনিত্যতার নিষেধ করে নিত্যতার কথা বলছেন। তিনি যদি এখানে জাতিরূপ আকৃতির অনিত্যতার নিষেধ করে নিত্যতার কথা বলতেন তাহলে তিনি—"নৈতদস্তি, আকৃতির্নিত্যাইত্যুক্তম্" অর্থাৎ—'না আকৃতি অনিত্য নয়, কিন্তু নিত্য ইহা [আমি] পূর্বে বলেছি' এইরূপই বলতেন। কারণ তিনি প্রথম পর্যায়ে আকৃতিকে নিত্য বলে এসেছেন। কিন্তু ভাষ্যকার সেভাবে বললেন না। তিনি "নিত্যাকৃতিঃ" 'আকৃতি নিত্য' এইভাবে বললেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে তিনি [মহাভাষ্যকার] দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্থানরূপ আকৃতিকেই অনিত্য বলেছিলেন। এখন আবার তৃতীয় পর্যায়ে সেই সংস্থানরূপ আকৃতিকে নিত্য বলছেন। এতে কেহ প্রশ্ন করতে পারেন এইভাবে মহাভাষ্যকারের উক্তিতে তো পূর্বাপরবিরোধের প্রসক্তি হলো। তার উত্তরে বলব—এই বিরোধের সমাধান তো মহাভাষ্যকার স্বয়ং 'কথম্' 'ন ক্বচিদুপরতা' ইত্যাদি নীচের বাক্যের দ্বারাই করে দিয়েছেন। সেই নীচের পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। "কথম্"? মহাভাষ্যকার যখন বললেন "নৈতদস্তি নিত্যাকৃতিঃ" না এইরূপ নয় আকৃতি নিত্য। তখন পূর্বপক্ষী বলছেন 'কথম্' আকৃতি কিরূপে নিত্য? পূর্বপক্ষীরএই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—"ন ক্বচিদুপরতেতি কৃত্বা সর্বত্রোপরতা ভবতি, দ্রব্যান্তরস্থা তু উপলভ্যতে" কোনস্থলে [কোন দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তিতে] উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত হলো বলে সর্বত্র নিবৃত্ত হয় না। অন্য দ্রব্যে [ব্যক্তিতে] উপলব্ধ হয়। কোন গোব্যক্তির ধ্বংস হলে সেই ব্যক্তিতে গরুর সংস্থান [অবয়বসন্নিবেশ] উপরত অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হলেও অন্যদ্রব্য

অর্থাৎ অন্য গোব্যক্তিতে গোসংস্থানরূপ আকৃতি উপলব্ধ হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে একটি গোব্যক্তিতে যে অবয়বসন্নিবেশ [সংস্থান] থাকে, অপর গোব্যক্তিতে তো সেই অবয়বসন্নিবেশ থাকে না। গোব্যক্তিগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ গোব্যক্তিগত অবয়বসন্নিবেশও ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশকে এখানে 'আকৃতি' শব্দের অর্থ বলে গ্রহণ করলে তো মহাভাষ্যকারের এই কথার সামঞ্জস্য হয় না। মহাভাষ্যকার বলছেন—একটি দ্রব্য বা ব্যক্তিতে আকৃতি উপরত হলেও অন্যত্র—অন্য ব্যক্তিতে উপলব্ধ হয়। মহাভাষ্যকারের এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে এখানে একই আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে থাকে। একটি ব্যক্তি মরে গেলেও জগতে অন্য ব্যক্তিতে সেই আকৃতি থাকে; তাতে সেই আকৃতি উপলব্ধ হয়। সংস্থানকে আকৃতি বলে গ্রহণ করলে সংস্থান এক নয় বলে ভাষ্যের উক্ত বচন সঙ্গত হয় না। এর উত্তরে বলা যায় ব্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেমন "ইহা গরু" "ইহা গরু" এইরূপ অনুগত জ্ঞান হয়। সেখানে অনুগমক হচ্ছে জাতি। এই জাতি রূপ আকৃতি যেমন সকল ব্যক্তির অনুগমক, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন সংস্থানেরও অনুগমক এই জাতি। প্রত্যেক গরুকে দেখলে, তাদের অবয়ব সন্নিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেই অবয়বসন্নিবেশগুলির মধ্যে এমন একটা সাদৃশ্য আছে, যাতে আমরা মহিষ প্রভৃতির অবয়ব সন্নিবেশ থেকে সমস্ত গরুর অবয়ব সন্নিবেশকে ভিন্ন একজাতীয় অবয়ব সন্নিবেশ বলে বুঝতে পারি। সুতরাং সকল গোব্যক্তিতে অবয়বসন্নিবেশগুলি এক অনুগত জাতিবিশিষ্ট অবয়বসন্নিবেশ বলে, গো-ব্যক্তিগত অবয়বসন্নিবেশগুলিকে এক বলা যেতে পারে [গৌণভাবে এক বলা যায়]। সুতরাং একটি গোব্যক্তি মারা গেলে তাতে অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতি না দেখা গেলেও অপর গোব্যক্তিতে সেই অবয়বসন্নিবেশ দেখা যায়। এইভাবে মহাভাষ্যের উক্তি সঙ্গত হয়। মহাভাষ্যকারের এইরূপ উক্তি থেকে বুঝা গেল সংস্থানরূপ আকৃতি নানাদ্রব্যে অর্থাৎ ব্যক্তিতে থাকে বলে কোন ব্যক্তি নষ্ট হলেও অপর ব্যক্তিতে উপলব্ধ হয়। এর দ্বারা কিন্তু সংস্থানরূপ আকৃতি যে নিত্য তাহাতো বুঝা গেল না। সংস্থানগুলি একজাতীয় বলে, বস্তুত এক নয়, অতএব নিত্যও নয়। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে—এখানে মহাভাষ্য-কার পারমার্থিক নিত্যতার কথা বা ব্যাবহারিক নিত্যতার কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্যতার কথাই বলেছেন। অভিপ্রায় এই যে—পারমার্থিক

ভাবে নিত্য হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্যাকরণঅনুসারে শব্দব্রহ্ম। আর ব্যাবহারিকভাবে নিত্য হচ্ছে, আকাশ, কাল, দিক্, জাতি ইত্যাদি। এবং প্রবাহরূপে একপ্রকার নিত্যতা স্বীকার করা হয়। যেমন সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ তীরে এসে বিলীন হয়ে গেলেও অন্যান্য তরঙ্গ উঠছে, আবার সেই তরঙ্গ বিলীন হলেও অপর তরঙ্গ উঠছে—এইভাবে প্রবাহ বা, ধারারূপে তরঙ্গ নিত্য। প্রত্যেক তরঙ্গ বিনাশী হলেও ধারারূপে নিত্য। এইরূপ এই জগতে এক একটি গোব্যক্তি বিনষ্ট হলেও অপর অপর গোব্যক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেইগুলির বিনাশেও অন্য গোব্যক্তি থাকছে—এইভাবে দ্রব্য বা ব্যক্তিকেও যেমন প্রবাহরূপে নিত্য বলা যায় সেইরূপ সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশও প্রবাহ রূপে নিত্য। একটি গোসংস্থান নষ্ট হলেও অপর গোসংস্থান উৎপন্ন হচ্ছে, সেটি নষ্ট হলেও আর একটি হচ্ছে,—এইভাবে সংস্থানও প্রবাহরূপে নিত্য। "সংস্থানস্বাবচ্ছিন্নব্যক্তীনামন্যতময়া ব্যক্ত্যা বিনা অনাদিকালস্যাবর্তনম্, সংস্থানস্য প্রবাহনিত্যতা।" অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যত সংস্থান (থাকে) তাহাদের অন্যতম সংস্থান কোন কালে নাই এমনটা নয়। এমন কোন কাল পাওয়া যাবে না, যে কালে কোন না কোন সংস্থান থাকে না। এইরূপ প্রবাহ নিত্যতাই সংস্থানের নিত্যতা, মহাভাষ্যকারের অভিপ্রেত। তাঁর এই অভিপ্রায় পরবর্তী গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রকটিত করেছেন।

উহাই বলছেন—"অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্ ধ্রুবং কূটস্থম্...... তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে।"

ধ্রুবম্ = অন্য বস্তুর সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধশূন্য। কূটস্থম্ – আগন্তুক বস্তুর সহিত সম্বন্ধশূন্য (২১২)।

অবিচালি – অপরিণামী। অনপায়োপজনবিকারি = 'অপায়শ্চ উপজনশ্চ বিকারশ্চ' এইভাবে দ্বন্দ্বসমাস করে প্রথমে 'অপায়োপজনবিকারাঃ' পদ সিদ্ধ হয়। তারপর 'অপায়োপজনবিকারাঃ সন্তি অস্য" এইরূপ অর্থে মত্বর্থীয় 'ইনি' প্রত্যয় করে 'অপায়োপজনবিকারি' এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। তারপর 'ন অপায়োজনবিকারি' এইরূপ নঞ্ তৎপুরুষ সমাস করে 'অনপায়োপজন

(২১২) ধ্রুবম্ – স্বাভাবিকবস্ত্বন্তরসংসর্গরহিতম্। কূটস্থম্ আগন্তুকেন সংসর্গরহিতম্। অবিচালি অপরিণামি। অপায়োপজনবিকাররহিতমিত্যস্যৈব ব্যাখ্যানম্—অনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি ইতি। ষড়্‌ভাববিকাররা হ্যত্যঃ যাস্কেন ভাষ্যেণ উচ্যতে।—অন্নম্ভট্টঃ।

বিকারি' ইহা সিদ্ধ হয়। অথবা "অপায়শ্চ উপজনশ্চ অপায়োপজনৌ, অপায়োপজনৌ চ তৌ বিকারৌ চেতি অপায়োপজনবিকারৌ, তৌস্তঃ অস্য ইতি অপায়োপজনবিকারি, ন অপায়োপজনবিকারি অনপায়োপজনবিকারি" এই-ভাবে ও সিদ্ধ করা যায়। এখানে 'অপায়' শব্দের দ্বারা বিনাশ এবং অপক্ষয় এই দুইটি অর্থ গৃহীত হয়েছে বলে 'অনপায়' শব্দের দ্বারা বিনাশ ও অপক্ষয়—রূপ বিকারের অভাব নিত্যবস্তুতে আছে—ইহা বুঝা যাচ্ছে। 'উপজন' শব্দের দ্বারা জন্ম এবং অস্তিত্ব বুঝায় বলে 'অনুপজন' অর্থে জন্ম এবং জন্মের পর অস্তিত্বের নিষেধ নিত্য বস্তুতে করা হয়েছে ইহা বুঝা যায়। 'বিকার' শব্দের দ্বারা 'বৃদ্ধি' বুঝায় বলে 'অবিকারি' বলতে বৃদ্ধিশূন্য বুঝা যায়। 'অবিচালি' শব্দের দ্বারা পরিণামরূপ বিকাররাহিত্য বুঝা গেছে। তাহলে "অবিচাল্যনপায়োপজন-বিকারি" এই অংশের দ্বারা 'জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে, বর্ধতে, অপচীয়তে নশ্যতি, এই ছয়টি ভাববিকারের নিষেধ করায় নিত্যবস্তুতে ছয়টি ভাববিকার থাকে না—ইহা সিদ্ধ হয়। "অনপায়োপজনবিকারি" এই শব্দের দ্বারা যাহা বলা হয়েছে—'অনুৎপত্তি, অবৃদ্ধি, অব্যয়যোগি' এই তিনটি শব্দের দ্বারাও তাহাই বলা হয়েছে। অতএব 'অনপায়োপজনবিকারি' শব্দেরই ব্যাখ্যা হচ্ছে 'অনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি। 'অনুৎপত্তি' শব্দের দ্বারা জন্ম ও সত্তার নিষেধ করা হয়েছে। 'অবৃদ্ধি' শব্দের দ্বারা বৃদ্ধির নিষেধ করা হয়েছে। 'অব্যয়যোগি' শব্দের দ্বারা অপক্ষয় ও বিনাশের নিষেধ করা হয়েছে। 'অনুৎপত্তি =নাস্তি উৎপত্তির্যস্য' এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে—এই শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। অবৃদ্ধি ='নাস্তি বৃদ্ধি র্যস্য' এইরূপ বিগ্রহে 'অবৃদ্ধি' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অব্যয়যোগি ="ব্যয়স্য যোগঃ অস্য অস্তি, ব্যয়যোগি, ন ব্যয়যোগি অব্যয়যোগি" এইভাবে এই শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অথবা 'অব্যয়স্য যোগোঽস্য অস্তি' এইরূপ বিগ্রহে—উহা সিদ্ধ হয়েছে বলা যায়। ধ্রুবশব্দের অর্থ অবিনাশী অর্থাৎ সম্বন্ধীর বিনাশ হলেও যাহার বিনাশ হয় না। যেমন—'গবাদি ব্যক্তিরূপ সম্বন্ধীর বিনাশ হলেও গোত্বাদি জাতির বিনাশ হয় না।' 'কূটস্থ' শব্দটি ঐ ধ্রুব' শব্দের ব্যাখ্যা। তাহলে উক্ত মহাভাষ্যবাক্যের অর্থ এইরূপ হয়—যাহা সম্বন্ধিবিনাশেও অবিনাশী এবং জন্ম, অস্তিত্ব [জন্মের পর অস্তিত্ব] বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্ভাববিকারশূন্য তাহা নিত্য—ইহাই যে নিত্যের লক্ষণ তা নয় কিন্তু যাহাতে [যাহা বিনষ্ট হলেও] তত্ত্বের বিঘাত

হয় না—তাহাও নিত্য। মহাভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—ধ্রুব, কূটস্থ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্মবস্তু নিত্য। আর গোত্বাদি জাতি নিত্য। এইরূপ সংস্থানও নিত্য। ব্রহ্মবস্তু কূটস্থ, ধ্রুব ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষিত বলে তাহা পরমার্থত নিত্য। আর গোত্বাদি জাতির জন্ম প্রভৃতি ছয়টি বিকার নাই, এবং সংসর্গী গোব্যক্তির বিনাশেও অবিনাশী, ইহা বৈশেষিক—প্রভৃতি অনেক বাদী বলেন। এই জন্য গোত্বাদি জাতিও নিত্য। শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে শব্দব্রহ্ম পারমার্থিক নিত্য। গোত্বাদি ব্যাবহারিক নিত্য।

কিন্তু সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশ বিনষ্ট হলেও মহাভাষ্যকার বলছেন—উহাও নিত্য। কেন নিত্য? তার উত্তরে বলেছেন—"যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে" অর্থাৎ যাহা বিনষ্ট হলেও তার তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না, তাকেও নিত্য বলা যায়। এই নিত্যকে প্রবাহরূপে নিত্য বলা হয়। যেমন—গোব্যক্তি নষ্ট হলেও সেই গোব্যক্তির তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ গোত্ব—তাহা নষ্ট হয় না। একটি গোব্যক্তি নষ্ট হলেও অপর গোব্যক্তিতে গোত্ব থাকে। অপর গোব্যক্তিতে গোত্বের জ্ঞান হয়। এই হেতু গোব্যক্তিকেও নিত্য বলা যায়। প্রবাহরূপে গোব্যক্তি সকল নিত্য। এক একটি গোব্যক্তি নষ্ট হলেও অপর অপর গোব্যক্তি জগতে থাকে বলে গোব্যক্তি সকল প্রবাহরূপে নিত্য। এইরূপ সংস্থান বা অবয়ব সন্নিবেশগুলির মধ্যে এক একটির বিনাশ হলেও অন্যান্য গোব্যক্তিতে অন্যান্য অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতিও নিত্য। অবশ্য উহা প্রবাহরূপে নিত্য। মহাভাষ্যকার এইভাবে প্রবাহরূপে নিত্যকেও সিদ্ধ শব্দের অর্থ বলে গ্রহণ করে "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিকের যোজনা করেছেন। "তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে।" এই মহাভাষ্যে 'তত্ত্বম্' শব্দটির উল্লেখ আছে। উক্ত শব্দের অর্থ জানবার জন্য পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করছেন—"কিংপুনস্তত্ত্বম্" অর্থাৎ 'তত্ত্ব কি? তত্ত্বের স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"তস্য ভাবস্তত্ত্বম্" তাহার ভাব—অর্থাৎ ধর্মিরূপবস্তুর প্রকারীভূত ধর্মকে ভাব বলে। সেই প্রকারীভূত ধর্মই বস্তুর তত্ত্ব। যেমন 'ঘট' রূপ ধর্মীর প্রকারীভূত ধর্ম হচ্ছে 'ঘটত্ব।' এই ঘটত্বই ঘটের তত্ত্ব। বস্তুবৃত্তি ধর্মকেই এখানে তত্ত্ব বলা হয়েছে। এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে।" এর অর্থ হচ্ছে—"আকৃতৌ বিহতায়ামপি তত্ত্বং তদ্‌বৃত্তি ধর্মঃ

ন বিহন্যতে"। অর্থাৎ আকৃতি বিনষ্ট হলেও তত্ত্ব বা তদ্‌বৃত্তি ধর্ম নষ্ট হয় না। যেমন গরুর অবয়ব সন্নিবেশ নষ্ট হলেও সেই অবয়বসন্নিবেশবৃত্তি ধর্ম যে গোত্ব তাহা নষ্ট হয় না। এক একটি গোব্যক্তি নষ্ট হলে সেই সেই গোব্যক্তিস্থিত অবয়বসন্নিবেশ নষ্ট হলেও অপর অপর গোব্যক্তিস্থিত অবয়বসন্নিবিশের জ্ঞান হয় বলে সর্বত্র অবয়বসন্নিবেশে অনুগত গোত্বরূপ জাতি থাকে। সেই জাতির বিনাশ হয় না। যদি ও গোত্বরূপ ধর্ম বা জাতি সমবায় সম্বন্ধে গোব্যক্তিতে থাকে, গোর অবয়বসন্নিবেশে থাকে না। অতএব গোত্বরূপধর্মটি অবয়বসন্নিবেশ বৃত্তি নয়, তথাপি গোত্বরূপ ধর্ম, সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে গোর অবয়বসন্নিবেশে থাকে বলে গোত্বকে গোর অবয়বসন্নিবেশবৃত্তি ধর্ম বলা যায়। এইভাবে অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতি বিনষ্ট হলেও তার তত্ত্ব অর্থাৎ গোত্ব নষ্ট হয় না বলে তাকেও অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতিকেও নিত্য বলা যায়। সুতরাং তাহা যদি পদের অর্থ হয় তাহলেও উক্ত বার্তিক গ্রন্থের অর্থের অসামঞ্জস্য হয় না। ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ॥ ৪৪ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথবা কিং ন এতেন—ইদং নিত্যম্, ইদমনিত্যম্ ইতি। যন্নিত্যং তং পদার্থং মত্বৈষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে—সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

কথং পুনর্জ্ঞায়তে— সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি।

[বার্তিক]

লোকতঃ ॥ [দ্বিতীয় বার্তিক]

[মহাভাষ্য]

যল্লোকেঽর্থমর্থমুপাদায় শব্দান প্রযুঞ্জতে। নৈষাং নির্বৃত্তৌ যত্নং কুর্বন্তি। যে পুনঃ কার্যা ভাবাঃ নির্বৃত্তৌ তাবত্তেষাং যত্নঃ ক্রিয়তে। তদ্ যথা ঘটেন কার্যং করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ কুরু ঘটং, কার্যমনেন করিষ্যামীতি। ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযোক্ষ্যমাণো* বৈয়াকরণ-

* 'প্রযুযুক্ষমাণো' পাঠান্তর।

কুলং গত্বাহ কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ্য ইতি। তাবত্যেবার্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা 'ইহা নিত্য' ইহা অনিত্য' ইহার দ্বারা [এইরূপ বিচারের দ্বারা] আমাদের কি [প্রয়োজন]। যাহা নিত্য তাহাকে পদের অর্থ মনে করে [নিশ্চয় করে] "সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ" এই বিগ্রহ করা হয়। শব্দ সিদ্ধ [নিত্য] অর্থ সিদ্ধ এবং সম্বন্ধ সিদ্ধ—ইহা কিরূপে জানলে? 'লোক থেকে' [মানুষের কাছ থেকে]। যেহেতু লোকে [বিশ্বের মানব] ভিন্ন ভিন্ন অর্থকে গ্রহণ করে [উদ্দেশ্য করে, বুঝাবার অভিপ্রায়ে] শব্দ সকল প্রয়োগ [উচ্চারণ] করে। ইহাদের [শব্দ সকলের] নিষ্পাদনে [উৎপাদনে] যত্ন করে না। যে সকল পদার্থ কার্য [উৎপাদ্য] তাহাদের উৎপত্তিতে যত্ন করা হয়। যেমন—ঘটের দ্বারা কার্য [প্রয়োজন] সম্পাদন করবে এই হেতু [লোকে] কুম্ভকারের গৃহে গমন করে বলে—ঘট [নির্মাণ] কর, উহার দ্বারা [আমি] কার্য [প্রয়োজন] সম্পাদন করব। সেইরূপ শব্দ সকল প্রয়োগ করবে বলে [সেইহেতু], বৈয়াকরণের গৃহে গমন করে, শব্দ সকল কর [নির্মাণ কর] [আমি] তাহাদের [শব্দ সকলের] প্রয়োগ করব—এইরূপ বলে, না। সেই পরিমাণেই [বৈয়াকরণের গৃহে না গিয়েই] অর্থকে গ্রহণ করে [অর্থকে বুঝাবার উদ্দেশ্য করে] শব্দ সকলের প্রয়োগ করে॥ ৪৫ ॥

বিবৃতি :—পদের অর্থ আকৃতিও হয় আবার দ্রব্যও হয়। পাণিনিকর্তৃক উভয়ই পদার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। এবিষয়ে বার্তিক কারের অভিমত কি? তাহা জানবার কৌতূহল হলে 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিক গ্রন্থের মহাভাষ্যকার কৃত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় আকৃতিও পদার্থ হয় আবার দ্রব্যও পদার্থ হয়। আকৃতি শব্দের দুইপ্রকার অর্থ মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া গেছে, জাতি এবং সংস্থান। দ্রব্যশব্দেরও দুই প্রকার অর্থ বুঝা যায়, ব্যক্তি এবং উপদানদ্রব্য। উক্ত বার্তিকগ্রন্থের সিদ্ধ শব্দটি নিত্য অর্থের বোধক ইহা বুঝাবার জন্য মহাভাষ্যকার পদের অর্থকে কখনও জাতি বলে গ্রহণ করে তার নিত্যত্ব বলেছেন, কখনও বা সংস্থান বলে গ্রহণ করে তার নিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন। আবার কখনও দ্রব্যকে পদের অর্থবলে গ্রহণ করে তার নিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন। তার মধ্যে

'সংস্থান' রূপ অর্থটি বস্তুত নিত্য নয় কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য। দ্রব্য অর্থাৎ উপাদান দ্রব্য মৃত্তিকা প্রভৃতিও বস্তুত নিত্য নয়, কিন্তু আপেক্ষিক নিত্য। জাতিরূপ অর্থটি বৈশেষিকাদি মতে নিত্য হলেও বেদান্তমতে বা ব্যাকরণ মতে পরমার্থত নিত্য নয়। এইরূপ অবস্থায় বার্তিকের 'সিদ্ধ' শব্দটির নিত্য অর্থ গ্রহণ করলে পদের অর্থ বস্তুত নিত্য না হওয়ায় বার্তিকগ্রন্থের অসামঞ্জস্য হয়ে যায়। এই অসামঞ্জস্য আশঙ্কার পরিহার করবার জন্য মহাভাষ্যকার বলছেন "অথবা কিং ন এতেন—ইদং নিত্যম্·········সম্বন্ধে চেতি।" আকৃতি নিত্য, দ্রব্য অনিত্য বা দ্রব্য নিত্য সংস্থানরূপ আকৃতি অনিত্য ইত্যাদি বিচারে কাজ কি? আকৃতি বা দ্রব্য যদি অনিত্য হয় বা নিত্য হয় হউক্। তথাপি জগতে কিছু নিত্য বস্তুতো আছে। যে বস্তু নিত্য তাকেই পদের অর্থ বলবো। তাকে [সেই নিত্যবস্তুকে] পদের অর্থ বললে 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' এই বার্তিকের 'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এইরূপ বিগ্রহ উপপন্ন হবে। কারণ 'শব্দ' যে নিত্য তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন অর্থকেও নিত্য বলা হল। শব্দ এবং অর্থ উভয়ই নিত্য হলে সেই উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য হবে। এখানে মহাভাষ্যকার "যাহা নিত্য তাকেই পদের অর্থ বলে গ্রহণ করব" এইভাবে পদের অর্থকে নিত্য বললেন, কিন্তু সেই অর্থটি কি? যাহা নিত্য অথচ পদের অর্থ; এই বিষয়ে মহাভাষ্যকার কিছু স্পষ্ট করে বললেন না। সুতরাং কোন্ বস্তু পদের অর্থ তাহার নিশ্চয় হল না। মহাভাষ্যপ্রদীপে কৈয়ট বলেছেন—যখন যখন শব্দ উচ্চারণ করা হয় তখন তখন অর্থাকার বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধবৃত্তিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় (২১৩)। এর ব্যাখ্যায় নাগেশ বলেছেন—বাহিরের বস্তু পদের অর্থ নয়, কিন্তু অর্থাকার বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় যে বৌদ্ধ পদার্থ তাহাই পদের অর্থ। বৌদ্ধ বলতে বুদ্ধিবৃত্তিরূপজ্ঞানে বিষয়ীভূত অর্থ। প্রশ্ন হতে পারে সেই বৌদ্ধ অর্থ নিত্য হলো কিরূপে? তার উত্তরে কৈয়ট এবং নাগেশ উভয়েই বলেছেন প্রবাহরূপে নিত্য (২১)। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানেও ঠিক বস্তুত নিত্যবস্তু পদের অর্থ বলে গৃহীত হলো না, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্যের গ্রহণ হলো। এখানে কৈয়ট

---

(২১৩) যদা যদা শব্দ উচ্চারিতস্তদা তদা অর্থাকারা বুদ্ধিরূপজায়তে ইতি প্রবাহনিত্যত্বাদর্থস্য নিত্যত্বম্। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

(২১৪) বাহ্যঃ পদার্থো ন শাব্দবোধে বিষয়ঃ কিন্তু বৌদ্ধঃ, স চ প্রবাহনিত্য ইতি ভাবঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

ও নাগেশের উপর বক্তব্য এইযে, যদি তাঁরা প্রবাহরূপ নিত্য পদার্থকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেন, তাহলে প্রবাহরূপে ব্যক্তি, বা সংস্থান বা দ্রব্যও নিত্য হয় বলে সেই পদার্থগুলিকে পদের অর্থ স্বীকার না করে তাঁরা আবার এক বৌদ্ধ অর্থকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেন কেন? এতে কি লাভ হলো। এবং এতে কি ঠিক ঠিক মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত হলো? আমাদের মনে হয়, "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্তিকের প্রথম ভাষ্য হচ্ছে 'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ,; ভাষ্যের ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলেছিলেন—জাতিরূপ অর্থ নিত্য; দ্রব্যরূপ অর্থকে পদের অর্থ বললেও সমস্ত শব্দের বাচ্যার্থ হচ্ছে সেই সেই অসত্য উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব নিত্য বলে পদের অর্থও নিত্য হয়। ঘট শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম; গো শব্দের অর্থ হচ্ছে গোত্বাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই মতে জাতিও অবিদ্যাকল্পিত বলে পরমার্থত নিত্য নয়। এইভাবে "যৎনিত্যং তং পদার্থং মত্বা" এই মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায়ও সেই অসত্য উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বকেই পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হত না, অথচ পদের নিত্য অর্থটিও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হত। অতিরিক্ত বৌদ্ধ অর্থেরও কল্পনা করতে হত না। যাই হোক মহাভাষ্যকার প্রথম থেকেই 'সিদ্ধে' ইত্যাদি বার্তিক গ্রন্থের বিগ্রহ করে এসেছেন 'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এইরূপ। 'সিদ্ধ' শব্দের 'নিত্য' অর্থই তিনি গ্রহণ করেছেন। মহাভাষ্যকারের কথিত বাক্যে প্রশ্ন হতে পারে 'শব্দ নিত্য' 'অর্থ নিত্য' এবং তাদের 'সম্বন্ধ নিত্য' ইহা কি করে জানা গেল? মহাভাষ্যকার উহা কি করে জানলেন? এইরূপ প্রশ্ন মহাভাষ্যকার "কথং পুনর্জ্ঞায়তে সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি।" এই গ্রন্থে উত্থাপিত করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তররূপে মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় বার্তিকাংশ "লোকতঃ।" এই গ্রন্থটি উপন্যস্ত করেছেন এবং পরে তার ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে 'লোক' এইশব্দের তাৎপর্যার্থ হচ্ছে অনাদিলোকব্যবহারপরম্পরা।" লোকে ইদানীং অর্থকে বুঝাবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করে; এর পূর্বকালেও এইভাবে ব্যবহার করত; তার পূর্বেও করত। সুতরাং লোকের এই যে শব্দার্থসম্বন্ধের ব্যবহার তাহা অনাদি। এই লোকের ব্যবহার বলতে বৃদ্ধদের অর্থাৎ শব্দার্থাভিজ্ঞ মানুষদের ব্যবহারই বুঝতে হবে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের ব্যবহার নয়। কারণ অজ্ঞদের ব্যবহারকে প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায় না। বৃদ্ধেরা, কোন্

শব্দের কি অর্থ, কোন্ শব্দের সঙ্গে কোন্ অর্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা জেনে ব্যবহার করেন। ইদানীং কালের বৃদ্ধেরা আবার পূর্ববর্তী বৃদ্ধদের ব্যবহার থেকে শব্দার্থসম্বন্ধবিষয়ে ব্যুৎপত্তি [জ্ঞান] লাভ করেন। অনিত্য বস্তু বিষয়ে লোকের যেরূপ ব্যবহার হয়, শব্দার্থ সম্বন্ধের ব্যবহার তা থেকে বিলক্ষণ, এই জন্য নিত্য। কি ভাবে লোকব্যবহারদ্বারা শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতা জানা যায়—ইহা বুঝাবার জন্য মহাভাষ্যকার বলছেন "যল্লোকে অর্থম্ অর্থম্ উপাদায়…… …..তাবত্যেবার্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে।" লোকে কোন অর্থ অপরকে বুঝাবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করে। সেইশব্দ শুনে অপরের অর্থজ্ঞান হয়। শব্দশুনে যখন তার অর্থের জ্ঞান হয়, তখন বুঝতে হবে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ আছে। যার সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই, তাদের মধ্যে একটিকে জানলে নিয়ত ভাবে অপরটির জ্ঞান হয় না। যেমন পর্বতের জ্ঞান হলে নিয়ত ভাবে নদীর জ্ঞান হয় না। কিন্তু হস্তীকে জানলে হস্তিপকের [মাহুতের] স্মরণ হয়। হস্তীর সঙ্গে হস্তিপকের সম্বন্ধ আছে এইভাবে শব্দ শুনলে অর্থের স্মরণ হয়, বা অর্থের জ্ঞান হলে তার বাচক শব্দের জ্ঞান হয় বলে শব্দ ও অর্থের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কোন লোক অপর ব্যক্তির জ্ঞানোৎপাদনের জন্য বলল "এই বনমধ্যে এক সুন্দর সরোবর আছে"। এই শব্দ থেকে শ্রোতার অর্থ জ্ঞান হল। এখানে বক্তা পূর্বোক্ত শব্দ গুলিকে উৎপাদন করে না, বা তার অর্থগুলিকে উৎপাদন করে না, কিন্তু পূর্বথেকে ঐ শব্দ ছিল. বক্তা উচ্চারণের দ্বারা ঐ শব্দকে অভিব্যক্ত করেছে মাত্র; অর্থও ছিল, বক্তা অর্থ· গুলিকেও উৎপাদন করে না, কিন্তু শব্দের উল্লেখ করে সেই শব্দসম্বদ্ধ অর্থ অপরকে বুঝায় অর্থাৎ অপরের অর্থজ্ঞান উৎপাদন করে; অর্থের উৎপাদন করে না। এথেকে বুঝা যায় শব্দ নিত্য, অর্থও নিত্য এবং তাদের সম্বন্ধও নিত্য। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন—লোকে কার্য অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর ব্যবহার করবার জন্য যেমন সেই বস্তুর উৎপাদনে যত্ন করে, সেইরূপ শব্দার্থসম্বন্ধের ব্যবহার করবার জন্য শব্দের উৎপাদনে যত্ন করে না। যেমন ঘটে জলরাখা প্রভৃতি কার্যের জন্য লোকে কুম্ভকারের গৃহে গমন করে, বলে ঘটতৈরী কর, আমি সেই ঘটের দ্বারা আমার প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করব। এইভাবে শব্দের প্রয়োগ

করবার জন্য কেউ বৈয়াকরণের গৃহে গিয়ে বলে না—শব্দ তৈরী কর আমি প্রয়োগ করব অর্থাৎ অর্থ বুঝাবার জন্য শব্দের প্রয়োগ করব, কিন্তু বৈয়াকরণের গৃহে না গিয়ে বা শব্দের নির্মাণ বিষয়ে অন্য কোন যত্ন না করেই শব্দের প্রয়োগ করে। এইরূপ শব্দের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে 'শব্দ নিত্য।' এখানে মহাভাষ্যকার স্পষ্টকরে অর্থ বা সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে পৃথক্ করে না বললেও তাঁর শব্দব্যবহারের উল্লেখ থেকেই অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যতা বুঝা যাচ্ছে। যেমন কোন লোক অপরকে কোন অর্থ বুঝাবার জন্য যেরূপ শব্দের সৃষ্টি বিষয়ে যত্ন করে না, সেইরূপ সেইশব্দের অর্থের সৃষ্টিবিষয়ে বা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ সৃষ্টি বিষয়েও যত্ন করে না। পূর্ব থেকে শব্দও থাকে, অর্থও থাকে সম্বন্ধও থাকে, বক্তা কেবলমাত্র উচ্চারণের দ্বারা শব্দের অভিব্যঞ্জন করে, শব্দ অভিব্যক্ত হয়ে সেই শব্দসম্বদ্ধ অর্থকে শব্দই বুঝিয়ে দেয়। সুতরাং শব্দ, অর্থ, ও তাদের সম্বন্ধ যে নিত্য, তাহা এই লোক ব্যবহার থেকে জানা যায়—ইহাই মহাভাষ্যকারের বক্তব্য ॥ ৪৫ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

যদি তর্হি লোক এষু প্রমাণম্, কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে ?

[বার্তিক]

লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ ॥

[তৃতীয় বার্তিক]

[মহাভাষ্য]

লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ ক্রিয়তে। কিমিদং ধর্মনিয়ম ইতি। ধর্মায় নিয়মো ধর্মনিয়মঃ। ধর্মার্থো বা নিয়মো ধর্মনিয়মঃ। ধর্মপ্রয়োজনো বা নিয়মো ধর্মনিয়মঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ :—যদি লোক [লোকব্যবহার] এই সকল বিষয়ে [শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধে অথবা শব্দ সমূহে] প্রমাণ, তা হলে শাস্ত্র কি করে ? "লোকব্যবহার থেকে অর্থজ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্য শব্দের প্রয়োগ [সিদ্ধ হলে] শাস্ত্রের

[ব্যাকরণ শাস্ত্রের] দ্বারা ধর্মনিয়ম [করা হয়]। [বার্তিকের অর্থ]। লোক ব্যবহার হতে অর্থজ্ঞান প্রয়োজনে শব্দপ্রয়োগে, শাস্ত্রের দ্বারা ধর্মনিয়ম করা হয়। এই ধর্মনিয়মটি কি? ধর্মের নিমিত্ত নিয়ম ধর্মনিয়ম। ধর্মার্থক নিয়ম ধর্ম নিয়ম। ধর্ম প্রযুক্ত নিয়ম ধর্মনিয়ম ॥ ৪৬ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার "লোকতঃ" এই বার্তিকাংশের ব্যাখ্যায় বলে এলেন অনাদিলোকব্যবহার থেকে শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব জানা যায়। তার উপর প্রশ্ন করা হচ্ছে "যদি তর্হি লোক এষু প্রমাণং কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে।" শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যত্ব যদি লোকব্যবহার থেকে জানা যায়, তাহলে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ বিষয়ে লোকব্যবহারই প্রমাণ বলে বুঝা যায়। ব্যাকরণের দ্বারা শব্দ নিষ্পাদ্য হয় না, ইহাও বুঝা যাচ্ছে। তাহলে এই ব্যাকরণ শাস্ত্র কি করে? ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। লোকের অর্থাৎ যদি অনাদিবৃদ্ধব্যবহার পরম্পরা থেকেই সাধারণ মানুষ শব্দের প্রয়োগ করে থাকে, সেক্ষেত্রে ব্যাকরণের কোন প্রয়োজন নাই। ইহাই প্রশ্নকারীর অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার "লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দ প্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ।" এই বার্তিক উদ্ধৃত করেছেন। যদিও বার্তিক গ্রন্থে "লোকতঃ' এই শব্দটি একবার উল্লিখিত আছে অথাপি অর্থের সঙ্গতি করবার জন্য মহাভাষ্যকার এই 'লোকতঃ' শব্দটি আর একবার আবৃত্তি করে "অর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে" এই বার্তিকাংশের সঙ্গে সম্বদ্ধ করে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে "লোকতঃ" এই শব্দের সম্বন্ধ না করলে অর্থসঙ্গতি হবে না। এই বার্তিক বাক্যস্থিত 'লোকতঃ' শব্দের অর্থ লোকব্যবহার হতে অর্থাৎ অনাদি বৃদ্ধব্যবহার পরম্পরা থেকে। 'অর্থপ্রযুক্তে' 'অর্থেন প্রযুক্তে' তৃতীয়াতৎ পুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন। এখানে 'অর্থ' শব্দের "অর্থজ্ঞান" এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে। অর্থজ্ঞানের জন্য প্রযুক্ত যে শব্দপ্রয়োগ তাহা লোকব্যবহার থেকে সিদ্ধ থাকায়—ইহাই "লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে'' এই বার্তিকাংশের অর্থ। "অপরের অর্থজ্ঞান হোক্" এই উদ্দেশ্যে অপরে শব্দ প্রয়োগ করে; এই শব্দ প্রয়োগ লোকব্যবহার থেকে মানুষ জেনে করে থাকে। এইভাবে লোকব্যবহার থেকে জেনে মানুষ অপরের অর্থজ্ঞানের জন্য শব্দের প্রয়োগ করে; এইভাবে শব্দপ্রয়োগ প্রাপ্ত হলে "শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ" ব্যাকরণ শাস্ত্র জানিয়ে দেয় এই শব্দের 'এই প্রকৃতি, এই প্রত্যয়'। এই ভাবে প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ জেনে

সাধুশব্দপ্রয়োগ করলে ধর্ম হয়, অন্যথা অসাধু শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয় না। সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্র শব্দ তৈরী করে না বা শব্দের প্রয়োগ সাক্ষাদ্‌ভাবে জানায় না, কিন্তু কোন্‌গুলি সাধুশব্দ তাহা জানিয়ে দিয়ে সেই সাধু শব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয় এইরূপ নিয়ম করে দেওয়াই ব্যাকরণ শাস্ত্রের কাজ। এইখানে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। মহাভাষ্যকার এই বার্তিকের সঙ্গে 'ক্রিয়তে' এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করে বার্তিকবাক্যের অর্থের সঙ্গতি করে দিয়েছেন। তারপর তিনি "ধর্মনিয়মঃ" এই শব্দটির অর্থ করবার জন্য প্রশ্ন উঠিয়েছেন "কিমিদং ধর্মনিয়ম ইতি।" ধর্মনিয়ম ইহা কি? ধর্মনিয়মের অর্থ কি? এইপ্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মহাভাষ্যকার 'ধর্মনিয়ম' শব্দটির তিন প্রকার বিগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। প্রথমে "ধর্মায় নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ" এইভাবে চতুর্থী বিভক্তির দ্বারা বিগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এইভাবে চতুর্থ্যন্ত 'ধর্ম' শব্দের উল্লেখ করলেও এখানে চতুর্থীতৎপুরুষ সমাস করে "ধর্মনিয়মঃ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ইহা মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় নয়। কারণ পাণিনি "চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ" [পাঃ সূঃ ২।১।৩৬] এই সূত্রের দ্বারা বলেছেন চতুর্থ্যন্ত শব্দের অর্থের জন্য যে বস্তু, সেই বস্তুবাচক শব্দ এবং বলি, হিত, সুখ, রক্ষিত এই সকল শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত শব্দের সমাস হয়। যেমন 'কুণ্ডলায় হিরণ্যম্‌' কুণ্ডলহিরণ্যম্‌। এখানে চতুর্থ্যন্ত শব্দ কুণ্ডল-শব্দ, সেই কুণ্ডল শব্দের অর্থ যে অলঙ্কারবিশেষ, তাহার জন্য হচ্ছে সুবর্ণ, সেই সুবর্ণের বাচক শব্দ হিরণ্য শব্দ, অতএব এখানে সমাস হল। সেইরূপ "ধর্মায় নিয়মঃ" এই বিগ্রহে চতুর্থী সমাসের প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু পাণিনি বলি ও রক্ষিত শব্দের উল্লেখ করে নিয়মিত করে দিয়েছেন—প্রকৃতি বিকৃতিভাব স্থলেই তাদর্থ্যে চতুর্থী সমাস হবে। 'ধর্ম এবং নিয়ম' এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার ও প্রকৃতি নয় বা কেহ কাহারও বিকৃতি নয়।

সুতরাং এখানে 'ধর্মস্য নিয়মঃ' সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠ্যন্তপদের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হবে। তবে যে মহাভাষ্যকার "ধর্মায় নিয়মঃ" এইভাবে বিগ্রহে চতুর্থী প্রয়োগ করেছেন—তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে—ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধসামান্যের বোধক বলে এখানে ষষ্ঠীর অর্থ তাদর্থ্যরূপ সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য 'ধর্মায়' এইরূপ চতুর্থীর প্রয়োগ করা হয়েছে। তারপর মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় বিগ্রহ দেখিয়েছেন—"ধর্মার্থো বা নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ।' এই বিগ্রহে মধ্যপদলোপী

কর্মধারয় সমাস করে 'অর্থ' পদের লোপ করা হয়েছে। যেমন "শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ" শাকপার্থিবঃ সমাস হয়। এখানেও সেইরূপ বুঝতে হবে। তৃতীয় বিগ্রহে মহাভাষ্যকার বলেছেন "ধর্মপ্রয়োজনো বা নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ"। এখানেও শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হয়েছে। তবে "ধর্মঃ প্রয়োজনং যস্য" ধর্মপ্রয়োজনঃ" অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে প্রয়োজন যার [যে নিয়মের] এইভাবে যদি "ধর্মপ্রয়োজন" শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে "ধর্মার্থঃ নিয়মঃ" এই দ্বিতীয় বিগ্রহের সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহের কোন ভেদ থাকে না। কারণ সেই দ্বিতীয় বিগ্রহে "ধর্মঃ অর্থঃ যস্য" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে 'ধর্মার্থঃ' শব্দটি ব্যুৎপাদন করতে হবে। 'ধর্মায়' ইতি 'ধর্মার্থঃ' এইভাবে যদি "ধর্মার্থঃ" শব্দটিকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন করা হয় তাহলে এই চতুর্থী সমাসটি নিত্য সমাস বলে—"ধর্মার্থঃ নিয়মঃ" এইরূপ বিগ্রহ করে, সেখানকার 'অর্থ' শব্দের লোপ করা যাবে না। নিত্যসমাসের একাংশলোপ ব্যাকরণের অনুশাসনবিরুদ্ধ। তাহলে বহুব্রীহি সমাস করেই [ধর্মঃ অর্থঃ যস্য] 'ধর্মার্থঃ' শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। সেখানে "ধর্মার্থঃ" শব্দের অন্তর্গত অর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রয়োজন', অন্য কোন অর্থ সেখানে সম্ভব হবে না। তাহলে দ্বিতীয় বিগ্রহ ও তৃতীয় বিগ্রহে অর্থের কোন প্রভেদ থাকবে না। তাতে তৃতীয় বিগ্রহ প্রদর্শন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এইজন্য কৈয়ট বলেছেন—'ধর্মপ্রযোজন ইতি'—লিঙাদিবিষয়েণ নিয়োগাখ্যেন ধর্মেণ প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ লিঙ্, লোট্, তব্য, অনীয়, লেট্, এই সকল প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ যে নিয়োগরূপ ধর্ম তার দ্বারা প্রযুক্ত। এই বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক। এইজন্য নাগেশের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে বিবৃত করছি। প্র+যুজ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট প্রত্যয় করে যে প্রয়োজন শব্দ নিষ্পন্ন হয় তাহা নপুংসক লিঙ্গ হয়, 'প্রয়োজনম্' এই প্রকাররূপ হয়। তার অর্থ 'ফল'। কিন্তু এখানে মহাভাষ্যে যে "ধর্মপ্রয়োজনঃ" শব্দের অন্তর্গত 'প্রয়োজন' শব্দটি আছে তাহা 'কৃত্যল্যুটোবহুলম্' [৩৩।১১৩] সূত্রানুসারে 'প্রযুজ্যতে 'অসৌ' এইভাবে কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। ধর্মেণ প্রযুজ্যতে [অসৌ] এইরূপ অর্থে ল্যুট্ করে, 'প্রয়োজন' এই কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে 'ধর্ম' শব্দের উত্তর কর্তায় ষষ্ঠী করে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়েছে— 'ধর্মস্য প্রয়োজনঃ' 'ধর্মপ্রয়োজনঃ' এইভাবে 'ধর্মপ্রয়োজন' শব্দ নিষ্পন্ন হলে

তার সঙ্গে 'নিয়ম' শব্দের 'ধর্মপ্রয়োজনঃ নিয়মঃ' এইরূপ বিগ্রহ করে শাকপার্থি-বাদিত্ব অনুসারে সমাস করে 'ধর্মনিয়মঃ' শব্দ সিদ্ধ হয়। এখানে অর্থাৎ 'ধর্ম-প্রয়োজনঃ' এই শব্দের অন্তর্গত 'ধর্ম' শব্দের অর্থ কার্য বা নিয়োগ। প্রভাকর মীমাংসক মতানুসারে তাঁরা লিঙ্, লোট, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ কার্য বা অপূর্ব স্বীকার করেন। যাগাদি ক্রিয়াজন্য এবং যাগাদিক্রিয়ার প্রয়োজক হচ্ছে অপূর্ব। এই অপূর্ব যেমন যাগাদিক্রিয়াসাধ্য, আবার সেইরূপ এই অপূর্বই যাগাদিক্রিয়ার প্রবর্তক। অপূর্ববশতই লোকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত হয়। এই অপূর্বকে প্রভাকরমতানুসারীরা 'কার্য' নামে—'নিয়োগ' নামে অভিহিত করেন। যাগাদিবিষয়ককৃতিসাধ্য বলে এই অপূর্ব কার্য। আবার এই অপূর্বই নিজের বিষয় যে যাগাদি ক্রিয়া, তাতে পুরুষকে নিযুক্ত করে বলে—এর নাম 'নিয়োগ'। এই 'নিয়োগ' লিঙাদির বাচ্যার্থ। এই নিয়োগ, কার্য বা অপূর্বকে প্রভাকরমতানুসারীরা ধর্ম বলেন। এই 'অপূর্বরূপ ধর্ম কর্তৃক নিযুক্ত হয় নিয়ম' এইরূপ অর্থ এখানে "ধর্মপ্রয়োজনো নিয়মঃ" এই মহাভাষ্যাংশের তাৎপর্য বলে বুঝতে হবে। ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ অপূর্বদ্বারা যে নিয়ম প্রযুক্ত হয়—নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই নিয়ম হচ্ছে "ধর্মপ্রয়োজনঃ নিয়মঃ"। কি সেই নিয়ম? এই প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ বলেছেন অসাধুনিবৃত্তি—অর্থাৎ অসাধুশব্দের প্রয়োগের নিবৃত্তি হয় যে নিয়ম থেকে সেই নিয়ম হচ্ছে কায বা অপূর্বের দ্বারা প্রযুক্ত। শাস্ত্রে যে বিধি আছে, সেই বিধি বা অপূর্বের দ্বারা অসাধুশব্দের নিবৃত্তি করা হয়। ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রের দ্বারা ধর্মনিয়ম। সুতরাং মহাভাষ্যকারের দ্বিতীয় বিগ্রহের অর্থ হচ্ছে [ধর্মার্থনিয়ম] 'ধর্মফলক নিয়ম', যে নিয়মের ফল বা প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম। আর তৃতীয় বিগ্রহের অর্থ হলো ধর্মপ্রয়োজ্য-নিয়ম, যে নিয়ম ধর্মের দ্বারা প্রযুক্ত হয়। এইভাবে অর্থের ভেদ থাকায় মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় কোন দোষ নাই ॥ ৪৬ ॥

মূল

[বার্তিক]

—যথা লৌকিকবৈদিকেষু ॥১॥ [চতুর্থ বার্তিক]

[মহাভাষ্য]

প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ—'যথা লোকে বেদে চ ইতি

প্রযোক্তব্যে 'যথা লৌকিকবৈদিকেষ্বিতি' প্রযুঞ্জতে। অথবা যুক্ত এবাত্র তদ্ধিতার্থঃ, যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু। লোকে তাবৎ "অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ" "অভক্ষ্যো গ্রাম্যসূকর" ইত্যুচ্যতে। ভক্ষ্যং নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে—ইদং ভক্ষ্যমিদমভক্ষ্যমিতি। তথা খেদাৎস্ত্রীষু প্রবৃত্তির্ভবতি। সমানশ্চ খেদাবগমো গম্যায়াং চ অগম্যায়াং চ। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে—ইয়ং গম্যা, ইয়মগম্যেতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—"যেমন লৌকিক পদার্থসমূহে ও বৈদিক পদার্থসমূহে" [নিয়ম দেখা যায়] ॥ ১ ॥ [বার্তিক]

[**ভাষ্যার্থ**] দক্ষিণদেশীয়গণ তদ্ধিতপ্রিয়; 'যেমন—লোকে ও বেদে এইরূপ প্রযোগের কর্তব্যতায়, [দক্ষিণদেশীয়গণ] 'যেমন লৌকিকে ও বৈদিকে" ইহা প্রয়োগ করেন। অথবা এখানে তদ্ধিত [প্রত্যয়ের] এর অর্থ সঙ্গতই, যেমন লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে। লোকে 'গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য' 'গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য' ইহা বলা হয়। ক্ষুধার প্রতিকারের জন্য ভক্ষ্য পদার্থ গ্রহণ করা হয়। এই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কুকুরের মাংস প্রভৃতির দ্বারাও ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারে। সেইখানে [ভক্ষণবিষয়ে] নিয়ম করা হয—ইহা ভক্ষ্য. ইহা অভক্ষ্য। সেইরূপ—রাগ বশত স্ত্রীতে প্রবৃত্তি হয়। গম্য এবং অগম্য স্ত্রীতে তুল্যভাবে খেদ [রাগ] নিবৃত্তি হয়। সেখানে—'ইহা গম্য, ইহা অগম্য এইরূপ নিয়ম করা হয় ॥ ৪৭ ॥

বিবৃতি—লোকব্যবহার থেকে জেনে মানুষ অপরকে অর্থ বুঝাবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করে। ব্যাকরণশাস্ত্র কেবল সেই শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ধর্মের নিয়ম করে দেয়—'সাধুশব্দের প্রয়োগ করবে'। ইহা বার্তিককার বলে এসেছেন; মহাভাস্যকারও বার্তিকের ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা প্রকটিত করেছেন। এখন সেই ধর্মনিয়ম বুঝাবার জন্য বার্তিককার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন—"যথা লৌকিক বৈদিকেষু" যেমন লৌকিক ও বৈদিক পদার্থবিষয়ে [নিয়ম করা হয়]। মহাভাষ্যকার উক্ত বার্তিকগ্রন্থের ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রথমে বলছেন "প্রিয়তদ্ধিতাঃ দাক্ষিণাত্যাঃ" দক্ষিণদেশীয়গণ তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করতে ভালবাসেন।

মহাভাষ্যকারের এইউক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে বার্তিককার কাত্যায়ন দক্ষিণদেশীয় ছিলেন। দক্ষিণদেশীয়েরা তদ্ধিতপ্রিয় বলে কি করে জানা গেল? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—'যেমন—যেখানে লোকে ও বেদে' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করলে কার্যনির্বাহ হয়ে যায়, সেখানে বার্তিককার—'যেমন লৌকিকে এবং বৈদিকে' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। "লোকে ভবঃ" 'লৌকিকঃ', 'বেদে ভবঃ' 'বৈদিকঃ" এইভাবে লোক এবং বেদশব্দের উত্তর—'তত্রভবঃ' অর্থে 'ঠঞ্' প্রত্যয় করে লৌকিক এবং বৈদিকশব্দ নিষ্পন্ন হয়। লোকে এবং বেদে বললে বুঝা যায়, যাবৎ লোক হচ্ছে অবয়বী, আর সেই লোকে কথিত কতিপয় পদার্থ হচ্ছে অবয়ব। এখানে লোক শব্দের অর্থ লোকব্যবহার। এইরূপ সমস্ত বেদ অবয়বী, বেদে কথিত পদার্থ অবয়ব। অতএব এখানে লোক বা বেদকে অববয়বী, এবং সেখানে প্রাপ্ত পদার্থকে অবয়ব ধরলে সেই অবয়বাবয়বিভাবে বলা যেতে পারে—"যেমন লোকে [নিয়ম] বেদে [নিয়ম]" এইরূপ বললে কোন ক্ষতি হয় না বরং শব্দের লাঘব হয়। বার্তিককার এইরূপ প্রয়োগ না করে—লোকসমুদায়, বেদসমুদায় এবং লোকসমুদায়ের অবয়ব, ও বেদসমুদায়ের অবয়বে আধারআধেয়ভাবের কল্পনা করে যে "লৌকিকবৈদিকেষু" এইরূপ প্রযোগ করেছেন—তাতে তাঁর তদ্ধিতপ্রিয়ত্বসূচিত হয়েছে - এইরূপ তাৎপর্যে মহাভাষ্যকার প্রথমে বার্তিক-কারের উপর কিঞ্চিৎ উপহাস করেছেন। কিন্তু মহাভাষ্যকার এই কথা বলে পরে যেন নিজেরই দোষসংশোধন করবার জন্য বললেন—"অথবা যুক্ত এবাত্র তদ্ধিতার্থঃ। যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।" অথবা এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ যুক্তিযুক্ত। যেমন লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে। 'লোক' শব্দ ও 'বেদ' শব্দের উত্তর 'অধ্যাত্মাদেষ্ঠঞিষ্যতে' এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে 'ঠঞ্' প্রত্যয় করে 'লৌকিক' ও 'বৈদিক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। লোক ও বেদ সমুদায় অবয়বী এবং সেই লোকে ও বেদে আছে যে সব পদার্থ তাহারা অবয়ব, এই-ভাবে অবয়বাবয়বিভাব কল্পনা করলে "যথা লোকে বেদে চ" এইরূপ বলা চলত। কিন্তু মহাভাষ্যকার বলছেন—এখানে লোক ও বেদকে ভিন্ন ধরে, সেইবেদে ও লোকে কথিত যে সিদ্ধান্ত শব্দ ও অর্থ, তাকেও ভিন্নধরলে লোক ও বেদ শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ের আবশ্যকতা থাকে। কারণ লোকে ও বেদে এই শব্দের দ্বারা আর লোক বেদ সম্ভূত বা লোক বেদ কথিত সিদ্ধান্তকে ধরা যায়

না। অথচ লোক বেদকথিত সেই সিদ্ধান্তকে বুঝাতে হবে। এইজন্য 'লোক' ও 'বেদ' শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করে 'লৌকিক' এবং 'বৈদিক' শব্দ নিষ্পাদন পূর্বক বার্তিককার প্রয়োগ করেছেন। অতএব এখানে বার্তিককারের তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োজন থাকায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। 'কৃতান্ত' শব্দের অর্থ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত দুইপ্রকার শব্দ ও অর্থ, উভয়ই সিদ্ধান্ত (২১)।

এখানে 'লৌকিক' এইশব্দের অর্থ স্মৃতিতে নিবদ্ধ। 'বৈদিক' এই শব্দের অর্থ শ্রুতিতে নিবদ্ধ, ইহা কৈয়ট বলেছেন। কিন্তু স্মৃতিতে বা শ্রুতিতে সিদ্ধান্ত শব্দ নিবদ্ধ থাকতে পারে, সিদ্ধান্ত অর্থ কিরূপে নিবদ্ধ থাকবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে নাগেশ ভট্ট বলেছেন "তৎপ্রতিপাদকবাক্যেষু ইত্যর্থঃ" সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্যসমূহে ইহাই অর্থ। সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্যে অর্থ বর্ণিত থাকে। তা হলে "যথা লৌকিকবৈদিকেষু" এই বার্তিকের তাৎপর্যার্থ হচ্ছে যেমন স্মৃতিতে উপনিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বাক্য সমূহে ও শ্রুতিতে উপনিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বাক্যসমূহে [নিয়ম করা হয়, সেইরূপ ব্যাকরণশাস্ত্রে ধর্মের নিয়ম করা হয়]

লৌকিক সিদ্ধান্ত বাক্যে অর্থাৎ স্মৃতিতে উপনিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বাক্যে কি ভাবে নিয়ম করা হয় ইহাই মহাভাষ্যকার প্রথমে প্রদর্শন করছেন "লোকে তাবৎ "অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ..........ইয়মগম্যেতি।" "অভক্ষ্যঃ গ্রাম্যকুক্কুটঃ" "অভক্ষ্যঃ গ্রাম্যসূকরঃ" এই দুইটি স্মৃতি বাক্য মহাভাষ্যকার কোন স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা ঠিক জানা যায় না। তবে ইহার অনুরূপ বাক্য বোধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লিখিত আছে 'অভক্ষ্যাঃ পশবো গ্রাম্যাঃ, তথা কুক্কুটসূকরম্।" গ্রাম্যকুক্কুট বা গ্রাম্যশূকর ভক্ষণ করবে না। স্মৃতিতে গ্রাম্যকুক্কুট ও গ্রাম্যশূকরের ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এই স্মৃতিবাক্যে কিভাবে নিয়ম করা হয়েছে তাহা বুঝাবার জন্য বলেছেন "ভক্ষ্যং চ নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে"। এই বাক্যটির অর্থের সঙ্গতি করতে হলে বলতে হবে 'ভক্ষ্যং চ নাম তৎ যৎ ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে'। একটি 'তৎ' পদ ও একটি 'যৎ' পদ অধ্যাহার করতে হবে। ভক্ষ্য পদার্থ তাহা

(২১) নানাবয়বাবয়বিবিভাগঃ, কিং তর্হি লোকবেদব্যতিরিক্তসিদ্ধান্তশব্দার্থোভয়রূপ ইত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপ—কৈয়ট।

যাহা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য গ্রহণ করা হয়। "শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুম্", এখানে 'অনেন" বলতে 'ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কর্তৃক' ইহাই বুঝতে হবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কুকুরের মাংস প্রভৃতির দ্বারাও ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়। এই মহাভাষ্যবাক্যে 'ক্ষুৎ' পদটি স্ত্রীলিঙ্গ ক্ষুধ্ শব্দের প্রথমা-বিভাক্তির একবচনান্ত রূপ। এবং ইহা কর্মকারক। উক্তকর্মে প্রথমা হয়েছে। এর ক্রিয়া হচ্ছে "শক্যম্।" শক৯ শক্তৌ শক্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে "শকি সহোশ্চ" [পাঃ সূঃ ৩।১।৯৯] সূত্রে যৎ প্রত্যয় করা হয়েছে। কর্মবাচ্যে ক্রিয়া কর্মের অধীন হয়। কর্ম এখানে 'ক্ষুৎ'। উহা স্ত্রীলিঙ্গ একবচনান্ত বলে, তার অনুসারে ক্রিয়া পদটি 'শক্যা' এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। অথচ মহাভাষ্যকার এখানে "শক্যম্" এইরূপ নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার একবচনের রূপ প্রযোগ করলেন কেন? ইহা কি ব্যাকরণের অনুশাসন বিরুদ্ধ হয় নাই? ইহার উত্তরে কৈয়ট বলেছেন শাক্‌ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে যে কৃত্যপ্রত্যয় [যৎপ্রত্যয়], এখানে হয়েছে; সেই কর্মটিকে কোন বিশেষভাবে না বুঝিয়ে সামান্যভাবে সেই কর্মকে নপুংসকলিঙ্গান্ত 'তৎ' প্রভৃতি কোন সর্বনামের দ্বারা বুঝিয়ে প্রথমে শক্‌ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করা হয়েছে। সেই হেতু উহা "শক্যং" এইরূপ নপুংসকলিঙ্গের একবচনের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর "ক্ষুৎ" এই কর্মপদের সঙ্গে 'শক্য' শব্দের সম্বন্ধ হওয়ায় তার স্ত্রীলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হলে এই স্ত্রীলিঙ্গত্ব পরে প্রাপ্ত হচ্ছে বলে বহিরঙ্গ। আর "শক্যম্" এই নপুংসক-লিঙ্গের সংস্কারটি পূর্বসিদ্ধ বলে অন্তরঙ্গ। অতএব বহিরঙ্গ 'স্ত্রীত্ব' আর অন্তরঙ্গ নপুংসকলিঙ্গ সংস্কারকে বাধাদিতে পারে না। "অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে" এই পরিভাষা থেকেও পাওয়া যায়; অন্তরঙ্গ কার্যে বহিরঙ্গকার্য অসিদ্ধ। এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রে বহু দেখা যায়। "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ [গীতা ১৮।৩১] "দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ন চ নাস্তিকঃ" [রামায়ণ ১।৬।৮]। যাহা হউক্ ভক্ষণ বিষয়ে মানুষের রাগ বশত যে কোন বস্তুর দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রাপ্ত আছে। সেইখানে অর্থাৎ সেই ভক্ষ্যপদার্থ বিষয়ে শাস্ত্র [স্মৃতি শাস্ত্র] "অভক্ষ্যঃ গ্রাম্য কুক্কুটঃ" ইত্যাদি বাক্যে নিয়ম করে দিলেন 'ইহা ভক্ষ্য ইহা অভক্ষ্য"। এখানে গ্রাম্যকুক্কুট বা গ্রাম্যশূকর প্রভৃতির ভক্ষণের নিষেধের দ্বারা শাস্ত্র তদ্‌ভিন্ন ভক্ষ্যবস্তুর ভক্ষণের অনুমোদন করেছেন। এখানে ইহাই নিয়ম, একের নিষেধের দ্বারা অপরের অনুমোদন। এইভাবে

খেদবশত অর্থাৎ চিত্তের খেদ বা কামনিবৃত্তির জন্য মানুষের স্ত্রীতে প্রবৃত্তি হয়। মানুষের সেই প্রবৃত্তি গম্যা এবং অগম্যা স্ত্রীতেও প্রাপ্ত থাকে। শাস্ত্র "পরদারান্ ন মর্শয়েৎ" অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন করবে না, ইত্যাদি নিষেধের দ্বারা শাস্ত্র বিধি অনুসারে বিবাহিত নিজ স্ত্রীগমনের অনুমোদন রূপ নিয়ম করেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে ব্যাকরণ শাস্ত্র জন্য জ্ঞান পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয়, অসাধু শব্দের প্রয়োগ করলে অধর্ম হয়, অতএব অসাধুশব্দের প্রয়োগের নিষেধরূপ নিয়ম ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা করা হয়॥ ৪৭॥

মূল

বেদে খল্বপি "পয়োব্রতো ব্রাহ্মণো যবাগূব্রতো রাজন্য আমিক্ষা-ব্রতো বৈশ্য" ইত্যুচ্যতে। ব্রতং নামাভ্যবহারার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন শালিমাংসাদীন্যপি ব্রতয়িতুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে। তথা বৈল্বঃ খাদিরো বা যূপঃ স্যাদিত্যুচ্যতে। যূপশ্চ নাম পশ্বনুবন্ধার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন যৎ কিঞ্চিদপি কাষ্ঠমুচ্ছ্রি-ত্যানুচ্ছ্রিত্য বা পশুরনুবন্ধুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে।

তথা অগ্নৌ কপালান্যধিশ্রিত্যাভিমন্ত্রয়তে "ভৃগূনামঙ্গিরসাং [ঘর্মস্য] তপসা তপ্যধ্বম্" [বাজসনেয়িসংহিতা ১।১৮]। অন্তরেণাপি মন্ত্রমগ্নির্দহনকর্মা কপালানি সন্তাপয়তি। তত্র চ নিয়মঃ ক্রিয়তে—এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি।

এবমিহাপি সমানায়ামর্থগতৌ(ক) শব্দেন চাপশব্দেন চ ধর্ম-নিয়মঃ ক্রিয়তে—শব্দেনৈবার্থোঽভিধেয়ো নাপশব্দেনেতি। এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি॥৪৮॥

অনুবাদ :—বেদেও 'ব্রাহ্মণ পায়োব্রত, ক্ষত্রিয় যবাগূব্রত, বৈশ্য আমিক্ষা ব্রত' ইহা বলা হয়। ভোজনের জন্য যাহা গ্রহণ করা হয় তাহা ব্রত। ব্রত পালন কারী, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মাংসাদিও ব্রতরূপে গ্রহণ করতে পারে। সেখানে [ব্রতরূপে ভোজনে] নিয়ম করা হয়। সেইরূপ 'বিল্বকাষ্ঠের বা খদির কাষ্ঠের যূপ হবে' ইহা [বেদে] বলা হয়। পশুবন্ধন করবার জন্য যূপ গ্রহণ করা হয়। সেই পশুবন্ধনকারী ব্যক্তি যে কোন কাষ্ঠ তক্ষণ [চাঁছা ছোলা]

(ক) "মর্থাবগতৌ" পাঠান্তর।

করে বা তক্ষণ না করে পশুবন্ধন করতে পারে। সেখানে [কাষ্ঠবিশেষরূপ যূপ বিষয়ে] নিয়ম করা হয়।

সেইরূপ অগ্নিতে কপাল সকল স্থাপন করে মন্ত্র পাঠ করে 'ভৃগুগোত্রীয়-গণের অঙ্গিরা গোত্রীয়গণের তপস্যাদ্বারা তপ্ত হও'। মন্ত্র [মন্ত্রোচ্চারণ] ব্যতীতও দাহক্রিয়াকারী অগ্নি কপাল সকলকে সন্তপ্ত করে। সেখানে [কপালের উষ্ণ করণে] নিয়ম করা হয়—এইরূপ [মন্ত্র পাঠ পূর্বক সন্তপ্ত করা হলে] করা হলে অভ্যুদয় কারী [অদৃষ্টোৎপাদনকারী] হয়। এইরূপ এখানেও [শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে] শব্দের [সাধুশব্দের] দ্বারা এবং অপশব্দের [অসাধুশব্দের] দ্বারা অর্থজ্ঞান সমান ভাবে হলেও ধর্মের নিমিত্ত নিয়ম করা হয়, সাধুশব্দের দ্বারা অর্থের কথন করবে, অসাধুশব্দের দ্বারা অর্থের কথন করবে না। এইরূপ করা হলে [তাদৃশ অনুষ্ঠান] অভ্যুদয়কারী [অদৃষ্টজনক] হয়॥ ৮॥

বিবৃতি :—লৌকিক নিয়ম অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিয়ম দেখিয়ে মহাভাষ্যকার এখন বৈদিক নিয়ম দেখাবার জন্যে বলছেন 'বেদে খল্বপি" ইত্যাদি। 'খলু' এবং 'অপি' এই দুইটি নিপাত নিশ্চয় অর্থের দ্যোতক। মহাভাষ্যে 'পয়োব্রতো ব্রাহ্মণো যবাগূব্রতো রাজন্যআমিক্ষাব্রতো বৈশ্যঃ" এইরূপ বাক্য ঠিক বেদে পঠিত বাক্য নয়। কিন্তু বেদে ব্রাহ্মণের ব্রত, ক্ষত্রিয়ের ব্রত ও বৈশ্যের ব্রত সম্বন্ধে যেরূপ বাক্য আছে, তার অর্থ গ্রহণ করে সেইরূপ তাৎপর্যে মহাভাষ্যকার এখানে বাক্যরচনাপূর্বক উল্লেখ করেছেন। 'ব্রত' বলতে কতকগুলি উপবাসাদি অনুষ্ঠানকে বুঝায়। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে ভোজনবিশেষকেও ব্রত বলা হয়। কোন যাগযজ্ঞ বা তপস্যাবিশেষে যে ভোজনের নিয়ম পালন, সেইরূপ নিয়ম পালনে, ব্রাহ্মণ কেবল দুগ্ধ পান করে থাকবেন, ক্ষত্রিয় কেবল যবাগূ [যবের দ্বারা নির্মিত খাদ্য বিশেষ] ভক্ষণ করে থাকবেন, বৈশ্য কেবল আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা ভক্ষণ করে থাকবেন। দুধ গরম করে ঘন করে তাতে দধি সংযোগ করলে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাকে 'আমিক্ষা' বলে। সুতরাং উহা ছানাবিশেষ। বেদশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম করা হয়েছে। এখন ব্রতানুষ্ঠানকারী মানুষ উত্তম শালি তণ্ডুলের অন্ন এবং মাংস প্রভৃতি ভোজন করেও ব্রতপালন করতে পারেন, কিন্তু সেই ভোজন বিষয়েই এখানে বেদশাস্ত্র নিয়ম করে দিয়েছেন—ব্রাহ্মণ কেবল দুগ্ধপানই করবেন, ক্ষত্রিয় কেবল যবাগূ ভক্ষণ করবেন, বৈশ্য কেবল ছানা ভক্ষণ করবেন ; দুগ্ধ প্রভৃতি একটি ভোজনের নিয়ম করে তদ্ভিন্ন বস্তুর

ভোজনের নিবৃত্তি করে দেওয়া হয়েছে। 'পয়োব্রতঃ' 'পয়ঃ ব্রতং যস্য' এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন শব্দ। এইরূপ 'যবাগূব্রতঃ' এবং 'আমিক্ষাব্রতঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝতে হবে।

মহাভাষ্যকার বৈদিক নিয়মের তিনটি উদাহরণের উল্লেখ এখানে করেছেন। প্রথম উদাহরণের কথা বলে দ্বিতীয় উদাহরণের কথা "তথা বৈল্বঃ খাদিরো বা ......নিয়মঃ ক্রিয়তে।" এই গ্রন্থে বলেছেন। বৈদিক যজ্ঞ তিন প্রকার, ইষ্টি, পশু ও সোম। যে যাগে ওষধি দ্রব্য অর্থাৎ ধান যব প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা যাগ সম্পাদন করা হয়, তাহাকে ইষ্টি যাগ বলে। যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি যাগ। যে যাগে পশুর দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা হয় তাহাকে পশুযাগ বলে। যেমন অশ্বমেধাদি যাগ। সোমলতার রস নিষ্কাসন করে তাহার দ্বারা যে যাগ সম্পাদন করা হয় তাহাকে সোমযাগ বলে। যেমন 'অগ্নিষ্টোম' প্রভৃতি যাগ। সোমযাগেও অপ্রধানভাবে পশুর আহুতি দিতে হয়। পশুকে বন্ধন করার জন্য যূপের প্রয়োজন। এই যূপ বেলকাঠ বা খয়েব কাঠের দ্বারা নির্মাণ হবে—ইহাই বেদে নিয়ম করেছেন। সেই যূপনির্মাণ করতে হলে কাঠকে চেঁছে খুব মসৃণ করতে হয়। আটটি কোণ করতে হয়, 'যূপং তক্ষোতি' 'যূপমষ্টাশ্রী করোতি' ইত্যাদিরূপ যূপের নির্মাণ প্রক্রিয়াও বেদে আছে। যাই হোক যাগে পশুর অনেক সংস্কার আছে। তার মধ্যে পশুকে যূপে বন্ধন করা একটি সংস্কার। পশুকে যে কোন কাঠে বন্ধন করা যেতে পারে, বা কাঠকে না চেঁছেও তাতে পশুকে বাঁধা যেতে পারে। কিন্তু বেদ নিয়ম করে দিলেন—বিল্ব অথবা খদির কাষ্ঠের যূপ করতে হবে। সেই কাষ্ঠ অবশ্য ভালভাবে পালিশ প্রভৃতি করতে হবে। কারণ যূপ বললেই চাঁছা ছোলা কাষ্ঠকে বুঝায়। এই নিয়মেও বিল্ব বা খদির কাষ্ঠের বিধান করে অন্য কাষ্ঠের নিবৃত্তি করে দেওয়া হয়েছে।

তারপর মহাভাষ্যকার—বৈদিক তৃতীয় নিয়মের উল্লেখ করেছেন— "তথাগ্নৌ কপালান্যধিশ্রিত্য ...অভ্যুদয়কারি ভবতীতি।" থালার যেমন কানা কিছুটা উঁচু থাকে সেইরূপ দুই আঙুল উঁচু কানাই বিশিষ্ট মাটির [পোড়ান] থালাকে 'কপাল' বলে। সেই কপাল আগুনের উপর স্থাপন করে কপালকে উষ্ণ করার বিধি বেদে আছে। উষ্ণ করার সময় এই মন্ত্রপাঠ করতে হয়—"ভৃগূনামঙ্গিরসাং ঘর্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্।" • 'ভৃগোরপত্যানি'

এইরূপ ভৃগুশব্দের উত্তর বহুবচনে যে অপত্য প্রত্যয় হয়, সেই অপত্য প্রত্যয়ের —"তদ্রাজস্য বহুষুলুক্ তেনৈবাস্ত্রিয়াম্ পাঃ ২।৪।৬২" অর্থাৎ বহুবচনে তদ্রাজ-প্রত্যয়ের লুক্ হয়ে "ভৃগবঃ" পদসিদ্ধ হয়। এখানে 'ভৃগূনাম্' পদটি ঐ বহুবচনে অপত্যার্থক 'ভৃগু' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ। সুতরাং উহার অর্থ ভৃগুর অপত্যগণের। এইরূপ "অঙ্গিরসাম্" পদেরও অর্থ 'অঙ্গিরার অপত্যগণের'।

'তপসা' এই পদের অর্থ তাপের দ্বারা বা তপস্যার দ্বারা। 'ঘর্মসা' এই পদটি বাজসনেয়ি সংহিতাতে [বর্তমান সংস্করণে] দেখা যায় না। সুতরাং "ভৃগূনামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বম্" এই মন্ত্রের সংক্ষেপে অর্থ হচ্ছে—[হে কপাল সকল] ভৃগুর অপত্যগণের এবং অঙ্গিরার অপত্যগণের তপস্যার দ্বারা বা তাপের দ্বারা তপ্ত হও। কপালগুলিকে অগ্নিতে [অগ্নির উপরে] স্থাপন করে মন্ত্রপাঠ না করেও তপ্ত করা যায়, আবার মন্ত্র বলেও তপ্ত করা যায়। কিন্তু বেদে নিয়ম করে দিয়েছেন—মন্ত্র উচ্চারণ করেই কপাল সকলকে তপ্ত করতে হবে। মন্ত্র উচ্চারণ করে তপ্ত করলে তা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়; সুতরাং মন্ত্র উচ্চারণ না করে তপ্ত করলে সেই অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না। এখানেও মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কপাল সকলের তপ্ত করা বিধির দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ না করে কপালের তপ্ত করার নিবৃত্তি রূপ নিয়ম করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এই বৈদিক তিনটি নিয়মের উদাহরণ প্রদর্শন করে এবং পূর্বে দুইটি লৌকিক নিয়মের উদাহরণের বর্ণনা করে, ব্যাকরণশাস্ত্রের ধর্মনিয়মের উপসংহার করছেন—"এবমিহাপি……অভ্যুদয়কারি ভবতীতি।" পূর্বোক্ত লৌকিক ও বৈদিক নিয়মের দৃষ্টান্তের মত শব্দপ্রয়োগবিষয়েও সাধুশব্দের বা অসাধু শব্দের দ্বারা তুল্যভাবে অর্থজ্ঞান হলেও ধর্মের নিয়ম করা হয়েছে—যে সাধুশব্দের প্রয়োগের দ্বারা অর্থের অভিধান [কথন, বোঝান] করবে, অসাধুশব্দের প্রয়োগ করে অর্থের অভিধান করবে না। এখানেও সাধু শব্দের প্রয়োগের বিধান করে অসাধু শব্দের প্রয়োগের নিবৃত্তিরূপ নিয়ম করা হয়েছে। এইরূপ সাধু শব্দের প্রয়োগ করলে অভ্যুদয় অর্থাৎ ধর্ম হয়। অন্যথা হয় না —ইহাই মহাভাষ্যকারের ভাষ্যের তাৎপর্য। ৪৮ ॥

মূল

[বার্তিক]

'অস্ত্যপ্রযুক্তঃ' [দ্বিতীয় সংখ্যক বার্তিকের অংশ]

[মহাভাষ্য]

সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ। তদ্ যথা—ঊষ, তের, চক্র, পেচ ইতি। কিমতো যৎ সন্ত্যপ্রযুক্তাঃ? প্রয়োগাদ্ধি ভবাঞ্চব্দানাং সাধুত্বমধ্যবস্যতি। য ইদানীমপ্রযুক্তা নামী সাধবঃস্যুঃ। ইদং তাবদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্—যদুচ্যতে সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। যদি সন্তি নাপ্রযুক্তাঃ, অথাপ্রযুক্তা ন সন্তি। সন্তি চ অপ্রযুক্তাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। প্রযুঞ্জান এব খলু ভবানাহ—সন্তি শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাৎ? নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্। সন্তীতি তাবদ্ব্রূমো যদেতাঞ্চাস্ত্রবিদঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে। অপ্রযুক্তা ইতি ব্রূমো যল্লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি। যদপ্যুচ্যতে কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীকঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাদিতি, ন ব্রূমোঽস্মাভিরপ্রযুক্তা ইতি। কিং তর্হি? লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি। নন্থ চ ভবানপ্যভ্যন্তরো লোকে? অভ্যন্তরোঽহং-লোকে ন ত্বহং লোকঃ ॥৪৯॥

অনুবাদঃ—আছে, অপ্রযুক্ত [অব্যবহৃত]। [বার্তিকানুবাদ]

[ভাষ্যানুবাদ]

[পূর্বপক্ষী] [কতকগুলি] শব্দ আছে [কিন্তু] প্রযুক্ত [ব্যবহৃত] হয় না। যেমন—ঊষ, তের, চক্র, পেচ ইত্যাদি।

[অন্য কোন প্রথমপূর্বপক্ষীর বিরোধী পূর্বপক্ষী] আছে অথচ অপ্রযুক্ত [ইহা] যদি [হয়] তাতে কি [হলো]?

[প্রথম পূর্বপক্ষী] আপনি [সিদ্ধান্তী] শব্দ সকলের প্রয়োগ থেকে [শব্দের] সাধুত্ব নিশ্চয় করেন। এখন যেগুলি [যে শব্দগুলি] অপ্রযুক্ত ঐগুলি সাধু হতে পারে না।

[কোন তটস্থ (বিচারে লিপ্ত নয়)] [আপনি ' যে বলছেন "শব্দ সকল আছে অথচ 'অপ্রযুক্ত'—ইহা বিরুদ্ধ। যদি [শব্দ] থাকে [তাহলে] অপ্রযুক্ত নয়, আর যদি অপ্রযুক্ত [হয়, তাহলে] নাই। আছে অথচ অপ্রযুক্ত —ইহা বিরুদ্ধ। আপনি প্রয়োগ করেই বলছেন—শব্দগুলি আছে, অথচ অপ্রযুক্ত। [প্রথম পূর্বপক্ষীর উপর উপহাস] আপনার তুল্য অন্য কোন্ ব্যক্তি এখন আছে—যে শব্দের প্রয়োগে সাধু [কুশল হয়] হতে পারে] ?

[প্রথম পূর্বপক্ষী] না ইহা বিরুদ্ধ নয়। আছে এইকথা বলছি— যেহেতু শাস্ত্রজ্ঞগণ [ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞ] শাস্ত্রের দ্বারা এই শব্দগুলির সংস্কার [প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যুৎপাদন] করে থাকেন। অপ্রযুক্ত ইহা বলছি [এইজন্য] যেহেতু লোকে অপ্রযুক্ত। আর যে আপনি বলছেন— "আপনার তুল্য অন্য কোন্ ব্যক্তি এখন শব্দের প্রয়োগে সাধু আছে ?' [এই বিষয়ে] [শব্দগুলি] আমাদের কর্তৃক অপ্রযুক্ত—ইহা বলছি না। [দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী] তাহলে কি ? [প্রথম পূর্বপক্ষী] লোকে অপ্রযুক্ত [ইহা বলছি]। [দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী] আজ্ঞে ! আপনিও তো লোকের ভিতরে [অন্তর্গত] ? [প্রথম পূর্বপক্ষী] আমি লোকের ভিতরে, কিন্তু আমি লোক নই ॥ ৪৯ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার প্রথম সংখ্যক বার্তিক ব্যাখ্যা করেছেন। এখন দ্বিতীয় বার্তিক ব্যাখ্যা করবার জন্য বার্তিকগ্রন্থ উদ্ধৃত করছেন **'অস্ত্যপ্রযুক্তঃ'**। "অস্ত্যপ্রযুক্তঃ" এইটুকুই দ্বিতীয় বার্তিক নয়। কিন্তু দ্বিতীয় বার্তিক সম্পূর্ণ হচ্ছে "অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ।" মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যার বিষয় বিভাগের সুবিধার জন্য "অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রযোগাৎ" এই সম্পূর্ণ বার্তিকের ' অস্ত্যপ্রযুক্তঃ" এই অংশটি প্রথমে উপস্থাপিত করেছেন। "অস্ত্যপ্রযুক্তঃ" এই অংশটিকে মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীর উপস্থাপনীয় আশঙ্কারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। বার্তিকে যে অস্তি অপ্রযুক্তঃ' এইভাবে একবচনের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ এই নয় যে 'একটি শব্দ অপ্রযুক্ত আছে।' কিন্তু জাতি অভিপ্রায়ে ওখানে একবচনের প্রয়োগ হয়েছে। সুতরাং শব্দত্ববিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ অপ্রযুক্ত অব্যবহৃত, ইহাই বার্তিকগ্রন্থের তাৎপর্য। সেই জন্য এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যকার "সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ" এইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ করে পূর্বপক্ষীর আশয় প্রকটিত করেছেন। পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার উভয়েই পূর্বে বলেছেন 'অনাদিবৃদ্ধব্যবহার

পরম্পরা থেকে জেনে লোকে অপরকে অর্থ বুঝাবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করে, ব্যাকরণশাস্ত্র সেইখানে ধর্মনিয়ম করে—'সাধুশব্দের প্রয়োগ করবে, অসাধু শব্দের প্রয়োগ করবে না।' এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে বা শিষ্টেরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করেন সেইগুলি সাধু; সেই শব্দই ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ করে ব্যুৎপাদন করে। অথচ এমন কতকগুলি শব্দ দেখা যাচ্ছে যেগুলিকে ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত করা হয়েছে, কিন্তু লোকে সেইশব্দ গুলির প্রয়োগ নাই। পূর্বপক্ষী সেইরূপ শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছেন, যেমন—উষ, তের, চক্র, পেচ।

পূর্বপক্ষী মনে করেছেন যে শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা সাধু হয়, যা অপ্রযুক্ত তাহা অসাধু। ব্যাকরণশাস্ত্র সাধু শব্দের ব্যুৎপাদন করে, অসাধু শব্দের ব্যুৎপাদন করে না। অপ্রযুক্ত শব্দ অসাধু। এখন ব্যাকরণ শাস্ত্র যদি অপ্রযুক্ত অর্থাৎ অসাধু শব্দের ব্যুৎপাদন করে তাহা অপ্রমাণ হয়ে পড়বে। পূর্বপক্ষীর মনে মনে এইরূপ অভিপ্রায় থাকলেও 'সব কথা প্রকাশ না করে বলেছেন— —'অপ্রযুক্ত অর্থাৎ যাহার প্রয়োগ করা হয় না এইরূপ শব্দ সকল আছে, যেমন উষ, তের, চক্র, পেচ।'

পূর্বপক্ষী এইকথা বলাতে অপর কোন ব্যক্তি [যিনি, ২য় পূর্বপক্ষী অথবা পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তীর বিচারে লিপ্ত নন] বলছেন—"কিমতো যৎসন্ত্যপ্রযুক্তাঃ" ? 'অপ্রযুক্ত [অব্যবহৃত] শব্দ যদি থাকে' তাতে তোমার কি ক্ষতি হলো ? অন্য তটস্থ ব্যক্তির এইরূপ কথায় প্রথম পূর্বপক্ষী বলছেন—"প্রয়োগাদ্ধি ভবাঞ্ছব্দানাং সাধুত্বম্……নামী সাধবঃ স্যুঃ।" আপনি [সিদ্ধান্তী] প্রয়োগ—থেকে শব্দের সাধুত্ব নিশ্চয় করেন। উষ, তের চক্র, পেচ—ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ নাই। তাহলে এই শব্দগুলির প্রয়োগ নাই বলে—ইহারা অসাধু হউক্। পূর্ব—পক্ষীর এই কথায় তটস্থ ব্যক্তি [দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী] বলছেন—"ইদং তাবদ্বি প্রতিবিদ্ধম্ ····প্রয়োগে সাধুঃ স্যাৎ" আপনার [১ম পূর্বপক্ষীর] কথা পরস্পর বিরুদ্ধ] যেহেতু ঘট প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা জল আনয়ন ক্রিয়া প্রভৃতি কার্য না হলেও, সেই ঘটাদির সত্তা থাকে। কিন্তু শব্দের সত্তা প্রয়োগ থেকেই জানা যায়। প্রয়োগ না হলে শব্দের সত্তা জানা যেতে পারে না। অথচ আপনি বলছেন—শব্দ আছে, অপ্রযুক্ত। সুতরাং আপনার কথা বিরুদ্ধ। শব্দ যদি থাকে—তাহলে প্রযুক্ত হবেই, অপ্রযুক্ত হতে পারে না। আর যদি

অপ্রযুক্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে—শব্দ নাই। আছে অথচ অপ্রযুক্ত ইহা [শব্দের বেলায়] বিরুদ্ধ। আপনি স্বয়ং প্রয়োগ করেই বলছেন, শব্দ আছে কিন্তু অপ্রযুক্ত। আপনি নিজের কথার বিরোধ নিজে বুঝতে পারছেন না—এই অভিপ্রায়ে তটস্থ ব্যক্তি ১ম পূর্বপক্ষীকে উপহাসযুক্ত বাক্য বলছেন, আপনার জাতীয় অন্য কোন্ ব্যক্তি আছে, যিনি এইরূপ শব্দ প্রযোগে পটু ?

তটস্থ ব্যক্তির এইরূপ কথায় প্রথম পূর্বপক্ষী তাঁর পূর্বপক্ষ দৃঢ় করবার জন্য বলছেন—"নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্। সন্তীতি ·······অস্মাভিরপ্রযুক্তাঃ ইতি।" অর্থাৎ আমার কথা বিরুদ্ধ নয়। কারণ ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি দেখে শব্দগুলির সত্তার অনুমান করেছি। আর আপনি [তটস্থ] যে উপহাস করেছিলেন—আপনার মত কোন ব্যক্তি এইরূপ শব্দ প্রযোগে পটু ইত্যাদি। আমার উপর এই দোষও আপতিত হয় না। যেহেতু আমি 'শব্দগুলি অপ্রযুক্ত' বলেছি কিন্তু "আমি শব্দগুলির প্রয়োগ করি না" এই কথা বলি নাই। প্রথম পূবপক্ষীর এই কথা শুনে তটস্থ ব্যক্তি প্রশ্ন করছেন—"কিং তর্হি ? শব্দগুলি আপনার কর্তৃক অপ্রযুক্ত নয় তো কি ? কার কর্তৃক অপ্রযুক্ত ? ইহার উত্তরে প্রথম পূর্বপক্ষী বলছেন—"লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি।" অর্থ বুঝাবার জন্য এই শব্দগুলি লোকে ব্যবহৃত হয় না। তটস্থ ব্যক্তির পুনরায় আক্ষেপ—"নন্থ চ ভবানপ্যভ্যন্তরো লোকে"। আজ্ঞে আপনিও তো লোকের অন্তর্গত। লোকে অপ্রযুক্ত হলে আপনার কর্তৃক ও এই শব্দগুলি অপ্রযুক্ত। তা হলে আপনি যে বলেছিলেন—'আমার কর্তৃক অপ্রযুক্ত—ইহা আমি বলছি না'—আপনার সেই বাক্য অসঙ্গত হয়ে গেল। তটস্থ ব্যক্তির এইরূপ আক্ষেপের উত্তরে প্রথম পূর্বপক্ষী বলছেন—"অভ্যন্তরোঽহং লোকে ন ত্বহংলোকঃ" আমি লোকের ভিতরে বা লোকের অন্তর্গত কিন্তু আমি লোক নয়। অর্থ বুঝাবার জন্য যারা শব্দ প্রয়োগ করে তারাই এখানে 'লোক' শব্দের অর্থ। আমি অর্থ বুঝাবার জন্য 'উস, তের' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করি নাই, কিন্তু শব্দগুলির কেবল স্বরূপেরই উল্লেখ করেছি; সুতরাং আমি লোক নয়। ইহাই প্রথম পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। এইভাবে প্রথম পূর্বপক্ষী তার অপ্রযুক্ত শব্দের সত্তা স্থাপন করে—ইহাই প্রতিপাদন করল যে অপ্রযুক্ত শব্দ যখন আছে, তখন সেই অপ্রযুক্ত শব্দগুলি অসাধু; ব্যাকরণশাস্ত্র সেই সকল শব্দের ব্যুৎপাদন করায় ব্যাকরণ অপ্রমাণ হলো ॥ ৪৯ ॥

মূল

[বার্তিক]

অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ ॥ ২ ॥

[মহাভাষ্য]

অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেৎ, তন্ন। কিং কারণম্? অর্থে শব্দ প্রয়োগাৎ। অর্থে শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে, সন্তি চৈষাং শব্দানামর্থা যেষ্বর্থেষু প্রযুজ্যন্তে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ :—[পূর্বপক্ষ] অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। [সিদ্ধান্ত] না; তাহা নয়। [শঙ্কা] কারণ কি? [উত্তর] অর্থে শব্দের প্রয়োগ হয় এই হেতুক। [বার্তিকানুবাদ] অর্থে [অর্থ বুঝাবার জন্য] শব্দের প্রয়োগ হয়। এই শব্দগুলির [উষ, তের ইত্যাদি শব্দের] অর্থ আছে, যে সকল অর্থে [অর্থ বুঝাবার জন্য] শব্দগুলি প্রযুক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ [ভাষ্যানুবাদ]

বিবৃতি :—'অস্ত্যপ্রযুক্তঃ' এই বার্তিকাংশের দ্বারা পূর্বোক্তরূপে যে আশঙ্কার উত্থাপন করা হয়েছে সেই আশঙ্কার উত্তর দিবার জন্য "অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ" এই সম্পূর্ণ বার্তিক বলা হয়েছে। আশঙ্কা হতে পারে যে "অস্ত্যপ্রযুক্তঃ" এবং "অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ" এই উভয়কে বার্তিক বলে স্বীকার করলে "অস্ত্যপ্রযুক্তঃ" অংশটি পুনরুক্ত হয়ে পড়ে। এর উত্তরে বলা হয় "ন অর্থে শব্দপ্রয়োগাৎ" এই অংশটি নিষেধ বুঝাচ্ছে, যার নিষেধ বুঝাবে, সেই নিষেধ্য অংশটিকে উপস্থাপিত করবার জন্য "অস্ত্যপ্রযুক্তঃ" অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে বলে পুনরুক্তি দোষ হয় না। যাই হোক্ পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছিল উষ ইত্যাদি শব্দগুলি আছে, অথচ লোকে প্রযুক্ত হয় না। তার উত্তরে বার্তিককার এবং বার্তিকের ব্যাখ্যাকার পতঞ্জলি উভয়েই বললেন অর্থে অর্থাৎ অর্থবিষয়ক জ্ঞানের জন্য পদগুলির প্রয়োগ করা হয়। অন্যলোকের যাতে অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার জন্য অপরে 'উষ' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ করেন। বার্তিককার ও ভাষ্যকারের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, যে 'উষ,' 'তের' ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ আছে অর্থাৎ অর্থের জ্ঞান হয়। অর্থের জ্ঞান হয় বলে, সেই অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাদের বাচক শব্দের প্রয়োগের অনুমান করা যায়। যেখানে যেখানে অর্থের জ্ঞান লোকের

হয়, সেই সেই স্থলে সেই সেই অর্থের বাচক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং "উষ' ইত্যাদি শব্দগুলি, লোকে প্রযুক্ত, যেহেতু সেই সেই অর্থজ্ঞানের জনক" এইরূপ অনুমানের দ্বারা শব্দগুলি প্রযুক্ত [লোকে ব্যবহৃত] ইহাই সিদ্ধ হয়, পূর্বপক্ষীর আশঙ্কিত অপ্রযুক্ত নয় (২১৬) ॥ ৫০ ॥

মূল

[বার্তিক]

অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ ॥ ৩ ॥

[মহাভাষ্য]

অপ্রয়োগঃ খল্বপ্যেষাং শব্দানাং ন্যায্যঃ। কুতঃ? প্রয়োগান্যত্বাৎ। যদেতেষাং শব্দানামর্থেঽন্যাঞ্ছব্দান্ প্রযুঞ্জতে। তদ্ যথা —উষেত্যস্য শব্দস্যার্থে ক্ব যূয়মুষিতাঃ, তেরেত্যস্যার্থে কিংযূয়ং তীর্ণাঃ, চক্রেত্যস্যার্থে কিং যূয়ং কৃতবন্তঃ, পেচেত্যস্যার্থে—কিং যূয়ং পক্কবন্ত ইতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ :—প্রয়োগের ভেদ আছে বলে [উষইত্যাদি শব্দের] অপ্রয়োগ [বার্তিকানুবাদ]। [মহাভাষ্যানুবাদ]। এই শব্দগুলির [উষ ইত্যাদি শব্দের] অপ্রয়োগ যুক্তিযুক্তই। কি হেতু [কিহেতু অপ্রয়োগ ন্যায্য]? প্রয়োগের ভেদ আছে [এই হেতু]। যে হেতু এই শব্দগুলির [উষ ইত্যাদি শব্দের] অর্থে [অর্থজ্ঞানের জন্য] [লোকে] অন্য শব্দের প্রযোগ করে। যেমন— 'উষ' এই শব্দের অর্থে [অর্থ বুঝাবার জন্য] 'ক্ব যূয়মুষিতাঃ," 'তের' এই শব্দের অর্থে "কিং যূয়ং তীর্ণাঃ, 'চক্র' এই শব্দের অর্থে ' কিং যূয়ং কৃতবন্তঃ," 'পেচ' এই শব্দের অর্থে "কিংযূয়ং পক্কবন্ত " এই রূপ [প্রয়োগ করে] ॥ ৫১ ॥

বিবৃতি :—পূর্ববার্তিকের শেষাংশে এবং তার ব্যাখ্যারূপ মহাভাষ্যে বলা হয়েছে, যেহেতু 'উষ' 'তের' ইত্যাদি শব্দের অর্থজ্ঞান হয়, সেই হেতু সেই অর্থের বাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, শব্দ গুলি প্রযুক্ত, অপ্রযুক্ত নয়।

---

(২১৬) অর্থে শব্দপ্রয়োগাৎ। অর্থসদ্ভাবঃ শব্দপ্রয়োগে লিঙ্গম্। ন হি বিনা শব্দেনার্থপ্রত্যায়নমুপপদ্যতে ॥—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

অর্থে শব্দপ্রয়োগাৎ ইতি। অর্থবিষয়কজ্ঞানায় শব্দপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

* "ক্ব যূয়ং" পাঠান্তর। 'ক্ব যূয়ং' পাঠান্তর।

অনুমানের দ্বারা শব্দগুলি লোকের প্রযুক্ত বলে জানা যায়। এখন তৃতীয় সংখ্যক বার্তিককে বার্তিককার অন্যমতে উষ, তের ইত্যাদি শব্দ গুলির অন্যভাবে অপ্রযুক্তত্বের আশঙ্কা করছেন। মহাভাষ্যকারও বার্তিক অনুসারে ব্যাখ্যা করে শব্দগুলির অপ্রযুক্তত্বের কারণ বর্ণনা করেছেন। "অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ" এই বার্তিক বাক্যে "অপ্রয়োগঃ" এই পদের সঙ্গে "উষ, তের ইত্যাদিশব্দানাম্ লোকে" এইরূপ বাক্যাংশ অন্বিত করে অর্থ বুঝতে হবে। "লোকে উষ তের ইত্যাদীনাং শব্দানাম্ অপ্রয়োগঃ" এইরূপ বাক্য হবে। সুতরাং তার অর্থ হচ্ছে—'লোকে 'উষ 'তের।' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের অভাব আছে। কি হেতু এই সকল শব্দের প্রয়োগের অভাব আছে? ইহার হেতুরূপে "প্রয়োগান্যত্বাৎ" এই বার্তিকাংশটিকে বুঝতে হবে। "প্রয়োগান্যত্বাৎ" এই শব্দটির এইরূপঅর্থ—"প্রযুজ্যতে ইতি" এইরূপ অর্থে প্রউপসর্গপূর্বক যুজ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে এখানে 'প্রয়োগ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে। যাহাকে প্রয়োগ করা হয় তাহাই এখানে 'প্রয়োগ' এই শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কাকে প্রয়োগ করা হয়? শব্দকেই প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং এখানে 'প্রয়োগ' বলতে শব্দকেই বুঝতে হবে। "প্রয়োগঃ অন্যঃ যস্য [অর্থস্য]' স প্রয়োগান্যঃ' তস্য ভাবঃ প্রয়োগান্যত্বম্।" অর্থাৎ যে অর্থের বোধক অন্য শব্দ আছে,। তাহা 'প্রয়োগান্য"। যে অর্থ বুঝাবার জন্য অন্য শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু 'উষ তের' ইত্যাদি শব্দের যে যে অর্থ, সেই সেই অর্থ বুঝাবার জন্য অন্যশব্দের প্রয়োগ করা হয়। ইহাই 'প্রয়োগান্যত্বাৎ' শব্দের অর্থ (২১৭। সুতরাং সমগ্র বার্তিক বাক্যের অর্থ এইরূপ হলো—"যেহেতু 'উষ, তের' ইত্যাদি শব্দের যা যা অর্থ, সেই সেই অর্থের বোধক অন্যান্য শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেইহেতু 'উষ, তের' ইত্যাদি শব্দগুলির লোকে প্রয়োগ হয় না।" মহাভাষ্যকার এই বার্তিকের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করবার জন্য বলেছেন—এইশব্দগুলির [উষ, তের ইত্যাদির] অপ্রয়োগ ন্যায্যই। 'খলু' ও 'অপি' এই দুইটি নিপাত অবধারণার্থক। উহার ক্রম ভিন্ন হবে—অর্থাৎ "ন্যায্যঃ" এইশব্দের পরে 'খল্বপি' এইরূপ ক্রম বুঝতে হবে। কেন ন্যায্য? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন—'উষ' এই-শব্দটি বস্ নিবাসে + কর্তৃবাচ্যে লিটের মধ্যমপুরুষের বহুবচনের [অ] রূপ।

(২১৭) প্রযুজ্যত ইতি প্রয়োগঃ শব্দঃ সোঽন্যঃ যস্যার্থস্যাস্তি তত্ত্বাদিত্যর্থঃ। —নাগেশ।

এই 'উষ' শব্দের অর্থ—'[তোমরা] বাস করেছিলে' এই অর্থ বুঝাবার জন্য লোকে—"ক যূয়ম্ উষিতাঃ" এইরূপ ভিন্নশব্দের প্রয়োগ করে। এখানে 'উষ' শব্দটি পরোক্ষ অতীত কালকে বুঝায়, যেহেতু পরোক্ষ অতীতে লিট্ হয়। আর "উষিতাঃ" এই শব্দটি বস্ ধাতুর উত্তর অতীত কাল মাত্রে 'ক্ত' [নিষ্ঠা] প্রত্যয় হয়েছে বলে কেবলমাত্র অতীতকাল সামান্যকে বুঝাচ্ছে। সুতরাং 'উষ' এইশব্দের যা অর্থ, সেই অর্থ তো "উষিতাঃ" শব্দটি বুঝাতে পারে না। 'উষিতাঃ' শব্দটি 'উষ' শব্দের সমানার্থক নয়। এইজন্য ''উষিতাঃ' শব্দের সঙ্গে 'ক' এবং 'যূয়ম্' এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে। তাতে 'ক' এই শব্দটি পরোক্ষ অর্থকে বুঝাচ্ছে, 'ক্তঃ' প্রত্যয় [বস্+ক্তঃ=উষিতাঃ] অতীত কাল ও কর্তৃত্ব অর্থকে বুঝাচ্ছে এবং 'যূয়ম্' শব্দটি মধ্যমপুরুষের আভিমুখ্য এবং বহুবচন বুঝিয়ে 'উষ' শব্দের সমানার্থক হয়ে গেছে (২১৮)। 'উষ' এই পদটি কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন। 'উষিতাঃ' এই পদটিও বসধাতু অকর্মক বলে তার উত্তর কর্তৃবাচ্যে— "গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ" [পাঃসূঃ ৩।৪।৭২] এই সূত্রানুসারে ক্ত প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে।

এইরূপ 'তের' পদটি তৄ প্লবনসন্তরণয়োঃ, তৄ ধাতুর লিটের কর্তৃবাচ্যে মধ্যমপুরুষের বহুবচনের রূপ [তৄ+লিট্ কর্তৃ অ], এর অর্থ, তোমরা সন্তরণ করেছিলে বা অতিক্রম করেছিলে। এই অর্থের জ্ঞানের জন্য "কিং যূয়ং তীর্ণাঃ" [পাঠান্তর আছে ক যূয়ংতীর্ণাঃ] এইরূপ অন্যশব্দের প্রয়োগ লোকে করে থাকে। প্লবন বা সন্তরণ, গমনার্থক বলে তৄ ধাতুটি গমনার্থক হওয়ায়, গমনার্থক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ঐ 'গত্যর্থাকর্মক" ইত্যাদি সূত্রে তৄধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করে 'তীর্ণাঃ' পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপ 'চক্র' এই পদটি ডু কৃঞ্করণে—কৃধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদে লিটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'থ [অ] প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ 'তোমরা করেছিলে' কৃধাতু সকর্মক বলে সকর্মকধাতুর [গমনার্থকভিন্ন] উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয় না বলে 'চক্র' এই পদের অর্থ বুঝাবার জন্য কর্তৃবাচ্যে ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত 'কৃতবন্তঃ' 'কিং যূয়ং কৃতবন্তঃ' এইরূপ অন্যশব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে 'পেচ' পদটিও ডুপচষ্ পাকে, পচ্ধাতু+লিট্

(২১৮) যদাপ্যুষেত্যস্য উষিতা ইতি সমানার্থো ন ভবতি পরোক্ষতাদেঃ বিশেষস্যানবগমাত্তথাপি-তৎ প্রত্যায়নায় পদান্তরসহিতঃ প্রযুজ্যতে।—কৈয়ট।

কর্তৃ মধ্যমপুরুষ বহুবচন পরস্মৈপদে থ [অ] প্রত্যয়ান্ত। অর্থ পূর্ববৎ তোমরা পাক করেছিলে। এইধাতু ও সকর্মক বলে তার অর্থ বুঝাতে "পক্কবন্তঃ" এইরূপ ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে 'উষ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝাতে লোকে ঐরূপ অন্যশব্দ যেহেতু প্রয়োগ করে, সেইহেতু ঐ 'উষ' প্রভৃতি শব্দের অপ্রয়োগ ন্যায্য—এই কথা বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার বললেন। প্রথম পূর্বপক্ষী অপ্রয়োগের হেতু দেখাতে না পেরে সিদ্ধান্তীর উপর দোষের আপত্তি দিয়েছিলেন ; আর এই বার্তিকে বা মহাভাষ্যে যে অপ্রয়োগের কথা আছে, সেই অপ্রয়োগের হেতু হচ্ছে অন্যশব্দের প্রয়োগ, অতএব অপ্রয়োগ ন্যায্য ইহাই এই বার্তিক ও ভাষ্যের তাৎপর্য ॥ ৫১ ॥

মূল

[বার্তিক]

অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ ॥ ৪ ॥

[মহাভাষ্য]

যদ্যপ্যপ্রযুক্তাস্তথাপ্যবশ্যং * দীর্ঘসত্রবল্লক্ষণেনানুবিধেয়াঃ। তদ্‌ যথা দীর্ঘসত্রাণি বার্ষশতিকানি বার্ষসহস্রিকাণি চ ; ন চাদ্যত্বে কশ্চিদপ্যাহরতি। কেবলমৃষিসংপ্রদায়ো ধর্ম ইতি কৃত্বা যাজ্ঞিকাঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ :—অপ্রযুক্ত [শব্দ] বিষয়ে দীর্ঘসত্রের মত [দীর্ঘসত্র ইদানীং অপ্রযুক্ত হলেও অন্যকালে যেমন প্রযুক্ত হোত, সেইরূপ কতকগুলি শব্দ ইদানীং অপ্রযুক্ত হলেও কালান্তরে প্রযুক্ত হোত] [বার্তিকার্থ]। [ভাষ্যার্থ] যদি ও [উষ প্রভৃতিশব্দ] অপ্রযুক্ত [অব্যবহৃত] তথাপি দীর্ঘসত্রের মত লক্ষণের দ্বারা [ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা] সংস্কার্য। যেমন—শতবৎসরব্যাপী, সহস্র-বৎসরব্যাপী দীর্ঘসত্রসকল [বেদ থেকে জানা যায়] কিন্তু আজকাল কোন লোকও [সেই সকল দীর্ঘসত্রের] অনুষ্ঠান করে না। কেবল ঋষিসম্প্রদায় [বেদাধ্যয়ন] ধর্ম,—এইহেতু [দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন করেন] যাজ্ঞিকগণ শাস্ত্রের দ্বারা [কল্প-সূত্রের দ্বারা] বলে থাকেন ॥ ৫২ ॥

বিবৃতি—পূর্বে বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীর মতাবলম্বনে

---

* 'যদ্যপ্যপ্রযুক্তা অবশ্যং' [তথাপি, পাঠ নাই] পাঠান্তর।

বলেছেন—'উষ' প্রভৃতি শব্দগুলি যে অর্থ বুঝায় সেই অর্থ বুঝাবার জন্য লোকে অন্যশব্দ ব্যবহার করে, সেইজন্য ঐ 'উষ' ইত্যাদি শব্দগুলি অপ্রযুক্ত। এখন বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার উভয়েই উত্তররূপে "শব্দগুলি অপ্রযুক্ত হলেও ব্যাকরণ শাস্ত্রে সেগুলির ব্যুৎপাদন করা যায়" ইহা বলবার জন্য দীর্ঘসত্রের উদাহরণ দিয়েছেন। "অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ"—এইটি চতুর্থ বার্তিক। এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘসত্র সকল পূর্বে অনুষ্ঠিত হোত, এখন অনুষ্ঠিত হয় না। অনুষ্ঠিত না হলেও যেমন বেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তিরা সেই সকল 'সত্র' বেদের যে অংশে পঠিত আছে, সেই বেদাংশ অধ্যয়ন করেন এবং যাজ্ঞিকেরা [যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিরা] কল্পসূত্রের সাহায্যে সেই সকল দীর্ঘসত্রের কথা বলে থাকেন: সেইরূপ "উষ, তের" ইত্যাদি শব্দ সকল অপ্রযুক্ত হলেও ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ করে সেই সকল শব্দের অনুশাসন কর্তব্য বলে, ব্যাকরণশাস্ত্রে তাদের ব্যুৎপাদন অন্যায্য নয়। আশঙ্কা হতে পারে—ব্যাকরণশাস্ত্র প্রয়োগমূলক—প্রযুক্তশব্দ [সাধুশব্দ] সকল দেখে ব্যাকরণসূত্র রচনা করা হয়েছে। এখন 'উষ, তের' ইত্যাদি অপ্রযুক্ত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণসূত্র যদি ঐ সকল শব্দের সংস্কার করে, তা হলে তো ব্যাকরণশাস্ত্র অপ্রমাণ হয়ে পড়ে। এর উত্তরে নাগেশ বলেছেন, বর্তমানে বা পাণিনি যখন সূত্রগুলি রচনা করেন, সেইসময় শব্দগুলি অপ্রযুক্ত হলেও কালান্তরে [অতীতে] শব্দগুলি প্রযুক্ত হত—ইহা পাণিনি দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জেনে ঐ সকল শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়াদিদ্বারা ব্যুৎপাদনের নিমিত্ত সূত্র রচনা করেছেন, অতএব তাঁরসূত্র অপ্রমাণ হতে পারে না (২১৯)। কল্পসূত্রে পাওয়া যায়—একশত বৎসর বা একহাজার বৎসর ব্যাপী এক একপ্রকার সত্র অনুষ্ঠিত হত। জ্যোতিষ্টোম যাগ তিন প্রকার—একাহ, অহীন এবং সত্র। একদিনে যে সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়ে সমাপ্ত হয়, তাকে 'একাহ' বলে। একদিনের অধিক দুই, তিন, ইত্যাদিরূপে ১২ দিন পর্যন্ত যে সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 'অহীন' বলে। ১২ দিনের উপর, তের, চৌদ্দ দিন, একমাস, ছয়মাস, একবৎসর শত বৎসর সহস্রবৎসর ইত্যাদি দীর্ঘকালে অনুষ্ঠিত সোমযাগকে সত্র বলে। শত-

---

(২১৯) নন্বপ্রযুক্তানুশাসনে নির্মূলত্বাচ্ছাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যং স্যাদতআহ সংপ্রতি ইতি। পাণিনের্ব্যাকরণপ্রণয়ন কালে ইত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপে দ্যোত।

বৎসর, সহস্র বৎসর পর্যন্ত যে সত্র সকল অনুষ্ঠিত হত, সেগুলিকে দীর্ঘসত্র বলা হয় অনেক যজমান মিলে সত্রের অনুষ্ঠান করতেন। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে [২৪।৫।২৩—২৪] "শতসংবৎসরং সাধ্যানম্। সহস্রসংবৎসরং বিশ্বসৃজাম্" ইত্যাদিরূপে সাধ্যান অয়ন নামক শতবৎসরব্যাপী সত্রের এবং সহস্রসংবৎসরব্যাপী বিশ্বসৃজাময়ন নামক সত্রের উল্লেখ আছে। "অহানি বাভিসংখ্যত্বাৎ" [জৈঃসূঃ ৭।৩১—৪০] এই মীমাংসাসূত্রে বৎসরকে দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহস্রবৎসর মানুষ বাঁচতে পারে না—এইজন্য এখানে বৎসর বলতে দিন বুঝতে হবে। অপরে বলেন এখন মানুষ শতবর্ষজীবী হলেও পূর্বে মানুষ বিশেষ করে ঋষিরা শতবৎসরের অধিক সহস্র বৎসর পর্যন্তও বাঁচতেন বলে এখানে বৎসরের অর্থ দিন ধরবার কোন হেতু নাই। বৎসর অর্থই এখানে গ্রাহ্য।

ঋষিসম্প্রদায় = বেদাধ্যয়ন। অনুবিদধতে = সংস্কার করেন। অনুবিধেয়াঃ = সংস্কারের যোগ্য ॥ ৫২ ॥

মূল

[বার্তিক]

সর্বে দেশান্তরে ॥ ৫ ॥

[মহাভাষ্য]

সর্বে খল্বপি এতে শব্দা দেশান্তরেষু * প্রযুজ্যন্তে। ন চৈবোপলভ্যন্তে +। উপলব্ধৌ যত্নঃ ক্রিয়তাম্। মহান্ হি ০ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ—সপ্তদ্বীপা বসুমতী, ত্রয়ো লোকাঃ, চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা ভিন্নাঃ ×, একশতমধ্বর্যুশাখাঃ, সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ, একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্, নবধা—থর্বণোবেদঃ, বাকোবাক্যম্, ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বৈদ্যকমিত্যেতাবাঞ্ছব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। এতাবন্তং শব্দস্য প্রয়োগবিষয়মননুনিশম্য 'সন্ত্যপ্রযুক্তা' ইতি বচনং কেবলং সাহসমাত্রম্। এতস্মিংশ্চাতিমহতি শব্দস্য

---

* 'দেশান্তর' পাঠান্তর। + 'ন চৈত উপলভ্যন্তে' পাঠান্তর। 0 'মহান্ শব্দস্য' পাঠান্তর। × 'বিভিন্নাঃ' পাঠান্তর।

প্রয়োগবিষয়ে তে তে শব্দাস্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা—শবতির্গতিকর্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষিতো ভবতি, বিকার * এনমার্যা ভাষন্তে শব ইতি। হম্মতিঃ সুরাষ্ট্রেষু, রংহতিঃ প্রাচ্যমধ্যেষু†, গমিমেবত্বার্যাঃ প্রযুঞ্জতে। দাতির্লবনার্থে প্রাচ্যেষু, দাত্রমুদীচ্যেষু। যে চাপ্যেতে ভবতোঽপ্রযুক্তা অভিমতাঃ শব্দা এতেষামপি প্রয়োগো দৃশ্যতে। ক্ব? বেদে। তদ্‌ যথা ‡—সপ্তাস্যে রেবতী রেবদূষ [ঋ. সং ৪।৫১।৪], যদ্বো রেবতী রেবত্যাং তদূষ,[১] যত্রা[২] নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র [ঋ. সং. ১।১৬৫।১১], যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্‌ [ঋ. সং ১।৮৯।৯]+ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ :—সব [এইসব শব্দ] অন্যদেশে [প্রযুক্ত হয়] [বার্তিকানুবাদ] ॥ [ভাষ্যানুবাদ] এই সকল শব্দ অন্য দেশে ব্যবহৃত হয়। [আশঙ্কা] এই শব্দগুলির [উষ, তের ইত্যাদি শব্দের] উপলব্ধি হয় না। [উত্তর] উপলব্ধির নিমিত্ত যত্ন কর। শব্দের প্রয়োগের স্থল বিশাল [ব্যাপক] সপ্তদ্বীপসমন্বিত পৃথিবী, তিন লোক [ভূলোক, ভুবলোক স্বর্লোক], অঙ্গের সহিত, রহস্যের সহিত চার বেদ বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন, - একশত এক অধ্বর্যু [যজুর্বেদের] শাখা, সামবেদ সহস্রশাখাযুক্ত, ঋগ্বেদ একবিংশতি শাখাবিশিষ্ট, অথর্ববেদ নয়শাখায় বিভক্ত, উক্তি প্রত্যুক্তিরূপশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, চিকিৎসাশাস্ত্র এই পরিমিত শব্দের প্রয়োগের স্থল। শব্দের এতাবৎ প্রয়োগস্থলের আলোচনা না করে "অপ্রযুক্ত [শব্দ] আছে" এই কথা বলা কেবল সাহসমাত্র [হঠকারিতামাত্র]। শব্দের প্রয়োগের এই অতি বিশাল ক্ষেত্রে, সেই সেই [নির্দিষ্ট] শব্দ সকল, সেই সেই স্থলে নিয়ত অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়। যেমন—গমানার্থক শুধাতু কম্বোজদেশেই কথিত [ব্যবহৃত] হয়। আর্যেরা ইহাকে বিকার [মৃতপ্রাণী] অর্থে 'শব বলে ব্যবহার করেন। হম্মধাতু [গমনার্থক] সুরাষ্ট্রে, রংহ ধাতু পূর্বদেশে ও মধ্যদেশে, আর্যেরা কিন্তু [গমনার্থে] গম ধাতুকেই প্রয়োগ করেন।

* "বিকার এবৈনম" পাঠান্তর। † 'প্রাচ্যমধ্যমেষু' পাঠান্তর। ‡ 'তদ্‌যথা' পাঠ নাই অন্যপুস্তকে।

১ 'রৈবতী রেবত্যাং অমূষ' এই পাঠান্তর দেখা যায়, উহা অশুদ্ধ পাঠ।

২ 'যত্রে নরঃ শ্রুত্যং' ইত্যাদি পাঠান্তর. অশুদ্ধ।

পূর্বদেশে দাতি [দা ধাতু] ছেদনার্থে, উত্তরদেশে দাত্র অর্থে [ব্যবহার করে]। আর আপনার এই যে সকল অভিমত অপ্রযুক্ত [অপ্রযুক্তরূপে অভিমত] শব্দ, উহাদেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

[পূর্বপক্ষী] কোথায়? [উত্তর] বেদে। সপ্তাস্থেরেবতী রেবদূষ [হে বিত্তশালী দেবগণ! আপনারা 'সপ্তাস্থে' বিত্তকে আলোকিত করেছেন]। যদ্বো রেবতী রেবত্যাং তদূষ [হে বিত্তশালী দেবগণ! যাহা সম্পৎপূর্ণ, সেইরূপ আলোকে আপনারা আমাদিগকে আলোকিত করেছেন]। যত্রা নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র [হে বীরগণ! যে প্রার্থনা ঐকান্তিকভাবে শ্রুত হয়, তোমরা আমার জন্য তাহা করেছ]। যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্ [যেখানে তোমরা আমাদের শরীরের জরাকে দৃঢ় করেছ]॥ ৫৩॥

বিবৃতি ঃ—বার্তিকার ও মহাভাষ্যকার পূর্বে বলেছেন—"উষ, তের" প্রভৃতি শব্দগুলি প্রাচীনকালে প্রযুক্ত হত, যেমন দীর্ঘসত্র। এখন বার্তিককার বলছেন—এই আধুনিক কালেও সেই সকল শব্দ অন্যদেশে প্রযুক্ত হয়। এই দেশে বর্তমানে প্রযুক্ত না হলেও অন্যদেশে বর্তমানকালেই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে বলেছিল, শব্দগুলি অপ্রযুক্ত, পূর্বপক্ষীর ঐ কথা সম্পূর্ণ অযুক্ত। বার্তিককার দেশান্তরে শব্দগুলি প্রযুক্ত হয় বলেছেন। মহাভাষ্যকার বার্তিকের ব্যাখ্যায় বললেন—দেশান্তরে যেমন এই সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়; সেইরূপ এই দেশেও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে—ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়। বার্তিকের 'দেশান্তরে' শব্দটি লোকান্তর, বিষয়ান্তরের উপলক্ষণ। পূর্বপক্ষী বলছেন—"ন চৈত উপলভ্যন্তে" অর্থাৎ এই 'উষ তের' ইত্যাদি শব্দগুলি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্র অতি ব্যাপক। এই সপ্তদ্বীপা সম্পূর্ণ পৃথিবীতে শব্দের প্রয়োগ হয়। পুরাণ শাস্ত্রে এই পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপের বর্ণনা আছে—জম্বুদ্বীপ [ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত], প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ এবং পুষ্করদ্বীপ। এই সমস্ত দ্বীপে লোকে শব্দের ব্যবহার করে। তিন লোক—ভূলোক, ভুবলোক এবং স্বর্গলোক। যদিও এই তিন লোকের মধ্যে পৃথিবী অন্তর্গত হয়েছে, তথাপি পৃথিবীতে শব্দের ব্যবহারের বাহুল্য আছে বলে সপ্তদ্বীপা বসুমতী বলে পৃথিবীর পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ হয়েছে [নাগেশ]। ভুবলোকের দ্বারা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল

নামক অধোদেশে সপ্তলোকের গ্রহণ বুঝতে হবে। স্বর্লোকশব্দের দ্বারা— স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক বুঝতে হবে। সুতরাং তিনলোক বলতে এখানে চতুর্দশভুবন বুঝতে হবে। এই চতুর্দশভুবনে শব্দের ব্যবহার আছে। তারপর শব্দ সকল সমস্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসব শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন মহাভাষ্যকার—প্রথমে চার বেদ। এই চারবেদের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যকার বলেছেন—অধ্বর্যুশাখা একশত এক। যজ্ঞে যজুর্বেদের মন্ত্রের কাজই প্রধানভাবে হয়ে থাকে, এবং সেই যজুর্বেদের কাজ যিনি করেন তাঁকে অধ্বর্যু বলে। এইজন্য অধ্বর্যুশাখা বলতে যজুর্বেদের শাখাসকল বুঝতে হবে। সামবেদ সহস্রবর্ত্মা, 'বর্ত্মন্' শব্দের দ্বারাও এখানে শাখাকেই বুঝাচ্ছে, সুতরাং সামবেদের এক হাজার শাখা। "একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্" ঋগ্বেদে সবচেয়ে বেশী মন্ত্র আছে বলে সেই বেদ যাঁরা পড়েন—তাঁদিগকে বহ্বৃচ বলে। 'বহ্বৃচানামাম্নায়ঃ' অর্থাৎ বহ্বৃচগণের বেদ এই অর্থে 'ঞ্য' প্রত্যয় করে 'বাহ্বৃচ্যম্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং 'বাহ্বৃচ্যম্' বলতে ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদের একুশটি শাখা। "নবধা আথর্বণো" অথর্বন্ শব্দের উত্তর 'তেন প্রোক্তম্' সূত্রে অণ্ প্রত্যয় করে 'আথর্বণ' শব্দ সিদ্ধ হয়। সেই আথর্বণ শব্দের উত্তর আবার 'তমধীযতে' অর্থে ঠক্ প্রত্যয় করে আথর্বণিক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তারপর আবার আথর্বণিকদের বেদ এই অর্থে আথর্বণিক শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় এবং ইক প্রত্যয়লোপ করে 'আথর্বণঃ' পদ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ অথর্ব বেদ। অথর্ব বেদের নয়টি শাখা। এইভাবে সমস্ত বেদ ১১৩১টি শাখায় বিভক্ত। তারপর বেদের অঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ। রহস্য বলতে উপনিষদ্ অংশকে বুঝতে হবে। "বাকোবাক্যম্" উচ্যতে ইতি বাকঃ পূর্বপক্ষবচনম্। অর্থাৎ যাহা বলা হয় তাকে বাক বলে, তার অর্থ পূর্বপক্ষের উক্তি। 'উচ্যতে ইতি বাক্যম্ উত্তরপক্ষবচনম্। অর্থাৎ 'বাক্যম্ বলতে এখানে উত্তরপক্ষের উক্তি বুঝতে হবে। 'বাকশ্চ বাক্যং চ অনয়োঃ সমাহারঃ' এইরূপ সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করে 'বাকোবাক্যম্' পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। যে শাস্ত্রে পূর্বপক্ষের উক্তি ও উত্তরপক্ষের উক্তি থাকে তাহাকে'বাকোবাক্যং' শাস্ত্র বলে। অবশ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে তর্কশাস্ত্রকে 'বকোবাক্যম্' বলেছেন। 'ইতিহাস' শব্দের অর্থ যে শাস্ত্রে 'পূর্বকালীন ব্যক্তিদের চরিত্রবর্ণনা থাকে

সেই শাস্ত্র। যেমন রামায়ণ, মহাভারত। পুরাণ = সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ মন্বন্তর এবং তত্ত্ববর্ণনা যে শাস্ত্রে থাকে তাহাকে পুরাণ বলে। বৈদ্যক = চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র। মহাভাষ্যকারের এইসব উল্লিখিত শাস্ত্রের দ্বারা অন্যান্য শাস্ত্রও তাঁহার অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে। উপবেদ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা, কাব্য, নাট্য ইত্যাদি শাস্ত্রও বুঝতে হবে। অবশ্য শিষ্ট বা আপ্তবাক্যই গ্রাহ্য। নাস্তিক প্রভৃতির বাক্যকে মহাভাষ্যকার শব্দের প্রয়োগের স্থলরূপে গ্রহণ করেন নাই।

এই ভাবে চতুর্দশ ভুবন, বেদাদি বিশাল শাস্ত্রসমূহ শব্দের ক্ষেত্র। এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা না করে, অন্যান্য লোকে না গিয়ে যে ব্যক্তি বলে এই শব্দগুলি 'অপ্রযুক্ত' তার মত মহামূঢ় আর কে আছে—এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন ঐরূপ 'অপ্রযুক্ত' বলা হঠকারিতা। তারপর মহাভাষ্যকার বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন "শবতির্গতিকর্মা" ধাতুকথনে "ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দেশে' এই সূত্রানুসারে ইক্ বা শ্তিপ্ প্রত্যয় হয়। 'শুধাতু বুঝাবার জন্য শ্তিপ্ প্রত্যয় করে 'শবতিঃ' এইরূপ হয়েছে। সুতরাং 'শবতি' মানে শুধাতু। গতি হয়েছে কর্ম যার অর্থাৎ গত্যর্থক। শুধাতুর গমন অর্থে কম্বোজদেশেই প্রয়োগ হয়। আর আর্যেরা বিকার অর্থে মৃত প্রাণীর দেহকে বুঝাবার জন্য 'শব' শব্দের প্রয়োগ করেন। গমনার্থক 'হম্ম' ধাতু সুরাষ্ট্রেই প্রযুক্ত হয়। গমনার্থক 'রংহ' ধাতু পূর্বদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়। আর্যেরা গমন অর্থ বুঝাবার জন্য 'গম্‌ৢ' ধাতুরই প্রয়োগ করেন। পূর্বদেশে ছেদন অর্থে দা ধাতুর প্রয়োগ হয়। আবার উত্তরদেশে 'দাতি' শব্দকে দাত্র [কাটারি] অর্থে ব্যবহার করে। এইভাবে শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়। আর পূর্বপক্ষী যে, উষ, তের, চক্র পেচ' প্রভৃতি শব্দকে অপ্রযুক্ত বলেছিলেন,—মহাভাষ্যকার সেই শব্দগুলি বেদে প্রযুক্ত আছে—ইহা দেখাবার জন্য কতকগুলি বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যদিও সেই মন্ত্রগুলির মধ্যে 'তের' এবং 'পেচ' শব্দের উল্লেখ নাই তথাপি এইরূপ বেদ পাওয়া যাবে যে বেদবাক্যে ঐ দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যাবে, এই অভিপ্রায়ই মহাভাষ্যকারের বুঝতে হবে। তা ছাড়া তো তিনি শব্দের বিশাল ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এমন অপ্রযুক্ত শব্দ নাই, পাণিনি, যার অনুশাসন

করেছেন। অতএব প্রযুক্ত শব্দেরই অনুশাসন করায় পাণিনি ব্যাকরণ প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

কিং পুনঃ শব্দস্য জ্ঞানে ধর্ম আহোস্বিৎ প্রয়োগে ? কশ্চাত্র বিশেষঃ ?

[বার্তিক]

জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাঽধর্মঃ ॥ ৬ ॥

[মহাভাষ্য]

জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাঽধর্মঃ * প্রাপ্নোতি। যো হি শব্দাঞ্জানা-ত্যপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব শব্দজ্ঞানে ধর্ম এবমপশব্দ-জ্ঞানেঽপ্যধর্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসো হ্যপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা—গৌরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ :—[পূর্বপক্ষ] শব্দের জ্ঞানে ধর্ম অথবা প্রয়োগে [ধর্ম] ?

[অপর পূর্বপক্ষ] এখানে [শব্দের জ্ঞান বা প্রয়োগ বিষয়ে] বিশেষ [ভেদ] কি ? (ভাষ্যানুবাদ)

[পূর্বপক্ষরূপ বার্তিক] যদি জ্ঞানে ধর্ম ইহা [বল] তাহলে অধর্ম [ও প্রাপ্ত হয়]'॥ ৬ ॥ [বার্তিকানুবাদ]

(ভাষ্যানুবাদ , জ্ঞানে ধর্ম—ইহা যদি হয়, সেইরূপ অধর্ম প্রাপ্ত হয়। যে, শব্দ সকল [সাধুশব্দ] জানে, সে, অপশব্দসকল ও [অসাধু শব্দও] জানে। শব্দজ্ঞানে [সাধুশব্দজ্ঞানে] যেমনই ধর্ম [হয়], অপশব্দজ্ঞানেও এইরূপ অধর্ম [হয়], অথবা বহুতর অধর্ম প্রাপ্ত হয়। যেহেতু অপশব্দ বহুতর [অধিকসংখ্যক] ; শব্দ [সাধুশব্দ] অল্পতর [অল্পসংখ্যক]। এক একটি সাধুশব্দের বহু অপভ্রংশ [আছে]। যেমন—'গৌঃ' এই সাধুশব্দের গাবী,

---

* 'তথাঽধর্মোঽপি' পাঠান্তর।

গোণী, গোতা, গোপোতলিকা—ইত্যাদি প্রকার অপভ্রংশ সকল [আছে] ॥ ৫৪ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার প্রথমেই 'শব্দানুশাসন' শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে বলে—শব্দের স্বরূপ, শব্দজ্ঞানের প্রয়োজনের কথা বলে ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন উচিত—ইহা দেখিয়েছেন। তারপর ব্যাকরণশাস্ত্র কিভাবে শব্দের উপদেশ করে—তাহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করে, শব্দের প্রকার ভেদ, অর্থের স্বরূপ, শব্দ, অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধের নিত্যতা প্রতিপাদন পূর্বক শব্দ প্রয়োগের লোকব্যবহারপূর্বকত্ব কীর্তন করে ব্যাকরণের ধর্মনিয়মকারকতা প্রদর্শন করেছেন। তারপর 'অপ্রযুক্ত শব্দের সংস্কারজনকতানিবন্ধন ব্যাকরণশাস্ত্র অপ্রমাণ'—এই প্রকার পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা খণ্ডন করে শব্দের প্রযুক্ততা স্থাপন করেছেন। এখন সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম অথবা প্রয়োগে ধর্ম—এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপনের নিমিত্ত প্রথমে পূর্বপক্ষ বার্তিক অনুসারে পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা প্রদর্শন করছেন—"কিং পুনঃ শব্দস্য জ্ঞানে ধর্ম আহোস্বিৎ প্রয়োগে" ? সাধু-শব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয়, অথবা জেনে প্রয়োগ বা ব্যবহার করলে ধর্ম উৎপন্ন হয় ? এইরূপ পূর্বপক্ষীর বাক্য শুনে, তটস্থ কোন ব্যক্তি অথবা দ্বিতীয় কোন পূর্বপক্ষী—জিজ্ঞাসা করছেন—"কশ্চাত্র বিশেষঃ ?" অর্থাৎ শব্দের জ্ঞান মাত্র থেকে যদি ধর্ম হয়, অথবা জ্ঞানপূর্বক শব্দের প্রয়োগ [উচ্চারণ] থেকে যদি ধর্ম হয়, তাহলে বিশেষ বা প্রভেদ কি ?

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষ রূপে বার্তিককার বলেছেন— সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যদি ধর্ম হয় বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে অধর্মও হবে। "জ্ঞানে ধর্মঃ অথবা প্রয়োগে" এইরূপ স্থলে সপ্তমীর অর্থ 'জনকতা' বলে বুঝতে হবে। অর্থাৎ সাধুশব্দের জ্ঞান ধর্মের জনক বা প্রয়োগ ধর্মের জনক। বার্তিকে যে বলা হয়েছে—"জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেৎ তথা অধর্মঃ" এর যথাশ্রুত অর্থ হচ্ছে—'সাধুশব্দের জ্ঞান যদি ধর্মের জনক হয়, তাহলে সেইরূপ অধর্মের জনক হবে।" কিন্তু যাহা ধর্মের জনক, তাহা আবার কিরূপে অধর্মের জনক হবে ? ধর্ম ও অধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ বলে, যেই বস্তু ধর্মের জনক হয়, সেই বস্তু অধর্মের জনক হতে পারে না! অতএব বার্তিকগ্রন্থ অসঙ্গত মনে হয়। এইরূপ আশঙ্কা হলে মহাভাষ্যকারের কথা স্মরণ করতে হয়। মহাভাষ্যকার পূর্বে বলেছিলেন —"ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি র্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্" ব্যাখ্যা থেকে শব্দের

বিশেষ অর্থের জ্ঞান হয়, সন্দেহবশত লক্ষণ বা লক্ষণবাক্য অলক্ষণ হয় না। এইজন্য মহাভাষ্যকার উক্ত বার্তিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে, তার আনুষঙ্গিক ভাবে অসাধু শব্দের জ্ঞান অবর্জনীয়ভাবে অর্জিত হয়ে যায়। ব্যাকরণ শাস্ত্র থেকে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণজনিত সাধুশব্দের জ্ঞান হলে সেই সাধু শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দগুলি যে অসাধু এই জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে হবেই. তাকে বর্জন করা যাবে না। তাহলে এখন সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যদি ধর্ম স্বীকার করা হয়, সাধুশব্দের জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী রূপে অর্জিত অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মও হবে; অধর্ম অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এইরূপ অর্থ করায় বার্তিক গ্রন্থ অসঙ্গত হয় না। মহাভাষ্যকার এই কথা বলে, তারপর বলেছেন; অসাধু শব্দজ্ঞান থেকে কেবল অধর্ম হবে —এইমাত্র নয়; কিন্তু অধিক অধর্ম হবে। কারণ সাধু শব্দের অপেক্ষা অসাধু শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী। একটি সাধু শব্দকে জানলে সেই সাধু শব্দের পর্যায় অসাধু শব্দ অনেক থাকায়, অনেক অসাধু শব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী হবে। তাতে একটি সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যদি একটি ধর্ম হয়, তাহলে তার পর্যায় অনেক অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অনেকগুলি অধর্ম হবে। একটি সাধু শব্দের জ্ঞানজন্য একটি ধর্ম যদি, অসাধু শব্দজ্ঞানজন্য অধর্মসমূহের মধ্যে একটি অধর্মকে নষ্ট করে—ইহা স্বীকার করা হয়, তাহলেও অসাধু শব্দ অনেক বলে, তজ্জন্য অধর্মের সংখ্যার আধিক্যই সিদ্ধ হবে। অসাধু শব্দের সংখ্যা যে অনেক বেশী তাহা জানাবার জন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন 'গৌঃ' এই একটি সাধু শব্দের অপভ্রংশ রূপ অসাধু শব্দ গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা ইত্যাদি আছে। সুতরাং সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে উক্তরূপে বহু অধর্মও উপস্থিত হবে বলে স্বীকার করতে হবে ॥ ৫৪ ॥

মূল

[বার্তিক]

আচারে নিয়মঃ ॥ ৭ ॥

[মহাভাষ্য]

আচারে পুনঋর্ষির্নিয়মং বেদয়তে—"তেঽসুরা হেঽলয়ো হেঽলয় ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবু" রিতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ :—[শব্দের] প্রয়োগে নিয়ম [সাধুশব্দ প্রয়োগ করবে অসাধু-শব্দপ্রয়োগ করবে না—এইরূপ নিয়ম] ॥ ৭ ॥ [বার্তিকানুবাদ] । [ভাষ্যানুবাদ] বেদ [শব্দের] প্রয়োগ বিষয়ে নিয়ম জানান—সেই অসুরেরা হে অলিগণ, হে অলিগণ—এইরূপ উচ্চারণ করে পরাজিত হয়েছিল ॥ ৫৫ ॥

বিবৃতি :—শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে, শব্দের জ্ঞান লাভ করতে গেলে অসাধুশব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী বলে সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যেমন ধর্ম হবে, সেইরূপ অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মও হবে। এই হেতু—শব্দের জ্ঞানে ধর্ম = এই পক্ষটি যুক্তিযুক্ত নয়। এই পক্ষটি বেদবিরুদ্ধ (২২০)। অতএব বার্তিককার "শব্দের প্রয়োগে ধর্ম" এই পক্ষে নিয়মের কথা বলেছেন "আচারে নিয়মঃ" এখানে বার্তিকে'আচার' শব্দেরঅর্থ 'প্রয়োগ'। সুতরাং শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের প্রয়োগে [উচ্চারণে] নিয়ম আছে বা নিয়ম জ্ঞাপিত হয়েছে। মহাভাষ্যকার বার্তিক গ্রন্থের "নিয়ম" এর ব্যাখ্যা করেছেন "আচারে পুন ঋষি নিয়মং বেদয়তে"। মহাভাষ্যের ঋষি শব্দের অর্থ বেদ। যেহেতু "তেঽসুরা" ইত্যাদি বেদবাক্য ঋষিকর্তৃক রচিত নয়। যদিও মহাভাষ্যকার বেদসমূহ বিভিন্ন ঋষি প্রণীত বলেছেন, তথাপি তাহা সর্বসম্মত নয় বলে, ঋষিশব্দের এখানে 'বেদ' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বেদ নিয়ম জ্ঞাপন করেছেন - এই কথা বলে মহাভাষ্যকার "তেঽসুরাঃ হেঽলয়ো হেঽলয়ঃ" ইত্যাদি" শ্রুতি উদ্ধৃত করে নিয়মের জ্ঞাপন বুঝিয়ে দিয়েছেন। অসুরেরা "হেঽলয়ো হেঽলয়ঃ" ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অসাধু শব্দ উচ্চারণ করার ফলে পরাজিত হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে অসাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে অসুরদের অধর্ম হয়েছিল। এ থেকে আরও বুঝা গেলে যে—'সাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে ধর্ম হয়।' সুতরাং "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি থেকে এই নিয়ম জ্ঞাপিত হল "সাধুশব্দের প্রয়োগ করবে, অসাধুশব্দের প্রয়োগ করবে না।" এখানে এই নিয়মই বার্তিককারের বার্তিকের তাৎপর্য। এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ১৩ সংখ্যক মহাভাষ্যের বিবৃতিতে দ্রষ্টব্য। সাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে যে ধর্ম হয়—তার জ্ঞাপক অন্য-শ্রুতিও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে—"একঃশব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি।" ॥ ৫৫ ॥

---

(২২০) এবং চ প্রয়োগাদেবাধর্মবদ্ধর্মোঽপীতি জ্ঞানাদ্ধর্ম ইতি বেদবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

মূল

[মহাভাষ্য]

অস্তু তর্হি প্রয়োগে।

[বার্তিক]

প্রয়োগে সর্বলোকস্য ॥ ৮ ॥

[মহাভাষ্য]

যদি প্রয়োগে ধর্মঃ, সর্বো লোকোঽভ্যুদয়েন যুজ্যেত। কশ্চেদানীং ভবতো মৎসরো যদি সর্বো লোকোঽভ্যুদয়েন যুজ্যেত? ন খলু কশ্চিন্মৎসরঃ। প্রযত্নানর্থক্যং তু ভবতি। ফলবতা চ নাম প্রযত্নেন ভবিতব্যম্। ন চ প্রযত্নঃ ফলাদ্ ব্যতিরেচ্যঃ। ননু চ যে কৃতপ্রযত্নাস্তে সাধীয়ঃ শব্দান্ প্রযোক্ষ্যন্তে, ত এব সাধীয়োঽভ্যুদয়েন যোক্ষ্যন্তে।

ব্যতিরেকোঽপি বৈ লক্ষ্যতে—দৃশ্যন্তে হি কৃতপ্রযত্নাশ্চাপ্রবীণাঃ, অকৃতপ্রযত্নাশ্চ প্রবীণাঃ। তত্র ফলব্যতিরেকোঽপি স্যাৎ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ:—[মহাভাষ্য] তা হলে [শব্দের] প্রয়োগে [ধর্ম—এই পক্ষ] হউক [স্বীকৃত হোক]। [বার্তিক] প্রয়োগে [ধর্ম এইপক্ষে] সকল লোকের [ধর্ম প্রসঙ্গ হবে]। [মহাভাষ্য] যদি [শব্দের] প্রয়োগে ধর্ম হয়, তা হলে সকল লোক [মানুষ] অভ্যুদয়ের [স্বর্গাদি] দ্বারা যুক্ত হবে। [পূর্বপক্ষ] যদি সমস্ত লোক অভ্যুদয়ের দ্বারা যুক্ত হয় [তাতে] এখন আপনার দ্বেষ কেন? [উত্তর] না আমার দ্বেষ নাই। প্রযত্নের ব্যর্থতা হয়। প্রযত্ন ফলজনক হওয়া উচিত। প্রযত্ন ফলবানে থাকবে না এটা ঠিক নয়।

[পূর্বপক্ষ] যাহারা প্রযত্ন করে তাহারা সাধুতরভাবে [উত্তমরূপে] শব্দের [সাধুশব্দের] প্রয়োগ করবে, এবং তাহারাই [উত্তমরূপে] অধিকতর অভ্যু-দয়ের দ্বারা যুক্ত হবে? [উত্তর] ব্যতিরেকও দেখা যায়—দেখা যায় যারা [ব্যাকরণশাস্ত্রে] প্রযত্ন করে তারা [শব্দপ্রয়োগবিষয়ে] অকুশল [হয়], আর যারা [ব্যাকরণে] প্রযত্ন করে না, তারা [শব্দ প্রয়োগে] কুশল হয়। সেইস্থলে [শব্দপ্রয়োগের কুশলতা ও অকুশলতায়] ফলের ব্যতিরেক ও হবে ॥ ৫৬ ॥

বিবৃতি—পূর্বে বার্তিককার এবং মহাভাষ্যকার শব্দের প্রয়োগে নিয়মের কথা বলেছেন। তাতে মহাভাষ্যকার নিজের মতানুসারে বলছেন—"অস্তু তর্হি প্রয়োগে" অর্থাৎ শব্দের জ্ঞানে ধর্ম অথবা প্রয়োগে ধর্ম—এই দুই পক্ষের মধ্যে 'জ্ঞানে ধর্ম' এই পক্ষে দোষ বলা হয়েছে। ঐ পক্ষে যদি দোষ থাকে—আর প্রয়োগে যদি নিয়মই থাকে তা হলে "শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয়' এইপক্ষই স্বীকার করা হউক। ইহার উত্তরে অথবা এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বার্তিককার শব্দের প্রয়োগপক্ষে দোষের আপত্তি দিচ্ছেন—"প্রয়োগে সর্বলোকস্য।" "শব্দের প্রয়োগে ধর্ম" এইপক্ষ স্বীকার করলে সকল লোকের ধর্ম ও তজ্জন্য অভ্যুদয়ের [স্বর্গাদির] প্রসঙ্গ হবে। মহাভাষ্যকারও এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় বললেন—যদি শব্দের প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করা হয়, তাহলে সব লোক অভ্যুদয় প্রাপ্ত হবে। বার্তিককার ও মহাভাষ্যকারের এই কথায় কোন পূর্বপক্ষী বলছেন—'কশ্চেদানীং······যুজ্যেত?" যদি সাধুশব্দের প্রয়োগকরে ধর্মজন্য অভ্যুদয়—সকল লোকের সম্ভাবিত হয়, তাহলে তো সেটা কোন দোষের নয়, পরন্তু তাহা মঙ্গলেরই হেতু হয়। আপনার [বার্তিককারের ও ভাষ্যকারের] তাতে [সকলের অভ্যুদয় প্রাপ্তিতে] দ্বেষ কেন? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"ন খলু কশ্চিৎ·········ন চ প্রযত্নঃ ফলাদ্ ব্যতিরেচ্যঃ"। না, আমার দ্বেষ নাই। সকল লোকে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হবে—এইটা দোষ নয়, কিন্তু প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করলে প্রযত্ন অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রযত্ন ব্যর্থ হবে। আমি ব্যর্থতা দোষের কথাই বলছি। শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হলে কেন ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়নপ্রযত্ন ব্যর্থ হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার প্রযত্নের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। অভিপ্রায় এই, শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হলে সকল লোক শব্দের প্রয়োগ করে ধর্মলাভ করবে। যারা ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রযত্ন করে নাই, তারাও শব্দের প্রয়োগ করে ধর্মপ্রাপ্ত হবে, আর ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রযত্ন করে, শব্দের প্রয়োগ যাঁরা করবেন তাঁরাও তুল্যভাবে ধর্মপ্রাপ্ত হবেন। এতে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রযত্ন ব্যর্থ হল। কারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রযত্ন না করে যদি ধর্ম বা তজ্জন্য অভ্যুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহলে ব্যাকরণে প্রযত্নটি আর অভ্যুদয়ের কারণ হবে না। সুতরাং ব্যাকরণে প্রযত্ন ব্যর্থ হবে। অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা কারণতা নির্ণয় হয়। তৎসত্ত্বে তৎসত্তা—হচ্ছে অন্বয়। তদসত্ত্বে তদসত্তা হচ্ছে ব্যতিরেক। যেমন মৃত্তিকা সত্ত্বে

ঘটের সত্তা মৃত্তিকা অসত্ত্বে ঘটের অসত্তা দেখা যায় বলে এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান থেকে ঘটের প্রতি মৃত্তিকার কারণতা জানা যায়। এইরূপ ব্যাকরণের প্রযত্ন থাকলে যদি ধর্ম হয় তাহলে অন্বয় থাকবে। এবং ব্যাকরণের প্রযত্ন না থাকলে যদি ধর্ম না হয়, তাহলে ব্যতিরেক থাকবে। কিন্তু ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করে সব লোক শব্দের প্রয়োগ করে যদি ধর্মপ্রাপ্ত হয়, তা হলে ব্যাকরণে প্রযত্নের অভাবেও ধর্ম প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যতিরেক থাকলো না; ব্যতিরেকের ব্যভিচার হল। সুতরাং ব্যাকরণে প্রযত্নটা আর ধর্ম বা অভ্যুদয়ের প্রতি কারণ হলো না। অতএব ব্যাকরণে প্রযত্ন ব্যর্থ হবে। প্রযত্নের ফল থাকা উচিত। প্রযত্নটি ফলের আশ্রয়ে যদি না থাকে তাহলে প্রযত্ন নিষ্ফল হয়। যেমন—অভ্যুদয়রূপফলের অধিকরণ যদি ব্যাকরণের অনধ্যয়নকারী ব্যক্তি হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিতে প্রযত্নের অভাব থেকে যাবে। তাতে প্রযত্নটি "ব্যতিরেচ্য" অর্থাৎ ফলকে ছেড়ে থাকবে। সুতরাং ব্যাকরণ প্রযত্ন ব্যর্থ হবে। কিন্তু এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাই মহাভাষ্যকারের বার্তিকব্যাখ্যার তাৎপর্য। মহাভাষ্যকার এইরূপ বলাতে কোন পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছেন—"নন্থ চ যে কৃতপ্রযত্না··· ··যোক্ষ্যন্তে?" যাঁরা ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রযত্ন করবেন তাঁরা উত্তমরূপে অধিক সাধু শব্দ প্রয়োগ করবেন; তাতে তাঁরা অধিক ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে অধিক অভ্যুদয় লাভ করবেন। আর যাঁরা ব্যাকরণে প্রযত্ন করবেন না তাঁরা সাধুশব্দের প্রয়োগ করলেও তত উত্তমরূপে বা অধিকভাবে সাধুশব্দের প্রয়োগ করতে পারবেন না। তাতে তাঁরা অধিক ধর্ম বা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হবেন না। এইভাবে ব্যাকরণে প্রযত্নের সার্থকতা আছে। ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বার্তিকের অভিপ্রায় অনুসারে বলেছেন—"ব্যতিরেকোঽপি বৈ লক্ষ্যতে··· · তত্র ফলব্যতিরেকোঽপি স্যাৎ।" অনেক সময় দেখা যায় যারা ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রযত্ন করেছে, তারা শব্দ প্রয়োগে তত কুশল হয় না। আবার ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রযত্ন করে নাই—এইরূপ অনেক লোক শব্দপ্রয়োগে বেশ কুশল হয়। যারা শব্দপ্রয়োগে কুশল হয়, তাদের ফলও নিশ্চয় ভাল হয়। আর যারা শব্দপ্রয়োগে কুশল হয় না—তাদের ফলেরও ন্যূনতা হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শব্দের প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করলে ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রযত্ন ব্যর্থ হয়॥ ৫৬॥

মূল

[মহাভাষ্য]

এবং তর্হি নাপি জ্ঞান এব ধর্মো নাপি প্রয়োগ এব। কিং তর্হি ?

[বার্তিক]

শাস্ত্রপূর্বকে প্রয়োগে অভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন ॥ ৯ ॥

[মহাভাষ্য]

শাস্ত্রপূর্বকং যঃ শব্দান্ প্রযুঙ্‌ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে ; তত্তুল্যং বেদশব্দেন। বেদশব্দা অপ্যেবমভিবদন্তি "যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উচৈনমেবংবেদ" "যোঽগ্নিংনাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনমেবং বেদ" [তৈঃ ব্রাঃ ৩।১১।৭।২] ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ] তাহলে এইরূপে জ্ঞানেও [সাধুশব্দের জ্ঞানে] ধর্ম [হয] না, প্রয়োগেও ধর্ম [হয়] না। প্রয়োগে ধর্ম [হয়] না। তাহা হলে কি ? [কোন বস্তু থেকে ধর্ম হয়] ?

[বার্তিকানুবাদ] শাস্ত্রপূর্বক [ব্যাকরণের অধ্যয়নপূর্বক] প্রয়োগে [সাধু-শব্দের প্রয়োগে] [ধর্ম], তাহা [শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগ] বেদ শব্দার্থের সহিত তুল্য ॥ ৯ ॥

[মহাভাষ্যানুবাদ] যে ব্যক্তি শাস্ত্রপূর্বক [ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়ন পূর্বক] শব্দ সকল [সাধুশব্দ সকল] প্রয়োগ করে সেই ব্যক্তি অভ্যুদয়ের [স্বর্গাদিফলের] দ্বারা যুক্ত হয়। বেদের শব্দ যে অর্থের বোধক সেই অর্থের সহিত তাহা [শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগ] তুল্য। বেদের শব্দও এইরূপ বলেন—"যিনি অগ্নিষ্টোম যাগ করেন এবং ঐ অগ্নিষ্টোমযাগকে এইরূপ জানেন।" [তিনি যথার্থ ফল প্রাপ্ত হন]।

"যিনি নাচিকেতনামক অগ্নির চয়ন [স্থণ্ডিলরচনাপূর্বক নাচিকেত অগ্নিস্থাপন ও তৎসাধ্য কর্ম] করেন এবং যিনি এই চয়নকে জানেন" [তিনি যথাযথ ফলপ্রাপ্ত হন] ॥ ৫৭ ॥

বিবৃতি :—সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে অসাধু শব্দজ্ঞানজনিত বহু অধর্ম এবং সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করলে—ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রযত্ন ব্যর্থ

হয়। এইভাবে বার্তিককার উভয়পক্ষেই দোষ দেখিয়ে এসেছেন। বার্তিক অনুসারে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"তাহলে জ্ঞানেও ধর্ম হয় না। প্রয়োগেও ধর্ম হয় না।" উভয় পক্ষ নিষিদ্ধ হওয়ায় তটস্থ কোন ব্যক্তি বা কোন পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করছেন—"কিং তর্হি?" তাহলে কি? অর্থাৎ কিসে ধর্ম হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার সিদ্ধান্ত বললেন—"শাস্ত্রপূর্বকে··· বেদশব্দেন"। শাস্ত্রপূর্বক অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রকৃতপ্রত্যয়াদির জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয়। এবং সেই ধর্ম থেকে অভ্যুদয় হয়। কেবল প্রয়োগ থেকে ধর্ম স্বীকার করলে ব্যাকরণে প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির জ্ঞানপূর্বক শব্দের [সাধুশব্দের] প্রয়োগে ধর্মস্বীকার করলে ব্যাকরণ প্রযত্ন ব্যর্থ হয় না। কারণ ব্যাকরণ অধ্যয়নে যত্ন না করলে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির জ্ঞান হয় না। অতএব প্রকৃতি প্রত্যয়াদির জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। যাঁরা ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করে সাধুশব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁদের সেই প্রয়োগ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির জ্ঞানপূর্বক নয় বলে—সেই প্রয়োগ হতে ধর্ম হয় না। কিন্তু যাঁরা ব্যাকরণাধ্যয়ন করে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁরা ধর্ম ও ধর্মজন্য অভ্যুদয়ের দ্বারা যুক্ত হন। অতএব ব্যাকরণে প্রযত্ন ব্যর্থ নয়। কেবল জ্ঞানে ধর্ম হয় না। কেবল জ্ঞানে ধর্ম না হলেও জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগে ধর্ম হয়—ইহাই এখানে সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। মহাভাষ্যকার বার্তিকের এইরূপ ব্যাখ্যা করে 'তত্তুল্যং বেদশব্দেন" এই বার্তিকাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন—বেদের শব্দসকলও এইরূপ বলেন—অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে ধর্ম বা অভ্যুদয় হয়—এই কথা বলেন। কেবল জ্ঞানে বা কেবল অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় হয় না। এই কথা বলে মহাভাষ্যকার দুইটি বৈদিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। 'যিনি অগ্নিষ্টোম যাগের পদ্ধতি জেনে অগ্নিষ্টোম যাগ করেন তিনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন।' 'যিনি নাচিকেত নামক অগ্নির চয়ন [চয়ন একপ্রকার কর্ম] জেনে—তার অনুষ্ঠান করেন—তিনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন?' এই দুইটি দৃষ্টান্তে জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে ধর্ম হয়—ইহাই বলা হয়েছে। ইহার তুল্য শব্দের প্রয়োগে অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির জ্ঞান-পূর্বক সাধু শব্দের প্রয়োগেও পূর্বোক্ত দুইটি বৈদিক স্থলের মত ধর্ম হয়। বার্তিকের 'বেদশব্দেন' এই শব্দের অর্থ হচ্ছে—'বেদঃ শব্দঃ [অর্থবোধকঃ] যস্য [অর্থস্য]' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন হয়ে বৈদিক অর্থের [অনুষ্ঠানের]

সহিত। বৈদিক অনুষ্ঠানের সহিত তুল্য হচ্ছে শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগ। অগ্নিষ্টোম জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে যেমন ধর্ম হয়, সেইরূপ ব্যাকরণজন্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয় ॥ ৫৭ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অপর আহ তত্তুল্যং বেদশব্দেনেতি। যথা বেদশব্দা নিয়মপূর্বকমধীতাঃ ফলবন্তো ভবন্তি, এবং যঃ শাস্ত্রপূর্বকং শব্দান্ প্রযুঙ্‌ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যত ইতি। অথবা পুনরস্তু জ্ঞান এব ধর্ম ইতি। নন্থ চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাঽধর্ম ইতি। নৈষ দোষঃ। শব্দপ্রমাণকা বয়ম্, যচ্ছব্দ আহ—তদস্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেঽধর্মম্। যচ্চ পুনরশিষ্টা-প্রতিষিদ্ধং নৈব তদ্দোষায় ভবতি নাভ্যুদয়ায়। তদ্‌যথা—হিক্কিত হসিত কণ্ডূয়িতানি নৈব দোষায় ভবন্তি নাভ্যুদয়ায় ॥৫৮॥

অনুবাদ :- অপরে বলেন—"তত্তুল্যং বেদশব্দেন" ইহার অর্থ, যেমন নিয়মপূর্বক অধীত বেদশব্দ ফলবান্ হয়, এইরূপ যে, শাস্ত্রপূর্বক [ব্যাকরণা-ধ্যয়নজনিত প্রকৃতিপ্রত্যয় জ্ঞানপূর্বক] শব্দের প্রয়োগ করে সে অভ্যুদয়ের দ্বারা যুক্ত হয়।

অথবা [সাধুশব্দের] জ্ঞানেই ধর্ম হউক্। [পূর্বপক্ষী] বলা তো হয়েছিল —জ্ঞানে ধর্ম ইহা যদি [স্বীকার করা হয়] তাহলে সেইরূপ অধর্ম [হবে]। [উত্তর] না। এই দোষ হয় না। আমরা শব্দপ্রমাণবাদী, শব্দ যাহা বলে তাহা আমাদের প্রমাণসিদ্ধ। শব্দ -শব্দজ্ঞানে ধর্ম বলে, অপশব্দ জ্ঞানে অধর্ম বলে না। আর যে সকল শব্দ বিহিতও নয় নিষিদ্ধও নয়, তাহা দোষের কারণও হয় না, অভ্যুদয়ের কারণও হয় না। যেমন হিক্কা, হাস্য ও কণ্ডূয়ন শব্দ, দোষের হেতুও নয়, অভ্যুদয়ের হেতুও নয় ॥ ৫৮ ॥

বিবৃতি :—"তত্তুল্যং বেদশব্দেন" এই বার্তিকবাক্যাংশের ব্যাখ্যা মহাভাষ্যকার পূর্বেই করেছেন। সেই ব্যাখ্যায় 'বেদশব্দটি" বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্নরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এখন ভাষ্যকার বলছেন অপরে বলেন—"বেদশব্দ" এই শব্দটি কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্নরূপে গ্রহণ করতে হবে।

"বেদ এব শব্দ" 'বেদশব্দ.'। বেদ শব্দ যেমন ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মপূর্বক অধীত হলে ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ শাস্ত্রপূর্বক অর্থাৎ ব্যাকরণাধ্যয়নপূর্বক প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি জ্ঞানপূর্বক শব্দের প্রয়োগ করলে অভ্যুদয় হবে। এইভাবে বার্তিককারের সিদ্ধান্ত হল, শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগে ধর্ম হয়, কেবল জ্ঞানে বা কেবল প্রয়োগে ধর্ম হয় না। কিন্তু মহাভাষ্যকার কেবল জ্ঞানেও ধর্ম হয়—এই পক্ষ স্থাপন করবার জন্য বলছেন—"অথবা পুনরস্তু জ্ঞান এব ধর্ম ইতি।" সাধুশব্দের জ্ঞানেই ধর্ম হউক্; কোন ক্ষতি নাই। তাতে পূর্বপক্ষী বলেন—"নম্নু চোক্তং ……অধর্ম ইতি।" সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে—অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হবে—এই দোষের আপত্তি পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। পূর্বপক্ষীর এই কথার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন "নৈষ দোষঃ, · ·· নাপশব্দজ্ঞানেহ ধর্মম্।" সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করতে হলে অসাধু শব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী হলেও অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মের আপত্তি হতে পারে না। কারণ সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যে ধর্ম হয়, তার বোধক শ্রুতিরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। 'অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়'—এই বিষয়ে কোন শাস্ত্র প্রমাণ নাই। ধর্ম ও অধর্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ। উহার প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব অনুমানও সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শব্দই ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে প্রমাণ। শাস্ত্র যদি বলে সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম হবে, তাহলে তাহা [সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম] প্রামাণিক হবে। শাস্ত্র যদি অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়—এই কথা না বলে তাহলে অসাধু শব্দের জ্ঞান অধর্মের জনক হতে পারে না।

"একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গেলোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি" এই শ্রুতি থেকে জানা যাচ্ছে একটি শব্দ [সাধুশব্দ] সম্যগ্‌জ্ঞাত হলে স্বর্গে বা ইহলোকে কাম্য ফল প্রদান করে। এই ধরণের কোন শাস্ত্র নাই যাহা অসাধু শব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয়—এই কথা বলে। সুতরাং অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হতে পারে না বলে—'সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম' এইপক্ষ স্বীকারে কোন বাধা নাই। "অসাধু শব্দ জানবে না" এইরূপ নিষেধ যদি শাস্ত্রে থাকতো তাহলে যেখানে যেখানে নিষেধ থাকে, সেই সেই স্থলে নিষেধ্যের অনুষ্ঠান বা জ্ঞান থেকে অধর্ম হয় বলে, অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হত। কিন্তু ঐরূপ নিষেধও দেখা যায় না।

যে বিষয়ে কোন বিধি থাকে না বা নিষেধ থাকে না সেই বিষয় থেকে ধর্মও হয় না বা অধর্মও হয় না। মহাভাষ্যকার এর উদাহরণ দিয়েছেন—যেমন হিক্কা, হাসা ও কণ্ডূয়ন ইত্যাদি। হিক্কার শব্দ, হাঁসার শব্দ বা কণ্ডূয়নের শব্দ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বিধান নাই; এবং নিষেধও নাই। অতএব ঐ হিক্কা প্রভৃতি কোন অভ্যুদয়েরও হেতু হয় না বা কোন প্রত্যবায়েরও হেতু হয় না। সুতরাং সাধুশব্দের জ্ঞানে অভ্যুদয়ের কথা শাস্ত্রে আছে বলে জ্ঞানে ধর্ম স্বীকারে কোন অনুপপত্তি নাই। আমরা [বৈয়াকরণরা] শব্দকে প্রমাণ স্বীকার করি—ইহাই মহাভাষ্যকারের তাৎপর্য ॥ ৫৮ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথবাঽভ্যুপায় এবাপশব্দজ্ঞানং শব্দজ্ঞানে। যো হি অপশব্দাঞ্জানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং জ্ঞানে ধর্ম ইতি ব্রুবতোঽর্থাদাপন্নং ভবতি—অপশব্দজ্ঞানপূর্বকে শব্দজ্ঞানে ধর্ম ইতি।

অথবা কূপখানকবদেতৎ ভবিষ্যতি। তদ্ যথা কূপখানকঃ কূপং খনন্ যদ্যপি মৃদা পাংসুভিশ্চাবকীর্ণো ভবতি সোঽপ্সু সঞ্জাতাসু তত এব তং গুণমাসাদয়তি, যেন স চ* দোষো নির্হণ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবতি। এবমিহাপি যদ্যপি অপশব্দজ্ঞানেঽধর্মস্তথাপি যস্ত্বসৌ শব্দজ্ঞানে ধর্মস্তেন চ+স দোষো নির্ঘানিষ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি। যদপুচ্যতে আচারে নিয়ম ইতি, যাজ্ঞে কর্মণি স নিয়মোঽন্যত্রানিয়মঃ(২২১)। এবং হি শ্রূয়তে যর্বাণস্তর্বাণো নাম ঋষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্মাণঃ পরাবরজ্ঞা বিদিতবেদিতব্যা অধিগত

---

*'.যন চ স দোষো' পাঠান্তর। + 'তেন স চ দোষো' পাঠান্তর।

(২২১) 'যজ্ঞে সুশব্দপ্রয়োগাদ্ধর্মোঽপশব্দপ্রয়োগাদধর্ম ইতি তত্রৈব তয়োঃ প্রয়োগনিয়মঃ। তদ্ব্যতিরিক্তস্থলে তু সুশব্দাপশব্দয়োঃ প্রয়োগেঽনিয়মঃ।" উদ্দ্যোত।

যাথাতথ্যাঃ। তে অত্রভবন্তো যদ্বান স্তদ্বান ইতি প্রযোক্তব্যে যর্বাণস্তর্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে। যাজ্ঞে পুনঃ কর্মণি নাপভাষন্তে। তৈঃ পুনরসুরৈ র্যাজ্ঞে কর্মণি অপভাষিতম্, ততস্তে পরাভূতাঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ:—অথবা অপশব্দের জ্ঞান, [সাধু] শব্দের জ্ঞানে উপায়। যে অপশব্দ জানে' সে শব্দ সাধুশব্দ] ও জানে। সুতরাং এইরূপ হলে [সাধুশব্দের জ্ঞানে অপশব্দজ্ঞান উপায় হলে] 'জ্ঞানে ধর্ম' এই কথা বলা থেকে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়—অপশব্দ জ্ঞান পূর্বক [সাধু] শব্দের জ্ঞানে ধর্ম [হয়]।

অথবা ইহা [অপশব্দের জ্ঞান জন্য অধর্ম ও সাধুশব্দের জ্ঞান জন্য ধর্ম] কূপ খনন কারীর মত হবে। যেমন কূপ খননকারী ব্যক্তি কূপ খনন করে যদিও মাটি এবং কাদার দ্বারা যুক্ত হয়, [তথাপি] [কূপে] জল উদ্ভূত হলে, সেই ব্যক্তি সেই জল হতে সেই [সেই এমন] গুণ প্রাপ্ত হয়, যে গুণের [জলের গুণের] দ্বারা সেই দোষ [কর্দম, ধূলি প্রভৃতিদোষ] নিবৃত্ত করা হয়, এবং অধিকতর অভ্যুদয়ের [মঙ্গল গুণের] সহিত [তাহার] যোগ হয়। এইরূপ এখানেও [শব্দজ্ঞানেও] যদিও অপশব্দের জ্ঞানে অধর্ম [হয়] তথাপি শব্দ [সাধুশব্দ] জ্ঞানে সেই যে ধর্ম [হয়] তাহার দ্বারা সেই দোষ [অধর্মদোষ] বিনষ্ট করা হয় এবং অধিকতর অভ্যুদয়ের [অপূর্বের] দ্বারা যোগ হয়। আর যে বলা হয় [হয়েছে] আচারে [শব্দপ্রয়োগে] নিয়ম [আছে], সেই নিয়ম যজ্ঞকর্মে [প্রয়োজ্য], যজ্ঞকর্মভিন্ন স্থলে অনিয়ম। এইরূপ শোনা যায় [শ্রুতিবাক্য শোনা যায়]—যোগজ প্রত্যক্ষের দ্বারা ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন, পরা ও অপরাবিদ্যাসম্পন্ন, জ্ঞাতব্যবিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন, তত্ত্বসাক্ষাৎকারবান্, যর্বাণ তর্বাণ নামক ঋষিগণ ছিলেন। সেই পূজ্য ঋষিগণ 'যদ্বা নঃ' 'তদ্বা নঃ' এইরূপ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে—'যর্বাণঃ' 'তর্বাণঃ' এইরূপ প্রয়োগ করেছিলেন। [তাঁরা] কিন্তু যজ্ঞকর্মে অপভাষা [অপভ্রংশাদি অসাধুশব্দ] প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু সেই অসুরেরা যজ্ঞকর্মে অপভাষা [অশুদ্ধ শব্দ] প্রয়োগ করেছিল; সেই হেতু তারা পরাজিত হয়েছিল ॥৫৯॥

বিবৃতি:—মহাভাষ্যকার শব্দের [সাধুশব্দের] 'জ্ঞানে ধর্ম' এই পক্ষ স্বীকার করে, অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না ইহা দেখিয়ে এসেছেন। এখন তিনি অন্যরূপে অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না—অথচ সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম হয়—ইহা প্রতিপাদন করবার জন্য বলেছেন "অথবা অভ্যুপায় এব........শব্দজ্ঞানে ধর্ম ইতি।" শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞান অর্জন করতে গেলে অপশব্দ অর্থাৎ

অসাধুশব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। অপশব্দগুলিকে অপশব্দত্বরূপে জানলে, তা থেকে ভিন্নরূপে শব্দের জ্ঞান হয়। সুতরাং সাধুশব্দের জ্ঞানলাভে অপশব্দের জ্ঞান উপায় অর্থাৎ সহকারী কারণ বলে, অপশব্দের জ্ঞানের কোন পৃথক্ ফল নাই। সাধুশব্দজ্ঞানের নান্তরীয়ক [অবশ্যম্ভাবী] হচ্ছে অসাধুশব্দের জ্ঞান। এইজন্য তার পৃথক্ ফল নাই। অতএব অপশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হতে পারে না। এই বিষয়ে নাগেশ একটি দৃষ্টান্ত বলেছেন। অগ্নি আনয়ন করতে গেলে পাত্রের আনয়ন অগ্নি আনয়নের নান্তরীয়ক [অবশ্যম্ভাবী], অগ্নি আনয়নের ফল থেকে পাত্র আনয়নের পৃথক্ ফল নাই। সেইরূপ সাধুশব্দের জ্ঞানে অসাধুশব্দের জ্ঞান নান্তরীয়ক [অবশ্যম্ভাবী] বলে, অসাধুশব্দের জ্ঞানের পৃথক কোন ফল নাই। অতএব সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম হলেও, অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না। এইজন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন—যে অপশব্দ জানে সেই সাধুশব্দ জানে। সুতরাং 'জ্ঞানে ধর্ম' এইপক্ষে অর্থাৎ পাওয়া যায়—অপশব্দের জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম হয়।

শব্দের জ্ঞানে ধর্ম হয়, অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না—ইহা মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত। তিনি এই সিদ্ধান্ত বলার পর—"তুষ্যতু দুর্জনঃ" এই ন্যায়ে 'অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয়' ইহা অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার করে নিয়েও "সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম" এই পক্ষটিকে ব্যবস্থাপিত করছেন—"অথবা কূপখানকবদিত্যাদি··· ·······ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি"। পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা 'অভ্যুপগমবাদ' দেখান হয়েছে। দুর্জন ব্যক্তিকে সহসা বশীভূত করা কষ্টকর, এইজন্য সে যা চায়, প্রথমে তাকে তার প্রার্থিত বস্তুর কিয়দংশ দিয়ে দিতে হয়। সে তার প্রার্থিত বস্তু পেলে আপাতত তুষ্ট হয়। ইহাকে 'তুস্যতু দুর্জনঃ' ন্যায় বলে। এখানে অসাধুশব্দের জ্ঞানে যদিও অধর্ম হয় না—ইহা মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত, তথাপি "অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়" ইহা স্বীকার করে নিয়ে, সেই অধর্মদোষের পরিহার ধর্ম থেকে হবে—বলে কূপখানকের উপমা দিয়েছেন। কূপ খনন করতে গেলে শরীরে কাদা মাটি লাগবেই। কিন্তু কূপ খনন করা হয়ে গেলে, সেই কূপ থেকে যে জল বেরোয়, সেই জলের দ্বারা কূপখননকারী ব্যক্তি শরীরে লগ্ন কর্দম ও শুষ্ক মৃত্তিকা প্রক্ষালন করে ফেলে, আর অধিকভাবে কূপের জলে স্নান আচমন পানাদি কার্য নিষ্পাদন করে।

সেইরূপ সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করতে গেলে অসাধুশব্দের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী বলে; যদিও সেই অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়, তথাপি সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যে উৎকৃষ্ট ধর্ম বা ধর্মের ফল অভ্যুদয় উৎপন্ন হয়, সেই ধর্মের দ্বারা অসাধুশব্দজ্ঞান জন্য অল্প অধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, অধিকন্তু ধর্মের উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে—পূর্বে বার্তিকে এবং মহাভাষ্যে—বলা হয়েছিল এক একটি সাধুশব্দের অনেক অপশব্দ আছে; অতএব সাধুশব্দ অপেক্ষা অসাধু শব্দ অনেক বেশী বলে সাধু শব্দের জ্ঞান থেকে যে পরিমাণ ধর্ম হবে, অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে তার অপেক্ষা অধিক অধর্ম হবে। অল্প ধর্ম অধিক অধর্মকে নষ্ট করতে পারে না। সুতরাং এখানে কূপখননের উপমা সঙ্গত হতে পারে না। কূপের বহুজলের দ্বারা শরীরের অল্প কাদা মাটি ধোয়া যায়। কিন্তু সাধুশব্দ জ্ঞানজন্য অল্পধর্ম বা ধর্মফলের দ্বারা অসাধুশব্দ জ্ঞান জন্য প্রচুর অধর্ম ধ্বংস করা যায় না। এর উত্তরে বলা যায়—পূর্বে যে বার্তিক ও মহাভাষ্যে—অসাধু শব্দের প্রাচুর্য বশত প্রচুর অধর্মের আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাহা পূর্বপক্ষীর মতে করা হয়েছিল। পূর্বপক্ষীর সেইমত ঠিক নয়। অধর্মের প্রাচুর্য্য হবে—এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। শাস্ত্রের বিধি বাক্যের দ্বারা ধর্ম বোধিত হয়। এইজন্য ধর্ম উৎকৃষ্ট বা ধর্মের ফল উৎকৃষ্ট। সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যে ধর্ম হয়—তার প্রমাণ শাস্ত্র বাক্য হচ্ছে 'একঃ শব্দঃ' ইত্যাদি, কিন্তু অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়—এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রবাক্য নাই। সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম হয়—ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ হওয়ায়, কল্পনা করা হয়, সাধুশব্দের বিপরীত হচ্ছে অসাধু শব্দ, অতএব অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়। ইহা কল্পনীয় বলে অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে প্রচুর অধর্ম হয়, ইহা সিদ্ধ হতে পারে না, কিন্তু অল্প অধর্ম হয়, তাহাও অভ্যুপগমবাদে। অতএব সাধুশব্দজ্ঞানজন্য বহুতর ধর্মের দ্বারা অসাধুশব্দ জ্ঞানজন্য অল্প অধর্ম নষ্ট হতে পারে বলে 'কূপ খননটি' এ স্থলে উপমা হতে পারে। বাচস্পতি মিশ্রও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগজন্য যে প্রচুর ধর্ম হয়, সেই ধর্মের দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদিযাগে পশু হিংসাজন্য অল্প অধর্মকে সহ্য করা যায়(২২২)। অবশ্য সাংখ্যেরা ধর্ম জন্য অধর্মের

---

(২২২) মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীত স্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাম্। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সাংখ্যকারিকা—২

বিনাশ স্বীকার করেন না। কিন্তু এখানে মহাভাষ্যকার কূপখানকের উপমা দিয়ে বলেছেন সাধুশব্দজ্ঞানজন্য ধর্মের দ্বারা অধর্ম দোষ নষ্ট হয়। "ধর্মস্তেন চ স দোষো নির্ঘানিষ্যতে।" অতএব অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম স্বীকার করলেও সেই অধর্ম, সাধুশব্দজ্ঞানজন্য ধর্মের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাবে, আরও সাধুশব্দ জ্ঞানজন্য উৎকৃষ্ট ধর্মের দ্বারা উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি হবে। মহাভাষ্যে যে "কূপখানকঃ" শব্দটি আছে তাহা "কূপস্য খানকঃ" এইরূপ বিগ্রহে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন। আর "খানকঃ" শব্দটি খন [অবদারণে] ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় [ণ্বুল্তৃচৌ ৩।১।১৩৩] করে নিষ্পন্ন হয়েছে। যদিও 'কূপংখনতি' এইরূপ বিগ্রহে "কর্মণ্যণ্ [৩।২।১]" সূত্রে অণ্ প্রত্যয করে 'কূপখান' পদ সিদ্ধ হত, তথাপি 'বাঽসরূপোঽ স্ত্রিয়াম্ [৩।১।৯৪] অর্থাৎ কৃৎ প্রকরণে স্ত্রীলিঙ্গে অধিকার ভিন্ন অসমানরূপ সামান্যশাস্ত্রকে বিশেষ শাস্ত্র বিকল্পে বাধা দেয় —এই নিয়মে 'অণ্' প্রত্যয়রূপ বিশেষ বিধি সামান্য 'ণ্বুল' প্রত্যয়কে পক্ষে বাধা দেয় নাই বলে খন্ ধাতুর উত্তর ণ্বুল করে 'খানক' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। কূপখানকবৎ='কূপ-খানকেন ইব' এইরূপ তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর ইবার্থে বতি প্রত্যয় হয়েছে। 'এতৎ=অসাধুশব্দজ্ঞানজন্য অধর্ম। মৃদা=কর্দমের দ্বারা। পাংসুভিঃ=শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা। অবকীর্ণঃ=লিপ্ত। তত এব=জল হতেই। আসাদয়তি = প্রাপ্ত হয়। যেন=যেগুণকর্তৃক। কর্তায় তৃতীয়া। নির্হণ্যতে=নির্+হন্ ধাতুকর্মবাচ্যে লট্ ত, 'হন্তেঃ' [৮।৪।২২] সূত্রে ণত্ব। 'শব্দজ্ঞানে ধর্মস্তেন চ স দোষঃ নির্ঘানিষ্যতে'। এই ভাষ্যে 'তেন' শব্দের অর্থ সেই ধর্ম কর্তৃক। কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া করে 'তেন' সিদ্ধ হয়েছে। নির্ঘানিষ্যতে=নির্+ হন্ ধাতু কর্মবাচ্যে লৃট্ ত। 'স্যসিচ্সীয়ুট্তাসিষু ভাবকর্মণোরুপদেশেঽ জ্ঝনগমদৃশাং বা চিণ্বদিট্ চ" [৬।৪।৬১] সূত্রে কর্মবাচ্যে বিকল্পে চিণবৎ ও ইট্ হয়েছে। 'হো হন্তের্ঞ্ণিন্নেষু' [৭।৩।৫৪] সূত্রে হন্ ধাতুর হকার স্থানে 'ঘ' হয়েছে।

এইভাবে মহাভাষ্যকার 'সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম" এই পক্ষ স্বীকার করে অসাধু শব্দের জ্ঞানজনিত অধর্ম দোষের পরিহার করলেন। এখন বার্তিককার যে বলেছিলেন "আচারে নিয়মঃ" অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগে নিয়ম—সাধুশব্দ প্রয়োগ করবে, অসাধুশব্দ প্রয়োগ করবে না। এই নিয়মের বিষয় মহাভাষ্য-কার খণ্ডন করার জন্য বলছেন—"যদপ্যুচ্যতে—আচারে নিয়মঃ ইতি........

তত্তন্তে পরাভূতাঃ।" সাধু শব্দের প্রয়োগ করবে অসাধুশব্দের প্রয়োগ করবে না'
—এই নিয়ম সর্বত্র নয়, কিন্তু যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্মে এই নিয়ম। 'ব্রাহ্মণেন ন
ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ" ব্রাহ্মণ অপভাষা বলবে না—এই নিষেধ যজ্ঞাদি
কর্মে; সর্বত্র নয়। অর্থাৎ যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগ করবে
না, কিন্তু সাধুশব্দের প্রয়োগ করবে। যজ্ঞাদি কর্মে অসাধু শব্দের
প্রয়োগ থেকে অধর্ম হয়। যজ্ঞাদিভিন্নস্থলে অসাধু শব্দের প্রয়োগে
অধর্ম হয় না। যদি বলা যায় যজ্ঞাদিকর্মভিন্নস্থলে অসাধু শব্দের
প্রয়োগ করলে যে অধর্ম হয় না, কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মে অসাধু শব্দের
প্রয়োগে অধর্ম হয়, তা জানলে কি করে? তার উত্তরে মহাভাষ্যকার
বলেছেন 'যর্বাণস্তর্বাণঃ' নামক কয়েকজন ঋষি ছিলেন. তাঁরা যজ্ঞাদিকর্মভিন্ন
স্থলে—"যদ্বা নঃ তদ্বা নঃ" অর্থাৎ যজ্ঞাদিব্যতিরিক্তস্থলে 'যদ্বা' যে বস্তু 'তদ্বা'
সেই বস্তু হোক, তাতে আমাদের কি? এই অর্থে "যদ্বা নস্তদ্বা নঃ" এইরূপ
প্রয়োগ করা উচিত ছিল. তা না করে তাঁরা "যর্বাণঃ তর্বাণঃ" এইরূপ
প্রয়োগ [অপভাষা প্রয়োগ] করেছিলেন। যজ্ঞে তাঁরা অপভাষা প্রয়োগ
করেন নাই। এই জন্য তাঁদের পরাজয় হয় নাই। কিন্তু অসুরেরা যজ্ঞ
কর্মেই "হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্তে "হেঽলয়ো
হেঽলয়ঃ', এইরূপ অসাধুশব্দের প্রয়োগ করেছিল, তাতে তারা দেবতাদের
নিকট পরাজিত হয়েছিল। সেই পরাজয় থেকে বুঝা যাচ্ছে যজ্ঞ কর্মে
অসাধু শব্দের প্রয়োগবশত অসুরদের অধর্ম হয়েছিল। আর ঋষিদের যজ্ঞ-
কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগ না করায় অধর্ম হয় নাই। শ্রুতিতে বর্ণিত
আছে—সেই ঋষিগণ "যর্বাণস্তর্বাণঃ" বলেছিলেন—এই হেতু তাঁদের নাম
হয়ে গেল যর্বাণস্তর্বাণ ঋষি। সেই ঋষিদের চারটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে,
—প্রত্যক্ষধর্মাণঃ, পরাবরজ্ঞাঃ, বিদিতবেদিতব্যাঃ ও অধিগতযাথাতথ্যাঃ।
উহার অর্থ যথা—প্রত্যক্ষধর্মাণঃ=প্রত্যক্ষঃ ধর্মঃ যেষাং তে' অর্থাৎ যোগজ-
সাক্ষাৎকার দ্বারা যাঁরা ধর্ম প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। অথবা যোগাভ্যাসজনিত
যাঁদের প্রত্যক্ষরূপধর্ম ছিল। পরাবরজ্ঞাঃ=পরা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অবরা
অর্থাৎ অপরা বিদ্যা—যাঁরা সেই পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা জানেন।

বিদিতবেদিতব্যাঃ=বিদিতং বেদিতব্যং যেষাম্। জ্ঞাতব্য বস্তুকে যাঁরা
শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা জানেন। অধিগতযাথাতথ্যাঃ=অধিগতং

যাথাতথ্যং যৈঃ। 'যথাতথা' এই শব্দের উত্তর স্বার্থে—ষ্যঞ্ প্রত্যয় করে যাথাতথ্যং সিদ্ধ হয়েছে। যাঁরা বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন।

ঋষিদের এইরূপ বিশেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে তাঁরা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তাঁরা যজ্ঞকর্মে অপভাষা প্রয়োগ করেন নাই—এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানীদেরও কর্মে অধিকার আছে (২২৩)।

মহাভাষ্যকার এবং হি শ্রূয়তে বলে—যে শ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন উহা কোন্ শ্রুতিতে আছে তাহা জানা যায় নাই। যা হোক এখানে মহাভাষ্যকার সাধু শব্দের জ্ঞানে ধর্ম ইহা প্রতিপাদন করেছেন, এবং যজ্ঞাদি কর্মে শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয় ইহাও সূচনা করেছেন। আর শাস্ত্র পূর্বক প্রয়োগে ধর্ম ইহা তো বার্তিকের সিদ্ধান্ত ॥৫৯॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথ ব্যাকরণমিত্যস্য শব্দস্য কঃ পদার্থঃ? সূত্রম্।

[বার্তিক]

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ ॥ ১০ ॥

[মহাভাষ্য]

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থো নোপপদ্যতে ব্যাকরণস্য সূত্রমিতি। কিং হি তদন্যৎ সূত্রাদ্ ব্যাকরণং যস্যাদঃ সূত্রং স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ [আচ্ছা] 'ব্যাকরণম্' এই শব্দের অর্থ কি? [একদেশীর উত্তর] সূত্র।

[বার্তিকানুবাদ] ব্যাকরণ শব্দের অর্থ সূত্র হলে ষষ্ঠী বিভক্তির [ব্যাকরণস্য সূত্রম্] অর্থ অনুপপন্ন [হয়] ॥১০॥

[মহাভাষ্যানুবাদ] সূত্র ব্যাকরণশব্দের অর্থ হলে 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ ষষ্ঠী

---

(২২৩) যাজ্ঞে পুনরিতি। অনেন তত্ত্বজ্ঞানিনামপি কর্মাধিকারং সূচয়তি। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

বিভক্তির অর্থ উপপন্ন [যুক্ত] হয় না। সূত্র থেকে সেই ব্যাকারণ কি ভিন্ন, যার এইসূত্র হবে ? ৬০॥

বিবৃতি :—ব্যাকরণের দ্বারা শব্দের [সাধুশব্দের] অনুশাসন করা হবে —ইহাই মহাভাষ্যকারের "অথ শব্দানুশাসনম্" থেকে আরম্ভ করে এযাবৎ গ্রন্থের সংক্ষেপে বক্তব্য। আর ব্যাকরণ ব্যতিরেকে প্রযাজ প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত করা যায় না [ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজঃ সবিভক্তিকাঃ কার্যাঃ] এবং [অধ্যেয়ং ব্যাকরণম্] ব্যাকরণ অধ্যযন করা উচিত - ইহা মহাভাষ্যকার পূর্বে বলে এসেছেন। মোট কথা ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে ইহা বলা হয়েছে। এখন 'ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থ কি ? ইহা জানাবার জন্য বিচার করা হচ্ছে। প্রথমেই প্রশ্ন করা হয়েছে 'ব্যাকরণ এই শব্দের অর্থ কি ? এই প্রশ্ন কোন পূর্বপক্ষী করেছে অথবা কোন তটস্থ ব্যক্তি করেছে। এইপ্রশ্নের উত্তরে আপাতত মহাভাষ্যকার বললেন 'সূত্রম্'। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ। যদিও ইহা মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্তের একদেশ, তথাপি তিনি আপাতত উত্তর দিয়েছেন এইজন্য—এর উপর বিচারের অবকাশ হবে, তাতে বিচার করে শেষে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্ণিত হবে। মহাভাষ্যকারের এই উত্তরে, অথবা বার্তিকগ্রন্থের অবতারণার বীজরূপে মহাভাষ্যকারের এই উক্তিতে বার্তিককার বলেছেন 'সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ।" 'সূত্রে ব্যাকরণে' এখানে ভাবে সপ্তমী। 'সূত্রে ব্যাকরণে সতি' অর্থাৎ 'সূত্র ব্যাকরণশব্দের অর্থ হলে" ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ অযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন "রামস্য গৃহম্" রামের ঘর। রাম ভিন্ন পদার্থ আর গৃহ ভিন্ন পদার্থ। রামের সঙ্গে গৃহের স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধ থাকায়, সেই সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়েছে। কিন্তু 'ঘটের কলস' এইরূপ ষষ্ঠীর ব্যবহার হয় না। যেহেতু ঘট ও কলস অভিন্ন বস্তু। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র-গুলিকে ব্যাকরণ বললে, সূত্র এবং ব্যাকরণ অভিন্ন পদার্থ হবে। তাতে লোকের [শিষ্টব্যক্তিদেরও] যে ব্যবহার আছে "ব্যাকরণস্য সূত্রম্" 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ ব্যবহারে ষষ্ঠীর অর্থ অনুপপন্ন হয়ে যাবে। যদি ব্যাকরণ এবং সূত্র ভিন্ন পদার্থ হয়, তাহলে তাদের কোন ভেদসম্বন্ধ বুঝাবার জন্য 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ প্রয়োগ হতে পারবে। কিন্তু সূত্রকেই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ প্রয়োগের অনুপপত্তি হবে। সুতরাং সূত্র ভিন্ন কোন বস্তুকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলা হউক্—ইহাই মহাভাষ্যকারের পূর্বপক্ষরূপে তাৎপর্য ॥ ৬০ ॥

মূল

[বার্তিক]

শব্দাপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১১ ॥

[মহাভাষ্য]

শব্দানাং চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি—ব্যাকরণাচ্ছব্দান্ প্রতিপদ্যামহ ইতি। ন হি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। কিং তর্হি? ব্যাখ্যানতশ্চ। ননু চ তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতি। ন কেবলানি চর্চাপদানি ব্যাখ্যানম্—বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ ইতি। কিংতর্হি? উদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] শব্দের জ্ঞানের অভাব [প্রাপ্ত হয়]। [মহাভাষ্যানুবাদ] শব্দসমূহের জ্ঞানের অভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু [লোকে] সূত্র থেকেই শব্দ সকলের জ্ঞানলাভ করে না। তাহলে কি? [কি থেকে শব্দের জ্ঞান হয়?] ব্যাখ্যা থেকেও [শব্দের জ্ঞান হয়]। সেই সূত্রই বিগৃহীত [বিগ্রহ করা হলে] হলে ব্যাখ্যা হয়। কেবল [সূত্রের] পদগুলির বিভাগ করলে ব্যাখ্যা হয় না—যেমন : –'বৃদ্ধিঃ' 'আৎ', 'ঐচ্'—[এইভাবে সূত্রের পদগুলির বিভাগ করলেই ব্যাখ্যা হয় না] তাহলে কি? [কি করলে ব্যাখ্যা হয়?]। উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ বাক্যের অধ্যাহার - এই সমস্ত মিলিত হয়ে ব্যাখ্যা হয় ॥ ৭১ ॥

বিবৃতি :—সূত্রকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে "ব্যাকরণস্য সূত্রম্" এইরূপ লোকব্যবহৃত ষষ্ঠীর অনুপপত্তি হবে। ইহা পূর্বে বার্তিককার ও ভাষ্যকার বলেছেন। এখন সূত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে আর একটি দোষের আপত্তি হয় –তাহাই বার্তিককার বলছেন—"শব্দাপ্রতিপত্তিঃ"। 'ব্যাকরণ থেকে আমরা শব্দ সকল জানি'—লোকের এইরূপ ব্যবহার হয়, সেই ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়ে যাবে। যেহেতু ব্যাখ্যারহিত কেবল সূত্র শ্রবণ করে লোকের শব্দের জ্ঞান হয় না। সুতরাং কেবল সূত্রকে ব্যাকরণ

শব্দের অর্থ বললে, লোকের "ব্যাকরণ থেকে শব্দ জানি" এইরূপ ব্যাকরণ থেকে শব্দপ্রতিপত্তিবিষয়ক ব্যবহার অনুপপন্ন [অযুক্ত] হয়ে যাবে। মহাভাষ্যকার এই জন্য—"ন হি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে" সূত্র থেকেই লোকে শব্দ জানে না।

তবে কি থেকে লোকে শব্দ জানে? এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"ব্যাখ্যানতশ্চ" অর্থাৎ সূত্র এবং ব্যাখ্যা থেকে শব্দজ্ঞান হয়। 'চ' পদের দ্বারা সূত্রকেও বুঝান হয়েছে। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলেছেন "নহু চ তদেব......ব্যাখ্যানং ভবতি।" সেই একই সূত্রকে যখন বিগৃহীত করা হয়—অর্থাৎ পদগুলিকে বিভক্ত করে দেখান হয় তখন সেই সূত্রই ব্যাখ্যা হয়।

তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন -"ন কেবলানি চর্চাপদানি .... ঐচ্ ইতি।" 'চর্চা' শব্দের অর্থ অভ্যাস। 'চর্চাপদানি'—শব্দের অর্থ হচ্ছে—অভ্যাসের জন্য বিভক্ত পদ সকল। যেমন বেদের অভ্যাস করবার জন্য বেদাধ্যায়ীরা বেদবাক্যের পদগুলিকে বিভক্ত করে পাঠ করেন, সেইরূপ ব্যাকরণের সূত্রের পদগুলিকে কেবল বিভক্ত করলেই সূত্রের ব্যাখ্যা হয় না। "বৃদ্ধিরাদৈচ্" এই সূত্রটির পদগুলিকে 'বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্' এইভাবে বিভক্ত করলেই ব্যাখ্যা হয় না। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করছেন "কিং তর্হি?" অর্থাৎ ব্যাখ্যা কাকে বলে? উত্তরে মহাভাষ্যকার বললেন—উদাহরণং, প্রত্যুদাহরণং, বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।"

সূত্রের পদগুলির বিগ্রহ, উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ ও বাক্যের অধ্যাহার—এই সব মিলিত হলে তবে ব্যাখ্যা হয়। যেমন "বৃদ্ধিরাদৈচ্" এই সূত্রে আদৈচ্চ্ বৃদ্ধিসংজ্ঞঃ স্যাৎ' এইরূপ বাক্যশেষের অধ্যাহার করতে হবে। তারপর উদাহরণ দিতে হবে—ইহ + এহি = ইহৈহি, এখানে 'ঐ' বৃদ্ধি। প্রত্যুদাহরণ—উদাহরণের বিপরীত হচ্ছে প্রত্যুদাহরণ। যেমন—উপ + ইন্দ্রঃ = উপেন্দ্রঃ। এখানে 'এ' বৃদ্ধি নয়। এইসব হচ্ছে ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা পাঁচ প্রকার বলে অন্যত্র কথিত আছে! যথাঃ—মূল শ্লোক বা সূত্রের (১) পদগুলির বিভাগ প্রদর্শন করা, (২) পদের অর্থ কথন, (৩) সমস্ত পদের সমাসবাক্য প্রদর্শন...

(৪) বাক্যের অর্থ দেখান, (৫) মূল বাক্যের অর্থের উপর আক্ষেপ অর্থাৎ আশঙ্কা দেখিয়ে তার সমাধান প্রদর্শন করা (২২৪)।

কেহ কেহ আক্ষেপকে একটি পৃথক্ ব্যাখ্যাঙ্গ বলে সমাধানকে তাথেকে পৃথক্ বলেন; তাঁদের মতে ব্যাখ্যা ৬ প্রকার। অপরে বলেন (১) উপোদ্ঘাত [উপক্রমণিকা], (২) পদ, (৩) পদের অর্থ, (৪) পদের বিগ্রহ, (৫) চালনা [বিশ্লেষণ], (৬) প্রত্যবস্থা [বাক্যের অর্থ] এই ছয় প্রকারব্যাখ্যা (২২৫) ॥ ৬১ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

এবং তর্হি শব্দঃ।

[বার্তিক]

শব্দে ল্যুড়র্থঃ ॥ ১২ ॥

[মহাভাষ্য]

যদি শব্দো ব্যাকরণং ল্যুড়র্থো নোপপদ্যতে। ব্যাক্রিয়তেঽনেনেতি ব্যাকরণম্। ন হি শব্দেন কিঞ্চিদ্ ব্যাক্রিয়তে। কেন তর্হি? সূত্রেণ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ:—[ভাষ্যানুবাদ] তাহলে এইরূপ অবস্থায় [সূত্রকে ব্যাকরণ-শব্দের অর্থ স্বীকার করলে পূর্বোক্ত দোষ হওয়ায়] শব্দ [সাধুশব্দ] [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হউক]

---

(২২৪) পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥
[গীতা উপোদ্ঘাত শাঙ্করভাষ্যের আনন্দগিরিকৃত টীকায় উদ্ধৃত]
পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপোঽথ সমাধানং ব্যাখ্যানং ষড়্বিধংমতম্ ॥
[পরিভাষেন্দুশেখরের ভৈরবীটীকায় উদ্ধৃত]
পরাশর উপপুরাণের ১৮শ অধ্যায়ে অনুরূপ পাঠ আছে
পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপেষু সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

(২২৫) উপোদ্ঘাতঃ পদঞ্চৈব পদার্থঃ পদবিগ্রহঃ।
চালনা প্রত্যবস্থাশ্চ ব্যাখ্যা তন্ত্রস্য ষড়্বিধা॥
[ক্ষিতীশচাটার্জীর পস্পশাহ্নিক ব্যাখ্যাগ্রন্থে উদ্ধৃত]

[বার্তিকানুবাদ] শব্দে [ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থ যদি 'শব্দ' হয় তাহলে] 'ল্যুট্' প্রত্যয়ের অর্থ [অনুপপন্ন হয়]।

[মহাভাষ্যানুবাদ] যদি শব্দ [সাধুশব্দ] ব্যাকরণ [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হয়] [তাহলে] 'ল্যুট্' প্রত্যয়ের অর্থ উপপন্ন [যুক্ত] হয় না। যাহার দ্বারা ব্যাকৃত করা হয় অর্থাৎ ব্যুৎপাদন [প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ] করা হয়, তাহা ব্যাকরণ। শব্দের দ্বারা কোন কিছু ব্যাকৃত করা হয় না। তাহলে কিসের দ্বারা [কিসের দ্বারা ব্যাকৃত করা হয়] ? সূত্রের দ্বারা [ব্যাকৃত করা হয়] ॥ ৬২ ॥

বিবৃতি :—সূত্রকে 'ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থ স্বীকার করলে ষষ্ঠীর অর্থ অনুপপন্ন হয় এবং শব্দের অপ্রতিপত্তি হয়। এই দুইটি দোষ দেখান হয়েছে।

এইজন্য আশঙ্কা করা হচ্ছে তাহলে শব্দকে অর্থাৎ সাধুশব্দকে 'ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থ স্বীকার করা হউক্। মহাভাষ্যকার সেই আশঙ্কা দেখিয়েছেন "এবং তর্হি শব্দঃ"। সূত্রপক্ষে পূর্বোক্ত দোষদ্বয় থাকায় 'শব্দই' ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হউক্। এই আশঙ্কার উত্তরে বার্তিকার বলছেন—"শব্দে ল্যুডর্থঃ" এই বার্তিকের সঙ্গে "ন উপপদ্যতে" এইরূপ বাক্যশেষের অধ্যাহার করে অর্থ বুঝতে হবে। শব্দকে অর্থাৎ সাধুশব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে স্বীকার করলে "ব্যাকরণম্" এই শব্দে যে ল্যুট্ প্রত্যয় হয়েছে, সেই 'ল্যুট্' প্রত্যয়ের অর্থ উপপন্ন হবে না। কেন উপপন্ন হবে না—ইহা বুঝাবার জন্য মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"ব্যাক্রিয়তে অনেন" এইরূপ করণবাচ্যে বিপূর্বক আঙ্পূর্বক কৃধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে 'ব্যাকরণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যার দ্বারা শব্দকে ব্যাকরণ অর্থা‸ ব্যুৎপাদন করা যায় তাহাই ব্যাকরণ। সূত্রের দ্বারা শব্দকে ব্যুৎপাদন করা হয়। এইজন্য ব্যুৎপাদনের করণ হচ্ছে সূত্র, আর কর্ম হচ্ছে শব্দ। 'ব্যাকরণ' শব্দটি করণবাচ্যে ল্যুডন্ত বলে—যার দ্বারা ব্যাকরণ অর্থাৎ ব্যুৎপাদন করা হয় তাকে ব্যাকরণ বলা হবে। যাকে ব্যুৎপাদন করা হয় সেই কর্মকে ব্যাকরণ শব্দ বলা যাবে না। শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে শব্দের দ্বারা কোন বস্তুকে ব্যাকরণ করা হয় না বলে, করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ অসঙ্গত হয়ে যাবে। সূত্রের দ্বারা শব্দকে ব্যাকরণ বা ব্যুৎপাদন করা হয় বলে—সূত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ স্বীকার

করলে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ উপপন্ন হয়। কিন্তু সূত্রে পক্ষে পূর্বে অন্য দোষদ্বয় দেখান হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে কর্মবাচ্যেও ল্যুট্ প্রত্যয় দেখা যায়। যেমন—"রাজভোজনাঃ শালয়ঃ" এই স্থলে ভুজ্যন্তে যে তে ভোজনাঃ' অর্থাৎ যাকে ভোজন করা হয়, এইরূপ কর্মবাচ্যে ভুজ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করা হয়েছে। তারপর "রাজ্ঞঃ ভোজনাঃ" এইরূপ কর্তৃষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সঙ্গে সমাস করে "রাজ ভোজনাঃ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। সেইরূপ এখানেও "ব্যাক্রিয়তে যৎ তৎ ব্যাকরণম্' এইরূপ কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে, শব্দকেই ব্যাকৃত করা হয় বলে শব্দই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে স্বীকৃত হউক্। এতে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থের অনুপপত্তি হবে না। এর উত্তরে কৈয়ট এবং নাগেশ বলেছেন কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়, কদাচিৎ কোন স্থলে, যেখানে উপায় নাই, সেইরূপ স্থলে স্বীকার করা হয়, সর্বত্র হয় না। অতএব 'ব্যাকরণ' শব্দে কর্মবাচ্যে ল্যুট্ করা যাবে না (২২৬) ॥ ৬২ ॥

মূল

[বার্তিক]

ভবে চ তদ্ধিতঃ ॥ ১৩ ॥

[মহাভাষ্য]

ভবে চ তদ্ধিতো নোপপদ্যতে—ব্যাকরণে ভবো যোগো বৈয়াকরণ ইতি। ন হি শব্দে ভবো যোগঃ। ক তর্হি? সূত্রে ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] ভব [তত্রভবঃ—সেখানে উদ্ভূত] অর্থে তদ্ধিত [প্রত্যয়] [উপপন্ন হবে না—যদি শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ স্বীকার করা হয়]। [মহাভাষ্যানুবাদ] ভব অর্থাৎ তাহাতে আছে বা উদ্ভূত এই অর্থে তদ্ধিত [প্রত্যয়] উপপন্ন হবে না। ব্যাকরণে উদ্ভূত যে যোগ

---

(২২৬) শব্দ ইতি করণে ল্যুড়্ বিধীয়তে। শব্দশ্চ ব্যাক্রিয়মাণত্বাৎ কর্ম, ন তু করণমিতি ভাবঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

ননু রাজভোজনা ইতিবৎ কর্মণি ল্যুটি ন দোষোঽত আহ করণে ইতি। কর্মণি, সতু কাচিৎক ইতি ভাবঃ। —মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

[সম্বন্ধ] বৈয়াকরণ [এই ভাবে যে ভব অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করে বৈয়াকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা উপপন্ন হবে না—যদি শব্দ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হয়]। যেহেতু শব্দে যোগ উৎপন্ন হয় না। তা হলে কোথায় ? [কোথায় যোগ উৎপন্ন হয় ?]। সূত্রে [যোগ উৎপন্ন বা উদ্ভূত হয়] ॥ ৬৩ ॥

বিবৃতি :—শব্দকে 'ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থ বললে দ্বিতীয় দোষের আপত্তি দিচ্ছেন বার্তিককার "ভবে চ তদ্ধিতঃ"। 'তত্র ভবঃ' অর্থাৎ সেই খানে আছে বা উৎপন্ন হয় বা অভিব্যক্ত হয় এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন 'মথুরায়াং ভবঃ মাথুরঃ' মথুরা দেশে যে জন্মে বা থাকে সে মাথুর। এইরূপ ব্যাকরণে ভব অর্থাৎ বিদ্যমান যে যোগ [সম্বন্ধ] এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় [অণ্] করে 'বৈয়াকরণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ স্বীকার করলে এইরূপ ভব অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় অনুপপন্ন হবে। কারণ "শব্দে আছে যে যোগ" এইরূপ অর্থ অসঙ্গত। শব্দে যোগ [শব্দে] থাকে না। কিন্তু সূত্রে যোগ [শব্দে] থাকে ॥ ৬৩ ॥

মূল

[বার্তিক]

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ ॥ ১৪ ॥

[মহাভাষ্য]

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা নোপপদ্যন্তে, পাণিনিনা প্রোক্তং পাণিনীয়ম্। আপিশলম, কাশকৃৎস্নম্ ইতি। ন হি পাণিনিনা শব্দাঃ প্রোক্তাঃ। কিং তর্হি ? সূত্রম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] [শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ স্বীকাধ করলে] প্রোক্ত [কথিত] প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় সকল [অনুপপন্ন হয়ে যাবে]। [মহাভাষ্যানুবাদ] [শব্দ ব্যাকরণ শব্দার্থ হলে] প্রোক্ত প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় সকল উপপন্ন হয় না। পাণিনি কর্তৃক প্রোক্ত পাণিনীয়ম্। [অপিশলি কর্তৃক প্রোক্ত] আপিশলম্, [কাশকৃৎস্ন কর্তৃক প্রোক্ত] কাশকৃৎস্নম্। কিন্তু পাণিনি কর্তৃক শব্দ কথিত হয় নাই। তা হলে কি ? [পাণিনি কর্তৃক কি কথিত হয়েছে] ? সূত্র কথিত হয়েছে ॥ ৬৪ ॥

বিবৃতি :—শব্দের ব্যাকরণশব্দার্থত্ব পক্ষে বার্তিককার তৃতীয় দোষ দিয়েছেন "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ।" প্রোক্তার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় এবং অন্যান্য অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন পাণিনি কর্তৃক প্রোক্ত 'পাণিনীয়'। অপিশলি কর্তৃক প্রোক্ত 'আপিশল' ইত্যাদি। শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে এই প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় অযুক্ত হয়ে যাবে। পাণিনি কর্তৃক শব্দ প্রোক্ত হয় নাই, কিন্তু সূত্রই প্রোক্ত হয়েছে। 'সূত্র' ব্যাকরণ শব্দার্থ হলে পাণিনি কর্তৃক সূত্র কথিত হয়েছে বলে "পাণিনীয়ম্" ইত্যাদি স্থলে প্রোক্তার্থক তদ্ধিত উপপন্ন হয়। শব্দ পক্ষে তাহা অযুক্ত হয়ে যায় ॥ ৬৪ ॥

মূল

কিমর্থমিদমুভয়মুচ্যতে ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি; ন প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইত্যেব ভবেঽপি তদ্ধিতশ্চোদিতঃ স্যাৎ? পুরস্তাদিদমাচার্যেণ দৃষ্টম্—ভবে চ তদ্ধিত ইতি, তৎ পঠিতম্। তদুত্তর-কালমিদং দৃষ্টং প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি, তদপি পঠিতম্। নচেদানী-মাচার্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্তয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ :—ভব অর্থে তদ্ধিত এবং প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিত এই উভয় কি জন্য বলা হয়েছে, প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত [এইমাত্র] [বলা হয় নাই কেন] [প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত] এইমাত্র বললেই 'ভব' অর্থে তদ্ধিত আশঙ্কিত হয়ে যায়?

আচার্য [বার্তিককার] পূর্বে 'ভব অর্থে তদ্ধিত' ইহা দেখেছেন [পাণিনি সূত্রে দেখেছেন], সেইহেতু তাহা [ভব অর্থে তদ্ধিতের কথা] বলেছেন। তারপর 'প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত' ইহা দেখেছেন; এইহেতু তাহাও [প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিতের কথা] বলেছেন। আচার্য [কাত্যায়ন] এখনই সূত্র করে অর্থাৎ বার্তিক রচনা করে, তাহা নিবৃত্ত করেন নাই ॥ ৬৫ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার এখানে বার্তিকের উপর একটি আশঙ্কা উঠিয়ে তার সমাধান করেছেন। বার্তিককার বলেছেন শব্দ যদি ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হয় তাহলে 'ভব' অর্থে তদ্ধিত অনুপপন্ন হবে। তারপর বলেছেন প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত অনুপপন্ন হবে। মহাভাষ্যকার বলছেন প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত

প্রত্যয় সকলের মধ্যেই তো ভব অর্থে তদ্ধিত অন্তর্ভূত। সুতরাং প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত সকল অনুপপন্ন হয় এই কথাই বার্তিককার বলতে পারতেন। তা না বলে তিনি একবার ভবঅর্থে তদ্ধিতের অনুপপত্তি, তার পর প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিতসকলের অনুপপত্তি এইরূপ উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ করে বললেন কেন? মহাভাষ্যকার এইরূপ বার্তিককারের উপর আশঙ্কা করে তার উত্তর দিয়েছেন—বার্তিককার কাত্যায়ন প্রথমে ভব অর্থে তদ্ধিত হয় ইহা পাণিনি সূত্রে দেখেছেন, এই জন্য সেই ভব অর্থে তদ্ধিতের অনুপপত্তির কথা বলেছেন। তারপর বার্তিককার দেখলেন প্রোক্ত প্রভৃতি অর্থেও তো তদ্ধিত হয়। তাহা দেখে পরে আবার প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিতের অনুপপত্তির কথা বলেছেন। যেমন সামান্য সূত্রের দ্বারা কোন বিষয় প্রতিপাদন করে, বিশেষসূত্রের দ্বারা সেই বিষয় প্রতিপাদন করা হয়, সেইরূপ বার্তিককারও অনুপপত্তি দেখাবার জন্য প্রথমে ভব অর্থে তদ্ধিতের, তারপর প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিতের কথা বলে 'শব্দ' কে ব্যাকরণ শব্দের বাচ্যার্থ থেকে নিবৃত্ত করেছেন। এতে বার্তিক-কারের কোন দোষ হয় নাই ॥ ৬৫ ॥

মূল

অয়ং তাবদদোষো যদুচ্যতে "শব্দে ল্যুড়র্থ" ইতি। নাবশ্যং করণাধিকরণয়োরেব ল্যুড্‌বিধীয়তে। কিং তর্হি? অন্যেষ্বপি কারকেষু—কৃত্যল্যুটো বহুলম্ [৩।৩।১১৩] ইতি তদ্ যথা—প্রস্কন্দনং প্রপতনমিতি। অথবা শব্দৈরপি শব্দা ব্যাক্রিয়ন্তে—তদ্‌যথা গৌরিত্যুক্তে সর্বে সন্দেহা নিবর্তন্তে—নাশ্বো ন গর্দভ ইতি ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদঃ—"শব্দে ল্যুডর্থঃ" ['ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থরূপে 'শব্দকে' গ্রহণ করলে ল্যাট্ প্রত্যয়েব অর্থের অনুপপত্তি হয়] এই যে বলা হয়েছে—এই দোষ হয় না। করণবাচ্যে বা অধিকরণ বাচ্যেই অবশ্য ল্যুট্ প্রত্যয়ের বিধান করা হয়; তা নয়। তাহলে কি? [অন্য কোন্ অর্থে ল্যুট্ বিহিত হয়]? "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" এই সূত্রে অন্য কারকেও [ল্যুটের বিধান হয়]। যেমন—প্রস্কন্দন, প্রপতন।

অথবা শব্দের দ্বারাও শব্দের ব্যাকরণ [ব্যুৎপাদন] করা হয়। যেমন 'গৌঃ' ইহা বললে—অশ্ব নয়, গর্দভ নয়, এইভাবে সকল সন্দেহ নিবৃত্ত হয় ॥ ৬৬ ॥

বিবৃতি :—শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে বার্তিককার যে দোষ দিয়েছিলেন "শব্দে ল্যুডর্থঃ" অর্থাৎ ব্যাকরণ শব্দে করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থের অনুপপত্তি হয় ; মহাভাষ্যকার সেই দোষ উদ্ধার করবার জন্য বলেছেন —"অয়ং তাবদদোষো......প্রস্কন্দনং প্রপতনমিতি।"

করণকারকে এবং অধিকরণ কারকেই যে ল্যুট্ হবে—এইরূপ ঐকান্তিক নিয়ম নাই। অন্যকারকেও ল্যুটের বিধান আছে। "কৃতল্যুটো বহুলম্" এই সূত্রে যেখানে যে বাচ্যে বা কারকে কৃত্যপ্রত্যয় বা ল্যুট্ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় সেখানে বহুলভাবে কৃত্য ও ল্যুট্ হয়।

অতএব 'ব্যাকরণ' শব্দে কর্মকারকে ল্যুট্ প্রত্যয় করলে 'ব্যাক্রিয়তে যৎ' [তৎ শব্দস্বরূপম্] যাহাকে ব্যাকৃত করা হয়—এই অর্থে ল্যুট্ প্রত্যয় করলে—ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ অনুপপন্ন হয় না। কারণ শব্দকেই ব্যাকৃত করা হয় বলে কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় সঙ্গত হয়। অন্যকারকে ল্যুটের উদাহরণ মহাভাষ্যকার প্রদর্শন করেছেন—প্রস্কন্দনং প্রপতনমিতি। 'প্রস্কন্দতি অস্মাৎ' প্রপততি অস্মাৎ' এইরূপ অপাদানকারকে এখানে ল্যুট হয়েছে। যদিও "ভীমাদয়োঽপাদানে" [৩।৪।৭৪] এই সূত্রে অপাদানকারকে ভীমাদিগণের অন্তর্গত বলে প্রস্কন্দন ও প্রপতন শব্দ সিদ্ধ হয় তথাপি সেই "ভীমাদয়োঽপাদানে" প্রভৃতি সূত্র 'কৃত্যলুটো বহুলম্" এই সূত্রের বিস্তার বলে "প্রস্কন্দন" প্রভৃতি স্থলে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' সূত্রে ল্যুট্ প্রত্যয় হতে কোন বাধা নাই।

এখন কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পাদন করলেও বার্তিকের "শব্দে ল্যুডর্থঃ এই অনুপপত্তির পরিহার হয় না। কারণ বার্তিককারের অভিপ্রায় হচ্ছে বিপূঃ আঙ্পূঃ কৃ। করণে ল্যুট্ করে এই ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, এখন কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে প্রতিপাদন করলেও করণবাচ্যে ল্যুটের অর্থের অনুপপত্তি তো থেকেই গেল। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন – "অথবা শব্দৈরপি শব্দা ব্যাক্রিয়ন্তে—তদ্ যথা গৌরিত্যুক্তে সর্বে সন্দেহা নিবর্তন্তে নাশ্বো ন গর্দভ ইতি।" 'ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন' এইরূপ করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করলেও 'শব্দ' ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হতে পারে। যাহার দ্বারা শব্দকে ব্যাকৃত করা যায়

তাহাকে ব্যাকরণ বললেও শব্দকে ব্যাকরণ বলা যায়। কারণ শব্দের দ্বারাও শব্দকে ব্যাকৃত করা হয়। যেমন মহাভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 'গৌঃ' এই শব্দ বললে গোশব্দের বাচ্য অর্থের নিশ্চয় হয়, সেইরূপ অশ্ব প্রভৃতি শব্দ সাস্নাদিমান্ বস্তুর বাচক নয় - ইহাও বুঝা যায়। অতএব ব্যাকৃতি হচ্ছে বিপরীত নিবৃত্তি এবং সদৃশ সংগ্রহ। "গৌঃ" শব্দ স্থলে বিপরীত অশ্বাদির বাচকতা নিবৃত্তি এবং সাস্নাদিমান্ অন্যান্য গোব্যক্তি সকলের সংগ্রহ। এইরূপ "সুদ্ধ্যুপাস্যঃ" শব্দ বললে প্রদ্ধ্যুপাস্যঃ, দধ্যানয়নম্, ইত্যাদি সদৃশ শব্দের যেমন জ্ঞান হয়, সেইরূপ দৈত্যারিঃ, উপেন্দ্র ইত্যাদি শব্দের নিবৃত্তি হয়। অতএব করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পন্ন করলেও অনুপপত্তি হয় না ॥ ৬৬ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অয়ং তর্হি দোষঃ—ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি। এবং তর্হি—

[বার্তিক]

লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্ ॥ ১৫ ॥

[মহাভাষ্য]

লক্ষ্যং চ লক্ষণং চৈতৎসমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুনর্লক্ষ্যং, কিং বা লক্ষণম্? শব্দো লক্ষ্যঃ, সূত্রং লক্ষণম্। এবমপ্যয়ং দোষঃ—সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তোঽবয়বে নোপপদ্যতে। সূত্রাণি চাপ্যধীয়ান ইষ্যতে—বৈয়াকরণ ইতি। নৈষ দোষঃ। সমুদায়েষু হি শব্দাঃ প্রবৃত্তা অবয়বেষ্বপি বর্তন্তে, তদ্ যথা—পূর্বে পঞ্চালাঃ, উত্তরে পঞ্চালাঃ, তৈলং ভুক্তম্, ঘৃতং ভুক্তম্, শুক্লো, নীলঃ, কপিলঃ কৃষ্ণ ইতি। এবময়ং সমুদায়ে ব্যাকরণ শব্দঃ প্রবৃত্তোঽবয়বেঽপি বর্ততে। অথবা পুনরস্তু সূত্রম্। ননু চোক্তম্ সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্ন ইতি? নৈষদোষঃ—ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে—শব্দাপ্রতিপত্তিরিতি; ন হি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতি-

পদ্যন্তে। কিং তর্হি? 'ব্যখ্যানতশ্চ' ইতি। পরিহৃতমেতৎ— 'তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতি' ইতি। ননু চোক্তম্—'ন কেবলানি চর্চাপদানি ব্যাখ্যানম্—বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ ইতি। কিং তর্হি? উদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি' ইতি। অবিজানত এতদেবং ভবতি। সূত্রত এব হি শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। আতশ্চ সূত্রত এব, যো হ্যুৎসূত্রং কথয়েন্নাদো গৃহ্যেত ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ :—[ভাষ্যানুবাদ] তা হলে এই দোষ [থেকে গেল] ভব অর্থে তদ্ধিত এবং প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিত। এইরূপ হলে—[বার্তিকানুবাদ] লক্ষ্য এবং লক্ষণ [এই উভয়ই] ব্যাকরণ [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ]।

[মহাভাষ্যানুবাদ] লক্ষ্য এবং লক্ষণ এই সমুদায় ব্যাকরণ [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ] হয়। লক্ষ্য কি? এবং লক্ষণই বা কি? শব্দ [হচ্ছে] লক্ষ্য। আর সূত্র [হচ্ছে] লক্ষণ। এইরূপ হলেও এই দোষ [হয়]—ব্যাকরণ শব্দ সমুদায়ে প্রবৃত্ত [হওয়ায়] অবয়বে [অবয়বকে বুঝাতে] উপপন্ন হয় না। অথচ সূত্র সকলের অধ্যয়নকারী ব্যক্তিতেও বৈয়াকরণ [এইরূপ শব্দের প্রয়োগ] স্বীকার করা হয়। না, এই দোষ হয় না। সমুদায়ে প্রবৃত্ত শব্দ সকল অবয়বেও প্রবৃত্ত হয়। যেমন পূর্ব পঞ্চাল দেশ, উত্তর পঞ্চাল দেশ। তৈল পান করেছে, ঘৃত ভোজন করেছে। শুক্ল, নীল, কপিল [কটা রং] কৃষ্ণ ইত্যাদি। এইরূপ সমুদায়ে [প্রবৃত্ত] এই ব্যাকরণ শব্দ অবয়বেও প্রবৃত্ত হতে পারে। অথবা সূত্র [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ] হউক। আজ্ঞে বলা হয়েছে, সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলে ষষ্ঠীর অর্থ অনুপপন্ন হয়? না—এই দোষ হয় না। ব্যপদেশিবদ্ভাবে [অভেদে ভেদের আরোপ করে] হবে [ষষ্ঠীর অর্থ উপপন্ন হবে]। আর যে বলা হয়েছিল শব্দের অপ্রতিপত্তি। সূত্র হতেই শব্দ জানে না। তাহলে কি? ব্যাখ্যা হতে [শব্দ জানে]। ইহার পরিহার করা [এর উত্তর দেওয়া] হয়েছে - সেই সূত্রই বিগৃহীত হলে ব্যাখ্যা হয়। আজ্ঞে একথা তো বলা হয়েছে—কেবল চর্চ্যমান পদ সকল অর্থাৎ পদগুলির বিভাগই ব্যাখ্যা হয় না। 'বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্' এইরূপ বিগৃহীত পদ ব্যাখ্যা হয় না। তাহলে কি? [ব্যাখ্যা কোন্ পদার্থ?] উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যের

অধ্যাহার এই সমস্ত ব্যাখ্যা হয়। যে জানে না তার এইরূপ [উত্তর] হয়। সূত্র থেকেই শব্দসমূহকে [লোকে] জানে। এইহেতু সূত্র থেকেই [শব্দের জ্ঞান হয়]। যে সূত্রের বাহিরে বলে—তার ঐ কথা গ্রাহ্য হতে পারে না ॥ ৬৭ ॥

বিবৃতি ঃ—শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে বার্তিককার যে দোষ দিয়েছিলেন, মহাভাষ্যকার সেই দোষের উদ্ধার করে শব্দ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হতে পারে—ইহা ব্যবস্থাপিত করেছেন। কিন্তু শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে বার্তিককারের "শব্দে ল্যুড়র্থঃ" এই আপাদিত দোষটি মাত্র মহাভাষ্যকার উদ্ধার করেছেন। বার্তিককারের আপাদিত আরও একটি [এক হিসাবে] দোষ—ভব অর্থে তদ্ধিতের এবং প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিতের অনুপপত্তি রূপ দোষ কিন্তু থেকে গেল। তার উদ্ধার তো মহাভাষ্যকার করেন নাই। শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে 'ব্যাকরণে ভবো যোগঃ বৈয়াকরণঃ' এইরূপ প্রয়োগ অনুপপন্ন হবে। কারণ শব্দে তো যোগ সম্ভব নয়, কিন্তু সূত্রেই যোগ সম্ভব। আর পাণিনিকর্তৃক প্রোক্ত পাণিনীয়, এইরূপ প্রোক্ত অর্থে তদ্ধিতও অনুপপন্ন থেকে গেল। কারণ পাণিনি কর্তৃক শব্দ প্রোক্ত হয় নাই, কিন্তু সূত্র উক্ত হয়েছে। এই দোষ যে থেকে গেল মহাভাষ্যকার তার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"অয়ং তর্হি দোষ...... ...তদ্ধিতা ইতি"। এই দোষ উদ্ধারের জন্য বার্তিকগ্রন্থের অবতারণা করবার উদ্দেশ্যে মহাভাষ্যকার বললেন—'এবং তর্হি' এইভাবে শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ স্বীকার করলে যদি ভব অর্থে তদ্ধিত এবং প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিতের অনুপপত্তি থেকে যায় তা হলে—সেই দোষ পরিহারের জন্য—"লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্" এই বার্তিকসিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হল। লক্ষ্য এবং লক্ষণ—এই উভয়ই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ। মহাভাষ্যকার এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"লক্ষ্যং লক্ষণং চৈতৎ সমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি।" লক্ষ্য ও লক্ষণ এই উভয়ের সমুদিতরূপই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ। এই কথায় পাওয়া গেল ব্যাকরণত্বটি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম। যেমন "অশ্বিনীকুমারত্ব" অশ্বিনীকুমারদ্বয়েই পর্যাপ্ত। সেইরূপ ব্যাকরণত্ব, শব্দ ও সূত্র এই উভয়ে পর্যাপ্ত। ব্যাকরণ শব্দটি যোগরূঢ়ি বৃত্তিতে শব্দ এবং সূত্র উভয়কেই বুঝাচ্ছে। লক্ষ্য ও লক্ষণের অর্থ জানাবার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—"কিং পুনর্লক্ষ্যম্, কিং বা লক্ষণম্" লক্ষ্য কি, লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার

বলেছেন—"শব্দো লক্ষ্যঃ, সূত্রং লক্ষণম্"। শব্দানুশাসনশাস্ত্র দ্বারা, শব্দের জ্ঞানই সাক্ষাৎ প্রয়োজন বলে কথিত হওয়ায় শব্দই [সাধুশব্দই] লক্ষ্য। শব্দকে জানাবার জন্য সূত্র, সূত্রের দ্বারা শব্দকে জানা যায় বলে সূত্র হলো লক্ষণ। "লক্ষ্যতে অনেনেতি লক্ষণম্" যার দ্বারা শব্দ লক্ষিত হয়। এখন শব্দ এবং সূত্র এই উভয়কে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বলায় ভব অর্থে তদ্ধিত এবং প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিতের অনুপপত্তি দোষ হয় না। কারণ ব্যাকরণ শব্দার্থের একদেশ যে সূত্র সেই সূত্রে ভবযোগ সম্ভব হয়। এবং পাণিনি কর্তৃক সূত্র প্রোক্ত হওয়ায় প্রোক্তাদ্যর্থক তদ্ধিতও উপপন্ন হয়। এই পক্ষে ব্যকরণশব্দ সূত্র ও শব্দ উভয়কে বুঝায় বলে—এই সমুদায় এবং তার অবয়বের ভেদ বিবক্ষা [বলবার ইচ্ছা] করে—'ব্যাকরণস্য সূত্রম্' এইরূপ ষষ্ঠীর অর্থও উপপন্ন হয়। যেমন 'বৃক্ষের শাখা' এইরূপ ব্যবহারে বৃক্ষসমুদায় ও তার অবয়ব শাখার ভেদ বিবক্ষা করা হয়। আর এই সূত্র ও শব্দ এই সমুদায় থেকে শব্দের জ্ঞান হয় বলে ব্যাকরণ থেকে শব্দসকল জানে [ব্যাকরণাচ্ছব্দান্ জানাতি]—এইরূপ ব্যবহারও সিদ্ধ হয় বলে 'শব্দাপ্রতিপত্তিরূপ দোষ হয় না। আর সূত্র এবং শব্দ এই সমুদায়ের অন্তর্গত সূত্রের দ্বারা শব্দের ব্যাকরণ অর্থাৎ ব্যুৎপাদন করা হয় বলে করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থেরও উপপত্তি হয়। সুতরাং এই উভয়ের ব্যাকরণশব্দার্থত্বে কোন দোষ নাই।

'বৃক্ষ' শব্দটি সমুদায়কে অর্থাৎ শাখা, মূল, স্কন্ধ, পত্র প্রভৃতি সমুদায়কে বুঝায়। লোকেও সমুদায়েই বৃক্ষশব্দের প্রবৃত্তি [প্রয়োগ বা ব্যবহার] হয়, একদেশ কেবল শাখা, বা মূলকে—বৃক্ষশব্দে ব্যবহার করে না। এইরূপ লক্ষ্য-লক্ষণ অর্থাৎ শব্দ ও সূত্র এই সমুদায়কে যদি ব্যাকরণশব্দের অর্থ বলা হয়, তাহলে একদেশ বা অবয়বকে অর্থাৎ কেবল শব্দকে বা কেবল সূত্রকে বুঝাবার জন্য তো ব্যাকরণ শব্দের প্রয়োগ হতে পারবে না। অথচ যিনি সূত্র সকল অধ্যয়ন করেন [শব্দ অধ্যয়ন না করেও] তাঁকে 'বৈয়াকরণ' বলা হয়। 'ব্যাকরণং বেত্তি অধীতে বা' এই অর্থে বৈয়াকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে সূত্র সকলকেও ব্যাকরণশব্দে ব্যাবহার করা হয়। কিন্তু শব্দ ও সূত্র এই সমুদায়ে প্রবৃত্ত [ব্যবহৃত] ব্যাকরণশব্দ অবয়বকে বুঝাতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা "এবমপ্যয়ং দোষঃ সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দ...... বৈয়াকরণ ইতি।" এই মহাভাষ্যে উত্থাপন করা হয়েছে।

তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"নৈষ দোষঃ। সমুদায়েষু.........অবয়বেষ্বপি বর্ততে।" যে শব্দ কোন সমুদায়কে বুঝায়, সেইশব্দ সমুদায়ের অবয়বকে বুঝাতেও অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন 'পঞ্চাল' শব্দ সমগ্র পঞ্চাল দেশকে বুঝায়, অথচ সেই সমগ্র পঞ্চাল দেশের এক এক অবয়বেও পঞ্চাল শব্দব্যবহৃত হয়। যেমন পূর্বপঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল। এইরূপ 'ঘৃত' বা 'তৈল' শব্দ সধারণত তৈলসমুদায় অর্থাৎ একমণ, একসের, একছটাক তৈলকে বুঝায় বা ঘৃত সমুদায়কেবুঝায়। কিন্তু যখন অল্প তৈল বা ঘৃতকে সংস্কৃত করে ঔষধ তৈয়ার করা হয়, তখন সেই ঔষধ লোকে সেবন করলে, বলা হয় এই ব্যক্তি তৈল ভোজন করেছে, ঘৃত ভোজন করেছে। এইভাবে সমুদায়ের বোধক শব্দ অবয়ব বা একদেশেও ব্যবহৃত হয়। কোন বস্ত্র বা অন্যকোন দ্রব্যের যদি কতক অংশ লাল আর কতক অংশ সাদা বা কাল হয়, তাহলে সমুদায় বস্ত্র বা দ্রব্যকে 'লাল' বলে যখন ব্যবহার করা হয়, তখন সেই বস্ত্রের যে অংশ লাল নয়, অন্যঅংশে 'লাল' ব্যবহার করায় তাকেও লাল বলে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে সমুদায়ে প্রবৃত্ত শব্দ অবয়বে যেরূপ ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ শব্দ ও সূত্র—এই সমুদায়ে ব্যবহৃত ব্যাকরণশব্দ, সূত্রমাত্র বা শব্দমাত্ররূপ অবয়বেও ব্যবহৃত হতে পারবে। মহাভাষ্যকার এইভাবে বার্তিকের মতানুসারে 'শব্দ ও সূত্র' এই উভয়কে ব্যাকরণ শব্দের অর্থরূপে ব্যবস্থাপিত করে—কেবল সূত্রেও ব্যাকেরণ শব্দের ব্যবহার অর্থাৎ কেবল সূত্রও ব্যাকরণশব্দের অর্থ হতে পারে—ইহা নিজে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিপাদন করছেন—"অথবা পুনরস্তু সূত্রম্।" মহাভাষ্যকারের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র দেখা যায়। এর পূর্বেও যখন বার্তিককার সিদ্ধান্ত করলেন—শাস্ত্র পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয়, শব্দের জ্ঞানে ধর্ম হয় না। তখনও মহাভাষ্য-কার প্রথমে বার্তিকের মতে সেই শাস্ত্রপূর্বক শব্দপ্রয়োগে ধর্ম হয়—ইহা ব্যাখ্যা করে পরে নিজে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তির দ্বারা শব্দের জ্ঞানেও ধর্ম হয়—ইহা ব্যবস্থাপিত করলেন। এখানেও ঠিক বার্তিককার কেবল সূত্র বা কেবল শব্দ ব্যাকরণশব্দের অর্থ হতে পারে না—ইহা দেখিয়ে শব্দ ও সূত্র এই উভয়কে যখন ব্যাকরণশব্দের অর্থ বলে সিদ্ধান্ত করলেন, মহাভাষ্যকারও ঠিক বার্তিক-কারের মত অনুসারে ব্যাখ্যা করলেন। এখন তিনি নিজে স্বতন্ত্র ভাবে কেবল সূত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে ব্যবস্থাপিত করবার জন্য যুক্তির উপন্যাস করে-ছেন। তিনি বললেন কেবল সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হউক। মহাভাষ্যকার

এইকথা বলাতে কেবল সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলে বার্তিককার যে দোষের আপত্তি দিয়েছিলেন পূর্বপক্ষী সেই দোষের স্মরণ করিয়ে বলছেন—"নন্থ চোক্তং সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোহনুপপন্ন ইতি।" কেবল সূত্র, ব্যকরণ শব্দার্থ হলে সূত্রের নিজের সঙ্গে নিজের ভেদ না থাকায় 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ ষষ্ঠীর অর্থ অসঙ্গত হয়ে যায়।

তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন "নৈষ দোষঃ, ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ভবিষ্যতি।" বিশিষ্ট অপদেশ ব্যপদেশ অর্থাৎ মুখ্য ব্যবহার। সেই ব্যপদেশ আছে যার সে হলো ব্যপদেশী অর্থাৎ যার [যে বস্তুর] মুখ্য ব্যবহার আছে সে ব্যপদেশী। যেমন "রামস্য গৃহম্" এখানে রামের ষষ্ঠীব্যবহার মুখ্য। কারণ এই মুখ্যব্যবহারের স্বস্বামিত্বরূপ সম্বন্ধ বা নিমিত্ত আছে। কিন্তু যেখানে মুখ্য ব্যবহারের নিমিত্ত নাই সেখানে ব্যপদেশীর মত নিমিত্ত—সম্বন্ধাদির নিমিত্ত ভেদের কল্পনা করে ব্যবহার হয়, তাকেই 'ব্যপদেশিবদ্ ভাব' বলা হয়। যেমন "রাহুর শির" এখানে ষষ্ঠীর মুখ্যব্যবহারের নিমিত্ত, ভেদ নাই; কারণ 'রাহু' হচ্ছে মস্তকমাত্র, রাহুর অন্যকোন শরীরাবয়ব নাই। রাহুর স্বরূপ হচ্ছে মস্তকমাত্র, সেই মস্তক থেকে যদি ভিন্নরূপে রাহুর হস্ত পদাদি সমুদায় থাকতো তা হলে, 'রাহুর শির' এইরূপ মুখ্যব্যবহার হত। কিন্তু এই মুখ্যব্যবহারের নিমিত্ত যে ভেদ সেই ভেদ নাই এই জন্য এ স্থলে ভেদের কল্পনা করে 'রাহুর শির' এইরূপ ব্যবহার হয়। "রাহুর শির" এইরূপ ব্যবহারে যে জ্ঞান হয় তাকে যোগদর্শনে বিকল্পাত্মক জ্ঞান বলে। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" বস্তু নাই, অথচ শব্দের সামর্থ্যে একপ্রকার যে জ্ঞান হয়, তাকে বিকল্প বলে। রাহু ও শিরের ভেদ নাই, অথচ 'রাহুর শির' এইরূপ শব্দ থেকে একপ্রকার জ্ঞান হয়। ইহাই ব্যপদেশিবদ্ভাব। মহাভাষ্যকার বলেছেন এইরূপ সূত্র এবং ব্যাকরণের মধ্যে ভেদ না থাকলেও 'রাহুর শির" এই ব্যবহারের মত 'ব্যাকরণের সূত্র' এখানেও এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হবে। তারপর সূত্রমাত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে বার্তিককার যে দ্বিতীয় দোষ দিয়েছিলেন "শব্দাপ্রতিপত্তিঃ" অর্থাৎ "ব্যাকরণ থেকে শব্দ জানে" লোকের যে এইরূপ ব্যবহার হয়, সূত্র মাত্র থেকে লোকে শব্দ জানতে পারে না বলে, সূত্রমাত্রকে ব্যাকরণ শব্দার্থ বললে সেই "ব্যাকরণ থেকে শব্দ জানে', এই ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়ে যাবে। এই দোষের উদ্ধার করবার

জন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন—"যদপ্যুচ্যতে শব্দাপ্রতিপত্তিঃ·········পরিহৃতং যেতৎ তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি।" কেবল সূত্র থেকে লোকে শব্দ জানে না, কিন্তু সূত্রের ব্যাখ্যা থেকে শব্দ জানে বলে সূত্রমাত্রে ব্যাকরণ শব্দের প্রবৃত্তি হলে, 'ব্যাকরণ থেকে শব্দ জানে, এইব্যবহার অনুপপন্ন হবে না। কারণ সূত্রই বিগ্রহ যুক্ত অর্থাৎ পদগুলির বিভাগকরা হলে সেই সূত্রই ব্যাখ্যাস্বরূপ হয়। সেই ব্যাখ্যা হতে লোকে শব্দ জানে। অতএব শব্দাপ্রতিপত্তি দোষ হয় না। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলছেন "নমু চোক্তম্ ন কেবলানি চর্চাপদানি··· ·· ···ব্যাখ্যানং ভবতি।" পূর্বেই বলা হয়েছে যে "বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্" ইত্যাদিরূপে কেবল সূত্রের পদগুলির বিভাগকরে দিলে ব্যাখ্যা হয় না ; কিন্তু উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যাধ্যাহার ইত্যাদি করলে তবে ব্যাখ্যা হয়। সুতরাং কেবল সূত্র [সূত্রের বিভক্ত পদসমূহ] ই ব্যাখ্যা হয় না বলে, সূত্রমাত্র থেকে শব্দ জানা যায় না। ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন "অবিজানত এতদেবং ভবতি·······...ন্নাদো গৃহ্যেত।" এতৎ=এইশব্দ জ্ঞান। এবং—উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যাধ্যাহার প্রভৃতি ব্যাখ্যাসহিত সূত্র থেকে শব্দের জ্ঞান। যারা মনে করে উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যাধ্যাহার, বিগ্রহ ইত্যাদি সহিত সূত্র থেকে শব্দের জ্ঞান হয় ; তাদের এইরূপ মনে করাটা অজ্ঞান থেকে হয়। তারা প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। কেন তারা অজ্ঞান ? তার উত্তরে বলেছেন ভাষ্যকার—সূত্র থেকেই লোকের শব্দ জ্ঞান হয়। প্রশ্ন হতে পারে কেবল সূত্র থেকে কিরূপে শব্দের জ্ঞান হবে ? সূত্র থেকেই তো লোকের শব্দের জ্ঞান হয় না। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—যে উৎসূত্র বলে অর্থাৎ যে সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্যের বাহিরে উদাহরণ ইত্যাদি বলে, তার সেই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হতে পারে না। মহাভাষ্যকারের এই কথা থেকে সূচিত হয়েছে উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যাধ্যাহার প্রভৃতি যা কিছু ব্যাখ্যা সে সবই সূত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। সূত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত নাই এইরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করে তা হলে, তাহা উৎসূত্র বলে অপ্রামাণিক হবে। সেই ব্যাখ্যা শিষ্টব্যক্তিরা গ্রহণ করবেন না। সুতরাং প্রামাণিক যা কিছু ব্যাখ্যা তা সূত্রে অন্তর্নিহিত বলে "সূত্র থেকেই লোকে শব্দ জানে" মহাভাষ্যকারের এই কথা যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

মহাভাষ্যকারের এই কথা যে যুক্তিযুক্ত তদ্বিষয়ে একটি শ্লোক দেখা যায়। নাগেশ তার উল্লেখ করেছেন 'সূত্রেষ্বেব হি তৎসর্বং যদ্বৃত্তৌ যচ্চ বার্তিকে। সূত্রং যোনিরিহার্থানাং সূত্রে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥" বৃত্তিতে অর্থাৎ ভাষ্যাদি ব্যাখ্যাতে যাহা উক্ত হয় এবং বার্তিকে যাহা উক্ত হয়, সে সমস্তই সূত্রে থাকে সূত্রেই সকল অর্থের যোনি অর্থাৎ কারণ, সূত্রেই সব প্রতিষ্ঠিত।

মহাভাষ্যে যে 'আতশ্চ' এইখানে 'আতঃ' শব্দটি আছে উহা একটি নিপাত। তাহার অর্থ "অতঃ" অর্থাৎ এই হেতু। তারপর "নাদো গৃহ্যেত" এইস্থলে "ন অদঃ" এইরূপ বিচ্ছেদ করে নিয়ে অর্থ বুঝতে হবে। অদস্ শব্দের নপুংসকলিঙ্গের একবচনের রূপ "অদঃ" অর্থ—উহা। অথবা "নাদঃ" শব্দমাত্র [অর্থশূন্য] যে উৎসূত্র বলে তার শব্দ 'নাদ' মাত্র অর্থাৎ অর্থশূন্য শব্দমাত্র ॥ ৬৭ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথ কিমর্থো বর্ণানামুপদেশঃ ?

[বার্তিক]

বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ ॥ ১৬ ॥

[মহাভাষ্য]

বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ। কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি। বৃত্তয়ে সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ।

কা পুনর্বৃত্তিঃ ? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ। অথ কঃ সমবায়ঃ ? বর্ণানামানুপূর্ব্যেণ সন্নিবেশঃ। অথ ক উপদেশঃ ? উচ্চারণম্। কুত এতৎ ? দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ। উচ্চার্য হি বর্ণানাহ—উপদিষ্টা ইমে বর্ণা ইতি ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ] [আচ্ছা] অইউণ্ ইত্যাদিরূপে] বর্ণের উপদেশ কি প্রয়োজনে ? [বার্তিকানুবাদ] [শাস্ত্রের] প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রমবিশেষের জন্য [বর্ণ সকলের] উপদেশ।

[মহাভাষ্যানুবাদ] [শাস্ত্রের] প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রমবিশেষের [ক্রমবিশেষ বুঝাবার জন্য . জন্য বর্ণসকলের উপদেশ। বৃত্তিসমবায়ের অর্থ কি ? [বৃত্তি-সমবায়—এইখানে কিরূপ সমাস হয়েছে] ?

বৃত্তির নিমিত্ত সমবায়—বৃত্তিসমবায়। অথবা বৃত্ত্যর্থক সমবায় বৃত্তিসমবায়। অথবা বৃত্তিপ্রয়োজন সমবায় বৃত্তি-সমবায়। বৃত্তি কি ? [বৃত্তি শব্দের অর্থ কি ?] শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। সমবায় কি ? [সমবায় শব্দের অর্থ কি ?] বর্ণ সকলের পৌর্বাপর্যরূপে সন্নিবেশ। উপদেশ কি ? [উপদেশ শব্দের অর্থ কি ?] উচ্চারণ। কিহেতু ইহা [উপদেশের অর্থ—উচ্চারণ কেন ?] দিশধাতু উচ্চারণার্থক। বর্ণসকল—উচ্চারণ করেই বলে—এই বর্ণসমূহ উপদিষ্ট হল ॥ ৬৮ ॥

বিবৃতি :—ব্যাকরণ শাস্ত্রই শব্দানুশাসনশাস্ত্র। এই ব্যাকরণে সাধুশব্দের অনুশাসন করা হবে – ইহাই সংক্ষেপে মহাভাষ্যকারের তাৎপর্য বলে এযাবৎ মহাভাষ্য থেকে জানা গেছে। কিন্তু ব্যাকরণের প্রথমেই যে 'অইউণ্, ঋ ৯ ক্,' ইত্যাদি ১৪টি সূত্র আছে; তাতে বর্ণেরই উপদেশ করা হয়েছে। বর্ণের উপদেশের দ্বারা তো কোন সাধু শব্দের অনুশাসন হয় না। সুতরাং এইসকল বর্ণের উপদেশের প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কা মহাভাষ্যকার উঠিয়েছেন—"অথ কিমর্থোবর্ণানামুপদেশঃ ?" এই গ্রন্থে। ইহার উত্তরে বার্তিককার বলেছেন—"বৃত্তি-সমবায়ার্থ উপদেশঃ।" এখানে 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ—"প্রবৃত্তি" শাস্ত্রের অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। সেই বৃত্তির জন্য অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রবৃত্তির জন্য সমবায়. বৃত্তিসমবায়। 'সমবায়' শব্দের অর্থ = বর্ণসমূহের ক্রমবিশেষ 'অ ই উণ্—' ইত্যাদি ক্রমবিশেষ। সুতরাং 'বৃত্তিসমবায়ে'র—স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে—শাস্ত্রের প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণসমূহের ক্রমবিশেষ। সেই বৃত্তি সমবায় হয়েছে অর্থ = প্রয়োজন যার, তাহা বৃত্তি-সমবায়ার্থ। উপদেশ = বর্ণের উপদেশ। লঘুউপায়ে শাস্ত্রের প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণসকলের যে ক্রমবিশেষ তাহা বুঝানো হচ্ছে—[অইউণ্ ইত্যাদিরূপে] বর্ণ-উপদেশের প্রয়োজন। লোকে প্রসিদ্ধ যে মাতৃকাবর্ণ "অ আ ই ঈ ইত্যাদি, তার দ্বারা বর্ণের জ্ঞান হয়। কিন্তু সেইরূপ বর্ণজ্ঞানের দ্বারা পাণিনি ব্যাকরণের লঘুউপায়ে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন—'দধি + অত্র' এখানে ইকারের স্থানে য্-কার বিধান করতে গেলে বলতে হবে—স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই ঈ স্থানে য্ হয়।

আবার 'মধু+অত্র' এখানকার সন্ধির জন্য বলতে হবে স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়। এতে অনেক গৌরব হয়ে যায় কিন্তু অইউণ' ইত্যাদি মাহেশ্বর সূত্রের দ্বারা প্রত্যাহার সংজ্ঞা সিদ্ধ হলে—"ইকো যণচি" এইরূপ অতি সংক্ষিপ্ত শব্দের সাহায্যে—স্বরবর্ণ পরে থাকলে, ইঈ, উঊ, ঋৠ,ঌ র স্থানে যথাক্রমে য্, ব্, র্ ল্ আদেশ হয়—ইহা জানা যায়। এতে অনেক লাঘব হয়। এইভাবে লঘু উপায়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রবৃত্তির নিমিত্ত "অইউণ্" ইত্যাদিরূপে বর্ণোপদেশ করা হয়েছে। ইহাই "বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ" এই বার্তিকের তাৎপর্যার্থ। বার্তিককার বর্ণোপদেশের আরও কতকগুলি প্রয়োজন পরে বলবেন। "বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ" এই বার্তিকের ব্যাখ্যা করতে মহাভাষ্যকার 'বর্ণানাম্' পদের অধ্যাহার করে বলেছেন—বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ। কার উপদেশ? বর্ণসকলের উপদেশ। ইহাই অর্থ।

"বৃত্তিসমবায়ার্থ." এই বার্তিকাংশের "বৃত্তিসমবায়" শব্দটিতে কিরূপ সমাস হয়েছে ইহা জানাবার জন্য মহাভাষ্যকার প্রশ্ন উঠিয়েছেন—"কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি।" অর্থাৎ 'বৃত্তিসমবায়ে' কি সমাস? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন "বৃত্তয়ে সমবায়ঃ········ বৃত্তিসমবায়ঃ। মহাভাষ্যকার পূর্বে 'ধর্মনিয়মঃ' শব্দে যেভাবে সমাসবাক্য দেখিয়েছিলেন, এখানেও ঠিক সেই রীতিই অবলম্বন করেছেন, তার দ্বারা "বৃত্তিসমবায়" শব্দে কিন্তু চতুর্থীতৎপুরুষ সমাস হয় নাই। কারণ প্রকৃতি-বিকৃতিভাব না থাকলে এরূপস্থলে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয় না। এখানে বৃত্তি ও সমবায়ের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই। কিন্তু তাদর্থ্যে চতুর্থী দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে তাদর্থ্যরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়ে সম্বন্ধে যে ষষ্ঠী হয়, সেই ষষ্ঠ্যন্তের সহিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস প্রতিপাদন করা। সুতরাং প্রথমে "বৃত্তেঃ সমবায়ঃ"—বৃত্তিসমবায়ঃ' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়েছে। এই প্রথম ষষ্ঠীসমাস পক্ষে অর্থ হচ্ছে—লাঘব বশত অর্থাৎ প্রত্যাহার সংজ্ঞার দ্বারা শাস্ত্রে প্রবৃত্তির জন্য বর্ণের উপদেশ।

তারপর মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় বিগ্রহ দেখিয়েছেন 'বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ঃ বৃত্তিসমবায়ঃ।' এই দ্বিতীয় বিগ্রহে—বৃত্তি শব্দটি লক্ষণাদ্বারা বৃত্ত্যর্থকে বুঝাচ্ছে। বৃত্তি=মানে বৃত্ত্যর্থ। সুতরাং 'বৃত্তিশ্চাসৌ সমবায়শ্চেতি। এইরূপ কর্মধারয় সমাস করে "বৃত্তিসমবায়ঃ" এই পদ সিদ্ধ হয়েছে—ইহাই বুঝতে হবে। এই দ্বিতীয় বিগ্রহে অর্থ হচ্ছে—শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী যে

সমবায় অর্থাৎ বর্ণসমূহের ক্রমবিশেষ ; তাহা। যেমন—“ইগ্ যণঃ সম্প্রসারণম্” [১।১।৪৭]। যণের স্থানে [য্ ব্ র্ ল্ স্থানে] যে ইক্ [ই উ ঋ ৯] তাহাকে সম্প্রসারণ বলে। এখানে যে য্ ব্ র্ ল্ স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ৯ আদেশ —ইহা ‘অইউণ্’ ইত্যাদি সূত্রে বর্ণের ক্রমবিশেষেরই ফল।

এরপর তৃতীয় বিগ্রহে বলা হয়েছে—“বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ঃ বৃত্তিসমবায়.”। বৃত্তিঃ প্রয়োজনং যস্য স ‘বৃত্তিপ্রয়োজনঃ’ এইভাবে প্রথমে বহুব্রীহি সমাস করে, তারপর “বৃত্তিপ্রয়োজনঃ সমবায়ঃ” এইরূপ শাকপার্থিবাদিবৎ কর্মধারয় অর্থাৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস করে, মধ্যবর্তী ‘প্রয়োজন’ পদের লোপ করে “বৃত্তিসমবায়ঃ’ এইপদ সিদ্ধ হয়েছে।

এইপক্ষে “বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ” এর অর্থ হচ্ছে—এইরূপ বর্ণগত ক্রম বিশেষের দ্বারা প্রথমে ‘ইৎসংজ্ঞা তারপর ‘প্রত্যাহার’ সংজ্ঞা, তারপর “ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ” [৬।৩।১১১] ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। এইভাবে মহাভাষ্যকার ‘বৃত্তিসমবায়’ শব্দের সমাস প্রদর্শন করে ‘বৃত্তি’ শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করবার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন = ‘কা পুনর্বৃত্তিঃ’ ? অর্থাৎ এখানে ‘বৃত্তি’ শব্দের অর্থ কি ? এর উত্তরে বলেছেন = “শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ” পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের [সূত্রের] প্রবৃত্তি।

‘সমবায়’ শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করবার জন্য প্রশ্ন করেছেন—‘অথ কঃ সমবায়ঃ ?’ ‘বৃত্তিসমবায়, এখানকার ‘সমবায়’ শব্দের অর্থ কি ? উত্তরে বলেছেন —“বর্ণানামানুপূর্ব্যেণ সন্নিবেশঃ” বর্ণ সকলের ক্রমবিশেষবিশিষ্ট রূপে উপস্থাপন। তারপর ‘উপদেশ’ শব্দের অর্থ জানাবার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন— “অথ ক উপদেশঃ ?” এখানে ‘উপদেশ’ শব্দের অর্থ কি ?
উত্তরে বলেছেন – ‘উচ্চারণম্’। “উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্” বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে আদ্য উচ্চারণকে উপদেশ বলে। এখন ‘অই উণ্’ ইত্যাদি চৌদ্দটি সূত্র যদি মহেশ্বরের আদ্য উচ্চারণ হয়, তাহলে ‘বর্ণসমাম্নায়’ অনাদি বলে যে প্রসিদ্ধি আছে, সেই প্রসিদ্ধি মিথ্যা হয়ে যায়। *এইজন্য এখানে* ‘উচ্চারণ’ শব্দের অর্থ করতে হবে অভিব্যক্তি। শিব চৌদ্দবার ঢক্কা বাজিয়ে ছিলেন। সেই চৌদ্দবার ঢক্কা নিনাদের দ্বারা অনাদি বর্ণসমাম্নায় অভিব্যক্ত হয়েছে (২২৭)।

তারপর মহাভাষ্যকার প্রশ্ন করেছেন—“কুত এতৎ”—কি হেতু ইহা ?

---

(২২৭) নন্বুপদেশ আদ্যোচ্চারণমস্যানাদিত্বাৎ, তৎ কথমুপদেশব্যবহারোঽত আহ —তাবেত্যুচ্চারণমিতি, ঢক্কানিনাদেনাভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ। – মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

অর্থাৎ 'উপদেশ' শব্দ থেকে 'উচ্চারণ' অর্থ কি করে পাওয়া গেল? উত্তরে বলেছেন—"দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ।.........ইমে বর্ণা ইতি।" উচ্চারণ হয়েছে ক্রিয়া যাহার যে দিশ্ ধাতুর তাহা [দিশ্ ধাতু] 'উচ্চারণক্রিয়ঃ"। ধাতুর অর্থ হচ্ছে ক্রিয়া। সুতরাং দিশধাতুর অর্থ উচ্চারণ। দিশ্ ধাতু থেকেই উচ্চারণ ক্রিয়া বুঝায়। 'উপদেশ' শব্দটি উপ+দিশ্ ধাতুর উত্তর ভাবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন। এইজন্য 'উপদেশ' শব্দের অর্থ উচ্চারণ। লোকেও বর্ণসকল উচ্চারণ করে বলে—এই বর্ণসকল উপদিষ্ট হল ॥৬৮॥

মূল

[বার্তিক]

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ ॥ ১৭ ॥

[মহাভাষ্য]

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ কর্তব্যঃ—অনুবন্ধানাসঙ্ক্ষ্যা-মীতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যা আসঙ্‌ক্তুম্।

স এষ বর্ণানামুপদেশো বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধকরণার্থশ্চ। বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্, প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] এবং অনুবন্ধ করবার জন্য [বর্ণসকলের উপদেশ]

[মহাভাষ্যানুবাদ] অনুবন্ধ করবার [বুঝাবার] জন্যও,—অনুবন্ধ করব [বুঝাব] এই হেতু বর্ণসকলের উপদেশ কর্তব্য। বর্ণসকলের উপদেশ না করে অনুবন্ধ করা [বুঝান] সম্ভব নয়। বর্ণসকলের সেই এই উপদেশ—শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণসকলের ক্রম বিশেষের জন্য এবং অনুবন্ধ করবার [জ্ঞাপন করবার] জন্য। শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রম বিশেষ এবং অনুবন্ধনিষ্পাদন প্রত্যাহারের জন্য। প্রত্যাহার, শাস্ত্রের প্রবৃত্তির জন্য ॥ ৬৯ ॥

বিবৃতি :—বার্তিককার বর্ণোপদেশের একটি প্রয়োজন বলেছেন বৃত্তি সমবায়ার্থ অর্থাৎ লাঘববশত শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রম বিশেষ। এখন

বর্ণোপদেশের দ্বিতীয় প্রয়োজন বলছেন—"অনুবন্ধকরণার্থশ্চ।" এখানে 'চ' শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। বর্ণের উপদেশ বৃত্তিসমবায়ার্থ এবং অনুবন্ধকরণার্থ। "উচ্চরিতপ্রধ্বংসঃ হ্যনুবন্ধঃ" অর্থাৎ যাহা উচ্চরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। নাগেশ বলেছেন—যাহা সমুদায়ের শেষে থাকে, এবং যাহাকে অন্যরূপ করা যায় না (২২৮)। যেমন "অইউণ্" এইখানে 'অ, ই, উ, ণ্' এই চারিটি বর্ণের সমুদায়ের শেষে আছে 'ণ্' এই বর্ণটি। একে অন্যরূপ করা যায় না। কার্যকালে একে গ্রহণ করা যায় না, অথচ ইহার কার্য থাকে। "অইউণ্" এখানে প্রথম 'অ' এবং শেষ 'ণ্' এই দুটি বর্ণ নিয়ে 'অণ্' প্রত্যাহার হয়। তাতে 'অ ই উ' এই তিনটি বর্ণকে ধরা হয়; কিন্তু 'ণ্' কে ধরা হয় না। অথচ 'ণ' অক্ষরটি 'অণ্' প্রত্যাহার গঠন করবার জন্য। মহাভাষ্যকার বলেছেন—'অনুবন্ধ করব' এইজন্য বর্ণসকলের উপদেশ করা উচিত। যেহেতু বর্ণের উপদেশ না করে অনুবন্ধ করা যায় না। ঠিক অনুবন্ধ করা যায় না কারণ যাকে অনুবন্ধ করা হবে বলা হচ্ছে, সেই বর্ণ তো পূর্ব থেকে সিদ্ধ হয়েই আছে। এইজন্য 'অনুবন্ধ করার' অর্থ হচ্ছে অনুবন্ধের জ্ঞাপন করা। 'অ ই উ ণ্' এই সমুদায়ে 'ণ্' বর্ণটি যে অনুবন্ধ তাহা জ্ঞাপন করা হচ্ছে, বর্ণোপদেশের প্রয়োজন। এইজন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন—"ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যা আসঙ্‌ক্তুম্।" বর্ণের উপদেশ না দিয়ে অনুবন্ধ করা অর্থাৎ অনুবন্ধ জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে বার্তিককার বললেন— 'বৃত্তিসমবায়ের জন্য এবং অনুবন্ধ করার জন্য বর্ণের উপদেশ।' কিন্তু বৃত্তিসমবায়ের এবং অনুবন্ধ করার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন "বৃত্তসমবায়শ্চ······প্রত্যাহারার্থম্"। শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যুপযোগিবর্ণক্রম বিশেষ এবং অনুবন্ধ করণের প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যাহার। 'প্রত্যাহার' কিসের জন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ।" প্রত্যাহারের প্রয়োজন হচ্ছে—শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। প্রত্যাহার সংজ্ঞা গ্রহণ করে, লঘু উপায়ে পাণিনিব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়েছে। 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে বর্ণা অস্মিন্' অর্থাৎ যাতে বর্ণগুলির সংগ্রহ হয়, তাকে প্রত্যাহার বলে। 'অণ্' 'অক্' প্রভৃতি সংজ্ঞার নাম প্রত্যাহার। এই সংজ্ঞা গুলির দ্বারা অনেক বর্ণের সংগ্রহ হয়। প্রতি+আ+হৃ+অধিকরণ কারকে ঘঞ্ =প্রত্যাহারঃ। লাঘব হেতুক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হচ্ছে প্রত্যাহারের প্রয়োজন। আসঙ্‌ক্তুম্ = আ + সন্জ্ + তুমুন্ ॥ ৬৯ ॥

---

(২২৮) অনুবন্ধত্বং চ সমুদায়ান্ত্যত্বে সতি নানাধেতিতাৎপর্যম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত।

মূল

[বার্তিকাংশ]

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ ॥ ১৮ ॥

[মহাভাষ্য]

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ—ইষ্টান্ বর্ণান্ ভোৎস্যামহে*ইতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণানিষ্টা বর্ণাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] এবং অভিলষিত [বর্ণ] জ্ঞানের [বর্ণ বুঝাবার] জন্য [বর্ণের উপদেশ]। [মহাভাষ্যানুবাদ] ইষ্টজ্ঞানের জন্যও [অভিলষিত বর্ণ জ্ঞাপনের জন্যও] বর্ণ সকলের উপদেশ = ইষ্ট বর্ণ সকল—বুঝাব। বর্ণের উপদেশ না করে = ইষ্ট বর্ণ জ্ঞাপন করা সম্ভব নয় ॥৭০ ॥

বিবৃতি :—বার্তিককার বর্ণোপদেশের তৃতীয় প্রয়োজন বলছেন—"ইষ্ট বুদ্ধ্যর্থশ্চ।" এখানে 'ইষ্ট' বলতে "ইষ্ট বর্ণ সকল" ইহাই বুঝতে হবে। আর 'বুদ্ধি' বলতে 'বোধন' [বুঝান] এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে। কারণ মহেশ্বর পাণিনির নিকট "অ ই উ ণ্" ইত্যাদিরূপে বর্ণের উপদেশ করেছেন—পাণিনিদ্বারা আমাদের ইষ্ট বর্ণ জ্ঞান উৎপাদন করবার জন্য। মহেশ্বরের নিজের ইষ্ট বর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন হবে বলেই মহেশ্বর পাণিনির নিকট উপদেশ করেন নাই। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের যাতে ইষ্টবর্ণের জ্ঞান হয়, সেইজন্য মহেশ্বর বর্ণোপদেশ করেছেন। অতএব ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ এখানে—'ইষ্টবোধনার্থশ্চ' এইরূপ বুধ্ ধাতুর ভিতরে 'ণিচ্' প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভূত বলে বুঝতে হবে। ইষ্টবর্ণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—বর্ণের কলা প্রভৃতি দোষ আছে। সেই কলাদির কথা পরে ভাষ্যকার বলবেন। কলা প্রভৃতি দোষ শূন্য বর্ণ বুঝাবার জন্য—মহেশ্বর বর্ণের উপদেশ করেছেন। ইহাই বার্তিকের অর্থ। মহাভাষ্যকার ইহাই ব্যাখ্যা করবার জন্য বলেছেন "ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ············ভোৎস্যামহে ইতি।" 'ইষ্ট বর্ণ বুঝাব'—এইজন্য বর্ণসকলের উপদেশ। এখানে মহাভাষ্যে "ভোৎস্যামহে" পদ আছে। তার অর্থ 'বুঝব' কিন্তু মহেশ্বর বা পাণিনি বা কাত্যায়ন—এঁরা কি নিজেরা ইষ্টবর্ণ বুঝবার জন্য বর্ণের উপদেশ করেছেন? এঁদের তো ইষ্টবর্ণের

* 'ভোৎস্য' ইতি পাঠান্তর।

জ্ঞান সিদ্ধই আছে। এঁরা নিজেদের ইষ্টবর্ণ জ্ঞানের জন্য বর্ণের উপদেশ করেন নাই। কিন্তু আমাদের ইষ্টবর্ণ জ্ঞানের উৎপাদনের জন্যই তাঁরা বর্ণের উপদেশ করেছেন। অবশ্য বর্ণের উপদেশ মহেশ্বরই করেছেন। তিনিও নিজের জন্য নয়। কিন্তু আমাদের জন্য। অতএব "ভোৎস্যামহে" পদটি সঙ্গত হতে পারে না। এইজন্য নাগেশ বলেছেন—"ভোৎস্যামহে" এই পদের অর্থ—"বোধয়িষ্যামহে" বুঝাব। এখানেও 'ণিচ্' প্রত্যয়ের অর্থ 'বুধ' ধাতুর মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে আছে। ইহাই বুঝতে হবে। অতএব "ইষ্টবর্ণ অর্থাৎ কলাদি দোষশূন্য বর্ণসকল [লোকদের] বুঝাব"—এইজন্য বর্ণের উপদেশ। সেইজন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন—"ন হ্যনুপদিশ্য... .. ..শক্যা বিজ্ঞাতুম।" বর্ণের উপদেশ না করে কলাদি দোষশূন্য বর্ণ বুঝানো যায় না। এই হেতু বর্ণের উপদেশ ॥ ৭০ ॥

মূল

[বার্তিক]

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেদুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিক—দীর্ঘপ্লুতানাম-প্যুপদেশঃ ॥ ১৯ ॥

[মহাভাষ্য]

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেদুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানাম-প্যুপদেশঃ কর্তব্যঃ। এবং গুণা অপি হি বর্ণা ইষ্যন্তে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] ইষ্টবোধনের জন্য যদি হয়, [তাহলে] উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ ও প্লুতে [বর্ণ সকলেরও] রও উপদেশ [করা উচিত]। [মহাভাষ্যানুবাদ] যদি ইষ্ট [বর্ণ] বুঝান [বর্ণোপ-দেশের প্রয়োজন] [উদ্দেশ্য] হয় [তা হলে] উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুতেরও [এই সকল বর্ণেরও] উপদেশ করা উচিত। এইরূপ গুণ বিশিষ্ট বর্ণসকলও ইষ্ট ॥ ৭১ ॥

বিবৃতি :—পূর্বে 'ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ' এই বার্তিকের বর্ণনা করা হয়েছে সেটা স্বতন্ত্র বার্তিক গ্রন্থ নয়। কিন্তু "ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি ·······প্যুপদেশঃ" এই বার্তিকের প্রথম অংশকে আবৃত্তি করে মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য প্রথমে পৃথক ভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই পূর্ব বার্তিকে বলা হয়েছে - ইষ্টবর্ণ

বুঝাবার জন্য বর্ণের উপদেশ করা হয়েছে। তারপর বার্তিককার আশঙ্কা করছেন—"ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেৎ.........উপদেশঃ।" ইষ্ট বর্ণ বুঝানো যদি মহেশ্বরের [বা পাণিনির] উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কলাদি দোষ রহিত বর্ণের উপদেশ করা যেমন উচিত, সেইরূপ উদাত্তত্ব প্রভৃতি গুণ যুক্ত বর্ণেরও উপদেশ করা উচিত। সমস্ত দোষশূন্য বর্ণ যেমন ইষ্ট, সেইরূপ সমস্ত গুণ যুক্ত বর্ণও ইষ্ট। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ, প্লুত বর্ণের জ্ঞানও লোকের অভিলষিত। এই সকল বর্ণের জ্ঞান না হলে, পদের অর্থেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান হবে না। উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। মহেশ্বরের 'অ ই উ ণ্" ইত্যাদি সূত্রে কিন্তু দীর্ঘ, প্লুত, অনুনাসিক এবং উদাত্তাদি তিন স্বর বিশিষ্ট বর্ণের উপদেশ নাই। অথচ সেইসব দীর্ঘ, প্লুত, অনুনাসিক, উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত বর্ণের উপদেশ করা উচিত। কারণ এইরূপ দীর্ঘ, প্লুতাদি বর্ণে জ্ঞান অভিলষিত। একই কালে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বর দিয়ে—সূত্রের পাঠ করা সম্ভব নয়। এইজন্য কোন একটি স্বর দিয়ে সূত্রের পাঠ করতে হবে। যে স্বর দিয়ে সূত্রের পাঠ করা হবে. সেই স্বর ভিন্ন অপর দুটি স্বরের কথা বলে দেওয়া উচিত হবে অর্থাৎ তিনটি স্বরের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করা উচিত। কিন্তু মহেশ্বর তাহা করেন নাই—ইহাই পূর্ব পক্ষীর অভিপ্রায় ॥ ৭১ ॥

মূল

[বার্তিক]

আকৃত্যুপদেশাৎসিদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

[মহাভাষ্য]

অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিঃ। তথোবর্ণাকৃতিঃ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] জাতির উপদেশ থেকে [উদাত্তাদির উপদেশ] সিদ্ধ [হয়ে গেছে]।

[মহাভাষ্যানুবাদ] অবর্ণ জাতি [অত্ব] উপদিষ্ট হয়ে সমস্ত অবর্ণকে গ্রহণ করবে। এইরূপ ইবর্ণ জাতি [ইত্ব] [উপদিষ্ট হয়ে সকল ইবর্ণকে, গ্রহণ করবে। এইরূপ উবর্ণ জাতি ॥ ৭২ ॥

বিবৃতি :—পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে বার্তিককার বলেছেন "আকৃত্যু পদেশাৎ সিদ্ধম্।" যেমন গোত্বাদি জাতির দ্বারা তাদের আশ্রয়রূপ সকল গোব্যক্তিকে সংগ্রহ করা হয়। সেইরূপ অত্ব, ইত্ব প্রভৃতি এক এক বর্ণগত জাতির উপদেশর দ্বরা উদাত্ত প্রভৃতি সকল বর্ণেরই উপদেশ করা হয়েছে। মহেশ্বর সূত্রে [অইউণ] বিশেষ বিশেষ উদাত্ত প্রভৃতি সকল বর্ণের গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আকৃতি অর্থাৎ বর্ণগত জাতিকে প্রধান ভাবে বলতে ইচ্ছা করা হয়েছে বলে, বিশেষ বিশেষ উদাত্ত প্রভৃতি বা দীর্ঘ প্রভৃতি বর্ণের বিবক্ষা করা হয় নাই। জাতির উপদেশ করতে গেলে, অকার প্রভৃতি হ্রস্বব্যক্তির উপ-উপদেশ ব্যতীত জাতির উপদেশ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য "অইউণ্" ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্ব অকারাদি ব্যক্তির উচ্চারণ করা হয়েছে। হ্রস্ব ব্যক্তির উচ্চারণ করলেও সেই হ্রস্বমাত্র বর্ণকে গ্রহণ করা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু হ্রস্ব ব্যক্তি গত অত্ব প্রভৃতি জাতির বিবক্ষা প্রধান ভাবে থাকায় তার দ্বারা সমস্ত দীর্ঘাদি বা উদাত্তাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণব্যক্তি গৃহীত হয়ে গেছে বলে, কোন অনুপপত্তি [কেন দীর্ঘাদির উপদেশ করা হল না ইত্যাদি আশঙ্কার] নাই। মহাভাষ্যকার—সেইজন্য বলেছেন অবর্ণজাতির গ্রহণের দ্বারা সমস্ত অবর্ণ ব্যক্তি গৃহীত হয়ে যায়; এইরূপ ইবর্ণজাতি এবং উবর্ণাদি জাতি দ্বারা সমস্ত ইউ বর্ণ ব্যক্তি গৃহীত হয়ে যায়॥ ৭২॥

মূল

[বার্তিক]

আকৃত্যুপদেশাৎসিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাংপ্রতিষেধঃ॥ ২১॥

[মহাভাষ্য]

আকৃত্যুপদেশাৎসিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

কে পুনঃ সংবৃতাদয়ঃ? সংবৃতঃ কলঃ ধ্মাতঃ এণীকৃতঃ অম্বূকৃতঃ অর্ধকঃ গ্রস্তঃ নিরস্তঃ প্রগীতঃ উপগীতঃ ক্ষ্বিণ্ণঃ রোমশ ইতি। অপর আহ—

গ্রস্তং নিরস্তমবলম্বিতং হৃত-
মম্বূকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্।
সন্দষ্টমেণীকৃতমর্ধকং দ্রুতং
বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ ॥ ইতি।

অতোঽন্যে ব্যঞ্জনদোষাঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] জাতির উপদেশ বশত যদি [দীর্ঘাদি ও উদাত্তাদি] সিদ্ধ হয় [তা হলে] সংবৃত প্রভৃতির নিষেধ [করতে হবে]। [মহাভাষ্যানুবাদ] জাতির উপদেশ থেকে [উদাত্তাদি] সিদ্ধ হয়, ইহা যদি বল [তাহলে] সংবৃত প্রভৃতির নিষেধ বলতে হবে। সংবৃত প্রভৃতি কাহারা? সংবৃত, কল, ধ্মাত, এণীকৃত, অম্বূকৃত, অর্ধক, গ্রস্ত, নিরস্ত প্রগীত, উপগীত, ক্ষিন্ন, রোমশ। অপরে বলেন—গ্রস্ত, নিরস্ত, অবলম্বিত, নির্হত, অম্বূকৃত, ধ্মাত, বিকম্পিত, সংদষ্ট, এণীকৃত, অর্ধক, দ্রুত, বিকীর্ণ; এইগুলি স্বরের দোষ বিষয়ে ভাবনা। এতদ্ভিন্ন দোষ সকল ব্যঞ্জনের দোষ ॥ ৭৩ ॥

বিবৃতি :—"আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধঃ" এইটি একটি সম্পূর্ণ বার্তিক। পূর্বে যে "আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্" এই অংশটি মাত্র উদ্ধৃত করে মহাভাষ্যকার তার ব্যাখ্যা করেছেন—সেটা এই বার্তিকেরই প্রথম খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন করে বা আবৃত্তি করে প্রয়োজনবশত মহাভাষ্যকার তার ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা একটা পৃথক্ বার্তিক নয়। যাই হোক পূর্বে বলা হয়েছিল আকৃতির অর্থাৎ জাতির প্রাধান্য বিবক্ষা করে 'অইউণ্' ইত্যাদিসূত্রে বর্ণের উপদেশ করায় দীর্ঘ প্রভৃতি এবং উদাত্ত প্রভৃতি বর্ণেরও গ্রহণ সিদ্ধ হয়ে যায়। তার উপর এখন আশঙ্কা হচ্ছে—জাতির উপদেশ বশত যদি উদাত্তাদির গ্রহণ সিদ্ধ হয় তা হলে সংবৃত প্রভৃতিরও গ্রহণ সিদ্ধ হয়ে যায় বলে, পৃথগ্ভাবে সংবৃত প্রভৃতির নিষেধ করাও দরকার হয়ে পড়বে। মনুষ্যত্ব জাতির দ্বারা যেমন উত্তম মনুষ্য সকলের সংগ্রহ হয়, সেইরূপ দস্যু তস্করাদি মনুষ্যেরও সংগ্রহ হবে। কারণ দস্যুতস্করাদিমনুষ্যেও মনুষ্যত্ব জাতি থাকে। এইরূপ অত্ব, ইত্ব প্রভৃতি বর্ণগত জাতির দ্বারা যদি সকল অবর্ণ, ইবর্ণ প্রভৃতির গ্রহণ হয়, তা হলে উদাত্তত্বাদি গুণ যুক্ত বর্ণেরও যেমন সংগ্রহ হবে, সেইরূপ কলত্বাদি দোষযুক্ত বর্ণেরও সংগ্রহ হবে। অথচ গুণযুক্ত বর্ণেরই

উচ্চারণ করতে হয়, দোষযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ করতে নাই। দোষযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করলে ইষ্টফল লাভ হয় না, পরন্তু অনিষ্টফল হয়। এখন বর্ণগত জাতির দ্বারা সকল বর্ণের গ্রহণ হলে দোষযুক্ত বর্ণেরও সংগ্রহ হয়ে যায় বলে সেই দোষযুক্ত সংবৃত প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণ করবে না—এইরূপ নিষেধ করে দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। অথচ কি মহেশ্বর, কি পাণিনি কেইই এইরূপ নিষেধ সূচক সূত্র বলেন নাই। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার তাৎপর্য। মহাভাষ্যকার একটি প্রশ্ন উঠিয়েছেন, বার্তিকে যে "সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধঃ" এই বাক্যে সংবৃত প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে—সেই সংবৃত প্রভৃতি কারা—অর্থাৎ বর্ণের দোষ কি কি? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার প্রথমে নিজের মতে ১২ প্রকার দোষের উল্লেখ করেছেন। তার পর অপরের মতে ১২ প্রকরে দোষের বা দোষযুক্ত বর্ণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে নিজের মতে (১) সংবৃত, (২) কল, (৩) ধ্মাত, (৪) এণীকৃত, (৪) অম্বুকৃত, (৬) অর্ধক, (৭) গ্রস্ত, (৮) নিরস্ত, (৯) প্রগীত, (১০) উপগীত, (১১) ক্ষিণ্ন, (১২) রোমশ, এই ১২টীর উল্লেখ করেছেন। তার পর অপরের মতেও ২টির উল্লেখ করেছেন, সেই ১২টির মধ্যে অবলম্বিত, হত বা নির্হত, সংদষ্ট, দ্রুত বিকীর্ণ ও বিকম্পিত এই ছয়টি মহাভাষ্যকারের উল্লিখিত দোষ থেকে ভিন্ন দোষ উক্ত হয়েছে এবং মহাভাষ্যকারের উল্লিখিত সংবৃত, কল, প্রগীত, উপগীত, ক্ষিণ্ন ও রোমশ—এই ছয়টি দোষ বাদ পড়েছে। এই সকল দোষের মধ্যে সংবৃতত্বটি হ্রস্ব অবর্ণ ভিন্ন অপর সকল স্বরবর্ণের দোষ। হ্রস্ব অবর্ণের গুণ হচ্ছে সংবৃতত্ব।

কল=যে বর্ণ যে স্থানথেকে উচ্চারণ করা আবশ্যক, সেই বর্ণকে অন্যস্থান থেকে উচ্চারণ করলে—তাহা কল হয় অর্থাৎ কলত্ব দোষ যুক্ত হয়। ধ্মাত=যার নিশ্বাস প্রশ্বাস খুব জোরে জোরে পড়ে সে ব্যক্তি হ্রস্ববর্ণ উচ্চারণ করলেও দীর্ঘের মত মনে হয় ঐরূপ বর্ণকে ধ্মাত বলে। এণীকৃত=সন্দিগ্ধ। এমন ভাবে উচ্চারণ করে যে ওকার কি ঔকার—তার নিশ্চয় হয় না, পরন্তু সন্দেহ হয়। ঐরূপ উচ্চারিত বর্ণকে এণীকৃত বলে। অম্বুকৃত=বর্ণ উচ্চারণকারী ব্যক্তি কোন বর্ণকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে, অথচ উচ্চারণটা মুখের ভিতরের দিকে কিছুটা হচ্ছে, এইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে অম্বুকৃত বলে। অর্ধক=যে উচ্চারণে দীর্ঘবর্ণও হ্রস্বের মত উচ্চারিত হয় ঐরূপ উচ্চারিত

বর্ণকে অর্ধক বলে। গ্রস্ত=যে উচ্চারিত বর্ণ জিহ্বার মূলে কিছুটা নিরুদ্ধ হয়, সেই বর্ণই গ্রস্তসংজ্ঞক হয়। নিরস্ত=কর্কশভাবে উচ্চারিত বর্ণ অথবা তাড়াতাড়ি উচ্চারিত বর্ণকে নিরস্ত বলে। প্রগীত=গানের মত যে বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় তাকে প্রগীত বলে। উপগীত=একটি বর্ণের নিকটে আর একটি বর্ণ এমন ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বর্ণটি প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে—এইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে উপগীত বলে। ক্ষিণ্ণ=কম্পনযুক্তরূপে উচ্চারিত বর্ণকে ক্ষিণ্ণ বলে। রোমশ=গম্ভীরভাবে উচ্চারিতবর্ণকে রোমশ বলে। অবলম্বিত=অপরবর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অন্য যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাকে অবলম্বিত বলে। নির্হত=কর্কশভাবে উচ্চারিত বর্ণকে নির্হত বলে। সন্দষ্ট=যে উচ্চারিত বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তের মত মনে হয় সেইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে সন্দষ্ট বলে। বিকীর্ণ=একবর্ণ অপর বর্ণে যদি ব্যাপ্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তাহলে তাকে বিকীর্ণ বলে। শ্লোকে যে "স্বরদোষভাবনাঃ" শব্দটি আছে তার অর্থ বলেছেন নাগেশ—'স্বরদোষজাতি সকল'। এই যে দোষ ১২টি বা ১৮টি বা বলা হয়েছে এগুলি স্বরবর্ণের দোষ বুঝতে হবে। "স্বরদোষ জাতি" ১২ বা ১৮। সুতরাং দোষ ব্যক্তি অনন্ত ইহা কৈয়ট বলেছেন। এইসকল স্বরদোষ থেকে ভিন্ন যে দোষ সেগুলি ব্যঞ্জন বর্ণের দোষ। মহাভাষ্যকার এই কথা বলে ব্যঞ্জনবর্ণের দোষ কতগুলি বা কি কি সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই ॥ ৭৩ ॥

মূল

নৈষ দোষঃ।

[বার্তিক]

গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎসংবৃতাদীনাং নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[মহাভাষ্য]

গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি। অস্ত্যন্যদ্ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনম্। কিম্? সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি। [প্রত্যাপত্তিবচনম্] এবং তর্হ্যষ্টাদশধা ভিন্নাং নিবৃত্তকলাদিকামবর্ণস্য প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি। সা তর্হি বক্তব্যা ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ] [না] এই দোষ হয় না। [বার্তিকানুবাদ] গর্গাদির [গণে] বিদাদির [গণে] [সংবৃতত্বাদিদোষরহিত] পাঠ আছে ; এই হেতু সংবৃত প্রভৃতির [সংবৃতত্বাদি দোষযুক্ত বর্ণের] নিবৃত্তি [হয়]। [মহাভাষ্যানুবাদ] গর্গাদির এবং বিদাদির [সংবৃতত্বাদি দোষরহিত] পাঠ আছে বলে, সংবৃত প্রভৃতির [সংবৃতত্ব প্রভৃতির] নিবৃত্তি হবে। গর্গাদি ও বিদাদি [গণে] তে [বর্ণসকলের বা বর্ণঘটিত গর্গাদি ও বিদাদির] পাঠে অন্যপ্রয়োজন আছে। কি ? [কি অন্যপ্রয়োজন ?] সমুদায়ের [গর্গাদি সমুদায় ও বিদাদি সমুদায়ের] যাহাতে সাধুত্ব [কলত্বাদিদোষরহিতত্ব] হয়। [প্রতিবিধি বচন—পুনরুদ্ধার বাক্য] এইরূপ হলে [গর্গাদি বিদাদি পাঠের অন্য প্রয়োজন থাকলে] আঠার প্রকারে বিশিষ্ট কলত্বাদি দোসশূন্য অবর্ণ প্রতিবিধি বলব। তাহলে সেই প্রতিবিধি বলা উচিত [বল]॥ ৭৪ ॥

বিবৃত্তি :—আশঙ্কা হয়েছিল—বর্ণগত জাতির প্রধানভাবে বিবক্ষা করে যদি সমস্ত উদাত্তাদি ও দীর্ঘাদি বর্ণের সংগ্রহ করা হয়; তাহলে সংবৃতাদি বর্ণেরও সংগ্রহ হয়ে যাবে। সেই সংবৃতাদি বর্ণের আবার নিষেধ করতে হবে। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার পরবর্তী বার্তিক গ্রন্থানুসরণে বলছেন—"নৈষ দোষ :" না এই দোষ অর্থাৎ পূর্বোক্ত দোষ হয় না। কেন দোষ হয় না ? তার উত্তরে বার্তিকগ্রন্থ হচ্ছে—"গর্গাদি বিদাদি পাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তিঃ।" গর্গাদি গণে [৪।১।১০৫] গর্গাদিশব্দের এবং বিদাদিগণে [৪।.।১০৪] বিদাদিশব্দের পাঠ আছে। সেই গর্গাদিশব্দ এবং বিদাদিশব্দ সংবৃতত্ব প্রভৃতিদোষরহিত বর্ণের দ্বারা ঘটিত অর্থাৎ গর্গাদিগণে বা বিদাদিগণে যে সকল শব্দের উল্লেখ আছে—সেই সকল শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলি সংবৃতত্বাদি দোষশূন্য। সংবৃতত্বাদি দোষশূন্য বর্ণ সমূহের দ্বারা ঘটিত গর্গাদিশব্দের ও বিদাদিশব্দের সেই সব গণে উচ্চারণ করা হয়েছে। সুতরাং সেই গর্গাদি ও বিদাদি শব্দে দোষশূন্য বর্ণের জ্ঞান হলে অন্যত্রও পাঠক দোষশূন্যরূপে বর্ণসকল উচ্চারণ করতে পারবে। অতএব বর্ণগত জাতির দ্বারা উদাত্তাদি বর্ণের সংগ্রহ হলেও সংবৃতাদি বর্ণের গ্রহণ হবে না, কারণ গর্গাদি ও বিদাদির পাঠ থেকেই সংবৃতাদি বর্ণের নিবৃত্তি —হয়ে যবে। ইহাই বার্তিককারের এই বার্তিকগ্রন্থের অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকারও এইভাবে বার্তিক ব্যাখ্যা করে আর একটি আশঙ্কা উঠিয়েছেন "অন্যদ্......প্রয়োজনম্"। গর্গাদিগণে গর্গাদিশব্দের এবং বিদাদিগণে

বিদাদিশব্দের পাঠের অন্য প্রয়োজন আছে। সংবৃতত্বাদি দোষনিবৃত্তি করা গর্গাদিপাঠের বা বিদাদিপাঠের প্রয়োজন নয়, কিন্তু অন্যপ্রয়োজন আছে। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূবপক্ষী জিজ্ঞাসা করেছেন 'কিম্?' অর্থাৎ কি অন্য প্রয়োজন আছে? তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি।" গর্গাদি শব্দের উত্তর যঞ্ প্রত্যয় করে এবং বিদাদি শব্দের উত্তর অঞ্ প্রত্যয় করে সমুদায়ের অর্থাৎ গর্গাদি প্রকৃতি যুক্ত প্রত্যয়ের যাতে সাধুত্ব হয় = গার্গ্য ইত্যাদি পদ বা বৈদ ইত্যাদি পদ যাতে সিদ্ধ হয় তার জন্য গর্গাদি-গণে গর্গাদিশব্দের এবং বিদাদিগণে বিদাদিশব্দের পাঠ আছে—বর্ণগত সংবৃতত্ব প্রভৃতি দোষ নিবৃত্তির জন্য গর্গাদির বা বিদাদির পাঠ করা হয় নাই। ইহাই মহাভাষ্যকারের আশঙ্কার অভিপ্রায়। [দোষের পুনরুদ্ধারের বর্ণন] [প্রত্যাপত্তি-বচনম্] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে যে পাঠ দেওয়া হয়েছে, তাহা সকল পুস্তকে নাই। এইজন্য উহা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যাহা হউক্, মহাভাষ্যকারের পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে তিনি স্বয়ংই বলেছেন—"এবং তর্হি····· প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি।" অর্থাৎ গর্গাদি ও বিদাদি পাঠের যদি অন্য প্রয়োজন থাকে, তার দ্বারা যদি সংবৃতাদি বর্ণের নিবৃত্তি না হয়, তাহলে অবর্ণের যে সকল দোষ আছে সেই দোষ নিবৃত্তি করে বা সেই সকল দোষ শূন্যরূপে অবর্ণের প্রতিবিধি অর্থাৎ দোষের পুনঃ উদ্ধার করব। এখানে মহাভাষ্যে অবর্ণ টি উপলক্ষণ বুঝতে হবে বর্ণমাত্রই এখানে অবর্ণের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছে। অবর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে ১৮ প্রকার ভেদ আছে বলে মহাভাষ্যকার বলেছেন 'অষ্টাদশধা ভিন্নাম্"। এইরূপ ই বর্ণ, উ বর্ণ ও ঋ বর্ণেরও ১৮ প্রকার ভেদ বুঝতে হবে। আর সংবৃতত্বটি হ্রস্বঅবর্ণের গুণবলে মহাভাষ্যকার অবর্ণের 'নিবৃত্তকলাদিকাম্' বলেছেন। অর্থাৎ কলত্বাদি দোষশূন্য অবর্ণের, সংবৃতত্বাদিদোষশূন্য ই বর্ণের, এইরূপ যথাযোগ্য দোষশূন্য বর্ণ সকলের প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ দোষের পুনরুদ্ধারের বচন বা বর্ণনা করব। মহাভাষ্য-কার পানিনির 'অ অ' [৮।৪।৬৮] এই শেষ সূত্রের ভাষ্যে অবর্ণের দোষ [কলত্বাদিদোষ] সমূহের উদ্ধার করেছেন। সেই জন্য এখানে বলছেন অবর্ণের কলত্বাদিদোষের উদ্ধার করব বা কলত্বাদি দোষশূন্য অবর্ণ বিষয়ক প্রতিবিধি [দোষের পুনরুদ্ধারের বিধান] বলব। অবর্ণ উপলক্ষণ সকলবর্ণেরই দোষের উদ্ধার করা হবে—ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকারের এই

কথায় পূর্বপক্ষী বলেছেন—"সা তর্হি বক্তব্যা" সেই প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ প্রতিবিধি বা দোষোদ্ধারের বর্ণনা করা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্রের [পাণিনি-ব্যাকরণের] শেষে যদি সমস্ত বর্ণের সংবৃতত্ব প্রভৃতি দোষনিবৃত্তির জন্য প্রতি-বিধান [দোষের পুনরুদ্ধার] করা হয় তাহলে গৌরব দোষ হয়ে যাবে। এই গৌরব দোষ প্রদানকরাই এখানে পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় ॥৭৪ ॥

মূল

[বার্তিক]

লিঙ্গার্থা তু প্রত্যাপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

[মহাভাষ্য]

লিঙ্গার্থা সা তর্হি ভবিষ্যতি। তত্তর্হি বক্তব্যম্। যদ্যপ্যেত-দুচ্যতে। অথবা এতর্হি অনেকমনুবন্ধশতং নোচ্চার্যমিৎসংজ্ঞা চ ন বক্তব্যা, লোপশ্চ ন বক্তব্যঃ। যদনুবন্ধৈঃ ক্রিয়তে তৎকলাদিভিঃ করিষ্যতে। সিধ্যত্যেবম্, অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাস-মেবাস্তু। ননু চোক্তম্ "আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধ" ইতি। পরিহৃতমেতৎ গর্গাদিবিদাদি পাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তির্ভবিষ্যতীতি। ননু চান্যদগর্গাদিবিদাদি-পাঠে প্রয়োজনমুক্তম্। কিম্? সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি। এবং তহ্যুভয়মনেন ক্রিয়তে—পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে কলাদয়শ্চ নিবর্ত্যন্তে। কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্? লভ্যমিত্যাহ। কথম্? দ্বিগতা অপি হেতবো ভবন্তি। তদ্ যথা :— আম্রাশ্চ সিক্তাঃ পিতরশ্চ প্রীণিতা ইতি। তথা বাক্যান্যপি দ্বিষ্ঠানি ভবন্তি—শ্বেতো ধাবতি, অলম্বুসানাং যাতেতি। অথবা ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ—কেমে সংবৃতাদয়ঃ শ্রূয়েরন্নিতি? আগমেষু। আগমাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। বিকারেষু তর্হি। বিকারা অপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রত্যয়েষু তর্হি। প্রত্যয়া অপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। ধাতুষু তর্হি। ধাতবোঽপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রাতিপদিকেষু তর্হি।

প্রাতিপদিকান্যপি শুদ্ধানি পঠ্যন্তে। যানি তর্হি অগ্রহণানি প্রাতি-পদিকানি। এতেষামপি স্বরবর্ণানুপূর্বীজ্ঞানার্থ উপদেশঃ কর্তব্যঃ। শশঃ ষষ ইতি মা ভূৎ। পলাশঃ পলাষ ইতি মা ভূৎ। মঞ্চকো মঞ্জক ইতি মা ভূৎ।

আগমাশ্চ বিকারাশ্চ প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ।
উচ্চার্যন্তে ততস্তেষু নেমে প্রাপ্তাঃ কলাদয়ঃ॥ ৭৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে প্রথমমাহ্নিকম্।

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] [ধাতুপ্রভৃতিতে স্থিত কলত্ব প্রভৃতি] লিঙ্গের [নিবৃত্তির জন্য] জন্যও [পুনরুদ্ধার] প্রতিবিধি। [মহাভাষ্যানুবাদ] তা হলে [বর্ণসকলের সংবৃতত্বাদি দোষনিবৃত্তির জন্য প্রত্যাপত্তিতে গৌরব হলে] সেই প্রত্যাপত্তি [ধাতুপ্রভৃতি গত কলত্বাদিলিঙ্গ নিবৃত্তির] লিঙ্গের নিমিত্তও হবে। তা হলে সেই [ধাত্বাদিগত কলত্বাদি] লিঙ্গ বলতে হবে। যদিও ইহা [সেইলিঙ্গ] বলা হয়। অথবা এখন অনেক শত অনুবন্ধ উচ্চারণ করবার প্রয়োজন নাই, ইৎসংজ্ঞা বলবার প্রয়োজন নাই, লোপ [সংজ্ঞা] বলবার প্রয়োজন নাই। অনু-বন্ধের দ্বারা যাহা [যে প্রয়োজন] করা হয়, কলা [কলত্ব] প্রভৃতির দ্বারা তাহাই করা হবে। এইরূপে [সকল অর্থ] সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা পাণিনির মতানু-যায়ী হয় না। যেমন ভাবে বর্ণনা আছে, সেই ভাবেই থাকুক।

আজ্ঞে! বলা হয়েছে—জাতির উপদেশ দ্বারা অনুদাত্তাদিবর্ণের গ্রহণ সিদ্ধ হলেও সংবৃতত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট বর্ণের গ্রহণ হয়ে যাওয়ায় তাদেরও নিষেধ করতে হবে।

এর পরিহার [উত্তর] করা হয়েছে [গর্গাদিগণে এবং বিদাদিগণে] গর্গাদির ও বিদাদির পাঠ থেকে সংবৃত প্রভৃতির নিবৃত্ত হবে।

আজ্ঞে! বলা হয়েছে—গর্গাদির ও বিদাদির পাঠবিষয়ে অন্য প্রয়োজন আছে। কি? [কি প্রয়োজন]। সমুদায়ের যাহাতে সাধুত্ব সিদ্ধ হয় [সেই প্রয়ো-জন সিদ্ধ হয়]। এইরূপ হলে [গর্গাদি বিদাদি পাঠের অন্য প্রয়োজন থাকলে]

তাহলে ইহার দ্বারা [গর্গাদি ও বিদাদির পাঠের দ্বারা] উভয় [প্রয়োজন] করা [নিষ্পাদন করা] হয়, [গর্গাদির ও বিদাদির] পাঠই [গর্গাদি বিদাদিগণে শুদ্ধ বর্ণপাঠ] বিশেষিত করা হয় এবং কলত্ব প্রভৃতিরও নিবৃত্তি করা হয়। একপ্রযত্নে কিরূপে উভয় লব্ধ হয়? লব্ধ হয়—ইহা [সিদ্ধান্তী] বলেন। কিরূপে? [কিভাবে উভয়ের লাভ হয়]। হেতু সকল দুই অর্থগত [দুই প্রয়োজন সম্পাদক] হয়। যেমন—আম্রবৃক্ষ সকল জলসিক্ত হয় ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন। সেইরূপ বাক্যসকল ও দুই অর্থে স্থিত হয়। শ্বেতো ধাবতি [শ্বেত ধাবন করে]। অলম্বুসানাং যাতা [অলম্বুসদেশের গমনকর্তা] ইত্যাদি। অথবা ইহাকে [পূর্বপক্ষীকে] ইহা [এইবিষয়] জিজ্ঞাসা করতে হবে—এই সংবৃত প্রভৃতি কোথায় শুনেছ? আগম সকলে [শুনেছি]। আগম সকল শুদ্ধভাবে পাঠকরা হয়। তাহলে বিকার সমূহে [শুনেছি]। বিকার সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে প্রত্যয়সমূহে [শুনেছি] প্রত্যয়সমূহও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে ধাতুসমূহে [শুনেছি] ধাতুসকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে প্রাতিপদিক সমূহে [শুনেছি]। প্রাতিপদিক সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে যে প্রাতিপদিকগুলি কার্যবিধিতে অনূদিত হয় নাই, [সেই সকল প্রাতিপদিকে সংবৃতত্বাদি দোষ শুনেছি]। এইসকল অগ্রহণ প্রতিপদিকেরও স্বর; বর্ণের আনুপূর্বী [যথাক্রমে] জ্ঞানের জন্য উপদেশ [অনুবাদরূপে গ্রহণ] করতে হবে। যাতে 'শশঃ' এইস্থলে 'ষষ:' এইরূপ না হয়। "পলাশ:" এইস্থলে 'পলাষ:' এইরূপ না হয়। 'মঞ্চক:' এইস্থলে 'মঞ্জক:' এইরূপ না হয়।

আগম, বিকার, ধাতুর সহিত প্রত্যয় [শুদ্ধভাবে] উচ্চারতি হয়। সেই হেতু সেই আগম প্রভৃতিতে এই কলত্বাদির প্রাপ্তি নাই ॥ ৭৫ ॥

ইতি পস্পশাহ্নিকের বার্তিক ও মহাভাষ্যের অনুবাদ।

বিবৃতি :—পূর্বে বলা হয়েছিল অত্ব, ইত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা উদাত্তাদি সকল বর্ণব্যক্তির সংগ্রহ করলে সংবৃতত্ব বা কলত্ব প্রভৃতি বিশিষ্টরূপে অশুদ্ধ বর্ণগুলিরও সংগ্রহ হয়ে যাবে; সেইগুলির আবার নিষেধ করতে হবে। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছিলেন শাস্ত্রের শেষে সকল বর্ণের কলত্বাদিদোষের উদ্ধারার্থ প্রতিবিধি করা হবে। তাতে পূর্বপক্ষী বলেছিলেন শাস্ত্রান্তে সমস্ত বর্ণের প্রতিবিধি বললে গৌরব দোষ হয়ে যাবে। এই গৌরব দোষ বারণের জন্য এখন বার্তিককার বলছেন "লিঙ্গার্থা তু প্রত্যাপত্তিঃ"।

অর্থাৎ 'ডু পচষ্ পাকে' এই ধাতুর 'ডু' এবং 'ষ্' টি অনুবন্ধ। তার 'ইৎ' হয়। 'ইৎ' হলে লোপ হয়। এই ভাবে অনেক ধাতু, প্রত্যয়, প্রভৃতিতে যে অনুবন্ধ হয়, সেই অনুবন্ধ স্থানীয় ধাতুপ্রভৃতিতে স্থিত যে কলত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ, সেই লিঙ্গের জন্য—লিঙ্গের নিবৃত্তির জন্যও শাস্ত্রান্তে প্রত্যাপত্তি করা হবে। শাস্ত্রের শেষে বর্ণগত সংবৃতত্বাদি দোষোদ্ধারের জন্যই যে কেবল প্রতিবিধি করা হবে তা নয় কিন্তু ধাতু প্রভৃতি স্থিত কলত্ব প্রভৃতি লিঙ্গেরও নিবৃত্তির জন্য প্রতিবিধি [দোষোদ্ধারার্থ বিধি] করা হবে। অতএব গৌরব দোষ হতে পারে না। মহাভাষ্যকারও বার্তিকের ব্যাখ্যায় এই কথা বলেছেন "লিঙ্গার্থা সা তর্হি ভবিষ্যতি।" অনুবন্ধস্থানীয় ধাতুপ্রভৃতিস্থিত কলত্বাদি লিঙ্গনিবৃত্তির জন্যও সেই প্রত্যাপত্তি বা দোষোদ্ধার প্রতিবিধি করা হবে। বার্তিককার ও মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলেছেন 'তত্তর্হি বক্তব্যম্' অর্থাৎ ধাতু প্রভৃতিতে স্থিত কলত্বাদি লিঙ্গের কথা বল। সেই সমস্ত কলত্বাদি লিঙ্গের কথা বললেও গৌরব দোষ পরিহৃত হয় না, পরন্তু গৌরব দোষ থেকে যায় —এই অভিপ্রায়ে পূর্বপক্ষী বলেছেন। পূর্বপক্ষীর এই দোষ পরিহারের জন্য মহাভাষ্যকার বার্তিকের এবং মহাভাষ্যেরও প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলছেন "যদ্যপ্যেতদুচ্যতে অথবৈতর্হি ·····করিষ্যতে।" যদিও ধাতু প্রভৃতিস্থিত কলত্বাদি লিঙ্গ বলা হয়, তথাপি শাস্ত্রে ধাতু প্রভৃতিতে অনুবন্ধ, ইৎসংজ্ঞা, লোপ প্রভৃতি না করায় গৌরব দোষ হয় না। এক একটি অনুবন্ধের শত শত উচ্চারণ করা হয়, আবার অনেক অনুবন্ধ আছে। অতএব অনেক শত শত অনুবন্ধ করতে গেলে তার আবার ইৎ সংজ্ঞা করতে হবে, তার আবার লোপ করতে হবে। এতে অনেক গৌরব হয়ে যায়। সেই সব অনুবন্ধ, ইৎসংজ্ঞা, ইতের লোপ না করার জন্য গৌরব হবে না। অনুবন্ধ না করলে "অণ্ ইক্" প্রভৃতি প্রত্যাহার সংজ্ঞা কি করে করা হবে? তার উত্তরে প্রদীপকার কৈয়ট বলেছেন "আদিরন্ত্যেন সহেতা" এইরূপ প্রত্যহার সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্র না করে "আদি কলৈঃ সহ" এইরূপ বলব। আর 'অণ্' এইরূপ সংজ্ঞা না করে "অইউ" এইরূপ সংজ্ঞা করা হবে। এতে "অইউণ্" এইরূপ সূত্রে 'ণ্' রূপ অনুবন্ধ করতে হবে না। অনুবন্ধ জনিত ইৎ সংজ্ঞা করতে হবে না। এবং 'লোপ' ও করতে হবে না। এইরূপ ধাতুতেও অনুবন্ধ না করে, কলাদি বর্ণের গ্রহণের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন

"অনুদাত্তঙিত আত্মনেপদম্" এই সূত্রের দ্বারা—এধ-ধাতুর অনুদাত্ত স্বর ইৎ হয় বলে এবং শীঙ্ ধাতুর ঙ্ ইৎ হয় হলে আত্মনেপদ হয়। এধ ধাতুর অকারকে অনুদাত্ত অনুবন্ধ এবং শীঙ্ ধাতুর ঙ্‌কে অনুবন্ধ ইৎ না করে কলত্ব দোষযুক্ত রূপে পাঠ করে "কলাদাত্মনে পদম্" এইরূপ সূত্র করলে আত্মনেপদ সিদ্ধ হবে। অথচ অনুবন্ধ করা, ইৎ সংজ্ঞা করা ও লোপ করা প্রভৃতি অনেক গৌরব থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়। এইভাবে ধাতুপ্রভৃতি অনুবন্ধাদি না করে কলত্বাদি দোষ যুক্তরূপে পাঠ করলে অনেক গৌরব পরিহৃত হয়। তারপর শাস্ত্রের শেষে বর্ণগত কলত্বাদি দোষ নিবৃত্তির জন্য প্রত্যাপত্তি করলে সেই সমস্ত দোষনিবৃত্তি হয়ে যাবে। এতে আর গৌরব হবে না। এইভাবে প্রত্যাপত্তির দ্বারা দুটি কার্য সিদ্ধ হবে—বর্ণগত সংবৃতত্বাদিদোষের নিবৃত্তি হবে এবং ধাতুপ্রভৃতির ঘটক বর্ণগত কলত্বাদি দোষের নিবৃত্তি হবে। মহাভাষ্য কার বলেছেন অনুবন্ধের দ্বারা যে কার্য করা যেত, সেই কার্যই কলত্বাদিযুক্ত বর্ণের দ্বারা করা হবে। তাতে অনুবন্ধাদিকরণ জনিত গৌবব দোষ হবে না। মহাভাষ্যের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেছেন "সিধ্যত্যেবম্, অপাণিনীয়ং তু ভবতি।" যদিও এভাবে সংবৃতত্বাদিদোষের পরিহার হয় অথচ অনুবন্ধাদির অকরণ জনিত গৌরবদোষেরও পরিহার হয়, তথাপি এই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন পাণিনির মতানুযায়ী নয়। কারণ "অইউণ্" ইত্যাদি বর্ণসমাম্নায়কে সমর্থন করবার জন্য বর্ণগত জাতির দ্বারা সকলবর্ণ সংগৃহীত হয়, বলায় সংবৃতত্বাদি দোষযুক্ত বর্ণেরও গ্রহণ হয়। সেই দোষ পরিহার করবার জন্য অনুবন্ধাদি না করে অন্য ভাবে ধাতু প্রভৃতির বর্ণকে কলত্বাদিযুক্ত উচ্চারণ করে, শাস্ত্রান্তে প্রত্যাপত্তির দ্বারা সেই দোষ পরিহার করলে 'বিছার ভয়ে পালিয়ে এসে সাপের মুখে পড়ার মত হয় অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা করার আবশ্যক হয় বলে অনেক কষ্ট কল্পনা করতে হয়। অথচ পাণিনি সরল উপায়েই লোকের শব্দজ্ঞানের জন্য প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং বার্তিককারের বা মহাভাষ্যকারের এই উপায় পাণিনির রীতি নয়। পূর্বপক্ষী এইরূপ দোষ প্রদান করলে মহাভাষ্যকার বলছেন "যথান্যাসমেবাস্তু।" অর্থাৎ "অইউণ্" ইত্যাদি বর্ণসমাম্নায়ে যেমন ভাবে বর্ণের সন্নিবেশ আছে, সেই সন্নিবেশেই অত্বাদি জাতির দ্বারা সকলবর্ণের গ্রহণ হোক। এর উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেছেন "ননু চোক্তম্ ...প্রতিষেধ ইতি।" জাতির উপদেশের দ্বারা সকল বর্ণের

গ্রহণ সিদ্ধ হলে সংবৃতাদিরও গ্রহণ হওয়ায় তাদের নিষেধ করতে হবে—এই দোষের কথা আমি পূর্বে বলেছিলাম।

উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"পরিহৃতমেতৎ নিবৃত্তিস্তু ভবিষ্যতীতি।" গর্গাদি বিদাদি পাঠ থেকে সংবৃতাদি বর্ণের নিবৃত্তি হবে—এই উত্তর বলেছি। পূর্বপক্ষী পুনরায় তাঁর পূর্বউক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—"ননু চান্যদ্............ সাধুত্বং যথা স্যাদিতি" গর্গাদি বিদাদি পাঠের অন্ত প্রয়োজন বলেছিলাম, প্রকৃতি প্রত্যয় সমুদায়ের সাধুত্ব গর্গাদি বিদাদি পাঠের প্রয়োজন—একথা বলেছিলাম। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"এবং তর্হি.........নিবর্ত্যন্তে।" গর্গাদি ও বিদাদি পাঠের অন্য প্রয়োজন থাকলেও সংবৃতত্বাদি দোষেরও নিবৃত্তি হবে। গর্গাদি প্রকৃতি এবং যঞ্ প্রত্যয় এই সমুদায়ের সাধুত্বও যেমন সিদ্ধ হবে, সেইরূপ সংবৃতত্ব প্রভৃতি দোষেরও নিবৃত্তি হবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠের এই উভয় প্রয়োজন আছে।

মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করেছেন—"কথং পুনরেকেন প্রযত্নেনোভয়ং লভ্যম্" একযত্নে কিরূপে উভয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—"উভয় প্রয়োজনের লাভ হয়।" পূর্বপক্ষী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছেন—"কথম্"? একযত্নে উভয় প্রয়োজন কি করে সিদ্ধ হয়, ব্যাখ্যা করে বুঝাও। ইহাই হচ্ছে পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকার উত্তরে উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন—'দ্বিগতা অপি......যাতেতি।" দ্বৌ [অর্থো] গতাঃ দ্বিগতাঃ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। অনেক হেতু দুটি করে প্রয়োজন সম্পাদন করে, অর্থাৎ একটি কর্ম থেকে দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যেমন আমগাছে জলসেচন করলে আমগাছগুলি যেমন সিক্ত হয়, সেইরূপ পিতৃপুরুষও তৃপ্ত হন। আবার অনেক বাক্যেরও দুই অর্থ আছে যেমন—শ্বেতো ধাবতি। অলম্বুসানাং যাতা বা ইতো ধাবতি—কুকুর এদিকে আসছে। শ্বেতো ধাবতি—শ্বেতী [ধবল কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত] দৌড়াচ্ছে। অলম্বুসানাং যাতা—অলম্বুলদেশে গমনকর্তা। অলং বুসানাং যাতা—খড়ের মত যাদের রং তাদের গমন কর্তা সমর্থ। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে গর্গাদিবিদাদি পাঠেরও উভয় প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকার এইভাবে গর্গাদি বিদাদি পাঠের দ্বারা পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা দূর করে অন্যভাবে—সংবৃতত্বাদিদোষের প্রসক্তি নাই এই কথা বলেছেন—অথবা "ইদং তাবদয়ং......নেমে প্রাপ্তাঃ

কল্পায়ঃ।" অভিপ্রায় এই যে—কেবল এক একটি বর্ণের প্রয়োগ লোকে করা হয় না, কিন্তু সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের প্রয়োগ করা হয় বা ধাতু, প্রাতিপদিক প্রভৃতির উচ্চারণ করা হয়। শিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থাৎ পাণিনি প্রভৃতি আচার্য ব্যক্তিগণ, ধাতু, প্রাতিপদিক প্রভৃতি যেভাবে পাঠ করেছেন—সেখানে তাঁরা শুদ্ধবর্ণবিশিষ্টরূপেই পাঠ করেছেন। সুতরাং সংবৃতত্বাদিদোষের প্রসক্তিই যখন নাই, তখন সংবৃতত্বাদিদোষের প্রতিষেধ করতে হবে—পূর্বপক্ষীর এই আশঙ্কা নির্মূল হয়ে যায়। এখানে পূর্বপক্ষী একটি কথা বলেছেন "অগ্রহণানি প্রাতিপদিকানি" এর অর্থ হচ্ছে—'ডিত্থ' 'ডবিত্থ' প্রভৃতি কতকগুলি প্রাতিপদিক আছে—যাকে ব্যাকরণের সূত্রে গ্রহণ করা হয় নাই অর্থাৎ ব্যাকরণের প্রক্রিয়ায় যাদের উল্লেখ করা হয় নাই। সেই সব প্রাতিপদিকে সংবৃতত্বাদিদোষ আছে। ইহাই পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছিলেন। উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—এই সকল প্রাতিপদিকেরও উপদেশ করতে হবে। নাগেশ উপদেশের অর্থ করেছেন—"ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ" ইত্যাদি সূত্রে অনুবাদরূপে এই সকল ডিত্থ, ডবিত্থ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের গ্রহণ করা হয়েছে সুতরাং সেই সব প্রাতিপদিকেও অশুদ্ধবর্ণের পাঠ নাই। স্বর ও বর্ণের যথাযথ সন্নিবেশের জ্ঞানের জন্য ঐ সকল প্রাতিপাদিকেরও গ্রহণ করতে হবে, তাতে সেই সকল প্রাতিপদিকেও সংবৃতত্বাদি দোষ থাকবে না। এইটা বুঝাবার জন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন—"শশঃ" এই শব্দটির অর্থ খরগোস। সেই খরগোস অর্থে—যাতে "ষষঃ" এইরূপ পাঠ কেহ না করে, তারজন্য এই প্রকারের প্রাতিপদিকগুলিকেও শুদ্ধভাবে ব্যাকরণ প্রক্রিয়ায় অনুবাদরূপে গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে 'পলাশঃ' স্থলে যাতে 'পলাষঃ' পাঠ না করে। "মঞ্চকঃ" স্থলে 'মঞ্জকঃ' পাঠ না করে। এইসব বলে মহাভাষ্যকার উপসংহারে বলেছেন—আগম, বিকার, ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতি সর্বত্রই শুদ্ধভাবে পঠিত হয়েছে। সুতরাং সংবৃতত্বাদিদোষের প্রাপ্তি নাই। মহাভাষ্যকারের শেষোক্ত কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে—'সংবৃতাদির প্রতিষেধ পক্ষ' নিরাকৃত হয়েছে অর্থাৎ 'অইউণ্' ইত্যাদি বর্ণোপদেশের প্রয়োজন কি? এর উত্তর দিতে গিয়ে বার্তিককার প্রসঙ্গক্রমে যে সংবৃতত্বাদির প্রতিষেধ করতে হবে বলেছিলেন—, সেই প্রতিষেধের আর প্রসঙ্গ নাই, ইহাই মহাভাষ্যকার বললেন। সর্বত্র শুদ্ধবর্ণের পাঠ আছে বলে সংবৃতত্বাদির প্রসঙ্গ না থাকায় তার প্রতিষেধের কথাও উঠতে পারে

না। আর মহাভাষ্যকারের এই কথায় বুঝা গেল যে সর্বত্র ধাতু প্রভৃতিতে শুদ্ধবর্ণ উচ্চারিত হয়েছে বলে, কোথায়ও অনিষ্টবর্ণের জ্ঞান হয় না। অতএব "ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ" অর্থাৎ ইষ্টবর্ণের জ্ঞানের জন্য বর্ণের উপদেশ এই তৃতীয় প্রয়োজনটি আর বর্ণোপদেশের প্রয়োজন নয়। সর্বত্রই যখন শুদ্ধ বর্ণের পাঠ আছে, তখন পাঠ থেকেই শুদ্ধবর্ণের জ্ঞান হবে। তারজন্য আর বর্ণোপদেশের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং "বৃত্তিসমবায়ার্থ" এবং "অনুবন্ধকরণার্থ' এই দুইটিই বর্ণোপদেশের প্রয়োজন—ইহাই মহাভাষ্যকারের শেষোক্তি দ্বারা সূচিত হয়েছে ॥ ৭৫ ॥

ইতি মহর্ষিপতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকের বিবৃতি ।